প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাংলা সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী

হুমায়ুন কবির

সভাপতি

রাসবিহারী দাস

অমিয়কুমার মজুমদার

কর্মসচিব

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে
দেবেশ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় এবং শেষ খণ্ড প্রকাশের এই শুভ অবসরে যাঁদের সাহায্যে এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকেই অভিনন্দন জানাই। ১৯৪৮ সালে মওলানা আজাদের উদ্যোগে এই গ্রন্থ রচনা সুরু হয়। ভারতীয় এবং অভারতীয় কৃতবিদ্য বহু দার্শনিকের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রবন্ধ একত্র সমাবেশ করে ১৯৫২ সালে গ্রন্থখানি ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শনের এরকম সমাবেশ পূর্বে বোধহয় কোনদিন হয়নি, সেদিক থেকে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব দর্শনের প্রথম ইতিহাস বলে দাবী করতে পারে। পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজও গ্রন্থখানিকে পৃথিবীর দর্শন সাহিত্যে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম অবদান হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

দেশ ও কালের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষের যে গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য, সাহিত্য দর্শন শিল্পবিজ্ঞানে তা উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও যুগের দর্শন আলোচনায় মানুষের ঐক্য স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয়। সম্পাদক মণ্ডলীর বিশ্বাস যে মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ঐক্য এ গ্রন্থেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই এ ধরণের গ্রন্থের বহুল প্রচারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি পরস্পরকে আরো ভালোভাবে জানবার সুযোগ পাবে এবং সে পরিচয়ের ফলে তাদের পারস্পরিক প্রীতি শ্রদ্ধাও বেড়ে চলবে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির পরস্পরের পরিচয়ের জন্য রচিত এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষীর পরিচয়েও সাহায্য করবে, এ আশা প্রথম থেকেই আমাদের ছিল। প্রথম থেকেই তাই উদ্দেশ্য ছিল যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। একথা স্বতোসিদ্ধ যে কেবলমাত্র ইংরাজির মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান ভারতবর্ষের পঁয়তাল্লিশ কোটী লোকের কাছে পৌছনো অসম্ভব। ইংরাজি বর্তমান জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র, কিন্তু সেই যোগসূত্রে যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আসে, দেশের সমস্ত লোকের কাছে তাকে পৌছতে হলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে তাকে প্রকাশিত করতে হবে। কেবল একটী ভারতীয় ভাষার বিকাশে ভারতবর্ষের জনমানস পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন সমস্ত ভারতীয় ভাষার প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও তাদের সমান শ্রীবৃদ্ধি।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীদের পক্ষে এটা আনন্দের কথা যে বাঙলা ভাষাতেই এ গ্রন্থখানির প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই অনুবাদের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। গ্রন্থখানির বাঙলা সংস্করণ প্রকাশও সহজ ছিল না। পরিভাষার মুস্কিলের কথা ছেড়ে দিলেও এ-ধরণের রচনার অনুবাদ সকলে করতে পারেন না। যাঁদের এ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান গভীর, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙলায় লিখতে অভ্যস্ত নন। যাঁরা বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দর্শনের এ ধরণের চুলচেরা বিচারে বিরক্তি ও ক্লান্তি অনুভব করেন। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ১৯৫৯ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। আজ ১৯৬৫ সালে নানা মুস্কিল নানা বাধা ও প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও যাঁদের উৎসাহ ও সাহায্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল, তাঁদের সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ভারত সরকার ও বাঙলা সরকারের অর্থ সাহায্য ও সমর্থন ভিন্ন এতবড় কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হত না। সেজন্য বাঙালী পাঠক তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা সংস্করণের সম্পাদক মণ্ডলীর উপর যে কার্যভার ন্যস্ত হয়েছিল, অধ্যাপক রাসবিহারী দাস ও অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদারই তা সম্পূর্ণভাবে বহন করেছেন, তার জন্য সাধারণ পাঠকের যে কৃতজ্ঞতা, তা ছাড়া আমি নিজে তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবেও কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত সুধী প্রবন্ধগুলি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বাঙালী পাঠক ঋণী। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীর দর্শনের পরিচয় বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন ধরণের রচনার বহুদূর প্রসারী সম্ভাবনা দেখা দিল।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন ধরে অন্তরাল থেকে বহু লেখক ও শিল্পীকে সাহায্য করেছেন। আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এককালে নতুন ও অপরিচিত লেখকের রচনা বহুক্ষেত্রে তাঁর সহায়তায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উৎসাহ, উদ্যম এবং নিরলস প্রচেষ্টা ভিন্ন এ বইখানিও কখনোই বাঙালী পাঠকের হাতে এত সত্বর পৌঁছত না।

নয়া দিল্লী
১লা মে, ১৯৬৫

হুমায়ুন কবির

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ প্রাচীন চিন্তাধারা ঃ মধ্যপ্রাচ্য এবং গ্রীস

দ্বিতীয় ভাগ ঃ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা

চতুর্থ খণ্ড : সমকালীন ইউরোপীয় দর্শন

দ্বিতীয় খণ্ড

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পারসীক চিন্তাধারা

ক। ঐতিহাসিক ভূমিকা

প্রাচীন পারস্যের ধর্মপ্রবর্তক জরথুস্ত্র—প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন পারসীক ধর্মপ্রবর্তকের নাম "জোরায়াষ্টার" এই আকারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা এই নাম "জোরোযাস্ট্রেস" বলিয়া উচ্চারণ করিত। লাটিন ভাষায় এই নাম "জোরোয়াস্ট্রেস" রূপে প্রচলিত হইল এবং পরে "জোরোয়াস্টার" এই পরিচিত আকার ধারণ করিল। প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে প্লেটোর আল্‌সিবাইডাস্ নামক গ্রন্থে এই নামেই তাঁহার প্রাচীনতম প্রামাণিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে খৃঃ পূঃ ছয় হাজার বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এরূপ মনে করা হইয়া থাকে। জোরোয়াষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর, অর্থাৎ জোরোয়াষ্টার যখন জীবিত ছিলেন তখন হইতে দুই হাজার বৎসর পরে লিখিত বুন্দাহিস্ক, আর্‌দা বিরাফ এবং জটসপরম এই সকল পহ্লবী গ্রন্থের ভিত্তিতে যে ইরাণী ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তদনুসারে তিনি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের তিন শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আল্‌বিরুণী মসুদি এবং অন্যান্য আরব লেখকগণ এই কল্পনামূলক ঐতিহ্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের এই মতই সর্বত্র গৃহীত হইত।

আরিষ্টট্‌ল, ইউডোক্সাস এবং হারমিপাস লিখিয়াছিলেন যে জোরোয়াষ্টার ট্রয়যুদ্ধের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। লেয়ার্টবাসী ডায়োজিনিস হারমোডোরাস এবং জান্‌থাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া একই কথা বলিয়াছেন। অপরপক্ষে এরিট্রিয়া-বাসী দিওদোরাস এবং এরিষ্টোজেনাস বলিয়াছেন যে পাইথাগোরাস জোরোয়াষ্টারের শিষ্য ছিলেন। প্লিনি সেইজন্য জোরোয়াষ্টার নামে মাত্র এক ব্যক্তিই ছিলেন অথবা ঐ নামধারী বহু ব্যক্তি ছিলেন এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন। প্লিনির সন্দেহ অমূলক নয়।

জোরোয়াষ্টারের তিরোধানের পর যাঁহারা মেডিয়ার রাঘা নগরীতে সর্বোচ্চ ধর্ম-গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইতেন তাঁহাদিগকে জরথুস্ত্রতেম অর্থাৎ "জরথুস্ত্র অথবা জোরো-ষ্টারের প্রায় সমতুল্য" এই নামে অভিহিত করা হইত।

গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া প্রথমে ইউরোপে ও পরে আমেরিকায় প্রাচ্য ভাষা, ধর্ম এবং সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে এই প্রশ্নের উপর প্রচুর আলোক-সম্পাত হইয়াছে।

আবেস্তা ভাষা সংস্কৃতের সহোদরা। প্রাচীন বলিয়া পরিচিত ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহে যে বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জোরোয়াষ্টার কর্তৃক রচিত গাথা অর্থাৎ পবিত্র স্তোত্রসমূহেও বর্তমান। ঋগ্বেদ এবং গাথাগুলির ব্যাকরণ, ছন্দ এবং রচনারীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ গাথাসমূহের বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি বৈদিক বিভক্তি প্রত্যয় হইতেও প্রাচীন। আধুনিক মতানুসারে বেদরচনার ও গাথারচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয়। জোরোয়াষ্টার অন্ততঃ ১০০০ খৃঃ পূঃ কালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিত আজকাল যে মত পোষণ করিয়া থাকেন তাহাই ঠিক।[১]

প্রাচীন পারস্যের দর্শন—বৌদ্ধমত ধর্ম নয় দর্শন এইরূপ বলা হয়। অপরপক্ষে জোরোয়াষ্ট্রীয় মত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা দর্শন নয় ধর্ম।

বর্তমানকালে যে স্থানকে হামাদান বলা হয়, প্রাচীন পারস্যে যাহাকে একবতন বলা হইত, ব্যাবিলনীয় শিলালিপিতে যাহাকে অগমতনু বলা হইত এবং গ্রীকরা এচবতন বলিত তাহার অর্থ হইতেছে "বহু পথের মিলন"। প্রাচীন পারস্য যেমন বিভিন্ন জাতির রাজপথ ছিল ঠিক তেমনই ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ সমূহের মিলন-ভূমি ছিল এবং ইতিহাসের বিভিন্নযুগে এইসকল মতবাদকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়াছিল।

জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে বিশ্বাসী প্রাচীন ইরাণীয়দের তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারে অনুরাগ ছিল না। "জরথুস্ত্রের ধর্মমত ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তত্ত্বসম্বন্ধীয় নয়। যাহাতে মানুষের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত পারসীকদের ধীশক্তি চরমতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারকে যাহা অসম্ভব তাহা করিবার চেষ্টা মনে করিয়া নিন্দা করিত।"[২]

কিন্তু পারসীকরা চিরন্তন সত্যসমূহ সম্বন্ধে বিচার করিত এবং এই সকল বিচার প্রাচীন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সেইরূপ, পারস্যের জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মমতের প্রভাবে যে মিথ্র-উপাসনা এবং ম্যানিকীয় মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল সেইগুলি পরবর্তী সময়ে ইউরোপে গিয়াছিল এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম মিলন—৬০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সাইরাস আইওনিয়া জয় করিয়াছিলেন। মাইলেশীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক থালিসের সময় হইতে গ্রীক্ দার্শনিকগণ প্রাচ্য মহাদেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আপামীয়াবাসী নুমেনিয়াস্

বলেন যে পিথাগোরাস এবং প্লেটো পারস্যের পুরোহিতদের এবং যে ব্রাহ্মণগণ পারস্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ চিন্তার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বর আহুর মজ্‌দা—আহুর মজ্‌দা—পরে যাঁহাকে অর্মাজ্‌দ বলা হইত—বলিতে 'পরম জ্ঞান' অথবা "জ্ঞানী পরম পুরুষ" বুঝায়। তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। তিনি সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা-কর্তা এবং পোষক। তিনি অদৃশ্য এবং অস্পর্শ। তিনি সত্য, ন্যায়বান্ এবং করুণাময়। যাহারা তাঁহার বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাঁহার ভালবাসার প্রার্থী তিনি তাহাদের বন্ধু এবং পিতা। তাঁহার বহু গুণ আছে। এই গুণগুলি তাঁহার আগন্তুক ধর্ম নয় পরন্তু তাঁহার নিজস্ব সত্তার অঙ্গীভূত। জড়রূপে তিনি আলোক এবং নৈতিকরূপে তিনি সত্য।

স্পেন্তা মইন্যু অথবা পবিত্র আত্মা—আহুর মজ্‌দার সৃজনী শক্তি এবং চিন্তার অভিব্যক্তি হইতেছেন স্পেন্তা মইন্যু অথবা পবিত্র আত্মা। আহুর মজ্‌দার চিন্তায় যাহা আদর্শ অথবা সর্বোত্তম সত্তা ইনি তাহারই প্রতীক। সৃষ্টির মধ্য দিয়া ঐশ চিন্তা জড়রূপ ধারণ করিলে তাহা দোষযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং সেইজন্য স্পেন্তা মইন্যুর প্রতিপক্ষ অথচ তাঁহারই সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ অংগ্র মইন্যু অথবা দুষ্ট আত্মা সর্বদাই তাঁহার পিছনে থাকে। পরবর্তীকালে এই দুষ্ট আত্মাকে অহ্রিমান বলা হইত। পরমেশ্বরের বক্ষ হইতে এই দুই আদিম যমজ আত্মা উদ্ভূত হইয়াছিল। স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পবিত্র আত্মা ধর্মকে এবং দুষ্ট আত্মা পাপকে গ্রহণ করিয়াছিল। মনুষ্যজাতির পরম শত্রু হিসাবে দুষ্ট আত্মা দুরভিসন্ধিপূর্ণ চাতুরী দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া মনুষ্যকে পাপের পথে লইয়া যায়।

জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মে আহুর মজ্‌দার প্রথম সৃষ্টি বহুমনঃ অর্থাৎ "উত্তম মন"কে আহুর মজ্‌দার পুত্র বলা হইয়াছে।

প্রাচীন বাইবেলে জিহোবার আত্মার কথা আছে। ফাইলো জুডিয়াস্ বলেন যে প্রজ্ঞা (Logos) ঈশ্বরের প্রথম-জাত সন্তান। তিনি ঈশ্বর এবং জগতের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধির কাজ করেন। এই প্রজ্ঞা প্লেটোর 'মঙ্গল-রূপ চরমতত্ত্ব' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। স্পেন্তা মইন্যু বা পবিত্র আত্মার ন্যায়ই তিনি সৃজন-কার্যে রত। স্পেন্তা মইন্যু এবং তাঁহার বিরোধী শক্তি অংগ্র মইন্যুকে দ্বরেষ্টার অর্থাৎ নির্মাণকারী বা কর্তনকারী বলা হইয়াছে। ফাইলোও সেইরূপ প্রজ্ঞাকে তোমীয়াম্ বা কর্তনকারী বলিয়াছেন এবং এই শব্দটিকে ঐ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আবার যেমন আলোকময় আত্মা স্পেন্তা মইন্যুর পিছনে সর্বদাই তাঁহার প্রতিপক্ষ অন্ধকারময় আত্মা বর্তমান, তেমনই ফাইলো বলেন যে প্রজ্ঞা যেমন ঈশ্বরের আলোক বা মহিমা তেমনই ইহাই আবার ঈশ্বরের অন্ধকার

বা ছায়াও বটে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, যাহা সৃষ্ট তাহা স্রষ্টার একাংশকে প্রকাশ করে এবং অপরাংশকে আবৃত করিয়া রাখে।

"সলোমনের জ্ঞান" নামক গ্রন্থে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা (Logos) এক এইরূপ বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান ঈশ্বর সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহা ঈশ্বরের মধ্যে এবং পার্শ্বে প্রায়-স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। জগতে ইহা ঈশ্বরের সক্রিয় সহায়করূপে কাজ করে।

নূতন বাইবেলে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যবর্তী আত্মার কথা আছে। আপামীয়াবাসী নুমেনিয়াস বলেন যে ঠিক যেমন স্পেন্তা মইন্যু বা পবিত্র আত্মা আহুর মজ্দার সপক্ষে কাজ করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর অপর একটি ঈশ্বরকে ঐশগুণাবলী দান করিয়াছেন এবং এই দ্বিতীয় ঈশ্বর জগতে মঙ্গলময় আত্মারূপে কাজ করেন। পরমেশ্বর আধ্যাত্মিক জগতে কাজ করেন এবং এই দ্বিতীয় ঈশ্বর আধ্যাত্মিক এবং জড় এই উভয় জগতেই কাজ করেন।

ওরিজেন বলেন যে ঈশ্বর 'প্রজ্ঞা' অথবা 'পুত্র'কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আহুর মজ্দা এবং স্পেন্তা মইন্যুর মধ্যে যে সম্বন্ধ পরম পিতার সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। ওরিজেন আরও বলেন যে 'প্রজ্ঞা' অথবা 'পুত্র' পরম পিতার ন্যায়ই শাশ্বত এবং তাঁহার সমকক্ষ হইলেও তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতব। আশা, অরেতা—বৈদিক ঋতের অর্থ ন্যায়—ইহার দৃশ্য প্রতীক হইতেছে অগ্নি। আশা বহিস্তা অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় সাতজন আমেশা স্পেন্তা, "পবিত্র অমর পুরুষ" অথবা শ্রেষ্ঠ দেবদূতগণের অন্যতম। তিনি নৈতিক রাজ্যে ন্যায়ের অধিকর্তা। সৎ ব্যক্তি আশাবান্ অর্থাৎ 'ন্যায়পরায়ণ' এবং অসৎ ব্যক্তি দ্রেগবন্ত অর্থাৎ 'দুষ্কর্মকারী'। ন্যায় এবং অন্যায়ের সৈন্যদের মধ্যে চিরকাল যুদ্ধ চলিতেছে এবং আহুর মজ্দাব সাহায্যে এবং পরিচালনায় মানবজাতি অন্যাযের সৈন্যদিগকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিবে। তখনই পৃথিবীতে ন্যায়ের রাজত্ব আরম্ভ হইবে।

এফিসাস নগরের হেরাক্লিতাস অগ্নিকেই প্রকৃতির মূল উপাদান বলিযা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যাহা কিছু আছে তাহা ইহা হইতেই আসিযাছে। ইহাই সকল বস্তুর সার। ইহাই প্রজ্ঞা বা Logos রূপে কার্য করে। জগতে যে ঐশ নিয়মের একাধিপত্য ইহা তাহাই। জগতে যে সর্বব্যাপী শৃঙ্খলা বর্তমান ইহা তাহারই নির্দেশক। ইহাই জগতের প্রজ্ঞা (Logos)। ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার নিয়ম যাহার দিকে মানুষ অগ্রসর হইতেছে।

ষ্টোয়িকরা হেরাক্লিতাসের চিন্তাসমূহ গ্রহণ করিযাছিল। মানুষ যদি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে জাগতিক নিয়ম অগ্নি অথবা প্রজ্ঞার সহিত এক তাহাই ঈশ্বর। জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে

যেমন বলা হইয়াছে ঠিক তেমনই ষ্টোইক্‌দের মতেও মানুষ হয় সৎ এবং জ্ঞানী নতুবা মন্দ এবং নির্বোধ হইয়া থাকে। জোরোয়াস্ত্রীয় মতে যেমন তেমনই ইহাদের মতেও অন্তিমে অগ্নি জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।[৩]

মানুষ জড় এবং আধ্যাত্মিক উপাদানে গঠিত—মানুষ নশ্বর দেহ এবং অবিনশ্বর আত্মা দ্বারা গঠিত। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ব্যতীত মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপাদান সমূহ হইতেছে "দীনা" (বিবেক), "উর্বান" (আত্মা) এবং "ফ্রবশি" (রক্ষাকারী আত্মা)।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। সে স্বাধীন কর্তা এবং তাহার সৎ অথবা অসৎ কর্মের জন্য দায়ী। তাহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে 'ন্যায়ের পন্থা একটিমাত্র।' আহুর মজ্‌দা কর্তৃক সৃষ্ট দুইটি আদিম আত্মা, পবিত্র আত্মা এবং দুষ্ট আত্মা, তাহাদের স্বীয় স্বীয় জীবনের পথ বাছিয়া লইয়াছিল। ঠিক সেইরূপ মানুষকেও ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে। দুইটি বিরোধী বস্তুর মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার আছে। তাহার আপনার পছন্দের উপর সব কিছুই নির্ভর করে। সেই তাহার ভাগ্যের নিয়ন্তা।

দীনা অথবা বিবেক—মানুষ ভবিষ্যতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করিবে তাহাই নিয়ন্ত্রণ করিতে ইহা মানুষকে সাহায্য করে। মানুষ যেমন বীজ বপন করে তেমনই ফলভোগ করে। যখন কোন সাধু ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন তাহার দীনা পরলোকে তাহার আত্মাকে সম্ভাষণ করে এবং এক অতুল সৌন্দর্যময়ী যুবতীর মূর্তি ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মা জিজ্ঞাসা করে যে তাহার পার্থিব জীবনে যাহার মত আর কাহাকেও দেখে নাই সে কে? ঐ মূর্তি উত্তর দেয় যে সে তাহার অপরিচিত নয়, ঐ আত্মা পার্থিব জীবনে যে সকল সৎচিন্তা করিয়াছিল, ভাল কথা বলিয়াছিল এবং সৎ-কার্য করিয়াছিল সেইগুলিই নারীরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে, ইহা সেই ব্যক্তির চরিত্রের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অপর পক্ষে, দুষ্ট ব্যক্তির আত্মার সম্মুখে বিচারের সেতুর কাছে তাহার বিবেক তাহার দুশ্চরিত্রের প্রতীকরূপে এক কুৎসিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ফ্রবাশি (পরবর্তীকালে ফরোহর)—জড়জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ স্বর্গস্থ মূল বস্তুগুলির পার্থিব প্রতিকৃতি। জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই এই সকল শাশ্বত আদর্শ বস্তুগুলির প্রতিকৃতি। আকাশ, পৃথিবী, জল, বৃক্ষ, প্রাণী, মনুষ্য এবং মঙ্গলের রাজ্যের অন্তর্গত যাহা কিছু সকলেরই ফ্রবাশি আছে। কেবলমাত্র দুষ্ট আত্মা অহ্রিমান্‌ এবং দানবগণের ফ্রবাশি নাই।

আহুর মজ্‌দা তাঁহার লোকোত্তর একাকিত্ব লইয়া বাস করিতেছিলেন। আধ্যাত্মিক ও জড় সৃষ্টির প্রত্যয় ও ধারণাগুলি তাঁহার মনে বর্তমান ছিল।

নরনারীদের ফ্রবাশিগুলি তাহাদের স্বর্গস্থ প্রতিরূপ। এই মূলবস্তুগুলির অনুকরণে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা স্বর্গে পরমানন্দে বাস করিত। অরমাজ্‌দ যখন মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন তখন তিনি এই বুদ্ধিসর্বস্ব আত্মাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা স্বর্গে থাকিতে ইচ্ছা করে, না তিনি যে জড়জগৎ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন সেখানে যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করে। ঐ জগতে সু এবং কু এই দুই বিরোধী বস্তু থাকিবে। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যদেহে জীবাত্মার সঙ্গী, বন্ধু এবং অভিভাবকরূপে একটি করিয়া ফ্রবাশি রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঐ ত্রুটীপূর্ণ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে অমঙ্গলের স্রষ্টা এবং তাহার দানবদের সহিত চিরকাল যুদ্ধ চলিবে।

মনুষ্যদের এই উচ্চতর প্রতিরূপগুলি অহ্রিমান এবং তাহার দুষ্ট অনুচরদের সম্মুখীন হইতে এবং মনুষ্যদিগকে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবার জন্য মনুষ্যদের হৃদয়ে বাস করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতরণ করিতে রাজী হইয়াছিল। এইরূপে তাহারা যে জগতে সুখ, দুঃখ, ভালো, মন্দ আছে সেখানে মনুষ্যদের দেহে বাস করিয়া এই সকল জড়পদার্থগুলির মাধ্যমে মন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার এবং এই ত্রুটিপূর্ণ জগতের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কিছুকালের জন্য নির্বাসিত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল।

যখন কোন মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে তখন উহার ফ্রবাশি উহার উচ্চতর প্রতিরূপ হিসাবে উহার সঙ্গ গ্রহণ করে। এই আত্মাই প্রকৃত অহং বা স্ব-রূপ। ফ্রবাশি ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত কর্মী এবং ঐ আত্মার রক্ষক এবং অভ্রান্ত চালক। ইহা আত্মাকে সুকর্ম করিতে উপদেশ দেয়, এইরূপ কর্ম করিলে প্রশংসা করে এবং দুষ্কর্ম করিবার কথা চিন্তা করিলে উহাকে তিরস্কার করে এবং সতর্ক করিয়া দেয়। এইভাবে যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত উহার বন্ধু এবং উপদেষ্টারূপে কাজ করে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার আত্মা তাহার অদৃষ্টানুযায়ী ফলভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে এবং উহার ফ্রবাশি স্বর্গে একাকী বাস করিতে থাকে।

প্রত্যেক বৎসরের শেষ দশদিন ফ্রবাশিদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবের দিনে তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করে। তাহারা মৃত ব্যক্তিদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং উহারা তাহাদিগকে আহ্বান ও অভ্যর্থনা করুক এবং তাহাদের আশীর্বাদ লাভ করুক ইহাই চায়।

বেদে যাঁহাদিগকে 'পিতৃপুরুষ' বলা হইত, প্লেটো যাহাদিগকে 'আইডিয়া' বলিতেন, রোমকরা যাঁহাদিগকে 'মেনস' বলিত ফ্রবাশিগণ তাহাদেরই সদৃশ। আরিষ্টটল মানুষের প্রাণ ছাড়াও আত্মার অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। আত্মাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ এবং বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য করিয়া থাকে। প্লেটো ও আরিষ্টটলের অনুবর্তীগণ এবং স্টোয়িকগণ প্রজ্ঞা (Nous)কে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি এবং মানুষের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ফাইলো ইহাকে প্রাণ (Soul) হইতে পৃথক্ করিবার জন্য Pneuma বলিয়াছেন।

ফ্রবাশিদিগকে ইয়াজাতা অথবা দেবদূতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিযা গণ্য করা হয নাই। ফাইলোও বলিয়াছেন যে উহাবা দেবদূত নয কিন্তু ব্যক্তিরূপে কল্পিত বিমূর্ত ধারণাসমূহ মাত্র এবং উহারা ঈশ্বরেব শক্তির প্রকাশ। ফ্রবাশিগুলি যেমন জগৎকে রক্ষা করিবার কাজে নিযুক্ত সেইরূপ 'আইডিয়া'গুলি ঈশ্বরেব কার্য সম্পাদন করে। তাহারা জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। কোন ব্যক্তিব ফ্রবাশি মনুষ্যেব অন্তরে আহুর মজ্‌দাব প্রতিচ্ছবি এবং সেইরূপ তাহার মনেব বিচারবুদ্ধিরূপ অংশ বিশ্ব-প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি। প্লুটার্ক মনুষ্যের প্রাণ (Soul) এবং আত্মা (Spirit) এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন।

প্রাচীন বোমকরা বিশ্বাস করিত যে মৃত ব্যক্তিরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের (Di Manes) সহিত মিলিত হয। বোমে সাধারণতন্ত্রের সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত যে Genius অর্থাৎ ঐশ প্রতিরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মেব সময়ে তাহার সঙ্গ লইয়া থাকে এবং সে যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে ততদিন তাহার সহিত অবস্থান করে। ঐ ব্যক্তিব মৃত্যুব পর উহা তাহার পূর্বপুরুষদেব সহিত মিলিত হয়। গ্রীক্ চিন্তার প্রভাবে লোকে বিশ্বাস করিত যে Genius অর্থাৎ ঐশ প্রতিরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর পবেও বাঁচিয়া থাকে। ক্রমে এই পূর্ব-পুরুষেরা ব্যক্তিরূপে কল্পিত রক্ষাকারী আত্মা বলিয়া গণ্য হইল। এই পূর্বপুরুষগণ ফ্রবাশিদের ন্যায় পৃথিবীতে নামিয়া আসে, যে সকল পবিবারের মধ্যে তাহারা বাস কবিত তাহাদের গৃহে যায় এবং লোকেরা তাহাদিগকে পূজা করুক ইহাই কামনা কবে। আপামীয়াবাসী নুমেনিয়াস মানুষের মধ্যে দুইটি আত্মার থাকার কথা বলিয়াছেন—উহাদের মধ্যে একটি বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট, আপরটি বিচারবুদ্ধিহীন। ওরিজেন মানুষের অন্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করিযাছেন—প্রাণ এবং আত্মা। এই দুইয়ের সম্বন্ধ আত্মা এবং উহার ফ্রবাশির সম্বন্ধের ন্যায়।

অমঙ্গলের সমস্যা—অমঙ্গলের অস্তিত্ব জীবনের এমন একটি ব্যাপাব যাহাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। জোরোয়াষ্টার অমঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন। ইহা মঙ্গলের নিষ্ক্রিয় অভাবমাত্র নয়। ইহা মঙ্গলের সক্রিয় শত্রু, উহার পরি-

পূরক নয়। ইহা মঙ্গলের অপরিণতাবস্থা নয়। ইহা মায়া হইতে উৎপন্ন হয় না। যে জগতের যথার্থ সত্তা আছে ইহা তাহাতেই বর্তমান। অমঙ্গল অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মঙ্গলের সাহচর্য করা এবং অমঙ্গলের সহিত যুদ্ধ করাই জীবন। মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই দুইটি একত্রাবস্থানকারী বিরোধী শক্তি।

অমঙ্গল যেমন মনুষ্যের তেমনই অরমাজ্‌দেরও শত্রু। অমঙ্গলের সহিত যুদ্ধ করা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই শাশ্বত যুদ্ধের সে সৈনিক এই জগৎ তাহার যুদ্ধক্ষেত্র। তাহার অন্তরে এবং বাহিরে যাহা কিছু মন্দ আছে তাহাকে বাধা দেওয়া এবং বিতাড়িত করাই তাহার কর্তব্য। কোন ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজে অমঙ্গল হইতে দূরে থাকে এবং নিজে সাধু হয় তাহা হইলে সে নিষ্ক্রিয় ধর্মাচরণ করিতেছে এইরূপ বলিতে হইবে। সমাজের মঙ্গলসাধন করা এবং সমাজে অমঙ্গলের সহিত যুদ্ধ করাই সক্রিয় ধর্মপরায়ণতার লক্ষণ। ধার্মিক হইয়া ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ করিয়া কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমস্ত মনুষ্যজাতির মুক্তির জন্য চেষ্টা করা এবং তাহার জন্য যুদ্ধ করা এবং চেষ্টা করা তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

এই জগৎ অসম্পূর্ণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসম্পূর্ণতার শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বহুযুগব্যাপী ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এবং মনুষ্যজাতির সঞ্চিত কর্মের ফলে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে মঙ্গলের জয় হইবে এবং জগৎ সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। অমঙ্গলের রাজার ক্ষমতা লোপ পাইবে। আলোক এবং অন্ধকারের, সত্য এবং মিথ্যার, ধর্ম এবং অধর্মের শক্তির মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে পরাজিত হইয়া সে জানু পাতিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে।

স্পেন্তা মইন্যু বা পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পরে আহুর মজ্‌দার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইত—জরথুস্ত্রের গাথাগুলিতে স্পেন্তা মইন্যু বা পবিত্র আত্মাকে আহুর মজ্‌দা হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইত। গাথাগুলির পরবর্তী যুগে এই দুইজনকে এক বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং আহুর মজ্‌দা ও অংগ্র মইন্যু অথবা অরমাজ্‌দ ও অহ্রিমান দুই বিরোধী শক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। এইজন্য প্রাচীন কাল হইতে জোরোয়াষ্ট্রীয় মতবাদকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী দ্বৈতবাদমূলক ধর্ম বলা হইয়াছে।

আরিস্তোক্সেনাসের (আনুমানিক ৩২০ খৃঃ পূঃ) সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া হিপোলিটাস বলেন যে পারসীকগণ জগতের দুইটি আদি কারণে বিশ্বাস করিত—উহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে আলোক বা পিতা এবং দ্বিতীয়টি অন্ধকার বা মাতা। ইউডেমাস

এবং আরিষ্টট্‌ল এই দুইটি শক্তিকে Zeus বা Oromazdes এবং Hades বা Areimanios রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক বলেন যে Oromazdes আলোক হইতে এবং Areimanios অন্ধকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

নবম শতাব্দীতে লিখিত বিতর্কপূর্ণ পহ্লবী গ্রন্থ শিকন্দগুমানিক বিজার অর্থাৎ সন্দেহ ধ্বংসকারী গ্রন্থ প্রায় অনেকটা দার্শনিক গ্রন্থের মত। এই গ্রন্থের দ্বৈতবাদী লেখক ইহুদী, খৃষ্টীয় এবং মুসলমান সমালোচকদের উত্তর দিতে গিয়া বলিতেছেন যে মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই দুইয়েরই কারণ হিসাবে ঈশ্বরকে নির্দেশ করিলে তাঁহাব ঈশ্বরত্বের হানি হয়। ঈশ্বব মঙ্গলময হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করিতে পারেন না। অপরিসীম বুদ্ধির অধিকারী ঈশ্বর তাঁহার নিজের শত্রুকে সৃষ্টি করিতে পারেন না। করুণা স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার নিজের সৃষ্ট জীবগণকে অমঙ্গল দ্বারা ক্লেশ দিতে পারেন না। দুষ্ট আত্মা যে মানুষেব কদর্যস্বভাবের ব্যক্তিরূপে কল্পিত প্রতীকমাত্র ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। অমঙ্গল জগতের আদি হইতেই বর্তমান। ইহা অন্য সাপেক্ষ নয অথবা মানুষ ইহাকে সৃষ্টি করে নাই। দেহ যখন আত্মার বিরুদ্ধে জযলাভ করে তখন ইহা বৃদ্ধি-লাভ করে কিন্তু ইহা দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে না। অমঙ্গলের স্রষ্টা মঙ্গলের স্রষ্টার ন্যায়ই একজন যথার্থ ব্যক্তিবিশেষ।

আমবা এই বলিযা আমাদের এই বিবরণ শেষ করিতে পারি যে অহ্রিমান অরমাজদের সমকালীন এবং সমপদস্থ হইলেও শাশ্বত নয, কারণ সে বিলযপ্রাপ্ত হইবে। অরমাজ্‌দ অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, আর অহ্রিমান অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে থাকিবে না। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে অরমাজ্‌দ এবং অহ্রিমান বস্তুতঃ পবস্পরের তুলনায় সমান নহেন।

মিথবাদের ইউরোপে গমন—বৈদিক মিত্র অথবা আবেস্তার মিথ্‌্র সমস্ত ইন্দো-ইরাণীয় দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। সেমেটিক মতবাদ জোরোয়াষ্ট্রীয় মতবাদের সহিত যুক্ত হইয়া উহাকে মিথ বাদে পরিণত করিয়াছিল।

প্লুটার্ক বলেন যে ৬৭ খৃঃ পূর্বাব্দে বন্দীরূপে ধৃত সিসিলিয় জলদস্যুগণ কর্তৃক রোমে মিথ পূজা আনীত হইয়াছিল। ইউরোপে মিথ্‌্র পূজা দ্রুত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি ঈজীয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছিল। ভারতবর্ষ এবং পন্তাস্ ইউক্সি-নাসের মধ্যবর্তী ভূভাগে মিথ্‌্র পূজা প্রচলিত হইল। এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অংশে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইহা ভারতবর্ষে পৌঁছাইয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এবং গুজরাতে ইহা বদ্ধমূল হইয়াছিল।[৩]

কমাজীনের (Commagene) রাজা প্রথম আন্তিয়োকাস মিথ্রের দক্ষিণ হস্ত ধারণ

২

করিয়া আছেন এইরূপভাবে প্রস্তরে উৎকীর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নীরো মেজাই (Magi)দের নিকট হইতে মিথ্র সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ডায়োক্লিশিয়ান, গালেরিযাস এবং লিসিনিয়াস। মিথ্রের উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ডায়োক্লিশিয়ান ৩০৭ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় প্রথানুযায়ী মিথ্রকে তাঁহার সাম্রাজ্যের রক্ষকরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। অজ্ঞেয় এবং অনধিগম্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মিথ্র মধ্যবর্তীর কাজ করেন। তিনি জগৎ নির্মাতারূপে জগৎকে গঠন করিয়াছিলেন।

পারস্যের রাজাদের উপর হ্বারেনা (Hvarena) বা রাজকীয় মহিমা অবতরণ করিয়াছিল। মিথ্র উপাসনা ইহাকে ইউরোপে লইয়া গিয়াছিল। শাসন-কার্যে নিরত প্রত্যেক রাজাই ঘোষণা করিতেন যে এই রাজকীয় মহিমা উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলরূপে তাঁহার উপর অবতরণ করিয়াছে, সেইজন্যই তিনি ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী অথবা নররূপী ঈশ্বর। সেমাইটরা ইহাকে গড় (Gada) বলিত এবং গ্রীকরা ইহাকে টাইসি (Tysce) বলিত। আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারীরা তাহাদের শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজকীয মহিমা অথবা টাইসির পূজা প্রবর্তন করিয়াছিল। রাজকীয় মহিমা বিতরণ করা মিথ্রের কার্য হওয়ায় রোমক সম্রাটগণ তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার ঐশ মহিমার অধিকারী ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আকিমিনীয় রাজারা শীতকালে ব্যাবিলনিয়ায় বাস করিতেন। কানূভীয় দেবতাতত্ত্বে মিথ্র এবং সূর্যের দেবতা শমস (Shamas) এক হইয়া গিয়াছেন। জোরোয়াষ্ট্রীয় দেবতাতত্ত্বে মিথ্র সূর্য হইতে ভিন্ন ছিলেন। সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া তিনি রোমক গূঢ়তত্ত্বে 'সল ইনুভিক্টাস্' অর্থাৎ অজেয় সূর্য নামে অভিহিত হইতেন।

জরবন্ অকরণ (Zarvan Akarana) অথবা অসীম কালে অরমাজদের গুণ-বিশেষ। মিথ্রবাদ ইহাকে প্রথমস্থান দিয়া থাকে ক্রনস্ (Kronos),—"কাল"ই পরমেশ্বর। প্রস্তরমূর্তিসমূহে ইহাকে সিংহের মস্তকবিশিষ্ট এক অদ্ভুত মনুষ্যরূপে দেখান হইযা থাকে। একটি সর্প তাঁহার শরীরকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার হস্তদ্বয়ে রাজদণ্ড এবং রাজাধিপত্যের বজ্র আছে এবং প্রত্যেক হস্তে স্বর্গের দ্বারসমূহের একটি করিয়া চাবী আছে। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সংহার কর্তা। যেসকল পারসীক দেবদূত মিথ্রের সহিত রোমে গমন করিয়াছিল তাহারা অলিম্পাস পর্বতের সূর্যালোকদীপ্ত চূড়াগুলিতে বাস করে। মিথ্র পূজার গূঢ় আচার সমূহ—যখন রোমে মিথ্র-পূজা প্রবেশ করিয়াছিল তখন পর্বতের গুহায় এবং ছায়াচ্ছন্ন স্থানগুলিতে মিথ্র-পূজার আচারসমূহ

অনুষ্ঠিত হইত। ভূমির নিম্নে গভীর সুড়ঙ্গপথের অভ্যন্তরে অবিরত অগ্নি প্রজ্জলিত রাখা হইত।

মিথ সংক্রান্ত গূঢ় আচারসমূহ গোপনে অনুষ্ঠিত হইত এবং সাধারণের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখা হইত। যাহারা যথোচিত নিয়মে দীক্ষিত হইত কেবলমাত্র তাহারাই এই সকল আচার অনুষ্ঠান করিতে পারিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৬।৩।১২) এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১১।৫) বলা হইয়াছে যে এইরূপ বিদ্যা পুত্র কিংবা শিষ্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেওয়া উচিত নয়। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে সমস্ত ধনের সহিত পৃথিবী দান করিবার প্রস্তাব করে তাহা হইলে উত্তরে তাহার বলা উচিত "এই বিদ্যা নিশ্চয়ই সমস্ত পার্থিব ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" মুণ্ডক (৩।২।১০।১১), শ্বেতাশ্বতর (৬।২২) এবং মৈত্রী উপনিষদেও এইভাবের কথা বলা হইয়াছে।

মিশর, ব্যাবিলন এবং পারস্যে গূঢ় তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্মগুলি এইরূপ গোপনতা রক্ষা করিত। সেইণ্ট পল বলেন যে গুপ্তবিদ্যা কেবলমাত্র যাহারা দীক্ষিত তাহাদের জন্য।

সদ্যোদীক্ষিত ব্যক্তিকে সর্বত্রই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইত। স্বীয় আত্মাকে পাপমুক্ত করিবার জন্য তাহাকে বহুবার যজ্ঞে আহুতি দিয়া এবং স্নান করিয়া শুদ্ধ হইত। তাহাকে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত কষাঘাত ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। তাহাকে অলৌকিক শক্তি বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠান করিতে হইত এবং নিগূঢ় রহস্য সমূহের অধিকারী হইবার জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হইবার পূর্বে দীক্ষার নানা স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হইত। পারস্যে মিথ্রের উদ্দেশ্যে স্তোত্রে (ইয়াশ্ত ১০।১১২) আপনার দেহে কশাঘাতের কথা বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম মিথ্রধর্মকে পরাজিত করে—কন্‌ষ্টান্‌টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ মিথ্রধর্মের ভাগ্যে পরিবর্তন আনিয়াছিল। জুলিয়ান দি অ্যাপষ্টেট (৩৬১-৬৬৩ খৃঃ) মিথ্রধর্মের গূঢ় রহস্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌লে মিথ্রপূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরে মিথ্রধর্ম রাষ্ট্রের রক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টধর্ম ইহাকে পরাজিত করিয়াছিল। আল্পস্ এবং ভস্‌জেস পর্বতমালায় এবং অন্যান্য স্থানে ইহা বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী কালেও ইহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। মিথ্রের উপাসকগণ ২৫-এ ডিসেম্বরে মকর সংক্রান্তিতে যখন আলোক অন্ধকারকে পরাজিত করে এবং দিন দীর্ঘ হইতে আরম্ভ করে তখন সূর্যের জন্মদিবস পালন করিত। খৃষ্টধর্মীরা ঐদিনাকে খৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভোজনোৎসবের দিন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মানিকীয় মতবাদ ইউরোপে গমন করে—মনি নামে এক জেরোয়াষ্ট্রীয় পুরোহিত নিজেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি

ধর্মপ্রবর্তকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জোরোয়াস্ট্রীয়, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় এবং সিরিয়ার নষ্টিক ধর্ম হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এক নূতন মিশ্রিত ধর্ম প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দ্বৈতমূলক মতবাদের সাহায্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আলোক এবং ঈশ্বর একার্থক। সয়তান অন্ধকার হইতে উদ্ভূত। অন্ধকারের শক্তির সহিত যুদ্ধ করা এবং অন্ধকাবেব বিরুদ্ধে আলোকের চরম জয়লাভে সহাযতা করা মানুষেব জীবনেব কর্তব্য। মানিকীয়বাদ দেহকে ক্লেশদান ও সন্ন্যাসধর্ম শিক্ষা দেয, কিন্তু এইগুলি জোরোযাস্ট্রীয ধর্মের আদর্শের বিরোধী। মনি জড়বস্তুকে সর্ব অমঙ্গলের মূল বলিয়া মনে করিতেন, সুতবাং তাঁহার মতে দেহকে ক্লেশদান সৎকার্য। সকল দেহজ কামনাই মন্দ। সেগুলিকে দমন করা এবং ধ্বংস করা উচিত। মনি শান্তভাবাত্মক সন্ন্যাসীজনোচিত নিষ্ক্রিয় গুণগুলিকে সমর্থন করিতেন। তাঁহার মতে চিবকৌমার্য একটি প্রশংসনীয গুণ। তিনি উপবাস করিতে পরামর্শ দিতেন।

মানিকীয মতবাদ সুদূব প্রাচ্যে ছড়াইযা পড়িয়াছিল এবং চীন পর্যন্ত পৌঁছাইযাছিল। ইহা চতুর্থ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য মহাদেশেও প্রবেশ করিয়াছিল। পূর্বে যেমন মিথ্রপূজা খৃষ্টধর্মের সহিত আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম কবিযাছিল পরবর্তীযুগে ইহাও তেমনিই করিয়াছিল। সেইণ্ট অগাষ্টাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কবিবাব পূর্বে মানিকীয় মতাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পরও তিনি মানিকীয মতবাদ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। তিনি এই দ্বৈত বাদমূলক দর্শন খৃষ্টধর্মের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট কবিযাছিলেন।[৬]

"প্রাচ্য হইতে আলোক আসিযাছে" এই সূত্রবাক্য প্রচলন লাভ কবিল—পরফিরি, ইউবুলাস, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ক্লেমেন, ষ্ট্রাবো, ডায়োজিনিস, লেযার্টাস এবং ফোটিযাস পারসীক ধর্মের পুরোহিতগণ এবং তাহাদের উপদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। নব-প্লেটোনীয় মতবাদ পারস্যের অভ্যন্তবে প্রবেশ করিযাছিল। আর্দেশির বাবেগানের প্রধানমন্ত্রী তনুসার নব-প্লেটোনীয় ছিলেন। যখন খৃষ্টীয ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'ন্যায-পরায়ণ' আখ্যাধারী রাজা নশিরওযান সিংহাসনে আবোহণ করিযাছিলেন তখন লোকে বলিত যে প্লেটোব একজন শিষ্য পারস্যের সিংহাসন অধিকার কবিযাছেন। ঐ মহান্ নরপতি যুন্দ-হি-শাপুর এ বিখ্যাত বিদ্যালয স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, রোম এবং অন্যান্য স্থান হইতে বিখ্যাত পণ্ডিত এবং লেখকগণ সেখানে আসিতেন। রাজা জাষ্টিনিযান এ্যাথেন্সের দর্শন বিদ্যালয় বন্ধ কবিয়া দিযাছিলেন এবং দার্শনিকদিগকে নির্বাসিত করিযাছিলেন। রাজা নশিরওয়ান তাঁহাদিগকে তাঁহাব বিদ্যালযে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজার আদেশে গ্রীকভাষায লিখিত কযেকটি দার্শনিক গ্রন্থ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ কবা হইয়াছিল। ঠিক সেইরূপে সংস্কৃতভাষায় লিখিত প্রখ্যাত গল্প-গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র সমেত কতকগুলি প্রয়োজনীয়

সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্যের রাজভাষা পহ্লবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলিকে আবার পহ্লবী হইতে সিরিয়াক এবং হিব্রুভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। আরবেরা পরে ঐগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিল। যখন তাহারা ইউরোপে গিয়াছিল তখন তাহারা ইউরোপের তামসযুগে জ্ঞান এবং বিদ্যার আলোক শিখা সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

দ্রষ্টব্য

১। Moulton, Early Zoroastrianism, পৃঃ ৮—২২, ৮৭, ১০৩ ইঃ, ৪১২, লণ্ডন, ১৯১৩।

২। Dhalla, M, N, Zoroastrian Theology, পৃঃ ৩৫৬, নিউ ইয়র্ক ১৯১৪ ; Casartelli, "Philosophy" (Iranian)-Hastings এর Encyclopaedia of Religion and Ethics, নবম খণ্ডে মুদ্রিত, পৃঃ ৮৬৬ ইঃ, নিউ ইয়র্ক, ১৯১৭।

৩। Carnoy, "Zoroaster"-Encyclopaedia of Religion and Ethics, দ্বাদশখণ্ডে মুদ্রিত, পৃঃ ৮৬৬-৭।

৪। Dhalla, M, N, History of Zoroastrianism পৃঃ ৩৮৪-৯১, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮।

৫। Bhandarkar, "Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems"—Grundriss der Indo-Arischen Philologie, ৩, ৬, পৃঃ ১৫৩-৭, ষ্ট্রাসবুর্গ, ১৯১৩।

৬। Windelband, A History of Philosophy, ইংরাজী অনুবাদ, Tufts, পৃঃ ২৯৮, নিউ ইয়র্ক, ১৯০৫।

পারসীক চিন্তাধারা (পূর্বানুবৃত্ত)

খ। জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে দর্শন

জোরোয়াষ্ট্রীয় মতবাদ একটি ধর্ম, ইহা এমন কি খৃষ্টধর্ম এবং ইস্‌লামের ন্যায় প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বলিয়া দাবী করে, সুতরাং মুখ্যতঃ ইহা দর্শন নয়। কিন্তু কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের উপদেশ সমূহ বিচারবুদ্ধির পরীক্ষায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে উহা শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমর্থন পাইতে পারে না। এই অর্থেই জোরোয়াষ্ট্রীয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভবপর ; কারণ প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে এবং জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

দ্বৈতবাদ—প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির মধ্যে জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে একটি—এমন কি প্রাচীনতম—বলিয়া নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ আলোচনায় ইহা দ্বৈতবাদী বলিয়াই বর্ণিত হয়, কারণ ইহা একটি মঙ্গলময় এবং একটি অমঙ্গলময় এই দুইটি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। পরবর্তীকালের জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে যখন জোরোয়াষ্টারের উপদেশের আদিম বিশুদ্ধতা ও শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং সকল শুভবস্তুর সৃষ্টিকর্তারূপে স্পেন্তা মইন্যু এবং সকল অশুভ বস্তুর সৃষ্টিকর্তারূপে অংগ্র মইন্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এক তাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই ধর্ম সম্বন্ধেই এই বর্ণনা সত্য। ভেন্দিদাদে (যাহা বি-দেব-দাতার অপভ্রংশ এবং যাহার অর্থ দানবদের বিরুদ্ধে নিয়ম) আমরা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই। প্রথম ফরগার্ডে আমরা পড়ি "আমি আহুর মজ্‌দা যাবতীয় ভূখণ্ড ও দেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন এরিয়ানা ভেইজোকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তখন ধ্বংসকারী অংগ্রমৈন্যু ইহার বিরোধীরূপে একটি শক্তিশালী সর্প এবং দেবগণকর্তৃক কৃত তুষার সৃষ্টি করিয়াছিল।

"আমি আহুর মজ্‌দা ভূখণ্ড ও দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোত্তম হিসাবে যেখানে সুগদ অবস্থিত সেই গৌ সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তাহাতে ধ্বংসকারী অংগ্রমৈন্যু ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ গৃহপালিত পশুসমূহের পক্ষে মারাত্মক একটি মহামারীর সৃষ্টি করিয়াছিল।"

এইভাবে আরও অনেক কিছু বলা হইয়াছে। পহ্লবী যুগে এই ধরণের চিন্তা প্রবণতা আরও সতেজে বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে শিকন্দ গুমানিক বিজার নামক একটি গ্রন্থে ঈশ্বর হিসাবে আহুর মজ্‌দা যে মঙ্গল-স্বরূপ তাহা প্রমাণ করিবার

জন্য প্রকৃত দার্শনিকের দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদকে সমর্থন করা হইয়াছিল। ইহাতে অত্যাধুনিক কালের জেম্‌স এবং সসীম জীবের নিত্যতায় বিশ্বাসী অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের যুক্তি-সমূহের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক আহুর মজ্‌দার চরম প্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্যও সমভাবেই উৎসুক, কারণ তিনিই শেষ পর্যন্ত সমস্ত অশুভ দমন করিবেন এবং অংগ্র মইন্যুকে পরাজিত করিবেন। কিন্তু জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম পরবর্তীকালে যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহাতেই এই সকল মত স্থান পাইয়াছিল। মানিকীয় মত-বাদরূপে এই স্তরের জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম এমন কি খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদকেও প্রভাবিত করিতে অক্ষম হয় নাই—খৃষ্টধর্মে ধর্মবিরোধী মানিকীয় মতের ইতিহাস হইতেই ইহা বুঝা যায়।

জোরোয়াষ্টার নিজে কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া কি অর্থে তাঁহার মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা যায় অথবা আদৌ বলা যায় কি না ইহা বিচার করাই অধিক সঙ্গত হইবে। জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে ইহা সর্বাংশেই একেশ্বরবাদমূলক। আহুর মজ্‌দাই জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। পরবর্তী-কালের জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মমতে দিন এবং রাত্রিকে যেরূপ স্থূল অর্থে বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এখানে সেরূপ করা হয় নাই। এমন কোন প্রাণী নাই যাহাকে কেবলমাত্র মন্দ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, জড়জগতেও অমিশ্র মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যখন জোরোয়াষ্টার গাথাগুলিতে তাঁহার নিজের দুঃখ ভোগ ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে গান করিয়াছেন কেবলমাত্র তখনই তিনি মানুষের মধ্যে যে অশুভ আছে তাহার সম্বন্ধে জোরের সহিত বলিয়াছেন এবং এমন একটি দ্বৈতবাদে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যাহা নৈতিক দ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্রষ্টা নিজে মঙ্গলময় হইলেও জগতে এমন কিছু আছে যাহা শুভ প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই বিষয় সম্বন্ধে গাথাগুলিতে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ আছে। ৪৫।১ ইয়াস্নায় তিনি বলিতেছেন "আমি এখন কথা বলিব; যাহারা দূর এবং নিকট হইতে আসিয়াছ তাহারা শ্রবণ কর। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ভাল করিয়া চিন্তা কর। যত্ন ও সুবিবেচনার সহিত আমার কথাগুলি বিচার করিয়া দেখ।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে সকল মনুষ্যেরই নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং ৩০।২ ইয়াস্নাতে তিনি এইভাবে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন "প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীনভাবে তাহার নিজের মত বাছিয়া লউক্।" সে কিসের মধ্য হইতে বাছিয়া লইবে আশা করা যায়? ৪৫।২ ইয়াস্নায় একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে এই উত্তরটি দেওয়া হইয়াছে "প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে যে দুইটি আত্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল এখন আমি তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিব। উপকারী মঙ্গলস্বভাব

আত্মা অমঙ্গলস্বভাব আত্মাকে এই কথা বলিয়াছিল—আমাদের চিন্তা, আদেশ, বুদ্ধি, বিশ্বাস, কার্য, বিবেক এবং মন ইহাদের মধ্যে কোন ঐক্য নাই।" মঙ্গল এবং অমঙ্গলের বিরোধিতার কথা এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এই বিরোধিতা দুইটি বস্তুর মধ্যে নয় দুইটি শক্তির মধ্যে। এই দুইটি আত্মাকে প্রকৃত ব্যক্তি বলিয়া অথবা ব্যক্তির রূপকমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে ইহা একটি সমস্যা। আধুনিককালে ধর্মানুভূতির মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝা গিয়াছে যে উপাসনার জন্য মূর্তিকল্পনার প্রয়োজন। আহুর মজ্‌দা নিজে যদি মঙ্গলস্বভাব আত্মা হন এবং ব্যক্তিবিশেষ হন. তাহা হইলে যে আত্মা তাঁহার বিরোধী তাহাকেও ব্যক্তি বলিযা কল্পনা করাই স্বাভাবিক, যদিও শেষ পর্যন্ত তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে অংগ্র মইন্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম এক নূতন শক্তিরূপে আবির্ভূত হইল এবং অংগ্রমইন্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ধর্মপ্রবর্তক জোরোয়াষ্টার যাহা কিছু মন্দ তাহার চিরকালের শত্রু বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহাকে নানারূপ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইত কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকিয়া সকল মনুষ্যকেই এই যুদ্ধে যোগদান কবিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। গাথাগুলির ভাষা হইতে কোন সন্দেহই থাকে না যে জোরোয়াষ্টার নিজে একজন দৃঢ়চেতা যোদ্ধা ছিলেন এবং অমঙ্গলের শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত তাঁহার শান্তি ছিল না। তাঁহার ভাষা হইতে ইহাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে তাঁহার মতে আহুর মজ্‌দার ভিতর কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে না সুতরাং সমস্ত অমঙ্গলই তাঁহার বাহিরে থাকিবে। দর্শনের ভাষায় সকল অমঙ্গল মঙ্গলের বিরোধী এবং ইহারই রূপক রূপে অংগ্র মইন্যুর কল্পনা করা হইয়াছে। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের এই বিরোধ আলোক এবং অন্ধকারের, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের, সত্য এবং মিথ্যার এবং এই ধরণের অন্যান্য বিরোধ রূপেও কল্পনা করা যাইতে পারে কিন্তু মূল ধারণাটি একই।

পারসীক পণ্ডিতগণের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়া জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মের অঙ্গহিসাবে দ্বৈতবাদকে একেবারেই অস্বীকার করিবার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, আহুর মজ্‌দা এক ও অদ্বিতীয় এবং মঙ্গলস্বভাব আত্মা স্পেন্তা মইন্যু এবং অমঙ্গলস্বভাব অংগ্র মইন্যু তাঁহার অধীন। তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে এরূপ মনে করিলে অমঙ্গল এবং তাহা হইতে যাহা কিছু ঘটে সব কিছুরই জন্য আহুর মজ্‌দাকেই দায়ী করিতে হয়। এরূপ কল্পনা গাথাগুলির সমগ্র ভাবধারার বিরোধী। ৪৫।২ ইয়াস্না হইতে যে অনুচ্ছেদটি পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে কোন আদান প্রদান হইতে পারে না। তাহারা সর্বতোভাবে পৃথক এবং তাহাদের কখনও মিলন

হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে অমঙ্গল নিশ্চয়ই একদিন পরাভূত হইবে। ইহা নিশ্চিন্ত যে জোরোয়াষ্টার অমঙ্গলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন; মঙ্গলস্বভাব আহুর মজ্‌দার সহিত ইহার কোন সংস্পর্শ আছে তাহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্য তিনি অমঙ্গলকে মানুষের মনে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল ঈশ্বরাতিরিক্ত একটি শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা বলিতে পারি যে, অমঙ্গল মঙ্গলের বিরোধী এবং এই বিরোধী শক্তিকে রূপকাকারে কল্পনা করিলে ইহা অংগ্র মইন্যুতে পরিণত হয়।

সমস্যার এই সমাধান যুক্তিসঙ্গত কি না তাহা লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী যুগের প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ ইহা গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতন বাইবেলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়া চিত্রিত হইলেও সয়তান ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাধা দিতেছে এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। খৃষ্টেও আমরা সেই দ্বন্দ্ব দেখি এবং সয়তান তাঁহাকে যে সকল প্রলোভন দেখাইয়াছিল সেইগুলি জয় করাতেই তাঁহার মহত্ত্ব। ইস্‌লামেও ইব্‌লিসের উল্লেখ আছে। এই ধরণের চিন্তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য এবং আমরা দেখিতে পাই যে Dr. Albert Schweitzer-এর ন্যায় খৃষ্টধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তিও সরলভাবে এবং অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই দাবী করিয়াছেন যে খৃষ্টধর্ম দ্বৈতবাদমূলক। তাঁহার Christianity and Religions of the World নামক গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন "যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধর্মকেই দুইটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে—হয় উহাকে নীতিমূলক ধর্ম হইতে হইবে নতুবা জগৎকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা খৃষ্টধর্মীরা প্রথমটিরই অধিক মূল্য আছে বলিয়া ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছি।" অপর একটি অনুচ্ছেদে তিনি লিখিতেছেন "দর্শনশাস্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও যে ধর্ম সর্বতোভাবে এবং প্রগাঢ়ভাবে নীতিমূলক আমরা তাহাকেই অবলম্বন করিয়াছি, কারণ একমাত্র ইহাতেই আমাদের প্রয়োজন।" কিন্তু কিছু পরেই তিনি আরও একটু দার্শনিকের মনোভাব লইয়া লিখিতেছেন "দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে যে ঈশ্বরকে আমরা জানি এবং নৈতিক ইচ্ছার অধিকারী রূপে যে ঈশ্বরের সহিত আমি পরিচিত হই তাঁহাদের মধ্যে সর্বাংশে মিল নাই। তাঁহারা এক কিন্তু কিভাবে এক তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" এই উক্তি অকপট এবং কেবলমাত্র Dr Schweitzerই যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এমন নহে। ধর্মে বিশ্বাসী অধিকাংশ লোক চিন্তা না করিয়া এবং সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঈশ্বরকে সর্ব শক্তিমান্ এবং মঙ্গলময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু W. James এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক

অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ এরূপ করাকে যুক্তির দিক হইতে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের লেখাতেও এই সমস্যা উঠিয়াছে। ঈশ্বরের এই দুইটি গুণের মধ্যে তাঁহারা একটিকে বাছিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা গুণের পরিবর্তে তাঁহার সর্বশক্তিসত্তাকে পরিহার করিতেই প্রস্তুত। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন, স্পিনোজার দর্শন এবং এক চরমতত্ত্বে বিশ্বাসী অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ সমূহ বিরোধী .পক্ষভুক্ত। তাহারা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করিতে এবং ঈশ্বরকে ব্রহ্ম অথবা চরমতত্ত্বের সহিত একীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সুতরাং জোরোয়াষ্টারের মতবাদ দ্বৈতবাদমূলক কিন্তু এই দ্বৈতবাদ নীতিমূলক দ্বৈত-বাদ। ভেন্দিদাদের যুগে পরবর্তী কালের জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে ইহা তাত্ত্বিক দ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু গাথাগুলিতে ইহার কোন সমর্থন নাই। কিন্তু জেরবানীয় বলিয়া পরিচিত মাজি জোরোয়াষ্ট্রীয়দের আরও পরবর্তী একটি সম্প্রদায় এই মত গড়িয়া তুলিয়া-ছিল যে জেরবানা অকর্ণ অর্থাৎ অসীম কালই আদিম সত্তা এবং ইহা হইতেই আহুর মজ্‌দা এবং অংগ্র মইন্যু উদ্ভূত হইয়াছিল। নীতিমূলক দ্বৈতবাদের সহিত যুক্ত করিয়া তাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিবার ইহা একটি নিপুণ চেষ্টা। অংগ্র মইন্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাই-বার মনোবৃত্তি জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মের সর্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট। যে কুস্তি বা পবিত্র সূত্র প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসী জোরোয়াষ্ট্রীয়কে কোটিদেশে পরিধান করিতে হয় তাহা এই সংগ্রামের প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং ইহা ঐ ব্যক্তিকে প্রতিপদে দুষ্ট আত্মার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দেয়। ঐ দুষ্ট আত্মাকে বর্ণনা করিবার জন্য যে সকল বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলি হইতেই ইহা বুঝা যায়। "অংগ্র মইন্যু দানবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুষ্ট দানব, সে মঙ্গলময় আত্মার সৃষ্ট জগতে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্থায়ী বিশেষণ হইতেছে 'মৃত্যুর কারণ'। সে সর্বাপেক্ষা হীন মিথ্যাবাদী। সে অত্যাচারী, তাহার সৃষ্টি কুৎসিত, তাহার ধর্ম নিকৃষ্ট ; তাহার জ্ঞান মন্দ, সে মন্দ অভিসন্ধি-পূর্ণ। অসাধুতা তাহার মজ্জাগত।"[১]

পূজা—প্রাক্-জোরোয়াষ্ট্রীয় যুগে ইরাণীয় ধর্ম প্রকৃতি-পূজা ছিল। জোরোয়াষ্টারের আবির্ভাবের পর অগ্নি, সূর্য এবং জলের ধর্মীয় গুরুত্ব চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু গাথাগুলিতেও তাহারা আহুর মজদার শক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তাঁহার যুগের পর যে সকল পুরোহিত পুরাতন পূজা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা এই প্রকৃতিপূজাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তবে প্রকৃতিকে তাঁহারা আহুর মজ্‌দার অধীন বলিয়াই মনে করিতেন। অবশ্যম্ভাবীরূপে অগ্নিকেই সকলে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং পবিত্র অগ্নি-মন্দির সমূহে অগ্নি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হওয়ায় জোরোয়াষ্ট্রীয়েরা অগ্নি-

উপাসক এই সুপরিচিত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা ক্রুশের উপাসনা করে ইহা যতদূর সত্য এই বর্ণনাও ততদূর সত্য। সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত ফির্দৌসির পংক্তিগুলি তখন যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনই আছে—"তাহারা (ইরাণীরা) অগ্নি-উপাসক ছিল ইহা বলিও না। তাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক ছিল।" Markham তাঁহার পারস্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলিয়াছেন "পারসীকরাই একমাত্র জাতি যাহারা ইতিহাসের কোন যুগেই কোনরূপ ক্ষোদিত মূর্তির পূজা করে নাই।"

নীতি—নীতিমূলক দ্বৈতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জোরোয়াষ্ট্রীয় নীতিতত্ত্ব অতি উচ্চস্তরের উপদেশ শিক্ষা দেয়। হুমৃতা (বিশুদ্ধ চিন্তা), হুখ্‌তা (বিশুদ্ধ বাক্য) ও হুবুরেস্তা (বিশুদ্ধ কর্ম)র আবশ্যকতার ব্যাখ্যা করিতে ইহা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। জোরোয়াষ্ট্রীয় নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নৈতিক জীবনের সারমর্ম ইহাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জোরোয়াষ্টারের যুগের পর তত্ত্ব ও ধর্মের দিক হইতে জোরোয়াষ্ট্রীয় মতবাদে কোন কোন বিষয়ে আদর্শ-বিচ্যুতি দেখা গেলেও জোরোয়াষ্ট্রীয় পুরোহিতদের কৃতিত্ব হিসাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা জোরোয়াষ্ট্রীয় নীতিতত্ত্বের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই নীতিতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে ইহা কোনপ্রকার সন্ন্যাস-ধর্মের পক্ষপাতী নয়। ভেন্দিদাদে বলা হইয়াছে "যাহারা আহার করে না তাহাদের পক্ষে উত্তমপূর্ণ ধর্মজীবন অথবা গৃহী-জীবন যাপন করিবার অথবা পুত্রোৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না" এবং সাদ দারে বলা হইয়াছে "আমাদের নিকট উপবাসের অর্থ চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ এবং হস্তপদ দ্বারা পাপকর্ম হইতে বিরত থাকা।" দরায়ুস্‌ দি গ্রেট তাঁহার শিলা-লিপিতে এই কথাগুলি ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছিলেন "হে মানব, তোমার প্রতি আহুর মজ্‌দার ইহাই আদেশ: কুচিন্তা করিও না, ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিও না, পাপ করিও না।"

পরলোকতত্ত্ব—যেমন ইহুদীদের তেমনই গ্রীক্‌দের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাহাদের অমরতা সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। জোরোয়াষ্ট্রীয় মতবাদে ইহা স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছিল। সাধুরা স্বর্গে যাইবে এবং অসাধুরা নরকে যাইবে জোরোয়াষ্টার দৃঢ়তার সহিত ইহাই বলিয়াছিলেন। আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার মত সরল ছিল, কিন্তু পরবর্তী জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মে ইহা কতকটা জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক মনুষ্যই যে বুদ্ধি, দীনা (অহং-বোধ অথবা বিবেক-বুদ্ধি) উর্বাণ (আত্মা) এবং ফ্রবাশি (রক্ষাকারী আত্মা) দ্বারা গঠিত এইরূপ মনে করা হইত। শরীর আত্মার বাহক, সুতরাং ইহাকে কর্মক্ষম এবং সুস্থ রাখিতে হইবে। দীনার উপর

মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে, মনুষ্য সৎকার্য করিলে ইহা অধিক বিশুদ্ধ হয় এবং অসৎকার্য করিলে মলিন হইয়া যায়। উর্বাণ হইতেছে যাহা অমরতা ভোগ করে সেই আত্মা। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে তাহার বিচার হয় এবং তখন ঐ মৃত ব্যক্তির উর্বাণ ধার্মিক হইলে একটি সুন্দরী যুবতী তাহাকে অভিবাদন করে এবং পাপী হইলে একটি কুৎসিত যুবতী তাহাকে অভিবাদন করে। এই নারীরা তাহার সৎস্বভাব অথবা অসৎ-স্বভাব দীনারই প্রতিবিম্ব মাত্র। ফ্রবাশির ধারণায় বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার অর্থ রক্ষাকারী আত্মা। সাধুব্যক্তিদের ফ্রবাশিগুলির কথাই লোকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া থাকে এবং প্রার্থনা করিবার সময় তাহাদিগকে স্মরণ করে।

কোন ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা দ্বারা যদি সেই ধর্মের মহত্ত্বকে পরিমাপ করিতে হয় তাহা হইলে জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মের আজকাল মহান্ বলিয়া বর্ণিত হইবার অধিকার নাই, কারণ সমগ্র পৃথিবীতে আজকাল এই ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু যদি কোন ধর্মের মহত্ত্ব তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের উপর ইহার প্রভাবের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্মের মহত্ত্ব অস্বীকার করা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পুস্তক "জোরোয়াষ্টার: তাঁহার জীবনী ও উপদেশ" হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধ শেষ করাই ভাল বলিয়া মনে করি।

"দুইহাজার বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম ইহার বিজয়মণ্ডিত জীবনে ইরাণের পূর্বে এবং পশ্চিমে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে ইহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে দান করিয়াছিল। ইহুদীগণ, খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণ এবং মুসলমানেরা জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক জোরোয়াষ্ট্রিয় ধর্মের মূল ভাবধারা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং এই ধর্মের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা অন্যান্য ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। জোরোয়াষ্ট্রীয় মতাবলম্বীদের মনে এই ধারণা থাকার জন্যই সম্ভবতঃ মুসলমান-গণ কর্তৃক পারস্য বিজিত হওয়ার পর পারসীকদের পক্ষে ইসলামধর্ম গ্রহণ এত সহজ হইয়াছিল এবং ইহাও নিশ্চিত যে এইজন্যই তাহারা অন্য লোকদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নাই। যে অগ্নিশিখা অন্যান্য অসংখ্য অগ্নি-শিখাকে প্রজ্জলিত করিয়াছে তাহার পক্ষে ঈর্ষ্যার ন্যায় একটি নীচ মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎকার্য জোরোয়াষ্ট্রীয়দের একচেটিয়া নয়। সুদূর অতীতে জোরোয়াষ্টার এই মর্মেই উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহা যে মনুষ্য জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে তাহাই তাঁহার পুরস্কার।"[২]

দ্রষ্টব্য

১। Dhalla's Zoroastrian Theology, পৃঃ ১৫৭

২। ঐ পৃঃ ১৩২

গ্রন্থবিবরণী

গাথা

ভেন্দিদাদ

Dastur, Dr. Dhalla : গ্রন্থাবলী, বিশেষ করিয়া Zoroastrian Theology and History of Zoroastrianism.

Jackson : Zoroaster.

Wadia, A. R : Zoroaster His Life and Teachings (নটেশন কোং), মাদ্রাজ।

Wadia, A. R : Dualism in Avesta and Its Philosophic import (Proceedings of the Oriental Conference, 1935-36)।

Moulton, J. H. : Early Zoroastrianism Kanga,

Cowasji : গাথাগুলির গুজরাটী অনুবাদ।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

প্রাক-সক্রেটিস যুগ

১। ভূমিকা: গ্রীক চিন্তাধারার প্রাথমিক পর্ব

সাধারণ অভিমত অনুযায়ী পাশ্চাত্য দেশে গ্রীকরা দর্শনের প্রবর্তন করেন। কতকগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ফলে গ্রীকরা এক স্বাধীন ও স্থায়ী দর্শনধারা সৃষ্টির জন্য সর্বতোভাবে যোগ্য ছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টির সহিত প্রখর বাস্তবতাবোধ এবং অনুরূপ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির যোগ হওয়াতে গ্রীকরা এক ভাব-জগৎ (World of Ideas) সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বাধীন মানবিক চিন্তা বা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা কবি-কল্পিত পৌরাণিক দেব-দেবীর পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবেই বস্তু-জগতকে ব্যাখ্যা করিবার দাবী করিতে পারিত। দর্শনের যাবতীয় মৌলিক প্রশ্ন ও সমস্যার উত্থাপন একটি বিরাট কাজ এবং গ্রীকরা শুধু যে ইহাই সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা নয়, হেলেনীয় মানস-ধর্ম অনুযায়ী স্বচ্ছ সরলতার সহিত এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও তাহারা দিয়াছিলেন। দার্শনিক চিন্তার যে মূল-তত্ত্বগুলিকে তাহারা রূপ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য দিয়াই পরবর্তী সমগ্র ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মনীতির বিকাশলাভ ঘটে এবং এখনও পর্যন্ত ঘটিতেছে।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ধারাগুলির মূল্য কেবলমাত্র গৌন ও উদ্যোগমূলক নহে। মানুষের চিন্তা-জীবনের বিকাশপথে এক বিরাট অগ্রগতি হিসাবে এইগুলির স্বকীয় মূল্য আছে। গ্রীকরা যুক্তির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন এবং ইহাকে দুইভাবে প্রযোগ করেন। গ্রীকদের নিকট জ্ঞান বলিতে শুধু জগৎ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই বোঝায় না, জীবন সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীও বোঝায়। এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শন পদ্ধতিগুলির মুখ্যধারার সহিত গ্রীক চিন্তার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। বিশিষ্ট গ্রীক চিন্তাবিদ্গণ সর্বদা দার্শনিক জীবন যাপন করিতেন। ইহাকে নীট্শে "দার্শনিক জীবনের নির্ভীক সরলতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আধুনিক দার্শনিকদের জীবনে তিনি ইহার সন্ধান পান নাই। কৃষ্টি সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা ছিল, ইহা "জীবন প্রসাধণ" অর্থাৎ জীবনের বহিরাবরণ এবং ছদ্মরূপ অপেক্ষা বৃহত্তর, কারণ সমস্ত অলঙ্করণের অন্তরালে নিরলঙ্কৃত গোপন থাকে। তাহাদের কৃষ্টির ধারণা ছিল নূতন ধরণের এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতির। অন্তর্দেশ

ও বহির্দেশের পার্থক্য দূর করিয়া, প্রচলিত প্রথা ও ছদ্ম আবরণ দূরে ফেলিয়া চিন্তা ও সঙ্কল্প, জীবন ও প্রতীতির মধ্যে ঐক্য হিসাবে ইহার প্রকাশ। প্রথাগত ও প্রসাধনমূলক সংস্কৃতির বিরোধী হইলেও যাহা কিছু আন্তরিক ও সৎ, তাহাই কৃষ্টির এই সত্যরূপের অগ্রগতির সহায়ক।

ইহা ছাড়া গ্রীকদর্শনে ধর্মান্ধতার অভাব জগৎ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বষ্টি করিয়াছে। চরিত্র-নীতি সম্বন্ধে ইহার মতবাদ শব্দ প্রমাণ ও দৈববাণী প্রভাবমুক্ত।

সর্বোপরি, গ্রীক শিল্প ও কাব্যের মত গ্রীক দর্শন জনসাধারণের মন হইতে জন্মলাভ করিয়া হেলেনীয় কৃষ্টির অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার রূপ নিখুঁত শিল্প-সঙ্গত এবং হোমারের কাব্য ও পেরিক্লিসের শিল্প-কলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মত অন্ত-হীন অম্লান সৌন্দর্যে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান।

হোমার—হোমারের সঙ্গীত-মুখরিত এশিয়া-মাইনরের আইওনিয়া গ্রীক-দর্শনের বাল্যভূমি। গ্রীক চিন্তাজগৎ, হোমার এবং দর্শন, এই দুই মেরুর মধ্যে আবর্তনশীল। এমনকি, হোমারের ভাষায় গ্রীক চিন্তাগঠনের আভাস পাওয়া যায়। আমরা যাহাকে "চরিত্র" বলি গ্রীকদের নিকট তাহা জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা রাজার ন্যায়-বিচারে জ্ঞান আছে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিষয়ে জ্ঞান আছে ইত্যাদির অর্থাৎ এই গুণগুলি তাহাদের আছে। দ্বিতীয়তঃ দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, "মৈরা (Moira) * অজেয় নিয়তি, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, পার্থিব-জীবনের যন্ত্রণা, এমনকি অমঙ্গলের উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ধারণাগুলির কোন সুষ্ঠু আলোচনার চিহ্ন হোমারের কোথাও নাই।

এইভাবে, হোমার পরবর্তী গ্রীক নীতি-শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। (তুলনীয়—স্টোয়িক "নিয়তি" এবং সক্রেতিসের "ধর্মই জ্ঞান।")

হোমারের মৃত্যুর দুই শতাব্দী কালের মধ্যে গ্রীকরা তাহাদের ঔপনিবেশিক অধিকারের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং উপনিবেশ স্থাপন ও বিদেশে বসবাসের ফলে বহু অন্য-দেশীয় অধিবাসীর সংস্পর্শে আসেন। এইরূপে তাহারা অনেক অজ্ঞাত প্রথা ও আচার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে, রাজতন্ত্রের প্রভুত্বের অবসান ঘটিল এবং গণতন্ত্রের কিংবা অভিজাততন্ত্রের প্রবর্তন হইল। কাব্যে গীতিকবিতার স্বষ্টি হইল এবং কবির ব্যক্তিজীবনে স্বীকৃতি লাভ করিল। ব্যক্তিগতভাবে পুরোহিত ও ভবিষ্যৎ-বক্তারা আত্মপ্রকাশ করিলেন ও প্রভাব বিস্তার সুরু করিলেন। ধর্ম সঙ্কটের মুখে পতিত হইল। প্রাচীন পূজাচার নূতন শক্তিমান হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারিল না।

অর্ফিউস—স্থানীয় দেবতাদের মধ্যে দিওনিসুস নামে এক দেবতা স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সৃষ্টিশীল প্রকৃতির দেবতা এবং প্রমত্ত সঙ্গীতের তালে তালে পাহাড়ের চূড়ায় মশালের আলোয় নৈশ উপচারে তাহার পূজা হইত। থ্রেস-দেশীয় চারণ-কবি অর্ফিউসের নামের সহিত এই উপাসনা পদ্ধতি যুক্ত ছিল। দেহ আত্মার যন্ত্র নহে, বরং ইহা আত্মার বন্ধন, কারাগার কিংবা সমাধিস্থল। অর্ফিউসপন্থী ধর্মতত্ত্বে জন্মান্তর অর্থাৎ দুঃখময় জন্মচক্র, সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে। সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ইহার যথেষ্ট মিল আছে, কেবলমাত্র শেষধাপে পার্থক্য, কারণ দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বে, ঈশ্বর ও জগতের প্রভেদে স্বার্থকভাবে সমন্বয় ঘটে নাই।

এইভাবে, গ্রীক্‌দর্শনের প্রথম উদ্গাতাগণ, অ্যারিষ্টটলের ভাষায় যাহাদের ধর্মবিদ বলা হয়, ধর্ম ও দর্শনের এক অপরূপ গোধূলি-আলোয় আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হন। গ্রীক দর্শনের দ্বিতীয় প্রাথমিক পর্ব প্রবচন-জ্ঞান এবং * সাতজন জ্ঞানীব্যক্তির উক্তি ও নীতির মধ্যে ইহা সুসঙ্গতভাবে পাওয়া যায়। প্লেটোর তালিকায় থেলিস, সোলোন, পিতাকাস, বিঅ্যাস, ক্লিওবিউলাস, মাইসন, চিলনের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারজনের নাম সমস্ত তালিকায় পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত মিলেটাসের থেলিসকে তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান দেওয়া হইত এবং আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ইউরোপীয় দর্শনের জনক হিসাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

প্রাক-সক্রেটিস দর্শন হইতেই প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদর্শনের সূত্রপাত (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম হইতে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত)। ইহা প্রধানতঃ ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা প্রকৃতি-দর্শনের আলোচনা। মানুষের চারিদিকের জগৎ সম্পর্কেই ইহার আগ্রহ। সোফিষ্টদের সন্দেহবাদের সহিত ইহার অবসান হয় এবং তাহারা মানুষ, মানুষের মানস-লোক ও নৈতিক জীবন এবং জীবনের নিত্যকার সমস্যার দিকে দর্শনের গতি নিরূপণ করেন।

বস্তু-বাদ বা প্রকৃতি-চেতনাবাদ প্রাক-সক্রেটিস দর্শন-ধারাকে "বস্তুবাদ" বলা হইয়াছে। কেবল অ্যানাক্সাগোরাস এই মতের ব্যতিক্রম। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রকৃতি ও চেতনা, কিংবা দেহ ও আত্মার বিভেদ প্রাচীন শুদ্ধ গ্রীক চিন্তাধারার অনুকূলে ছিল না। গ্রীকরা সর্বদা প্রকৃতিকে সপ্রাণ মনে করিতেন। তাহাদের এই ধারণাকে প্রকৃতি-চেতনাবাদ বলিলেই ঠিক বলা হয়। এই সব চিন্তাবিদ্‌দের নিকট প্রাণ ও চেতনার কোন সমস্যা নাই, কারণ প্রতিটি বস্তুই সপ্রাণ এবং অল্প বা বেশি পরিমাণে

* Seven Sages

চেতনা দ্বারা সঞ্জীবিত। হেরাক্লিটাস ও সোফিষ্টদের নিকট আমরা চরিত্রনীতি ও সামাজিক নীতি সম্বন্ধে প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাই; শিক্ষানীতি সম্বন্ধেও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। প্রাক্‌-সক্রেটিস দর্শনকে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা বলিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। কালিক অনুক্রমে অনুযায়ী স্থূল ব্যাখ্যার প্রচলনে তৃপ্ত না থাকিয়া এই সমস্ত প্রাচীন দার্শনিকগণ প্রশ্ন তুলিলেন, প্রকৃত অস্তিত্বশীল বস্তুর মধ্যে অবিনশ্বর কি এবং প্রকৃত বস্তুর উপাদান কি? সহজভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়াই পুরাতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে পার্থক্য অনুভূত হয়।

২। থেলিস ও অ্যানাক্সীমীন

থেলিস প্রথমদিকের বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্মভূমি ছিল মিলেটাস। মিলেসিয় দর্শনশাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই কারণে, প্রথম ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বজ্ঞানী যে সোলোনের সমসাময়িক থেলিস ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা জানা যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে তিনি সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে লিডীয় ও মিডদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায় (৫৮৫ খৃঃ পূঃ মে ২৮)। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশ, সুতরাং তাঁহার জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৬২৫-৬২৪ অব্দে নির্ধারণ করা যায়। খৃঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন। থেলিস মিশর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং মিশরীয় জ্যামিতি প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব—থেলিস হয়ত কিছু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শীঘ্রই হারাইয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমরা অ্যারিস্টটল হইতে পাই। নিম্নলিখিত উক্তি-গুলি থেলিসের নামে প্রচলিত:

(১) পৃথিবী জলের উপরে ভাসমান।

(২) জল সমস্ত বস্তুর উপাদানগত কারণ।

(৩) সমস্ত বস্তু দেবতা-অধিষ্ঠিত। চুম্বক সজীব, কারণ ইহার লোহাকে চালিত করিবার শক্তি আছে। প্রথম উক্তির অর্থ দ্বিতীয় বচনের তাৎপর্যে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, জলই আদি বস্তু এবং অপর সকল বস্তু ইহার ক্ষণিক বিকাশ। প্রথম বস্তু কি, তাহা অপেক্ষা, আদি কিংবা মূল বস্তু কি, এই প্রশ্ন প্রথম উত্থাপন করাতেই থেলিসের মহত্ত্ব। এই প্রশ্নে তাঁহার উত্তর: জল। যে সমস্ত বস্তু

আমরা জানি, সবই জলের বিভিন্ন আকার। আমাদের নিকট কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকারে ইহা পরিচিত।

তৃতীয় উক্তি হইতে মনে হয় যে থেলিস "জগতের আত্মায়" বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ইহা অ্যারিস্টটলের অনুমান। বারনেট থেলিসের এই ধরণের উক্তিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না, কারণ তাঁহার মতে চুম্বককে সজীব বলিয়া মনে করার অর্থ, অপরাপর বস্তু সেইরূপ নহে। থেলিসের নিমিত্ত কারণ সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বজ্ঞগণ "থেলিসের বিরাট পদক্ষেপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই এবং নিমিত্ত কারণ সম্পর্কে লক্ষ্য না করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। অবশেষে অ্যানাক্সাগোরাসের আবির্ভাব ঘটিল এবং তিনি মানসিক নিমিত্ত কারণের ধারণাকে পুনরাবিষ্কার করিলেন। এই কারণে অ্যারিস্টটল তাঁহাকে যে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন, তিনি সত্যই তাহার যোগ্য।"

বিশ্ব-চেতনাবাদ—আমরা ফেলারের উক্তিকে পরিহার করিয়া থেলিসের দর্শনকে "প্রকৃতি-চেতনাবাদ" না বলিয়া "বিশ্ব-চেতনাবাদ" আখ্যা দিব। "সমস্ত বস্তু দেবতা-অধিষ্ঠিত" বলিয়া থেলিস চুম্বক ও অলঙ্কার প্রস্তুতের খাদকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটি পদার্থকে সমস্ত বস্তুতে দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণের নিদর্শন হিসাবে লইয়াছেন। বারনেটের ব্যাখ্যায় বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

অ্যানাক্সীমীন—অ্যানাক্সীমীনের নীতিগুলি থেলিসের চিন্তার বিকাশ, কিন্তু অ্যানাক্সীমান্দার একেবারে পৃথক চিন্তাধারার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। অ্যানাক্সীমীনের রচনাভঙ্গী সহজ ও অকৃত্রিম এবং অ্যানাক্সীমান্দারের কাব্যময় গদ্য হইতে পৃথক। অ্যানাক্সীমান্দারের তত্ত্বগুলি দুঃসাহসিকতার জন্য খ্যাত; অ্যানাক্সীমীনের চিন্তাধারা অধিকতর সতর্ক এবং দৃঢ় ধারণা প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া সফল।

আদি বা মূল-বস্তু-বাদ—তিনিই প্রথম সকল পরিবর্তনশীল বস্তুর আদি কারণ হিসাবে একটি প্রকৃত অস্তিত্বশালী কারণ ঘোষণা করিলেন এবং এই কারণেই তিনি অমর। বস্তুর পৃথকীকরণের কারণ হিসাবে তাঁহার মতে স্থূলীকরণ (ঘনত্ব) ও সূক্ষ্মীকরণ (প্রসারণ) দায়ী, অথবা, কণাগুলির নৈকট্য ও দূরত্বজনিত পার্থক্য দ্বারাও ইহা হইতে পারে। সমানভাবে বিস্তৃত অবস্থায় অর্থাৎ পৃথকভাবে বায়ু অদৃশ্য। খুব সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত হইলে ইহা অগ্নিতে পরিণত হয় এবং ঘনীভবনের ফলে ইহা তরল হয়, শেষে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে অন্তর্নিহিত দ্রব্য এক এবং অসীম, কিন্তু অ্যানাক্সীমান্দারের মতে ইহা নির্বিশেষ নহে, বিশেষ; ইহা বায়ু। ইহা হইতে সমস্ত বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুর জন্ম। "আমাদের আত্মাও বায়ু এবং ইহা যেমন আমাদের ধারণ করে, সেইরূপ

নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং বায়ু সমস্ত জগতকে ঘিরিয়া (ধারণ করিয়া) রহিয়াছে।" বিভিন্ন বস্তুতে ঘনত্ব ও প্রসারণ অনুযায়ী ইহার পার্থক্য ঘটে। এই দার্শনিক আবিষ্কারের আবশ্যকতা প্রত্যেকের নিকট স্পষ্ট। মিলেসীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ইহার দ্বারাই প্রথম পরিপূর্ণভাবে সুসঙ্গত হইয়া ওঠে, কারণ প্রতিটি বস্তুকে এক দ্রব্যের বিকার বলিয়া মনে করা হয়। সমস্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত। বস্তু সমূহে পার্থক্যের কারণ বিশিষ্ট স্থানে আদি বস্তুর কম বা বেশি পরিমাণ অস্তিত্ব এবং এই মত দ্বারাই আদি বস্তুর ঐক্য রক্ষা করা যায়। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে উপমা সাহায্যে ইহা বোঝা যায়, যে, জগতের প্রাণের সহিত আদি বস্তুর একই রকম সম্পর্ক। অন্তর্বিশ্ব হইতে বহির্বিশ্বে সংযোগের প্রাচীন যুক্তির ইহার উদাহরণ।

৩। অ্যানাক্সীমান্দার ও হেরাক্লিটাস

অনাক্সীমান্দার—মিলেসীয় শাখার দ্বিতীয় ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন অ্যানাক্সীমান্দাব। তিনি খৃঃ পূঃ ৬১০-৬০৯ অব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। কতকগুলি ব্যবহারিক আবিষ্কারের জন্য তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মানচিত্র প্রস্তুতকারক। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম পুস্তকাকারের গদ্যে তাঁহার তত্ত্বগুলি লিখিয়া রাখিয়া গিযাছিলেন।

মুল-বস্তু-বাদ—অ্যানাক্সীমান্দার জল, বায়ু কিংবা অগ্নিকে আদি এবং প্রথম পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁহার মতে, বস্তুর উপাদানগত ও আদি কারণ একপ্রকার নির্বিশেষ, অসীম পদার্থ যাহা হইতে যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব হয় এবং যাহাতে যাবতীয় পদার্থ পুনরায় প্রত্যাবতন করে। যাহা হইতে বস্তুর উৎপত্তি, তাহাতে পুনর্বার বস্তুসমূহ অদৃশ্য হয় এবং "ইহাই নিয়ম ; নিধারিত নিয়ম অনুসারে তাহারা বস্তুর পৃথক অস্তিত্বের দরুণ অবিচারজনিত ক্ষতি পরিশোধন করিয়া শান্ত ভাব বজায় রাখে।" জগতের বিপরীত বস্তুর বহুল সমাবেশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং এই বিপরীত পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান হইল উষ্ণ এবং শীতল, সিক্ত এবং শুষ্ক পদার্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বস্তুকে বিচার করিলে ইহা বলাই স্বাভাবিক যে, বিপরীতগুলি নির্বিশেষ কোন পদার্থ হইতে পৃথকীকৃত হইয়াছে এবং তাহা হইলে, বিপরীতগুলির কোন একটিকে আদি পদার্থ হিসাবে কল্পনা করা যায় না। শুষ্ক পদার্থকে উপেক্ষা করিয়া থেলিস সিক্ত দ্রব্যকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। অ্যানাক্সীমান্দারের প্রশ্ন হইতেছে, কোন

বিশেষ আকারের পদার্থ কি করিয়া আদি বস্তু হইবে? মৌলিক দ্রব্যগুলি (কালগত হিসাবে ভ্রান্ত শব্দ ব্যবহার অনুমোদিত হইলে) পরস্পরের বিপরীত—বায়ু, শীতল, জল আর্দ্র, অগ্নি উত্তপ্ত এবং এইজন্য, ইহাদের যে কোন একটি অসীম হইলে অপরগুলি কালক্রমে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যাইবে। অতএব, অপরিবর্তনীয় ধ্বংসরহিত কোন পদার্থ নিশ্চয় আছে। ইহার ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং ইহা হইতে অস্তিত্বের অপচয় পূরণ করা যায়। "জলই একমাত্র সত্ত্বা," থেলিসের এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। ইহাকে এ্যারিস্টটল তাঁহার "নির্বিশেষ বস্তু"বাদের পূর্বাভাস বা পূর্বসূচনা বলিয়া মনে করিতেন। অ্যানাক্সীমান্দার যে জন্য আদি বস্তুকে "অসীম" বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা অ্যারিস্টটল নির্দেশ করিয়াছিলেন। "অর্থাৎ তাহা হইলে পরিবর্তন অসম্ভব হইবে না।"

সাধারণ মতবাদ—অ্যানাক্সীমান্দারের স্পষ্ট ধারণা ছিল, যে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত জীবনের উৎস ও পরিণাম একমাত্র আদি বস্তুকেই তিনি অনাদি ও অন্তহীন বলিয়া মনে করিতেন। এই ধারণা তাঁহাকে নৈতিক তৃপ্তি দান করিত। "প্রতিটি পৃথক অস্তিত্বকে তিনি অবিচার ও প্রবঞ্চনা বলিযা মনে করিতেন। ইহার ফলে জীবনের পরস্পর সংঘর্ষশালী ও ধ্বংসকারী রূপগুলিকে কালের নিয়ম অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।" প্রাকৃতিক নিযম তাঁহার মনে বিরাট এক ন্যায়ের রাজত্বের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। "যাহা কিছুরই অস্তিত্ব আছে, তাহাই ধ্বংসের যোগ্য।" কোন কিছুই তাঁহার নিকট "দৈব" বলিয়া বোধ হইত না, সমস্তই শক্তির উৎস-স্বরূপ অনাদি, অপরিবর্তনীয়, অক্ষর বস্তু। জগৎ চক্রের শেষে সকল বস্তুই আদি পদার্থে লীন হইবে। ইহাই আদি জাগতিক সত্ত্বাব ঐক্য।

হেরাক্লিটাস—(খৃষ্টপূর্ব ৫৩৫-৪৭৫ অব্দ)—ইফেসসের হেরাক্লিটাস ছিলেন ব্লাইসনের পুত্র এবং আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০৪-৫০০ অব্দে তিনি প্রসিদ্ধ হন। সাহসিকতায়, স্বকীযতায় এবং যুক্তি নিষ্ঠায় হেরাক্লিটাস ও অ্যানাক্সীমান্দাব প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে দুইজন দিকপাল। তিনি কাহারও শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু মিলেসীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব এবং যেনোফেনের প্রথমদিককার কবিতার সহিত পরিচিত ছিলেন। পাইথাগোরাস কর্তৃক প্রদত্ত নীতিগুলির সম্বন্ধে তাঁহার কিছু পরিমান জ্ঞান ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি নিজের নিকট ঋণী ছিলেন, কারণ যাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তাঁহাদের কেহই সত্যকার অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত ছিলেন না।" তিনি ইফেসসের রাজবংশের সন্তান ছিলেন, কিন্তু নিজের সমস্ত স্বত্ব ভ্রাতাকে দান করিয়াছিলেন।" নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল তাঁহার উপাস্য দেবী।" তাঁহার প্রভূত অহঙ্কার ও

আত্মবিশ্বাস ছিল,এবং কোন গুরুর পদপ্রান্তে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেননি।" তাঁহার গ্রন্থের নাম অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁহার স্টোয়িক টীকাকাররা ইহাকে তিনঅংশে ভাগ করিয়াছিলেন: (১) প্রাকৃতিক (২) রাজনৈতিক এবং (৩) ধর্মনৈতিক। তাঁহার রচনা-ভঙ্গীর সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার প্রবাদ আছে এবং পরে এইজন্য তিনি "তিমির" অর্থাৎ দুর্বোধ আখ্যা লাভ করেন। তিনি ভবিষ্যৎ বক্তার ভঙ্গীতে লিখিতেন, এবং এই সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি মহৎ ব্যক্তিত্বের যুগের অধিবাসী ছিলেন এবং তদানীন্তন কালে ইহাই রীতি ছিল। এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের কিঞ্চিদধিক দিব্য-প্রেরণালব্ধ মনে করিতেন।" হেরাক্লিটাস জনসাধারণ সম্বন্ধে বিতশ্রদ্ধ ছিলেন।" তাঁহার রহস্যময় দর্শন বৃহত্তর জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় অধিকারীর জন্য লিখিত হইত। জন-সাধারণকে তিনি নতুন মানুষ দেখিয়া কুকুর যেমন চীৎকার করে কিংবা সোনার তাল ফেলিয়া গাধা যেমন খড়ের আঁটি বাছিয়া লয়, সেইরকম মনে করিতেন। তাঁহার এক-বোখা মেজাজের জন্য কখনও কখনও বিরোধী উক্তির সৃষ্টি হইত।

উপদেশাবলী—তিনি শুধু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন তাহা নহে, প্রকৃতি সম্বন্ধে অতীত গবেষণার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতিও ছিল না। এতদিন পর্যন্ত যে সত্য ধরা পড়ে নাই, তাহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। স্বাধীন ও পরস্পর সংঘর্ষ পরায়ণ দৃশ্যমান বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে এক এবং অন্যপক্ষে, এই একই আবার বহু,—এই সত্যটি এতদিন পর্যন্ত অবজ্ঞাত ছিল। বিপরীতের দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে সুর সৃষ্টি। বহু পদার্থকে জানাই জ্ঞান নহে, দ্বন্দ্ব-মুখর বিপরীত-সমূহের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে অনুভব করাই জ্ঞান। ইহাই তাঁহার মূল তত্ত্ব এবং একে একে ইহার বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

পরিবর্তনবাদ—এই সূত্রেই আমরা তাঁহার তত্ত্বকে অ্যানাক্সীমান্দারের চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিতে পারি, কারণ তিনি বিপরীতের সংঘাতকে অবিচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অন্যদিকে, হেরাক্লিটাসের নিকট ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়। তাহা হইলে নূতন মৌলিক দ্রব্য বলিতে কি বোঝায়? যে দ্রব্য স্বকীয় বিশিষ্টতা হইতে অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় এবং অন্য সমস্ত বস্তু যাহাতে পরিণামে লীন হয়, সেই দ্রব্যই হেরাক্লিটাসের কাম্য। অগ্নিতে তিনি এই দ্রব্য আবিষ্কার করিলেন; জলন্ত শিখায় অগ্নির পরিমাণ সমান থাকে, অবশ্য দ্রব্য অবিরত পরিবর্তিত হইতে থাকে। অগ্নি সর্বদা ধূমে পরিবর্তিত হইতেছে এবং দাহ্য পদার্থ হইতে জাত নূতন দ্রব্য ইহার স্থান অধিকার করিতেছে। ইহাই আমাদের ইপ্সিত অবস্থা। জগতকে যদি আমরা "চির-অনির্বাণ" অগ্নিরূপে কল্পনা করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি কিভাবে ইহা অন্য বস্তুতে পরিণত হইতেছে এবং সমস্ত

পদার্থ ইহাতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। ইহার সাহায্যে পরিবর্তন এবং গতি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্নি সর্বদাই দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ধূম নিষ্ক্রমণপূর্বক প্রজ্জলিত হইতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সমস্ত জগৎ চির-প্রবহমান একটি নদীর মত এবং কোন কিছুই মুহূর্তের জন্য স্থির নহে। সমস্ত পদার্থই চলমান এবং সমস্ত কিছুই চঞ্চল। "একই নদীতে দুইবার অবগাহন করা যায় না।"

ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী পথ—অনন্ত প্রবাহকে "বিনিয়োগের" ভিত্তিতে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অগ্নি যখন ধূম প্রদান করে এবং তাহার পরিবর্তে দাহ্যবস্তুকে গ্রহণ করে, তখন এই ঘটনার জন্য এই ধরণের নাম দেওয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধ অগ্নি প্রধানতঃ সূর্যে পাওয়া যায়। পরিবর্তনকে তিনি "ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী" পথ বলিতেন। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণকে সরল অর্থে গ্রহণ করিলে (বারনেট ও যেলারের মত) অর্থহীন সমস্যার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং তাঁহাকে প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁহার রহস্যময় শব্দ ভাণ্ডারে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার চির-অনির্বাণ বহ্নি সম্পর্কে ধারণায় বস্তুর পদার্থ বা শক্তি ছাড়া আরও কিছু আছে। অগ্নি, তাঁহার মতে, একটি বিরাট দাহ-কর্মের বস্তুগত দিক, ইহা সৃষ্টিশীল, উৎপাদন ও ধ্বংসের শক্তি এবং নিত্য প্রবহমান পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সমষ্টি। যে এক অবিরত বহুতে রূপান্তরিত হইতেছে, আবার যে বহু নিরন্তর একে পরিণত হইতেছে এবং যে এক স্থির দ্রব্য বা সত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই একের ধারণাই হেরাক্লিটাসের দর্শনের ভিত্তিভূমি। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে হেরাক্লিটাসের মত আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা ব্যাঞ্জনময় সুস্পষ্ট এবং মূর্ত চিন্তার অধিকারী নীট্শে। তিনি সত্তার এই বিরাট পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষার রূপ এবং শক্তির ক্রীড়াময় এই জগতের উপর তাঁহার সমস্ত দর্শন চিন্তাধারাকে স্থাপিত করিয়াছেন।

৪। ধর্মীয় পুর্নজাগরণ : পাইথাগোরাস এবং যেণোফেন

পাইথাগোরাস প্রবর্তিত দর্শনকেন্দ্র বিশুদ্ধ চিন্তার উন্নততর স্তরের পরিচয় দেয় এবং গ্রীক চিন্তার ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে বিদ্যমান। পরবর্তী সমগ্র গ্রীক চিন্তার একটি ধারা ইহার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছিল। ইহা ধর্মীয় পুর্নজাগরণের যুগ এবং দর্শনের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য।

অর্ফিউস ও পাইথাগোরাস—অর্ফিউস-পন্থী প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় সত্যের জন্য দেব-

বাণীর উপর নির্ভর করিত। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিশ্বাস সমূহের সহিত তাঁহাদের নীতিগুলির বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল। এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসী জনের আত্মাকে "জন্মচক্র হইতে মুক্ত করা" এবং এই লক্ষ্যকে সার্থক করিবার জন্য অর্ফিউসপন্থীরা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিত। এই ধর্মীয় পুর্ণজাগরণ "দর্শন সর্বোপরি একধরণের জীবনযাত্রা" এই বিশ্বাসকেই সুদৃঢ় করিল। অ্যারিষ্টটল বলেন, দীক্ষিত ব্যক্তিকে কোন কিছু শিক্ষা লাভ করিতে হইত না, এক বিশেষভাবে তাহাদের সমাহিত হইতে হইত এবং এক বিশেষ মানস-স্তরে উন্নীত হইতে হইত। বিজ্ঞানকেও একধরণের "বিশুদ্ধীকরণ", এবং "চক্র" হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করা হইত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধীরে ধীরে জগৎ সম্বন্ধে নিরাসক্তি অর্জন করিবেন।

পাইথাগোরাস—(খৃষ্টপূর্ব ৫৮২-৫০৬ অব্দ) দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রাচীন পাইথাগোরীয় চিন্তাধারাকে পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ প্রায়ই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের। পাইথাগোরীয় দর্শনশাখার কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও মোটামুটিভাবে অপ্রতিহতগতি ছিল। বিভিন্ন দর্শনমতবাদের উপাদান ইহাতে গ্রথিত হইয়াছিল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, প্রাচীন পাইথাগোরীয় দার্শনিকদের গ্রন্থ হইতে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ এবং গণিতশাস্ত্রে তাঁহাদের আগ্রহ ও উন্নতি। এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত সামস্ দ্বীপের অধিবাসী পাইথাগোরাস সর্বসাধারণ মতানুযায়ী এই দর্শনশাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পাইথাগোরাস সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্যসম্মত বিবরণ দেওয়া সহজ নয়। তাঁহার সম্বন্ধে হেরাক্লিট্টাস্ লিখিয়াছেন, "পাইথাগোরাসের জ্ঞানসাধনা সাধারণ মানুষের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং বহু পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাঁহার ছিল, তেমনি বহু হানিকর প্রয়োগবিদ্যাও তাঁহার জ্ঞাত ছিল।" তাঁহার জীবন অপেক্ষা তাঁহার চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমরা অনেক কম জানি। হেগেল বলেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তিনি অপ্রাকৃত নিরাময় শক্তির অধিকারী ছিলেন।

পাইথাগোরীয় সম্প্রদায়—প্রথমতঃ, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বভাববিশিষ্ট এই সম্প্রদায় কোন রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। এমন কোন ইঙ্গিত নাই যাহার সাহায্যে বলা যাইতে পারে, যে, পাইথাগোরীয়গণ গণতান্ত্রিকদল অপেক্ষা অভিজাত সম্প্রদায়কে বেশি পছন্দ করিতেন। রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করিত, তাহা সুবিধাজনক না হওয়াতে সভ্যদের ধর্মীয় চেতনার অধিকতর তৃপ্তি সাধন করাই ছিল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। ইহা শুদ্ধ জীবনাদর্শের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। পাইথাগোরাস জন্মান্তর সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দিতেন। একই পৃথিবীর সন্তান হিসাবে মানুষ ও পশুর মধ্যে নিকট সম্পর্কের যে আদিম বিশ্বাস

প্রচলিত ছিল, ইহা তাহারই উন্নততর অবস্থা। কোন কোন খাদ্য সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ যেমন গো প্রভৃতি পশু মাংস বর্জন, এই বিশ্বাসেরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের নিরামিষভোজীদের মত মানবিকতাবোধজনিত কিংবা ভারতবর্ষের মত তপশ্চর্যা প্রসূত ছিল না। ইহা ছিল অপবিত্রতা বোধ হেতু নিষেধাজ্ঞা। পাইথাগোরীয়গণ দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীত মাংস ভক্ষণ করিতেন।

বিজ্ঞানসাধক পাইথাগোরাস—অ্যারিষ্টটল বলেন যে, তিনিই প্রথম শুভ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু ইহার বিভিন্ন রূপকে সংখ্যার সহিত সমন্বয় করিয়া ভুল করেন। হেরাক্লিটাস স্বীকার করেন যে, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের দুই প্রান্ত—ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল? অর্ফীয় সম্প্রদায়ের "বিশুদ্ধীকরণে" ইহার উত্তর পাওয়া যায়। নির্মোহ বিজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধতা, এবং যে মানুষ এই বিশুদ্ধাতে আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই দার্শনিক এবং "জন্ম চক্র" হইতে তিনি সার্থকভাবে মুক্ত। পাইথাগোরাস পাটীগণিতকে বাণিজ্যের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান এবং ইহাকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।" ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজে যাহারা সংখ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের কথা বলিতে গিয়া অ্যারিষ্টটল পাইথাগোরীয়দের কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ত্রিভুজের ব্যবহার জানিতেন, এবং ৩, ৪, ৫ সাহায্যে সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করিতেন। পরবর্তী যুগে ইহা "পাইথাগোরীয় ত্রিভুজ" নামে অভিহিত হয়। প্রচলিত পাইথাগোরীয় উপপাদ্য, "ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুর বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর বর্গক্ষেত্রের সমান" বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল।

অনুপাত ও ঐক্যতান—সঙ্গীত ও ঔষধ; পাইথাগোরাস এক বিরাট আবিষ্কার করেন। ইহার সাহায্যে সঙ্গীতের "অষ্টকের" সহিত গীতিমাত্রার সংখ্যাগত আনুপাতিক তাল ও লয়ের নিবিড় সম্পর্ক ধরা পড়ে। ঔষধে এবং সঙ্গীতে পাইথাগোরীয়গণ অনুপাত ও ঐক্যতানের নিয়ম প্রয়োগ করেন।

তাঁহাদের মতে দেহ বাদ্যযন্ত্রের মত কোন একটি পর্দায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সঙ্গীতের উচ্চ ও নীচ তানের মতই দেহের উত্তাপ ও শীতলতা, সিক্ত শুষ্কভাব। স্বর-সঙ্গতিই দেহের স্বাস্থ্য এবং দেহ-যন্ত্রের তার অহেতুকভাবে চড়া পর্দায় বাঁধা হইলে বা শিথিল হইলে রোগের উদ্ভব হয়। আমরা এখনও ঔষধ ও সঙ্গীতে মিল অথবা সঙ্গতির কথা বলিয়া থাকি। বিপরীত বস্তুর প্রকৃত সংমিশ্রণের ফলে যে "স্বর-ঐক্য" ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই সত্যকার স্বাস্থ্য। চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বস্তুর যেমন খাদ্য বা জলবায়ু সম্বন্ধে একই ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। খাদ্য ও পানীয়ে সংযমের বেলায়, কিংবা দেহের তাপ বা মানসিক ভাবের বেলায় অথবা এক আবহাওয়াকে অন্য

আবহাওয়াকে পৃথক করিবার বেলায় আমরা একই ভাবে পাইথাগোরীয় নীতি অনুসরণ করি। (তুলনীয়, "অজীর্ণ রোগ" শরীর যন্ত্র বিকল হওয়ার ফল।)

সংখ্যা—এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলেই পাইথাগোরাস বলিতে চাহিলেন, যে, সমস্ত পদার্থ সংখ্যা। গীতিময় শব্দকে যদি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থই কেন সেইরূপ হইবে না? পদার্থ ও সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য প্রকার সাদৃশ্য অন্বেষণ করা পাইথাগোরীয়দের প্রিয় চিন্তাধারা ছিল।

পাইথাগোরীয় তত্ত্বের দার্শনিক মূল্য—পাইথাগোরীয়গণ তাঁহাদের তত্ত্বকে আত্মা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে মানস-পদার্থকে সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত করিলেন। সংখ্যা-তত্ত্বের নিম্নলিখিত প্রযোগ বহুভাবে এ্যারিস্টটল দেখিয়াছেন :—

"চিন্তা এক, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুই, কারণ ইহাই কেবল এক হইতে জাত…প্রতিটি পদার্থই চিন্তা অথবা বিজ্ঞান, জনমত বা অনুভূতিদ্বারা বিচার করা হয়।" এই সমস্ত অস্পষ্ট ধারণাগুলিতে হেগেলের মত আধুনিক দার্শনিক ও "কিছু যুক্তি" খুঁজিয়া পাইয়াছেন। চিন্তা বিশুদ্ধ ও সার্বিক, জ্ঞান 'অপর' কিছু সম্পর্কে আলোচনা করে। এইভাবে আকার ও উপাদানকে পৃথক করা হইয়াছে।

যেনোফেন, এলিয়াটিক দর্শনের সূত্রপাত—পাইথাগোরাস তাঁহার সমসকার ধর্ম আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন, যেনোফেন মানবিক গুণবিশিষ্ট সমস্ত দেবতাকে অস্বীকার করিতেন। তিনি পাইথাগোরাস ও তাঁহার জন্মান্তরবাদকে উপহাস করিতেন। তাঁহার প্রধান গুণ হইতেছে যে তিনি দর্শন ও কাব্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেন, তাহা প্লেটোর "রিপাবলিক" গ্রন্থে পরিণতি লাভ করে। "মনুষ্য-সমাজেও যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অসম্মানকর, যেমন চুরি, চরিত্রদোষ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে দেবতাগণকে ভূষিত করা" নীতিশিক্ষার উদাহরণ হিসাবে অতীব ক্ষতিকারক। তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসনকার হিসাবে জাতির নীতিশিক্ষাগুরু হিসাবে এবং বিচক্ষণ সাধারণ জ্ঞানের প্রবক্তা হিসাবে যেনোফেন অদ্বিতীয়। তিনি দুঃখ করিতেন যে, সাধারণ লোক শারীরিক শক্তির যতটা মূল্য দেয়, জ্ঞানকে ততখানি মর্যাদা দেয় না। তিনি বলিয়াছেন, একজন ক্রীড়াবিদ বা মল্লযোদ্ধার একজন দার্শনিকের অপেক্ষা বেশি সম্মানলাভ সত্যই অদ্ভুত। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, রাষ্ট্র অধিকতর সু-শাসনের জন্য কি দার্শনিক অপেক্ষা বেশি মল্ল যোদ্ধা প্রয়োজন?

ঈশ্বর এবং জগৎ—তত্ত্ববিদ্যায় অ্যারিষ্টটল যেনোফেনকে "প্রথম একের ধারণার প্রবর্তক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এলিয়াটিকদের প্রথম দার্শনিক হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন। প্লেটো সোফিষ্ট গ্রন্থে বলিয়াছেন : "এলিয়াটিকদের মতে সমস্ত

পদার্থ নামে বহু, কিন্তু প্রকৃতিকে এক, তাহাদের এই উপকথা যেনোফেনে পাওয়া যায় এমনকি, তাঁহারও আগেকার বলিয়া মনে হয়।" বারনেট তাঁহার এলিয়া নগরে বসতি স্বীকার করেন না এবং তিনি যে একটি দর্শনশাঁখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার মনে হয়না। তিনি প্লেটোর উক্তিকে মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না। যাহা হউক, দর্শনের ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হইতেছে, তিনি এলিয়াটিক দর্শননীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিনা, তিনি এলিয়াতে দর্শনালোচনার কেন্দ্র স্থাপন করেন কিনা, তাহা নহে। যেনোফেনের চিন্তাধারা পারমেনিডিসের পূর্বাভাস। যেনোফেন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি এক স্থানে অবস্থান করেন এবং তিনি গতিহীন। আদি সত্তা সম্বন্ধে এই বিশিষ্ট উক্তি সমগ্র এলিয়াটিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য। যেনোফেন বলেন, যাহারা বলে, দেবতাদের জন্ম হয় এবং যাহারা দেবতাদের মৃত্যুর কথা বলে, উভয় দলই সমান পাপী। কারণ, দুইদলের বক্তব্যই হইতেছে যে, দেবতাদের অস্তিত্ব নাই। তিনি বহু দেবতাতে বিশ্বাস করিতেন না। "ঈশ্বর এক, তিনি সমগ্র দর্শন করেন, সমগ্রকে অনুভব করেন, সমস্ত কিছু শ্রবণ করেন, এবং বিনা আয়াসে মন এবং চিন্তা দ্বারা সমগ্র জগতকে চালিত করেন।" বারনেট এই সমস্ত পদ্যগুলিকে হোমারীয় দেবতার উদ্দেশে বিদ্রূপ বলিযা ব্যাখা করিয়াছেন এবং ইহাদের ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। যেনোফেন তাঁহার তত্ত্বের একেশ্বরবাদী মতকে পরিষ্কারভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রশংসার যোগ্য। বস্তুতঃ, আর একটি পদক্ষেপের দ্বারা পারমেনডিস এই পূর্ণ দার্শনিক একেশ্বরবাদ হইতে সর্বেশ্বরবাদে পৌছাইতে পারিয়াছিলেন।

৫। এলিয়াটিক দর্শন : পারমেনিডিস এবং জোনো

পারমেনিডিস—পাইরেসের পুত্র পারমেনিডিস এলিয়ার নাগরিক ছিলেন। প্লেটোর মতে খৃষ্ট পূর্ব ৫১৫ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কারণ ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি যখন এথেন্সে আসেন এবং সক্রেটিসের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন, তখন সক্রেটিসের বয়স ছিল আঠার কিংবা কুড়ি। তিনি এলিয়াটিক দর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তত্ত্বগুলি একটি কাব্যের আকারে লিখিত এবং কাব্যের সুরুতেই অশ্বচালিত রথে কবি এক "দেবীর" নিকট উপনীত হইতেছেন। তিনি কবিকে সহজ সত্য এবং সাধারণ মানুষের মিথ্যা বিশ্বাসগুলি দর্শন করাইলেন। কাব্যটি এইজন্য দুইভাগে বিভক্ত : (১) সত্যেব পথ (২) মতের পথ।

পারমেনিডিসের পদ্ধতি—তাঁহার আলোচনার পদ্ধতি অপূর্ব। "যাহা চিন্তা করা যায়, কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে ; কারণ যাহা আছে, তাহারই জন্যই চিন্তার অস্তিত্ব।" অতএব অসত্তা সর্বতোভাবে পরিতজ্য, কিন্তু ইহা পূর্ববর্তী সমস্ত মতবাদের গৃহীত সত্য। ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসপরায়ণ জগতের সহিত আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পারমেনিডিসের মতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভ্রান্ত। তাঁহার পরিপূর্ণ দ্বান্দ্বিক নীতির দ্বারা অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে।

সত্তাবাদ—তাঁহার মহৎ তত্ত্ব অনুযায়ী (অর্থাৎ যাহা অচিন্তনীয়, তাহার অস্তিত্ব নাই) পারমেনিডিস অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। উৎপন্ন হইতে হইলে হয় যাহা আছে, তাহা হইবে, নতুবা, যাহা নাই, তাহা হইবে। যাহা নাই তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ অসত্তা বলিয়া কিছু নাই। যাহা আছে তাহা হইতেও ইহা উৎপন্ন হইতে পারেনা, কারণ যাহা আছে, তাহা ছাড়া অন্য কিছুর উৎপত্তি সম্ভব নহে, কারণ ইহার অন্য কোন শূন্য স্থান নাই। ইহা কি আছে, অথবা, ইহা কি নাই? যদি ইহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে ইহা সামগ্রিকভাবে বর্তমান। এইভাবে পারমেনিডিস জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন। অসত্তা হইতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু, যাহা আছে, তাহা পরিপূর্ণভাবেই আছে, এবং তাহা কম বা বেশি হইতে পারে না। অতএব, ইহা একস্থানে যে পরিমাণ আছে, অন্য স্থানেও সেই পরিমাণ আছে। (এই জন্যই সূক্ষ্মীকরণ ও স্থূলীকরণ অসম্ভব।) ইহা সংবদ্ধ ও অবিভাজ্য ; কারণ ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়া বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে পারেনা। অতএব, ইহা পরিপূর্ণ সংবদ্ধ অবিভাজ্য বিশ্ব। (ইহা পাইথাগোরীয় অসংযুক্ত সত্তা অথবা শূন্য দেশনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা।) অধিকন্তু, ইহা অচঞ্চল। গতিশীল হইতে হইলে ইহাকে শূন্য দেশে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু শূন্য দেশের অস্তিত্ব নাই। বারনেটের মতে, এহ সত্তা গোলাকার ও সসীম। এই বিষয়ে বারনেট ও যেলারের মতের সহিত অ্যাডামসন ও গোম্পরেজের মতের প্রচুর পার্থক্য আছে। এই প্রশ্ন আমাদের গভীরভাবে আলোচনা করা উচিত, কারণ পারমেনিডিস "ভাববাদের" জনক ছিলেন, না অপরাপর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মত বস্তুবাদী ছিলেন, ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। যেলার সত্তা ও অসত্তার পার্থক্যের সহিত দেশপূর্ণতা ও শূন্য দেশ এক করিয়াছেন এবং বারনেট এই বিষয়ে তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। অতএব যাহা আছে, তাহা সসীম, গোলাকার গতিহীন সংবদ্ধ বিশ্ব এবং ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। পদার্থ-বিজ্ঞার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত "পদার্থই" পারমেনিডিসের সত্তা।

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ—সে সমস্ত প্রতীকগুলিকে বারনেট বস্তুবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদেরই ভাববাদ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পারমেনিডিস হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির সাহায্যে আমাদের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে পারি। "সত্তা অনাদি, এবং ধ্বংসরহিত। ইহা সার্বিক, একক, গতিহীন এবং অনন্ত। ইহার অতীত ও ভবিষ্যৎ কিছুই নাই, কারণ ইহা বর্তমান······শক্তিশালী প্রয়োজন ইহাকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে।···অতএব ঐশ্বরিক অধিকার অনুযায়ী ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই। কোন কিছুই ইহার অপূর্ণ নাই, কারণ কোন বিশেষ কিছু না থাকার অর্থ একেবারে নিঃস্ব হওয়া।" (পারমেনিডিসের কাব্য, ৫৯-৮৯ ছত্র)। অ্যাডামসন ও গোম্পরেজ পারমেনিডিস সম্পর্কে ভাববাদী ব্যাখ্যায় সহানুভূতিশীল। অ্যাডামসন মনে করেন যে, পারমেনিডিস মন বা আত্মার ধারণায় না পৌঁছাইলেও অ-বস্তুময় সত্তার কল্পনা করিয়াছিলেন। গোম্পরেজ স্পিনোজার তত্ত্ব অনুযায়ী পারমেনিডিসকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "পারমেনিডিসের সার্বিক সত্তা কি কেবলমাত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বস্তু, ইহা কি শুধুই পদার্থ?······এই ধারণা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই ধারণাই আমাদের মনে আসে যে, স্পিনোজার মতই, পারমেনিডিসও বলিতে চাহিয়াছিলেন, যে চিন্তা ও ব্যাপ্তি একই দ্রব্যের দুই গুণ এবং সত্তা চিন্তাযুক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট··· পারমেনিডিসের বস্তুগত সত্তা নিঃসন্দেহে আত্মিকগুণবিশিষ্ট ছিল। ইহা একসঙ্গে সার্বিক বস্তু ও সার্বিক মন।" পারমেনিডিসের এই স্পিনোজীয় ব্যাখ্যা একেবারে অসঙ্গত নহে।

পারমেনিডিস সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল—প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশি মূল্যবান, কারণ তাঁহারা পারমেনিডিসের নিকটবর্ত্তী কালের মানুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে পারমেনিডিসের তত্ত্ব ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা কম ছিল। অ্যারিষ্টটলের সাক্ষ্যই অধিকতর মূল্যবান, কারণ তাঁহার বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি পারমেনিডিস সম্পর্কে একটি নিখুঁৎ সঙ্গত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, যদিও চিন্তা ও বস্তুর ঐক্য-তত্ত্ব তিনি মানেন না। প্লেটো কিন্তু পারমেনিডিসের বক্তব্য সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও তাঁহার ভাববাদ সম্পূর্ণ অন্যধরনের ছিল। প্লেটো পারমেনিডিস সম্পকে বলেন, তাঁহার মত ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্র। ইহা হইতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তিকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে অন্ততঃ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার মত প্রকৃতই মূল্যবান। তিনি সোফিষ্ট গ্রন্থে বলিয়াছেন, পারমেনিডিস অসত্তাকে অনির্বচনীয়, অচিন্তনীয়, অযৌক্তিক মনে করিতেন এবং তাহার দ্বারা তিনি বলিতে চাহিতেন, যাহা আছে, তাহা চিন্তার যোগ্য, উপলব্ধি করা যায় এবং যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

পারমেনিডিস ও শঙ্করাচার্য—প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সহিত গ্রীক চিন্তার অনেক সাদৃশ্য আছে। শঙ্করাচার্য বহু বর্ষব্যাপী প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিভূ এবং তিনি পারমেনিডিসের মতই চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার অদ্বিতীয় সার্বিক সত্তার দর্শন, সত্তাকে একই সঙ্গে চিন্তা ও অস্তিত্ব, সৎ ও চিৎ মনে করা অসত্তাকে (মায়া) সত্তার বিপরীত বলিয়া কল্পনা করা, অসত্তাকে অস্তিত্বহীন বলা, জগতের বৈচিত্র্যকে প্রতিভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করা, দৃশ্যমান জগৎ ও প্রকৃত সত্তার মধ্যে এবং ব্যবহারিক ও পরমার্থিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য করা প্রভৃতির জন্য (ইহা পারমেনিডিসের মত সত্য ও মতের পার্থক্য) শঙ্করাচার্যকে আমরা ভারতীয় পারমেনিডিস বলিতে পারি। সর্বশেষে, যৌক্তিক সার্বিক সত্তার বিরুদ্ধে যেভাবে পারমেনিডিস ও শঙ্করাচার্য দুই জনেই যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আশ্চর্য রকম-মিল দেখা যায়। সার্বিক সত্তা সর্বাংশে না অংশতঃ বিশেষের মধ্যে বিরাজ করে? সর্বাংশে বিরাজ করিলে ইহা বহু পদার্থে বিস্তৃত; অতএব ইহা বহু। ইহা যদি অংশতঃ বিশেষের মধ্যে থাকে, বিশেষ বহু বলিয়া ইহা বিভাজ্য। (তুলনীয় প্লেটো : পারমেনিডিস ১৩১, এ, এফ, এফ এবং শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ২, ১, ১৮)। যুক্তিগুলির বিস্ময়কর সাদৃশ্যদ্বারা গোম্পরেজের সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করা যায়, যথা, "অন্য কারনে যদি পারমেনিডিসের ভাববাদী ব্যাখ্যা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে পারমেনিডিসের সহিত ভারতীয় বেদান্ত দার্শনিকদের সহিত যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে শেষ সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।" (গোম্পরেজ : গ্রীক থিংকারস্ ১, ১৭৯)।

জেনো (খৃষ্টপূর্ব: ৪৮৯ অব্দ)—পারমেনিডিসের সার্বিক অদ্বৈতবাদের দৃষ্টি কোণ হইতে জেনো প্রচলিত বহুত্ব বাদগুলিকে খণ্ডন করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ দ্বান্দ্বিক যুক্তি-পদ্ধতির দ্বারা তিনি স্বীয় গুরুর অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিরোধীপক্ষের জগতকে ধূলিসাৎ করেন। দুই সহস্র বর্ষের অধিককাল অগ্রগতি ও দর্শন আলোচনার পরেও বারট্রাণ্ড রাসেলের মত একজন যুক্তিধর্মী আধুনিক দার্শনিক তাঁহার যুক্তিগুলিকে "অতীব সূক্ষ্ম ও গভীর" বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। জেনোর দর্শনের বিষয় অস্তিত্ববাচক কি নাস্তিবাচক তাহা লইয়া মতভেদ আছে। গোম্পরেজের মতে, তিনি এলিয়াটিক দর্শনের ঐক্য সম্বন্ধে বিশ্বাস লইয়া দর্শন আলোচনা সুরু করিলেও সন্দেহবাদী এবং শূন্যবাদী হিসাবে শেষ করেন। যেলার অবশ্য তাঁহার নাস্তিবাচক যুক্তিপদ্ধতির অস্তিত্ববাচক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে করেন। বিরোধী কোন সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাঁহার আলোচনা সুরু করেন এবং তাহা হইতে কোন অর্থহীন বা দুইটি বিপরীত সিদ্ধান্ত বাহির করেন। বস্তুতঃ, বহুত্ববাদকে অর্থহীন সিদ্ধান্তে রূপায়ণ করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার যুক্তিগুলি প্রধানতঃ এম্‌পিডক্লিজ ও পাইথাগোরীয়দের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট

হইলেও প্রসঙ্গতঃ সমস্ত বহুত্ব বাদীর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে অ্যানাক্সা-গোরাস ও পরমাণুবাদীগণও আছে। এমন কি, হেরাক্লিটাসের অবিশ্রাম গতি ও পরিবর্তনের মতবাদও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বান্দ্বিক যুক্তিবাদী বা তার্কিকদের মধ্যে প্রথম বলিয়া আমরা জেনোকে শুধু সোফিস্টগণ ও সক্রেটিসেরই নয়, প্লেটো-প্রবর্তিত-তর্ক পদ্ধতিরও পূর্বসূরী বলিতে পারি।

গতির বিরুদ্ধে যুক্তি—জেনোর যুক্তিগুলিকে অ্যারিস্টটল দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) গতির বিরুদ্ধে যুক্তি এবং (২) বহুত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি। গতিশীল কোন পদার্থের পক্ষে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানই সম্ভবপর নহে। বেগবান অ্যাকিলিসের পক্ষে তাঁহার অগ্রবর্তী মৃদুগতি কচ্ছপকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

চলন্ত তীরকে স্থির বলিয়া ধরিতে হইবে। এই যুক্তিগুলি সম্বন্ধে এ্যারিস্টটল বলেন, এইগুলির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হইল অসীম ও অসীমের ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে পার্থক্য না করা। "পরিমাণ গতভাবে অসীমের পক্ষে সসীম সময়ে কোন কিছুর সংস্পর্শে আসা সম্ভব নহে, কিন্তু বিভাগজাত অনন্ত ক্ষুদ্রতম অংশের পক্ষে ইহা সম্ভব।" (অ্যারিস্টটল—পদার্থবিদ্যা, ষষ্ঠ, ২, ২৩৩)। সুতরাং সসীম সময়ে ক্ষুদ্রতম স্থান অতিক্রম করা সম্ভব। ক্ষুদ্রতম অংশের গাণিতিক মাপ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হয়। অ্যারিস্টটল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই অসীমের সহিত সসীমের যে সম্পর্ক, ক্ষুদ্রতম অংশের সহিতও তাহার বেশি বা কম নহে; সসীমের সহিত সম্বন্ধে তাহারা একস্থানে বিরাজ করে।

বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি—সিম্পলিকিযাসের দ্বারা এই যুক্তিগুলি রক্ষিত হইয়াছে। সত্তা বহু হইতে পারে না কারণ ইহা একই সঙ্গে সসীম ও অসীম হইবে। ইহা সসীম, কারণ ইহা যতগুলি বিন্দু আছে, তাহার সমষ্টি ইহা অসীম, কারণ যে কোন বিন্দু যুগলের মধ্যে আমরা অন্তর্বর্তী আর একটি বিন্দু স্থাপন করিতে পারি। আবার, সত্তার কোন পরিমাণ থাকিতে পারে না, কারণ একই রেখা এক সঙ্গে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম হইতে পারে এবং এই ধারণা অর্থহীন। সর্বশেষে, কিছু পরিমাণ শস্য কিভাবে শব্দ সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা অকল্পনীয, কারণ প্রতিটি শস্য ও প্রতিটি শস্যের ক্ষুদ্রতম অংশকে শব্দ সৃষ্টি করিতে শোনা যায় না, যদিও শব্দ তৈয়ারী হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

গতির বিরুদ্ধে জেনোর যুক্তিগুলি সময় সম্পর্কে প্রযুক্ত অসীম ও অবিভাজ্য বিশেষণের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত। বহুত্ব সম্বন্ধে যুক্তিগুলি দেশ সম্পর্কে ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত। জেনোইউক্লিডকে তাঁহার বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

শস্য-কণা-সমষ্টি সম্বন্ধে জেনোর যুক্তি লাইবনীজ অধ্যায়ী ও আধুনিক মনো-

বিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের যাথার্থ অপ্রমাণের জন্য এই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে ; লাইবনীজ যে সমুদ্রের গর্জন সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহারও একই সমস্যা। লাইবনীজ তাঁহার "অনুপ্রত্যক্ষ" মতবাদ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করেন, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান অবচেতন ও অচেতন মন এবং অবচেতন অংশের মিলনে চেতন-মনের সৃষ্টির সাহায্যে এই সমস্যা আরও সুচারুরূপে সমাধান করিয়াছে।

জেনোর দার্শনিক মূল্য—জেনোর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে অবিভাজ্য ও জ্যামিতিক বিন্দুর প্রকৃতি আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত এইগুলি বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃত অবদান। তাঁহার পরিপূর্ণ গতিহীন সত্তার আলোচনায় অ্যারিস্টটল বলেন, জেনোর নিকট সমগ্র বিশ্ব স্থির-সত্তামাত্র, একপ্রকার "রুদ্ধ-বিশ্ব" যাহাতে গতি বা পরিবর্তন নাই। হেরাক্লিটাসের অবিরাম গতি-বাদের বিপরীত প্রান্তে যাইতে চেষ্টা করিয়া এলিয়াটিকগণ, পারমিনিডিস ও জেনো এক "পরিত্যক্ত, নিবাত, নিষ্কম্প বিশ্বে" উপনীত হইলেন। অ্যারস্টটলের নিকট সত্তা সম্পর্কে এই ধারণা অকল্পনীয়। আধুনিক কালে বার্গ্‌সঁ জেনোর ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন এবং তিনি গতিকে দেশ-কাল সম্পর্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গতি শুদ্ধ দেশগত বা কালগত নয়। ইহা দেশ ও কালের মধ্যে সহযোগের সম্পর্ক : গতি অবিভাজ্য। তীরটিকে গতিপথের প্রতি বিন্দুতে স্থির ধরিলে ইহা কখনও গতিবান হইতে পারে না। বার্গ্‌সঁ বলেন "গতিশীল পদার্থকে ইহার পথের একটি বিন্দুতে মনে করার অর্থ ইহার পথকে সেই বিন্দুতে কাঁচি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা এবং যে একটি গতিরেখা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছিলাম, তাহার পরিবর্তে দুইটি গতিরেখা স্থাপন করা।" (ক্রিয়েটিভ ইভ্যুলুশন, ৩২৫-২৮ পৃঃ)।

৬। এম্‌পিডক্লিজ ও আনক্সাগোরাস

এম্‌পিডক্লিজ (খৃষ্টপূর্ব ৪৯৫-৪৩৫ অব্দ)—বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে অনুরাগ এবং প্রাকৃতিক সীমা লঙ্ঘন করিবার জন্য একই প্রকার নিরলস ঐকান্তিক সাধনার সমন্বয়ে এম্‌পিডক্লিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কোন্ কোন্ শক্তি প্রকৃতিকে চালনা করে তাহা আবিষ্কার করাই এবং সেই শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজেকে উচ্চ স্তরের

মানুষ বলিয়া ভাবিতেন, কারণ জন্মসূত্রে চিকিৎসক, কবি এবং জননেতা হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; "মরজগতে তিনি অমর দেবতার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেন" এবং তিনি যখন নগরপরিক্রমায় বাহির হইতেন, সহস্র সহস্র মানুষ তাঁহার অনুগামী হইত।

উপদেশাবলী : বহুত্ববাদ—এলিয়াটিকদের মতই তিনি পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন, কিন্তু তিনি গতির অস্তিত্ব মানিতেন। পদার্থ স্বরূপে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু দ্রব্যসমূহ অবিরাম পরিবর্তনশীল ; তাহাদের উপাদান সমূহ (চারিটি মূল পদার্থ) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত ও বিশ্লিষ্ট হইতেছে। সুতরাং আমাদের মৌলিক ঐক্যের ধারণা ত্যাগ করা উচিত। জল হইতে বায়ুর উদ্ভব হয় না, কিংবা অগ্নি হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয় না, অথবা বায়ু হইতে জল সৃষ্ট হয় না এবং এই চারিটি মূল পদার্থকে আমরা সমভাবে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিব। "মূল পদার্থগুলিকে" তিনি অনাদি ও অনন্ত বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, এম্‌পিডক্লিজ অ্যানাক্সিমান্দার ও পাইথাগোরীয়দের বিপরীত ধারণাকে (যথা উষ্ণ এবং শীতল, সিক্ত এবং শুষ্ক পদার্থ) গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইহারা প্রত্যেকেই পারমেনিডিস-প্রচলিত অর্থে সত্য পদার্থ। এই কারণে তাঁহার দর্শনকে পারমেনিডিসের অদ্বৈতবাদ ও ডেমোক্রিটাস এবং পরমাণুবাদীদের চরম বহুত্ববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা হিসাবে অভিহিত করা হয়।

রাগ ও দ্বেষ—এলিয়াটিকগণের সমালোচনার জন্য পরবর্তী দার্শনিকদের পক্ষে গতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। এম্‌পিডক্লিজ চারিটি মূল পদার্থের "মিশ্রণজাত অবস্থাকে মৌলিক বলিয়া মনে করেন, ইহারই জন্য পরিবর্তন ও গতি সম্ভব হয়। কিন্তু মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের কারণ কি ? এম্‌পিডক্লিজ দ্বেষের অস্তিত্ব কল্পনা করেন, যাহার ফলে জগতের সমস্ত উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় এবং রাগের দ্বারা সমস্ত উপাদান একত্রিত হয়। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এম্‌পিডক্লিজের দ্বেষ ও রাগ আত্মিক শক্তি নয়, অপর চারিটি পদার্থের মত ইহারাও ভৌতিক উপাদান। দেহের পক্ষে শোণিত ও বায়ুর মতই জগতের পক্ষে দ্বেষ ও রাগ। ধ্বংসপরায়ণ বস্তু সমন্বিত জগতের অস্তিত্ব দ্বেষ ও রাগের জন্যই সম্ভব। মূল উপাদানগুলিই শাশ্বত ; বিশেষ দ্রব্যগুলি অস্থির সমবায় এবং মূল পদার্থগুলি "একে অপরের সহিত" একভাবে বা অন্যভাবে মিশ্রিত হইলে ইহাদের সৃষ্টি হয়। ইহারা মরণশীল অথবা ধ্বংসপরায়ণ, কারণ ইহাদের স্বকীয় কোন উপাদান নাই। ইহাদের মৃত্যু বা ধ্বংসের শেষ নাই। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং রাগ ও দ্বেষ শক্তিদ্বয় ব্যতীত সকল বস্তুরই ধ্বংস অনিবার্য। প্রাচীন গ্রীক চিন্তায় মন ও বস্তুর দ্বন্দ্ব সর্বপ্রথম অ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া ওঠে।

আনাক্সাগোরাস (খৃষ্টপূর্ব ৫০০-৪২৮ অব্দ)—ধনী পরিবারে তাঁহার জন্ম, কিন্তু সম্পদ ত্যাগ করিয়া তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এথেন্সে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে তিনি পেরিক্লিস কর্তৃক আহূত হন। নীট্‌শে পেরিক্লিসকে অ্যানাক্সাগোরীয়দের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং পৃথিবীর মধ্যে মহত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। প্লেটো মত প্রকাশ করিয়াছেন, অ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনই পেরিক্লিসের প্রতিভাকে মহত্বের শিখরে উনীত করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে, অ্যানাক্সাগোরাস উৎপীড়িত হন এবং "সূর্য উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড এবং চন্দ্রের দেহ মৃত্তিকানির্মিত" শিখাইবার জন্য তাঁহার বিচার হইয়াছিল। প্রকৃত আইওনিয়াবাসীর মত তিনি গদ্যে লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ হইতে দেখা যায় যে তাঁহার রচনারীতি উন্নত ও মনোমুগ্ধকর ছিল।

বীজ-তত্ত্ব—এম্‌পিডক্লিজের মত তাঁহার দর্শন এলিয়াটিকতত্ত্বের গতিহীন মৌলিক পদার্থের সহিত অবিরাম সৃষ্টিশীল ও ধ্বংসশীল জগত-তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পারমেনিডিসের সিদ্ধান্তগুলি অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি পুর্নপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমগ্র বস্তুসমূহে বৃদ্ধি নাই, কারণ সমগ্র ব্যতীত কিছুই নাই এবং সমগ্র সকল সময়ই সমান। কিংবা, কোন কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সাধারণতঃ মানুষ যাহাকে উৎপাদন ও ধ্বংস বলে, তাহা আসলে মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ। এইভাবে তিনি বহু মৌলিক পদার্থ স্বীকার করিলেন। এবং এইগুলিকে তিনি 'বীজ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এইগুলি ঠিক এম্‌পিডক্লিজের চারিটি মূল পদার্থ যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ নহে, বরং ইহারা মিশ্র পদার্থ।" "প্রতিটি পদার্থের মধ্যে প্রতিটি পদার্থ আছে।" (অংশ, ১১) "কেশ অ-কেশ পদার্থ হইতে কিভাবে জাত হয়, দেহ অদেহ পদার্থ হইতে কিভাবে জাত হয়? (অংশ, ১০)। অস্থির ক্ষুদ্রতম অংশও অস্থি এবং এমন কোন ক্ষুদ্রতম বস্তু নাই, যাহাতে বিপরীত সমূহের অংশ নাই। এই উক্তিগুলি এম্‌পিডক্লিজের চারিটি মৌলিক পদার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রতিটি বস্তুতে প্রতিটি বস্তু থাকিলেও যে বস্তু অধিক পরিমাণে থাকে, দ্রব্য তাহারই প্রকৃতি-প্রাপ্ত হয়। (অংশ ১২)। "এক জগতের দ্রব্য অন্য জগতের দ্রব্য হইতে অস্ত্রদ্বারা পৃথক নহে।" অতএব জগতে বস্তুর বিভিন্নতা অংশগুলির বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ অনুযায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত বস্তুর মিশ্রিত জাগতিক অবস্থা হইতে বিচিত্র জগতের উদ্ভব কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? কিভাবে গতির সৃষ্টি হয়—ইহা আর একটি সমস্যা এবং গ্রীক চিন্তাধারায় আনক্সাগোরাসের দ্বিতীয় অবদান অর্থাৎ তাঁহার প্রজ্ঞাবাদে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

প্রজ্ঞা—এম্‌পিডক্লিজের মত তিনিও মিশ্রিত পদার্থে গতি-সৃষ্টির জন্য কোন বহিঃকারণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি ইহাকে মন বা প্রজ্ঞা আখ্যা দিলেন। এই মূল্যবান তত্ত্বের জন্য তাঁহাকে দর্শনে মন বা আত্মার আবিষ্কর্তা বলা হয়। কিন্তু আত্মার ধারণাকে তিনি এম্‌পিডক্লিজ অপেক্ষা বেশি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল উভয়েই অ্যানাক্সোগোরাসের নূতন অবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রকৃতির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "প্রজ্ঞা" পরিপূর্ণভাবে সরল, কিন্তু বিপরীত দিকে, পদার্থ মিশ্রিত ও যৌগিক। প্রজ্ঞা "অমিশ্র'' এবং নিজের জন্যই অস্তিত্ববান, ইহা "সূক্ষ্মতম ও পবিত্রতম" পদার্থ; ইহা সর্বভূতজ্ঞ ও প্রভূত শক্তি সম্পন্ন। মিশ্র বস্তুকে পৃথক করাই ইহার প্রধান কাজ। প্রজ্ঞা কর্তৃক চালিত হইবার পূর্বে বস্তু স্তূপাকারে থাকে এবং তখন সমস্তই একীভূত থাকে। কিন্তু আনক্সাগোরাস এই পৃথকীকরণের পরবর্তীস্তর এবং জগৎ সৃষ্টি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দের্কাতের মত দ্বৈতবাদী, এবং লাইবনীজের মত উদ্দেশ্যমূলক চৈতন্যবাদী নহেন। ভারতীয় দর্শনে, তাঁহার মতবাদের সহিত সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের সাদৃশ্য আছে।

৭। সোফিষ্টগন: প্রোটাগোরাস ও ডেমোক্রিটাস

সোফিষ্টগন—সত্তা সম্বন্ধে এলিয়াটিকগণের ধারণা ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিরোধী ছিল। বিজ্ঞানের জগৎ কি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জগৎ অপেক্ষা অধিকতর সত্য? আমরা কিভাবে বলিতে পারি যে চিন্তা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক নহে? মানুষের চিন্তা যুগ হইতে যুগে, ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিতে, এমন কি দেশ হইতে দেশে প্রভেদ হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাগুলির এক বিষয়ে ঐক্য আছে, যথা অন্যান্য চিন্তাধারাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করা হয়। খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এইরূপ সংশয়ভাবাপন্ন চিন্তাধারা ছিল।

সোফিষ্ট" * শব্দটির আধুনিক অর্থগ্রহণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্লেটো ও অ্যারিস্টটল "সোফিষ্ট'' বলিতে "সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য যুবকদের বেতনভুক শিকারী" ও "মিথ্যা জ্ঞান বিতরণে অর্থ উপার্জনকারী" বুঝিয়াছেন। "সোফিষ্টদের যুগ" সবদিক দিয়া বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যুগ।

* সোফিষ্ট—কুতার্কিক।

প্রোটাগোরাস (খৃষ্টপূর্ব ৫০০-৪৩০ অব্দ)—অ্যাবডেরা নিবাসী প্রোটাগোরাস ছিলেন আদিতম সোফিষ্ট। প্লেটো তাঁহার থিটেটাস গ্রন্থে এই দার্শনিকের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রহসন রচনা করিলেও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রহসন মাত্র এবং আরও আন্তরিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপলব্ধি করিতে বাধ্য হই, সক্রেটিসের প্রোটোগোরাস সম্পর্কে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। প্লেটো তাঁহার গ্রন্থকে "সত্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন, কারণ "সত্য" বলিতে গ্রীকভাষায় "অস্ত্র-নিক্ষেপক"ও বোঝায় এবং মল্লযুদ্ধ হইতে গৃহীত এই উপমা দ্বারা জ্ঞানের উৎস হিসাবে সংবেদন সম্পর্কে সমালোচনা করা হইয়াছে।

তাঁহার প্রসিদ্ধ মতবাদ "মানুষই যাবতীয় বিষয়ের অর্থাৎ যত বিষয় আছে, সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং যে সমস্ত বিষয় নাই, তাহাদের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে একমাত্র মানদণ্ড।" কোন্ মানুষ মানদণ্ড? ব্যক্তি মানুষ না সাধারণ মানুষ? প্লেটো ইহার এইরকম অর্থ করিয়াছেন।

"আমি যেরকম দেখি, বস্তু সমূহ সেই রকম, এবং তুমি যেরকম দেখ, তোমার নিকট বস্তুসমূহ সেই প্রকার।" ডেমোক্রিটাসও এই নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা নীতি বিগর্হিত তত্ত্ব নহে। প্লেটো স্পষ্টই বলিয়াছেন, প্রোটাগোরাসের মতে সমস্ত বিশ্বাস একই রকম হইলেও কোন কোন বিশ্বাস আবার বিশ্বাস অপেক্ষা দৃঢ়তর হইতে পারে। এইরূপে প্লেটো প্রোটাগোরাসকে নির্দেশনার জন্য প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তণের সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিয়মের একনিষ্ঠ সমর্থক বলিয়া মনে করেন। তিনি সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের দৃঢ় সমর্থন করিতেন এবং মনে করিতেন, যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং প্রথা প্রভৃতি মানুষকে বর্বরতা হইতে উদ্ধার করে। বিপ্লবী না বলিয়া তাঁহাকে বরং ঐতিহ্যগত নীতিবাদের সমর্থক বলা যায় এবং তাঁহার এই সমর্থন পুরাতন সংস্কার বশতঃ নহে, সামাজিক প্রথার মূল্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই। বারনেট ধর্মবিরোধিতার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগকে "একেবারেই অবিশ্বাস্য" বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য যে, দেবতারা আছেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু যদি ধ্রুবজ্ঞান পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রথাগত উপাসনাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতি বা স্বভাবের বিরুদ্ধে নিয়মের সমর্থক ইহাই বলিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে ধর্মবিরোধী কিছুই নাই।

মানবিক মানদণ্ডবাদ—যেলার বলেন, প্রোটাগোরাস নীতিগত বা রাজনীতিগত বিচারে ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিনিধি ছিলেন না। বারনেট এই নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মানুষের সাধারণজ্ঞানের বিরোধী মতবাদগুলিকে অবহেলা করা যাইতে পারে।" গোম্পরেজ "মানুষ" কথাটির জাতিগত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মানব-প্রকৃতি

কিংবা সাধারণ মানুষই যাবতীয় বিষয়-সমূহের মানদণ্ড, ব্যক্তিমানুষ নহে। তাঁহার মতে এই তত্ত্বটির কোন নৈতিক অর্থ থাকিতে পারে না এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবাদের মানদণ্ড ইহা হইতে পারে না। তত্ত্বটির শিলার কর্তৃক মানবিক ব্যাখ্যা হইতে মনে হয় যে প্রোটাগোরাস গ্রীকচিন্তাধারা বিনষ্টকারী বুদ্ধিবাদ ও সৌন্দর্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। ইহাকে "ব্যক্তিপ্রভাবিত সমষ্টিগত" ব্যাখ্যা বলা যায়। এই মত অনুযায়ী প্রোটাগোরাসের "মানবতাবাদ" "ব্যক্তি মানুষ" ও "জাতি মানুষকে" ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। বারনেট ইহাকে নীতি বিহর্গিত তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন না। যেলার মনে করেন, প্রোটাগোরাসের মতে কোন সার্বভৌম ধর্ম, নীতি বা ন্যায় নাই। তিনি সমস্ত নীতি ও নিয়মকে আপেক্ষিকভাবে সত্য বলিয়া মনে করিতেন অর্থাৎ যে মানবজাতি এইগুলিকে প্রণয়ণ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই এইগুলি প্রযোজ্য, কিন্তু যতদিন মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে হয়, ততদিনই এইগুলি প্রযোজ্য।

ডেমোক্রিটাস (খৃষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০ অব্দ)—ডেমোক্রিটাসের মন ছিল সার্বজনীন এবং তাঁহার যুগের সমস্ত দার্শনিক জ্ঞানের তিনিই ছিলেন ধারক। বিশ্বতত্ত্ববাদীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মানসিক জীবনকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এইজন্য তিনি নিঃসন্দেহে তাঁহার স্বদেশবাসী প্রোটাগোরাস দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পার-মেনিদিসের মত তিনিও সমগ্র সৃষ্টি বা ধ্বংসের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিচিত্র সত্তা, গতি ও যৌগিক বস্তুর উৎপন্ন বা ধ্বংসকে অস্বীকার করিতেন না।

পরমাণুবাদ—ডেমোক্রিটাস সত্তা ও অসত্তা, পূর্ণ ও শূন্যকে সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতেন। উপলব্ধির অতীত অসংখ্য কণাতে পূর্ণ বিভক্ত হয়। শূন্যদ্বারা এক অপর হইতে পৃথকীকৃত হয় এবং ইহারা প্রত্যেকেই অবিভাজ্য। এইজন্য ইহাদিগকে "পরমাণু" বা "শূন্যসহান রহিত ঘন পদার্থ" বলা হয়। ডেমোক্রিটাসের এই "পরমাণুগুলি" পারমেনিদিসীয় মতে সৎ; ইহাদের উৎপত্তি নাই, ও ধ্বংসও নাই, দ্রব্যগত দিক দিয়া ইহারা পরিপূর্ণভাবে সমজাতীয়, কেবলমাত্র আকার এবং পরিমাণ দ্বারা ইহাদের পৃথকীকরণ সম্ভব; ইহাদের কোন গুণগত পরিবর্তন হয়না, কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন হয়। দ্রব্যের গুণ পরমাণুগুলির আকার, পরিমাণ, অবস্থান এবং সমাবেশের উপর নির্ভর করে। ইহা সত্বেও, ইহাদের মধ্যে একটি মূল্যবান পার্থক্য আছে; এই পার্থক্যই পরে লকের প্রাথমিক ও গৌন গুণের পার্থক্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কতকগুলি গুণ (যথা, ওজন, ঘনত্ব, কাঠিন্য) পদার্থের স্বকীয়; অপরগুলি (যথা, বর্ণ, স্বাদ) দ্রষ্টার প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করে। ডেমোক্রিটাসের মতে, এই পরমাণুগুলি পরিমাণ ও ওজনের পার্থক্যের জন্য প্রথম হইতেই ঘূর্ণায়মান অবস্থায়

রহিয়াছে। এইরূপে গতি আদি পদার্থে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং (এম্‌পিডক্লিজ ও আনক্সাগোরাসের মত) গতিসৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র শক্তিকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। এই গতিদ্বারা একদিকে একজাতীয় পরমাণুগুলি একত্রিত হয় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন আকারের পরমাণু-সংযোগের দ্বারা পৃথক এবং একক পরমাণু-মিশ্রণ বা জগতের সৃষ্টি হয়। আমরা যে জগতে বাস করি, তাহা অসীম জগত সমূহের একটি।

জ্ঞানতত্ত্ব—অন্যান্য দ্রব্যের মত আত্মাও পরমাণুদ্বারা গঠিত। বাহিরের পরমাণুদ্বারা আত্মার পরমাণুতে অভিঘাত সৃষ্টি হইলে সংবেদন জাত হয় এবং এই সমস্ত পরমাণু ইন্দ্রিয়-পথের দ্বারা প্রবেশ করে। আমরা যাহা দেখি, তাহা দৃষ্টির বিষয় নহে, পদার্থগুলি অবিরাম যে "প্রতিকৃতি" সৃষ্টি করে, তাহাই দৃষ্টির বিষয়বস্তু। যে পদার্থ হইতে ছায়ার বা প্রতিকৃতির উৎপত্তি, ইহা তাহার অবিকল নকল নহে; বাতাসের মধ্য দিয়া আসিবার ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে। ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আপেক্ষিকতা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। "ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কোন কিছুকেই নিশ্চিন্তভাবে জানি না।" ডেমোক্রিটাস অবশ্য প্রোটাগোরাসের মত সমস্ত জ্ঞানকে আপেক্ষিক করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি "যথার্থ জ্ঞান" ও "মিথ্যা জ্ঞানের" মধ্যে পার্থক্য করেন, প্রথম জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পৃথক এবং আত্মা-লব্ধ-জ্ঞান। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে তাঁহার জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। বাহিরের পরমাণু কর্তৃক আত্মা-পরমাণুতে অভিঘাত সঞ্জাত হইলে যুক্তি সৃষ্টি হয়।

নীতিশাস্ত্র—যুক্তি যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চস্তরের, সেইরূপ মঙ্গল সম্বন্ধে যৌক্তিকজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ কামনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মার শান্ত ভাব, চিত্তের ঐক্যভাবযুক্ত শান্তিই হর্ষ ও বিষাদ অপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের। "মানুষের পক্ষে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হইলে যে পরিমাণ সুখ সম্ভব, তাহা ভোগ করা এবং যতটুকু দুঃখ সহ্য না করিলেই নয়, তাহা সহ্য করা উচিত।" কিন্তু ডেমোক্রিটাস নিকৃষ্ট (ইতর) সুখবাদ হইতে পৃথকভাবে সুখকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মার শান্তি বা আনন্দময় ভাবের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতি ও জগৎ সম্বন্ধে যান্ত্রিক ও বস্তুবাদী নীতিতে বিশ্বাসী দার্শনিকের মধ্যে এইখানে আমরা চরিত্র সম্বন্ধে ভাববাদী-তত্ত্বের সম্ভাবনা দেখি।

গ্রন্থপঞ্জী

বেক্‌ওয়েল : সোর্স বুক অফ্‌ গ্রীক ফিলোসফি।
বারনেট : আর্‌লি গ্রীক ফিলোসফি।
ফেয়ারব্যাঙ্কস্ : দি ফার্ষ্ট ফিলোসফারস্ অফ্‌ গ্রীস।
গ্রোটে : হিষ্ট্রী অফ্‌ গ্রীস।
গোম্পরেজ : গ্রীক থিংকারস্, খণ্ড-১
যেলার : আউটলাইনস্ অফ্‌ দি হিষ্ট্রী অফ্‌ গ্রীক ফিলোসফি।
যেলার : দি প্রি-সক্রেটিক স্কুলস, দুই খণ্ড।
অ্যাডামসন : ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফ্‌ গ্রীক ফিলোসফি।
বারনেট : থেলস্ টু প্লেটো।
রনডে : থেলস্।
রনডে : হেরাক্লিটাস।
রনডে : অ্যারিস্টটলস্ ক্রিটিসিজম্ অফ্‌ দি এলিয়াটিকস্।
রনডে : অ্যারিস্টটলস্ ক্রিটিক অফ্‌ প্রোটাগোরিয়ানিজম্।
শ্রীঅরবিন্দ : হেরাক্লিটাস।
হেগেল : হিষ্ট্রী অফ্‌ ফিলোসফি, ১ম খণ্ড।
লিউস্ : বায়োগ্রাফিক্যাল হিষ্ট্রী অফ্‌ ফিলোসফি।
নীট্‌শে : লেকচারস্ অন্ গ্রীক ফিলোসফারস্।
বেন্ : দি গ্রীক ফিলোসফারস্, দুই খণ্ড।
ফেরিয়ার : লেকচারস্ অন্ গ্রীক ফিলোসফি, দুই খণ্ড।
দিইয়েলস্ : দোক্সাগ্রাফি গ্রীকি।
রিটার : গেসকিক্‌টে দার ফিলোসফি অল্‌টার জিট।
অয়ার্কস অফ্‌ প্লেটো অ্যাণ্ড অ্যারিষ্টটল।

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ

সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিষ্টটল

১। সক্রেটিস : ৪৭০—৩৯৯ খৃঃ পূঃ

সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে যাঁহার নাম আমাদের সকলের হৃদয়ে সর্বাধিক শ্রদ্ধা উদ্রেক করে তিনি মহামতি সক্রেটিস। কিন্তু সক্রেটিসের লেখা কোন পুস্তক আমরা পাই নাই। লেখা দিয়াই মানুষের বিচার হয় না; লিখিত গ্রন্থের উর্দ্ধে মনুষ্যত্বের স্থান। দীর্ঘকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সক্রেটিস-চরিত্র আজও অম্লান মহিমোজ্জ্বল মূর্তিতে আমাদের নিকট দীপ্তিমান; এবং তাহারই আলোকে আজ আমরা বুঝিতে পারি মানব সমাজে একজন মহামানব ছিলেন সক্রেটিস। তিনি ছিলেন একজন ভগবৎ প্রেরিত পুরুষ, একজন পথপ্রদর্শক। শুধু গ্রীসের নয় সমগ্র ইউরোপের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

সক্রেটিস ও সোফিষ্টগণ—প্রথমদিকে গ্রীসীয় দর্শনের তত্ত্ববিদ্যার দিকটি ছিল অপরিণত যদিও তত্ত্বানুসন্ধানই ছিল ইহার ভিত্তিভূমি। সোফিষ্টদের প্রভাবে এই দর্শন একটি নূতন ধারায় প্রভাহিত হইল, ক্রমে ক্রমে হইয়া উঠিল মানবকেন্দ্রিক। 'মানুষই বিশ্বের মানদণ্ড' প্রোটাগোরাসের এই সূত্রটি দর্শনের একটি মূলসূত্রে পরিণত হইল। 'নিজেকে জান' ডেলফী নগরীর এই বাণীর ভিতরে গ্রীসের দর্শন পাইল তাহার প্রেরণার মূল উৎস। সমকালীন লোকেরা সক্রেটিসকে সোফিষ্ট বলিয়াই জানিত। গ্রীক দর্শনের কুলবিচারে তাঁহাকে সোফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি মনে করাই স্বাভাবিক কারণ প্রোটাগরাস ও জর্জিয়াস চিন্তাধারায় যে মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করিয়াছিলেন তাহা পরিণতিলাভ করে সক্রেটিসের চিন্তাধারায়। সেকালের সাধারণ সোফিষ্টগণ অবশ্য কতগুলি বিক্ষিপ্ত ও আপাত সদৃশ মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, ইহার ভিতরে কোন সুবিন্যস্ত মতবাদ বা চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় না। সোফিষ্টদের মানব কেন্দ্রিক চিন্তাধারা সক্রেটিসের ভিতরে পূর্ণতম পরিণতি লাভ করে। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল সদর্পেই তিনি তাহাদের বলিয়াছিলেন "এই সহজ সরল কথাটি জানিও হে এথেন্সবাসী, পার্থিব বিষয় আলোচনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" বেশ

জোরের সঙ্গেই বারবার তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে মানুষের প্রাথমিক কর্তব্যই হইল নিজেকে জানা, স্বরূপটি উপলব্ধি করা। এই কারণেই মানুষের আধ্যাত্মিক ধর্মগুলির লক্ষণ নির্দেশের জন্য তাঁহার ছিল আন্তরিক প্রয়াস। তিনি বলিতেন দেশের আইন ও সামাজিক অনুশাসন যেরূপই হউক প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার আছে। তাঁহার এই সব উক্তির ভিতরে সোফিষ্ট ঐতিহ্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে। সোফিষ্টদের সহিত সক্রেটিসের সাদৃশ্য কিন্তু এইটুকুতেই শেষ। সোফিষ্ট নামটি পরবর্তী যুগে যে একটি ইতর ভাবের ইঙ্গিত করিত, চিন্তা জগতে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পরিবর্তে মনে একটা বিরূপ ভাবের উদ্রেক করিত, সোফিষ্ট কথাটির অর্থের এইরূপ পরিবর্তনের জন্যও সক্রেটিসই কিন্তু প্রধানতঃ দায়ী। তখনকার নিম্নস্তরের সোফিষ্ট-গোষ্ঠীর সহিত তিনি নিজেকে কখনই এক করিতে চাহিতেন না। যে সোফিষ্ট সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় করিত তাহাদের সঙ্গে একই স্তরে নামিয়া আসা সক্রেটিসের মত একজন সত্যের একনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। সোফিষ্টরা বলিত সব কিছুই মনোসাপেক্ষ, তাহাদের মতে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবর্তনশীল সমাজের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। জগতে ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছু নাই। ভাল মন্দ সবই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের কল্পনা। এরূপ মতবাদের ভিতরে নিহিত থাকে অরাজকতার বীজ। সক্রেটিসের মত গভীর চিন্তাশীল লোকের পক্ষে এরূপ মতবাদ সমর্থন করা সম্ভব নয়। তিনি দেবতায় বিশ্বাস করিতেন; দেবতা অজ্ঞ মানুষের কল্পনা প্রসূত বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। ভাল ও মন্দের পার্থক্যটি শুধু কল্পিত নয়, উহা প্রকৃত—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস এবং এইরূপ বিশ্বাস থাকিলেই স্থায়ী দৃঢ়মূল সমাজ গঠন করা সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করিতেন সমাজে কতগুলি সর্বজনীন নীতি বা সূত্র রহিয়াছে, এই নীতিগুলির প্রতিষ্ঠা পারমার্থিক সত্যে। শাশ্বত এই সব নীতির সন্ধানে আজীবন সাধনা করিতে তিনি ছিলেন প্রস্তুত, এবং সত্য যদি লাভ হয় তাহার প্রচারও প্রতিষ্ঠা কল্পেও জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি ছিলেন উৎসুক। জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের এই যে চেষ্টা, আদর্শে এই যে জলন্ত বিশ্বাস—ইহা কিন্তু সোফিষ্টদের হৃদয়ে সাড়া জাগাইত না। এই কারণেই সক্রেটিসের স্থান ছিল সাধারণ সব সোফিষ্টদের উর্দ্ধে।

প্লেটো ও জেনোফন-এর সক্রেটিস—সক্রেটিস কিছুই লিখিতেন না। তিনি তাঁহার সুবিদিত পরিহাসের ভঙ্গিতে সকলকে এই কথাটিই যেন বিশ্বাস করাইতে চাহিতেন যে তিনি শুধু সত্যের সন্ধানী। ছোট-বড় সকলের সাথে কথা বলিয়া আলোচনা করিয়াই তিনি পাইতে চান সত্যের সন্ধান। ডেলফীতে দৈববাণী হইয়াছিল যে সেকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিস, কিন্তু তবুও

তিনি জ্ঞানী বলিয়া দাবী করিতেন না, বলিতেন তিনি ইহাই জানেন যে তিনি কিছু জানেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাহা জানে না তাহাই জানে বলিয়া বড়াই করে। সক্রেটিসের কথাবার্তার ভিতরে এমন একটি আবেগ, এমন একটা প্রাণস্পর্শী ধর্ম ছিল যাহার ফলে প্লেটো রচিত সক্রেটিসের কথোপকথনগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সক্রেটিস ও প্লেটোর প্রতিভাসৃষ্ট সক্রেটিসের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা গ্রীসীয় সাহিত্যের পণ্ডিতদের নিকট এক সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য না থাকিয়া পারে না। কিন্তু আবার এমন অনেক নজির আছে যাহাতে মনে হয় ঐতিহাসিক সক্রেটিস ও প্লেটো বর্ণিত সক্রেটিস মূলতঃ অভিন্ন। জেনোফনের স্মৃতিকথা বা 'মোমারবিলিয়া' নামক রচনায় সক্রেটিসের যে ছবি আমরা পাই তাহাতে প্লেটোর কাব্যময় মাধুর্য নাই বটে কিন্তু সক্রেটিস চরিত্র সেই একই। জেনোফনের চিত্রেও আমরা দেখিতে পাই সেই প্লেটো বর্ণিত সক্রেটিস—সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি, মুখশ্রী মোটেই গৌরব করিবার মত নয়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া লোকজনের ভুল দেখাইয়া দিতেছেন। এথেন্সের সকল গৃহেই তিনি ছিলেন সমাদৃত অতিথি; গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া জুটিত কত মননশীল নগরবাসী, জীবনের সকল রকম বড় সমস্যা নিয়াই চলিত আলোচনা। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডল পেশাদার দার্শনিকদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে আসিত সৈন্য ও সেনাপতি, দেশশাসক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ, আসিত পাণ্ডিত্যের অভিমানে গদগদ গর্বিত সোফিষ্টদের দল; আসিত তরুণের দল—নিজেদের দেহশ্রী সম্বন্ধে এরা ছিল বেশ সচেতন আর মদ্য মাংসের প্রাচুর্যে এদের কোন অরুচি ছিল না। ইহা ছাড়া আরও আসিত সাধারণ বহুলোক—এঁদের আকর্ষণ ছিল, প্রধানতঃ সক্রেটিসের কথাবার্তার দিকে, তাঁহার প্রশ্নে, তাঁহার কথায় শ্লেষ থাকিত প্রচুর কিন্তু সবই জ্ঞানগর্ভ, এই সব কথার মধ্য দিয়া স্বর্ণের দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিত সক্রেটিসের জ্ঞান, আর ইহার সম্মুখে আসিয়া নত হইয়া যাইত সোফিষ্টদের গর্বিত মস্তক। প্লেটো রচিত 'কথোপকথন'গুলিকে অবশ্য সক্রেটিসের আলোচনার যথাযথ অনুলিপি বলিয়া কেহই মনে করে না। অপরদিকে জেনোফন ছিলেন একজন সৈনিক, সাহিত্যরস বর্জিত সাধারণ কাজের মানুষ। তাঁহার রচিত স্মৃতিকথা তাই একটি নীরস বিবরণ ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহার ভিতর দিয়া কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না। তবে তিনি তাঁহার বিবরণে যে সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও ঐ একই কথা প্রমাণ করে। কথোপকথন' ও 'স্মৃতিকথা' উভয়ের মধ্য দিয়াই সেই একই সক্রেটিস, প্রতিভাদীপ্ত সেই একই মূর্তি আমাদের কাছে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তর্কবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—(Logic and Ethics) : প্লেটোর 'কথোপকথন'গুলিতে প্রায় সব তত্ত্বকথাই সক্রেটিসকে দিয়া বলান হইয়াছে, কিন্তু এই সব তত্ত্বই সক্রেটিসের দান একথা বলা অসম্ভব। দর্শনে সক্রেটিসের নিজস্ব দান বলিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস আমরা পাই। একটি সামান্য বিষয়ক ধারণা (Concept) অপরটি নৈতিক ধর্মগুলির লক্ষণ (definitions of Virtues)। ইহা ছাড়া আলোচনা করার পদ্ধতিটি অবশ্য তাঁহার সম্পূর্ণই নিজস্ব। প্রথমটির মধ্যে তাঁহার তর্কশাস্ত্র, দ্বিতীয়টিতে তাঁহার নীতিশাস্ত্র। আর দুই এর ভিতরে লুকানো আছে এক চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, এবং এখানেই পাই আমরা পরবর্তীকালের সমস্ত বিজ্ঞানবাদের উৎস।

সোফিষ্টের দল পদার্থের পরিবর্তনশীল রূপটির কথাই শুধু আলোচনা করিতেন, কিন্তু সক্রেটিস চলিয়া যাইতেন আরও গভীরে। পরিবর্তনের পিছনে যে পরিবর্তনহীন শাশ্বত সত্তা বর্তমান তাহাই দেখিবার জন্য ছিল তাঁহার প্রয়াস। কোন একটি মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম যাহাই থাকুক, বিশেষ ধর্মগুলি বাদ দিলেও তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহার বলে আমরা তাহাকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করি। ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ ধর্মগুলি বাদ দিলেও যাহা থাকিয়া যায়, এবং যাহা সকল ব্যক্তি মানুষের ভিতরেই বর্তমান থাকে তাহা হইতেই পাই আমরা 'সঠিক' বা 'সামান্যে'র কল্পনা। এই সার্বিকই হইল সকল ব্যক্তির মধ্যে 'জাতি' বা 'সামান্য'। এই তত্ত্বটি দীর্ঘ তেইশশত বৎসর ধরিয়া মানবজাতির অস্থি মজ্জায় এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ মনে হইতে পারে কথাটি খুবই সাধারণ, কিন্তু দর্শনের অগ্রগতির পথে এই তত্ত্বটি একটি বিরাট পদক্ষেপ এবং ইহারই বলে সম্ভব হইয়াছে পরবর্তিকালের দার্শনিক চিন্তার বিস্তার। 'সকল জ্ঞানই সার্বিকের জ্ঞান'—প্লেটো ও এরিষ্টলের এই নীতির মূলে সক্রেটিস। সার্বিক সম্বন্ধীয় এই তত্ত্বটি সক্রেটিসের এক মৌলিক অবদান। আবার নৈতিক ধর্মগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়াও তিনি এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে তাঁহার তার্কিক প্রতিভা, তাঁহার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার প্রণালীটি বেশ ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছিল। পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও সার্বিক সত্তা আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না বটে, তবে তিনি নিজে ইহা করেন নাই। এ কাজটি করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে এরিষ্টটল। গণিতের দিক হইতে সার্বিকের তাৎপর্য কি হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন প্লেটো। মানব চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় লাভ করাই ছিল সক্রেটিসের লক্ষ্য। মানব চরিত্রের বিভিন্ন ধর্মগুলির পিছনে যে সব নৈতিক ধারণা রহিয়াছে তাহাদের প্রকৃত রূপটি তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজটি অবশ্য সহজ নয়, তবে সক্রেটিসের প্রতিভার কাছে

শক্তও কিছু নয়। নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে তখনকার দিনে যে সব ধারণা প্রচলিত ছিল তিনি একটি একটি করিয়া সেগুলি লোকের সামনে তুলিয়া ধরিতেন এবং বিচার করিয়া দেখাইয়া দিতেন সে সব কত অন্তঃসার শূন্য। ফলে যে সব লোক তাঁহার বিচার শুনিতে আসিত তাহাদের অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তাহারা শান্ত হইতে পারিত না। গ্রীসীয় চরিত্রের একটি বিশেষ ধর্ম (temperance) সংযম বা মিতাচার। মিতাচার ধর্মটি সত্যই সুন্দর ও সুষম। 'চারমিডিস' (charmides) গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের বেশ বুঝাইয়া দিতেন যে শুধু শান্ত বিনীত ভাবই মিতাচার নয়। নিজের কর্তব্য পালনও মিতাচার নয়। এমন কি পরহিতব্রত বা আত্মজ্ঞানও মিতাচার নয়। সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাই সকল নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি। মিতাচার ধর্মটি স্বতন্ত্রভাবে বুঝা যায় না। নৈতিক ধর্মবোধের সঙ্গে ইহা একসূত্রে গাঁথা। চারমিডিস গ্রন্থে তাঁহার আলোচনাটি নেতিমূলক বটে তবুও ইহার ফলে আমাদের দৃষ্টি অধিকতর স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে পারে। গ্রীসীয় চরিত্রের আর একটি মূল্যবান ধর্ম বন্ধুত্ব (friendliness)। 'লাইসিস' (lysis) গ্রন্থে তিনি এবিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও অনেকটা নেতিমূলক। তেজস্বিতা বা বীরত্বের (courage) যে বিশ্লেষণ তিনি 'লাচেস' (Laches) গ্রন্থে দিয়াছেন তাহা কিছুটা যেন অস্বাভাবিক। তিনি বলিতে চান এই 'তেজস্বিতা'র ভিতরে সকল নৈতিক গুণের সমন্বয়। মিতাচার, বন্ধুত্ব ও তেজস্বিতা—এই ধর্ম তিনটি সম্বন্ধে যে সুন্দর বিচার ও বিশ্লেষণ আমরা পাই তাহা সক্রেটিসেরই দান। এই বিশ্লেষণে প্লেটোর স্বীয় প্রতিভার স্পর্শ নাই বলিয়াই পণ্ডিতদের ধারণা। সক্রেটিসের বিচারের ভিতর দিয়া এই কথাটি বেশ বুঝা যায় যে জ্ঞান (wisdom), তেজস্বিতা (courage) এবং মিতাচার (temperance) কোনটিই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম নয়। এই জন্যই চাই এমন একটি ব্যাপক ধর্ম যাহার মধ্যে এই সকল আংশিক ধর্মগুলির হইতে পারে পূর্ণ সমন্বয়। সক্রেটিসের মতে এই ব্যাপক ধর্মটি 'ন্যায়পরায়ণতা' (justice)। যে অর্থে যে কোন নৈতিকগুণকে ধর্ম বলা হয় সে অর্থে ধর্ম বহু, কিন্তু প্রকৃত অর্থে ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম মাত্র একটি। নৈতিক জীবনের এই মূল ঐক্যসূত্রটি তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার বিচারের একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে প্রতিটি খণ্ডন, প্রতিটি নেতিমূলক কথার মধ্য দিয়াই ইতিমূলক তত্ত্বটি আমাদের কাছে আসিয়া যেন ধরা দেয়।

'জ্ঞানই ধর্ম'—এই কথাটি সক্রেটিসের দানরূপেই সুপরিচিত। কথাটি সমালোচনা করা সহজ। সুচতুর অভিড বলিয়াছেন, "ভাল কি বুঝি কিন্তু মন্দটি করি।" একটি

সুবিদিত কথা আছে যে নরকের পথও সদিচ্ছায় আচ্ছাদিত হইতে পারে। ভাল কি তাহা বুঝিলেই হয় না, কাজে তাহা করিতে হয়। সক্রেটিস নিজে ছিলেন মহৎ ও উদার ; স্বাভাবিক উদারতা বশে তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষ যদি ভাল কি বুঝিতে পারে তবে কাজে তাহা অবশ্যই পরিণত করিবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা, আমরা জানি সক্রেটিসের এ বিশ্বাস ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের চরিত্র অত সবল নয়। সক্রেটিসের এ বিশ্বাসের মূলে ছিল মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সততায় আস্থা। তিনি ধরিয়া নিতেন মানুষ যাহা বুঝে কাজেও তাহা করে। সক্রেটিসের এই সরল উদার বিশ্বাসটির মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মানুষ গৌরব বোধ করিতে পারে। সক্রেটিসের লক্ষ্য ছিল আদর্শের প্রতি। মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন এবং সে দিক দিয়া তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। মানুষের যাহা করা উচিত মানুষ যদি তাহা না করে তবে সে ত্রুটি তার, সক্রেটিসের নয়। সক্রেটিসের ভুলের চেয়ে মানুষের অক্ষমতার বেদনাটিই এখানে বড়।

সক্রেটিসের ব্যক্তিত্ব :—সক্রেটিস যদি ইহার বেশী আর কিছু নাও করিতেন তবুও দর্শনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান থাকিত। দর্শন-জগতে সক্রেটিসের স্থান বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে মানুষ সক্রেটিসকে। উপদেশের পিছনে যে মানুষ, বাণীর আড়ালে যে ব্যক্তি সন্ধান করিতে হইবে তাহাকে। তখনকার সমাজের সকল দুর্নীতি সকল কলুষতা যে মহান ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানিয়াছিল সেই ব্যক্তিত্বের জয়ই সক্রেটিসের জয়। 'মেনো' (Meno) নামক রচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার জীবনে। মেনোতে তিনি বলিয়াছেন যে মানুষ স্বভাববশেই ধর্মলাভ করে না, চেষ্টা করিয়াও অর্জন করিতে পারে না, ধর্ম "সৎলোকদের হৃদয়ে ভগবৎ প্রেরিত গুণ", "সৎলোকেরা ভগবানের দান হিসাবে ইহা লাভ করেন।"[২] ভগবানের দেওয়া এই আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়াই সক্রেটিসের আবির্ভাব। এই সম্পদটিকে পরিণতি দান করাই দার্শনিকরূপে সক্রেটিসের কাজ। তিনি যদি কিছু লিখিয়া যাইতেন তবে সে লেখার মূল্য যাহা হইত তাঁহার দৈব জীবনের মূল্য যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। তাহার ফল যে অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রীসের লোক ছিল সৌন্দর্যপ্রিয় ; সক্রেটিসও এ বিষয়ে ছিলেন খাঁটি গ্রীক। মানব দেহের সৌন্দর্যের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না, আর দেহখানিকে সুন্দর সুঠাম করিয়া গড়িয়া তুলিতে তাঁহার দেশবাসী বেশ ভালই জানিত। আলকিবিয়াডিসের দেহশ্রী, এমনকি চারমিডিসের নগ্ন দেহের শোভা দেখিয়াও তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিতেন। তাই বলিয়া তাঁহার ভিতরে অশ্লীলতার লেশমাত্র ছিল না। আলকিবিয়াডিস নিজেই বলিয়াছেন সৌন্দর্য চর্চায় যখনই তিনি কোথাও একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন সক্রেটিসের তীক্ষ্ণ সমালোচনা হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই।[৩] দৈহিক শোভার গণ্ডী কতটুকু তাহা সক্রেটিসের মত চিন্তাশীল ব্যক্তির না জানার কথা না। আলকিবিয়াডিসের দেহশ্রীতে মুগ্ধ হইয়াও সক্রেটিস মন্তব্য করিয়াছিলেন: "সত্যি, এমন সুন্দর বুঝি আর হয় না। কিন্তু এর সঙ্গে আর একটি জিনিসের যোগ যদি থাকিত।" "কি সে জিনিস?"—ক্রিটিয়াস প্রশ্ন করিলেন। "যদি আত্মাটি তার মহৎ হইত। তবে ক্রিটিয়াস, তোমাদের বংশে যখন ওর জন্ম, ওর আত্মার উদারতা থাকা ত উচিত।" ক্রিটিয়াস বলিলেন "ওর বাহিরটি যেমন সুন্দর অন্তরটিও তাই।"[৪]

সৌন্দর্য ও প্রেমের দার্শনিক বিচার রহিয়াছে সিম্পোজিয়াম (Symposium) নামক গ্রন্থে। প্লেটো সেখানে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে সক্রেটিসের চিন্তারই প্রকাশ। প্লেটো বলিয়াছেন: "যে প্রেম আত্মাকে বাদ দিয়া শুধু দেহতেই আবদ্ধ সে প্রেম নীচু স্তরের। সে প্রেম ক্ষণস্থায়ী কারণ যে দেহে তাহার আকর্ষণ তাহাও ক্ষণস্থায়ী। যৌবনের উচ্ছল দীপ্তিটুকু ম্লান হইয়া যাইতেই তাহার প্রেমও যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়। প্রেম গুঞ্জন ও আশ্বাসবাণী সব যায় বিস্মৃতিতে লীন হইয়া। মহতের প্রেম কিন্তু অচঞ্চল, আজীবন তাহার স্থায়িত্ব; যাহা চিরন্তন, তাহার সঙ্গে যুক্ত সে প্রেমও হয় শাশ্বত।"[৫]

সক্রেটিসের কথাবার্তা হইতে জানা যায় তিনি নিজের দৈহিক বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না। ভগবান তাঁহাকে দেহশ্রী দেন নাই তবে রসবোধ দিয়াছিলেন প্রচুর। তিনি নিজের কদাকার নাসিকাটি নিয়া রঙ্গ করিয়া বলিতেন—নাসারন্ধ্রটি বড় হওয়ায় ঘ্রাণ নেওয়ার সুবিধাই হইয়াছে, নাকটি বেশী চাপা হওয়াতে দৃষ্টি কোথায়ও বাধা পায় না। আর অক্ষিগোলক দুইটি বেশী স্ফীত হওয়ায় শুধু সামনের দিকেই নয়, সবদিকের জিনিস দেখিতেই সুবিধা হয়। যে লোক নিজেকে নিয়াও এইভাবে রসিকতা করিতে পারে আবার অপর দশজনকে হাসাইতেও পারে সে প্রকৃতই সুখী। সক্রেটিসের সূক্ষ্ম রসবোধের একটি প্রচলিত কাহিনীতে সকলেই আনন্দ বোধ করেন। কথিত আছে সক্রেটিসের স্ত্রী একবার বহুক্ষণ তর্জন গর্জনের পর তাঁহার মাথায় এক বালতি জল ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সক্রেটিস শুধু শান্তভাবে তখন বলিয়াছিলেন, "এত গর্জনের পর একটু বর্ষণ হওয়াই ত স্বাভাবিক।"

ভারতীয় ঋষির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এমন লোক একটি মাত্রই ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় জীবনের আদর্শ, জীবন্মুক্ত পুরুষ। সহজ সরল এঁদের

জীবন, বেশভূষায় ইহারা উদাসীন, পার্থিব লাভালাভে সমজ্ঞান, সংসারে বাস করিয়াও ইহারা সবরকম পার্থিব বন্ধনের উর্দ্ধে। এইরূপ চরিত্রই ছিল সক্রেটিসের। সক্রেটিস তাঁহার নিজের ধারায় কঠোর জীবন যাপন করিতেন। উপবাস বা নিয়মপালনের কোন বাড়াবাড়ি তাঁহার ছিল না। সুখ দুঃখ ভালমন্দ যখন যাহাই আসুক নিস্পৃহভাবে তিনি সব গ্রহণ করিতেন। পানাহারের ব্যাপারেও তাঁহার ভাবনার কিছু ছিল না। যখন যাহা জুটিত তাহাতেই খুসী। আবার ভাল কিছু খাদ্য বা পানীয় পাইলে তাহাও খুসী মনেই ভোগ করিতে পারিতেন। শুধু তৃষ্ণার্ত হইলেই তিনি পান করিতেন, কাজেই পানজনিত মত্ততা কখনও তাঁহার আসিত না।[৬] নগ্নপদে ও নগ্নশিরে সকল ঋতুতে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। রূঢ় প্রকৃতির স্পর্শ তাহার বলবান দেহখানিকে আরও কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মহান আত্মার উপযুক্ত বাহনরূপেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তিনি তাঁহার দেহখানিকে। তুষারপাত বা প্রখর রৌদ্র কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি হাটিতেন এত দ্রুত যে সৈন্যরাও তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। সে যুগটা ছিল রাজনৈতিক কোলাহলের যুগ, তখনকার নাগরিকেরা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠিত। এই সব অন্ধ মত্ততা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতেন সক্রেটিস; কারণ তিনি ছিলেন "প্রকৃতই এত সৎ যে রাজনৈতিক হইয়া জীবন যাপন করা তাহার পক্ষে ছিল অসম্ভব।"[৭]

তাঁহার ঐতিহাসিক মহত্ত্ব:—সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনীত হইল যে তিনি ধর্মবিরোধী, দেশের যুবকদের তিনি বিপথে চালিত করিতেছেন তখনই তাহার মহত্ত্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। এথেন্স্ ছাড়িয়া গেলে অনায়াসেই তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এথেন্সে বাস করা তাঁহার জন্মগত অধিকার, তিনি তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। এথেন্সের সমাজ তাঁহার জীবনের সঙ্গে গাঁথা। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ সহরেরই মানুষ। তিনি বুঝিতেন তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা বিকাশের জন্য নগরের পরিবেশ অপরিহার্য। তিনি বলিতেন "নগরে যাহারা বাস করে তাহারাই ত আমার শিক্ষক।"[৮] এথেন্সে বাস করিয়াও যদি তিনি শুধু তাঁহার মতবাদ প্রচারে বিরত থাকিতেন, বিতর্কমূলক আলাপ-আলোচনা বন্ধ রাখিতে সম্মত হইতেন তাহা হইলেও তাঁহার জীবন রক্ষা পাইত। কিন্তু সত্যানুসন্ধান ও সত্য প্রচারের অধিকার তিনি বিসর্জন দিতে রাজী হইলেন না। যদি হইতেন, যদি অমর্যাদা স্বীকার করিয়া আরও কিছুকাল তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে যে সক্রেটিসকে আমরা ভালবাসি, যে সক্রেটিসকে শ্রদ্ধা করি তাঁহাকে আর জগতের লোক পাইত না। অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর তাঁহার শেষদিন কয়টি। তেজস্বী

সক্রেটিস দণ্ডদাতাদের কাছে নত হইলেন না। হেমলক বিষের পাত্রখানি গ্রহণ করিলেন, প্রশান্তচিত্তে উহা পান করিলেন, যেন কোন উপাদেয় পানীয় তিনি গ্রহণ করিতেছেন। প্লেটোর 'এপলজি' অতি উচ্চস্তরের রচনা। দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল বই পাওয়া শক্ত। আর ইহার ভিতরে আমরা পাই আদর্শের অনুপ্রেরণা—এখানে আমরা দেখিতে পাই সক্রেটিসকে সত্যের পূজারীরূপে। আমরা দেখিতে পাই দণ্ডগ্রহণ করিয়া সক্রেটিস তাঁহার দণ্ডদাতাদেরই অভিযুক্ত করিয়া গেলেন। সক্রেটিস ও তাঁহার দণ্ডদাতা—ইহাদের কাহার বিধান সত্য জগত আজ বুঝিতে পারিয়াছে। জগত বুঝিয়াছে সেই 'অজ্ঞ' 'অধার্মিক' সক্রেটিস একজন ক্ষণ-জন্মা পুরুষ—ইহাদের আগমনে মানবজাতি উন্নীত হয়। ভগবদ্ গীতা বলিয়াছেন পৃথিবী যখন অধর্মের গ্লানিতে ভরিয়া যায় তখন মানবজাতির উদ্ধারের জন্য ভগবানের আবির্ভাব হয়। সক্রেটিসও একজন অবতারকল্প পুরুষ।

ইউরোপের দার্শনিক জগত সক্রেটিসকে শুধু একজন মহান শিক্ষকরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঈশ্বরের অবতাররূপেই গৃহীত হইতেন। প্যালেস্টাইন, আরব অথবা ইরাণে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরূপে সমাদর পাইতেন। অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাই তাঁহার স্থান ছিল সাধারণ মানুষের উপরে। তিনি বলিতেন একটা দৈব সঙ্কেত তাঁহাকে পথের নির্দেশ দেয়, কিন্তু এই সঙ্কেত বা বাণী ছিল কিছুটা নেতিবাচক, অর্থাৎ শুধু নিষেধ করে, আদেশ জানায় না।[৯] তাঁহার অন্তরের দেবতা, তাঁহার হৃদয়ের দ্যুতিময় প্রকাশ, তাঁহাকে সব কাজে উৎসাহ দিত; কিন্তু এই নির্দেশ অপরে খুসী হয় গ্রহণ করিত বা করিত না। কখন কখন তিনি নাকি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। সিম্পোজিয়াম গ্রন্থে বর্ণিত আছে এইরূপ একটি ঘটনা। একদিন সকালবেলা তিনি কোন একটি বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সমাধান না পাওয়ায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন। দুপুর হইয়া গেল, কৌতূহলী জনতা চারিপাশে ভিড় করিল কিন্তু ধ্যানমগ্ন সক্রেটিস পরের দিন ভোর পর্যন্ত সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন।[১০]

চিন্তার স্বাধীনতার জন্য, জীবনে সততার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কঠিন যুদ্ধ সক্রেটিস করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি—এই যুদ্ধ তিনি করিয়াছেন মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস নিয়া, এই যুদ্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার স্থির গভীর দৃষ্টি এবং জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা। 'এপলজি' গ্রন্থখানার জীবন্ত সতেজ বর্ণনা হয়ত প্লেটোর কবি-প্রতিভারই দান, কিন্তু তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, উহার মূলতত্ত্বগুলির মধ্যে সক্রেটিসের জীবনাদর্শেরই প্রকাশ। বহু শতাব্দীর

ব্যবধানের ওপার হইতে সক্রেটিসের কালজয়ী বাণী আজও যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে :

"...আমি বিশ্বাস করি আমি ঈশ্বরের যে সেবা করিয়াছি তাহা অপেক্ষা কল্যাণকর কাজ এই রাষ্ট্রে কখনও কেহ করে নাই। যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের সকলকে আমি ইহাই শুধু বলিয়াছি তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ কর। তোমাদের আত্মার উন্নতি, চরম উন্নতি, কি ভাবে হইবে তাহাই প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্যরূপে গ্রহণ কর। আমি বলিতে চাই অর্থ হইতে কখনও ধর্ম আসে না। বরং ধর্মই মানুষকে অর্থ দান করে, ধর্ম হইতেই ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সকল কাম্য বস্তুর উৎপত্তি হয়। ইহাই আমার শিক্ষা। আর যদি বল এই শিক্ষা যুবকদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছে তবে স্বীকার করিব আমি অসৎ লোক। কেহ যদি বলেন ইহা আমার শিক্ষার মূলকথা নয় তবে তিনি অসত্য ভাষণ করিবেন। সুতরাং শোন হে এথেন্‌বাসী, তোমাদের আজ আমি স্পষ্ট বলিতে চাই, তোমরা খুসী হয় এনিটাসের কথা মানিও, না হয় মানিও না ; খুসী হয় আমাকে মুক্তি দিও, না হয় দিও না ; তোমাদের যাহা খুসী করিও। তবে স্থির জানিও আমি আমার মত ও পথ কিছুতেই পরিবর্তন করিব না— একবার কেন বহুবার মৃত্যুবরণ যদি করিতে হয় তবুও না।"[১১]

সক্রেটিস নিজেকে খাপছাড়া ভাষায় বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন তিনি একজন ধাত্রী, তাঁহার কাজ সত্যকে প্রসব করান। আবার বলিতেন তিনি একটি দংশনকারী কীট, এই কীটটিকে "ভগবান রাষ্ট্রদেহে বসাইয়া দিয়াছেন, এই কীট সারাদিন সবজায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায় ও সবসময় তোমাদের ভৎর্সনা করিয়া দংশন করিয়া জাগ্রত রাখে।" কখনও বা বলিতেন তিনি এক ধরণের পাগল, তবে এই পাগলামিটি আনে "আত্মার মুক্তি, সমাজের রীতিনীতির উর্দ্ধে আধ্যাত্মিক স্তরে আত্মার মুক্ত বিচরণ।"[১২] সক্রেটিস তাঁহার দৃঢ় ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়া এনাক্‌সাগোরাসের উদ্দেশ্যবাদকে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের বাণীই পরবর্তী যুগের সমস্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদের প্রাণস্বরূপ। সক্রেটিসের সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবটি কোমল স্নিগ্ধতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে প্লেটোর ফিড্রাস (Phaedrus) গ্রন্থে। সেখানে সক্রেটিস প্রার্থনা জানাইতেছেন :

"ওগো প্রিয় দেব প্যান, হে অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ, তোমরা আমার হৃদয়টিকে সুন্দর করিও, আমার অন্তর ও বাহির এক করিয়া দিও। আমি যেন বুঝিতে পারি জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সম্পদশালী। অর্থসম্পদ আমাকে হে দেব সেইটুকুই দিও যতটুকু সংযত জীবনের পক্ষে প্রয়োজন। আর কিছু ?—না—ইহাই আমার যথেষ্ট।"[১৩]

সক্রেটিস বরণ করিয়াছিলেন শহীদের মৃত্যু। তাঁহার মহাপ্রয়াণ জগতকেও করিয়াছে মহীয়ান। সক্রেটিসের বাণীতে আমরা পাই খৃষ্টের পূর্বাভাষ। খৃষ্টের মত সক্রেটিসও বলিয়াছিলেন: "প্রথমে চাহিও ধর্মরাজ্য, অনুসরণ করিও ধর্মপথ। আর যাহা কিছু সম্পদ আপনি আসিয়া জুটিবে।"[১৪] প্রকৃত পথ কি তিনি তাহা জানিতেন এবং পথের নির্দেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সমাজকে। এপলজি গ্রন্থে আমরা পাই তাঁহার মুখের শেষ কথা কয়টি—কি গভীর অর্থপূর্ণ সে কথা! "বিদায়ের সময় উপস্থিত। এখন আমরা যে যাহার পথে যাইব—তোমাদের পথ জীবনের—আমার মৃত্যুর—কাহার পথ ভাল ভগবানই জানেন।"[১৫] ভগবান জানেন নিশ্চয়ই—কিন্তু আজ মানব সমাজও জানে!

২। প্লেটো: খ্রি. খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও অন্তত অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-রূপে প্লেটো চিরকালই সুপরিচিত। সক্রেটিস যাহা কিছু আমাদের দিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে ভক্তশিষ্য প্লেটোই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। প্লেটো না থাকিলে জগত সক্রেটিসের মহত্ত্ব বুঝিতেই পারিত না। তবে প্লেটোর গুরুভক্তি আবার এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার সমাধান হওয়া শক্ত, এবং অদ্যাবধিও সে সবের সমাধান মেলে নাই। প্লেটো রচিত সব গ্রন্থেই প্রধান নায়ক সক্রেটিস! সক্রেটিস চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই সব সংলাপ রচিত এবং সব তত্ত্বকথাই সক্রেটিসকে দিয়াই বলান হইয়াছে। সুনিপুণ নাট্যকারের মত প্লেটো সবসময়ই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। কিন্তু এখানেই সমস্যা দাঁড়ায় তত্ত্ব কথাগুলি কি মূলতঃ সক্রেটিসেরই, অথবা প্লেটোর নিজের মতামত? সক্রেটিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস স্বয়ং প্লেটো, সুতরাং সক্রেটিসের মুখপাত্র-রূপেই প্লেটো কথা বলিয়াছেন এরূপ মনে করা কিছু অসঙ্গত নয়। আবার অন্যদিকেও কথা আছে। সক্রেটিসের পরবর্তী যুগে বিভিন্ন মতের সকল শ্রেণীর দার্শনিকেরাই সক্রেটিসকেই নিজেদের উৎসরূপে বর্ণনা করিত, এবং ঐ সব দার্শনিকদের মধ্যে যেমন সিনিকস ও সিরেনাইকসদের (Cynics and Cyrenaics) মধ্যে মতের পার্থক্য খুবই বেশী ছিল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা খুব স্বাভাবিক যে সক্রেটিসের মতামত ছিল তরল অবস্থায় এবং এই জন্যই বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকেরা সক্রেটিসের মতের বিভিন্ন দিক খুশীমত বাছিয়া নিয়া নিজেদের মতের সমর্থনে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে।

সুতরাং সক্রেটিসের মতামত প্লেটোর প্রতিভার দীপ্তিতে যে একটু ভিন্নরূপে দেখা দিবে ইহাও খুব স্বাভাবিক। ফলে প্লেটো রচিত 'কথোপকথন'গুলি আজ আমাদের কাছে এই সমস্যা নিয়া দেখা দিয়াছে—এখানে আমরা কাকে পাই, সক্রেটিসকে না প্লেটোকে? অথবা ইহার ভিতরে সক্রেটিস কতটুকু, আর প্লেটোই বা কতটুকু? কথোপকথনগুলি ব্যাখ্যা করার আরও এক বিশেষ অসুবিধা এই যে বেশ পরিচ্ছন্ন প্রবন্ধের আকারে আমরা ইহাদের মতামত পাই নাই। কথোপকথনগুলি মূলতঃ নাটকধর্মী—খুবই উপাদেয়, খুবই ব্যঞ্জনাময় এবং যথেষ্ট চিন্তাপ্রসূ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা থাকিয়া যায় অসমাপ্ত। ইহাদের শেষ কথাগুলি যেন কিছুটা নেতিবাচক ও অসম্পূর্ণ; এবং যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি কথোপ-কথনেরই নিজস্ব একটা ঐক্য আছে, তবুও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি যে সব কথোপকথন রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের সবগুলিকে মিলাইয়া সকলের মধ্যে পরিপূর্ণ একটি ঐক্য বা সামঞ্জস্য বাহির করা কঠিন। সবদিক বিবেচনা করিয়া বোধহয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে প্লেটোরচিত কথোপকথনগুলির মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহার নিজের মতেরই প্রকাশ, তবে এই সব মতের উৎস ও প্রেরণা ছিল সক্রেটিসের মহান ব্যক্তিত্বে। প্লেটোর জন্ম হয় এক অভিজাত পরিবারে। পরবর্তীকালে তিনি সক্রেটিসের সান্নিধ্যে আসিয়া এতই মুগ্ধ হন যে নিজেকে আড়ালে রাখিয়া সক্রেটিসের মুখ দিয়া নিজের বক্তব্যটি প্রকাশ করিতে পছন্দ করিতেন। এথেন্সের লোকেরা যখন সক্রেটিসকে মারিয়া ফেলিল প্লেটো তখন ইচ্ছা করিয়াই নিজেও নির্বাসনে চলিয়া গেলেন! কিছুদিন তিনি সিরাকিউজের শাসনতন্ত্র রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিলেন। পরে এথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া একাডেমী স্থাপন করিলেন। অনেকে মনে করেন প্লেটো কল্পনাবিলাসী। জীবনের কঠোর বাস্তব সত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কম। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতাকে তিনি প্রকৃত মূল্যবান মনে করিতেন ঠিকই কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে রূপায়নের দিকেও ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। সমকালীন লোকেরা অবশ্য প্লেটোকে ততটা গুরুত্ব দিত না। এমন কি তাঁহার শিষ্য এরিষ্টটলও তাঁহার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তবুও কালের পরীক্ষায় আজ প্রমাণিত হইয়াছে প্লেটোর মতবাদ কত প্রাণবান। খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে আসিয়া ইউরোপে লোকেরা যখন প্লেটোকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিল এবং বিধর্মী প্লেটোকে যাদুঘরের সামগ্রী করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আরবের লোকেরা কিন্তু তখন প্লেটোকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল এবং প্লেটোবাদ আরব সংস্কৃতিতে সঞ্চার করিল নূতন প্রাণের স্পন্দন। বিস্মৃতপ্রায় প্লেটোকে ইউরোপ ফিরিয়া পাইল মুরদেশীয় কাজ্জি ও করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এজন্য আরব নিশ্চয়ই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত যে দুইজন মনীষী ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশী

প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাঁহাদের একজন প্লেটো অপরজন এরিষ্টটল। শিলার এ প্রসঙ্গে কৌতুকভরে যে কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা আজ প্রায় ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিয়াছিলেন পৃথিবীতে সব লোক প্লেটোপন্থী বা এরিষ্টলপন্থী হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করে। সব কৌতুকবাক্যের মত এই কথাটিও অর্ধসত্যমাত্র। আমার মনে হয় এরিষ্টটল তাঁহার মহান গুরুর যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুটা ভ্রান্ত। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব প্লেটো ও এরিষ্টটলের চিন্তাধারা মূলতঃ একই। এই দুইজনের ভিতরে পার্থক্য যেটুকু তাহা প্রধানতঃ তাঁহাদের আলোচনা পদ্ধতিতে। প্লেটো ছিলেন কবিধর্মী, তাঁহার কল্পনায় ছিল প্রাণের স্পর্শ, ছিল একটা মৌলিক সজীবতা। এরিষ্টটল বাস্তবধর্মী; তাঁহার চিন্তা বিজ্ঞানসম্মত, পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সুতরাং প্লেটোপন্থী ও এরিষ্টটলপন্থীর প্রভেদ মূলতঃ কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদীর ও বাস্তবধর্মী বৈজ্ঞানিকের মন ও মেজাজের পার্থক্য ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরা মানুষের মন, কত রকম বিভিন্ন ভাবধারা দেখা যায় একই চরিত্রে; ভাবুক আর বাস্তবঘেষা এই দুইটি কোঠায় সব মানুষকে ভাগ করিয়া ফেলা চলে না। এ কথা অবশ্য ঠিক যে বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হইয়া ডারউইনের সঙ্গীতের রস গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আইনষ্টিনের ক্ষেত্রে আবার দেখিতে পাই সঙ্গীতেই ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। সুতরাং একই লোকের পক্ষে আদর্শবাদী ও বৈজ্ঞানিক, প্লেটোপন্থী ও এরিষ্টটলপন্থী দুইই হওয়া সম্ভব—অবশ্য মাত্রাভেদে। সুতরাং কোন লোক যদি প্লেটোকে অথবা এরিষ্টটলকে কিছুটা বেশী পছন্দ করেন তবে বুঝিতে হইবে তাহার মূলে শুধু ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজের ব্যাপার। সুতরাং এইরূপ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্লেটো বা এরিষ্টটলের মধ্যে একজনকে ছোট বা বড় প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া দার্শনিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়।

প্লেটো এরিষ্টটলের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও, তাঁহাদের প্রচারিত নীতির উপযোগিতা যে আধুনিক সমাজেও অক্ষুণ্ণ এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্লেটোর লেখার ভিতরে গ্রীক মনের চেয়ে আধুনিক মনের প্রকাশই বেশী। আধুনিকতার আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি ছিলেন আধুনিকভাবসম্পন্ন। প্লেটোর চিন্তা ও মানসিক গঠন আধুনিক ইউরোপের, এবং যদিও আজ হইতে তেইশশত বৎসর পূর্বে তিনি এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তবুও সত্যের শাশ্বত জগতে তাঁহাকে আমরা বরণ করি একজন কালজয়ী নেতারূপে।

নারীদের সম্বন্ধে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন, রাজনীতির দিক হইতে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ ছিল

সমাজতান্ত্রিক ধরণের, জাতিকে সবল করিয়া গড়িবার জন্য তিনি প্রজনন বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ প্রচার করিতেন, তবে প্লেটোর মতবাদের যে কোন একটি দিকও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তিনি যে আদর্শবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই সর্বাগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ প্লেটোর আদর্শবাদই তাঁহার দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা।

তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)—প্লেটোর বিজ্ঞানবাদের উৎস যে সক্রেটিসের সার্বিকের (Concept) কল্পনার মধ্যে একথা নিশ্চিত। সক্রেটিস সার্বিক বলিতে বুঝিতেন এমন একটি পদার্থ যাহা কোন বস্তুর সারতত্ত্ব প্রকাশ করে, যাহা বাদ দিলে কোন বস্তু সেই বস্তুরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু যাহা সবরকম বিশেষ গুণের উর্দ্ধে। ইহার পব আর একটু অগ্রসর হইযা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই কঠিন নয় যে এই সার্বিক সত্তাটির, প্লেটোর ভাষায় আইডিয়া (Idea) বা ভাব পদার্থটির অধিষ্ঠান এক অতীন্দ্রিয় জগতে। সক্রেটিস সম্ভবতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত নিজে কখনও করেন নাই, প্লেটো নিজেও সত্যই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন কিনা এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা যায়। এ বিষয়ে অস্পষ্টতা ও মতভেদের কারণ এরিষ্টটল। এরিষ্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তব-ঘেঁষা। তিনি ভাবিতেই পারিতেন না কোন বস্তুর সারতত্ত্ব সেই বস্তুর বাহিরে কি করিযা থাকিতে পারে। প্লেটোর লেখা কাব্যধর্মী, ব্যক্তিত্ব আরোপ করিযা কথা বলা কবিদের স্বভাব ; প্লেটোর বর্ণনাগুলি এরিষ্টটল বেশীরকম আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিযা এই বলিয়া সমালোচনা কবিতেন যে প্লেটো দুইটি স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টি করিযা গিয়াছেন—একটি বাস্তব পদার্থের জগত আর একটি সার্বিক ভাবময় সত্তাব অতীন্দ্রিয জগত। স্বয়ং এরিষ্টটল এরূপ সমালোচনার জনক বলিযা সাধারণের মনে ধারণা জন্মিযা গিয়াছে যে প্লেটোর সার্বিক সত্তা এক ভিন্ন জগতের পদার্থ। অবশ্য এরূপ ধারণা যে প্লেটোর নিজের ভাষা হইতেও জন্মিতে পারে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার টিমিয়াস (Timaeus) গ্রন্থেব উল্লেখ করা যাইতে পারে ; সেখানে তিনি বলিয়াছেন : "অতএব এ কথাও আমাদের মানিয়া নিতে হইবে যে এক রকমের পদার্থ আছে যাহা সব অবস্থাতেই পরিবর্তনহীন। যাহা সৃষ্টি করা যায় না, যাহার ধ্বংসও হয় না। যাহা অন্য কোন পদার্থ হইতে কিছুই গ্রহণ করে না বা অপর কোন পদার্থের সহিত যাহা যুক্ত হইতেও যায় না, যাহা দেখা যায় না বা কোন রকম ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না এবং যে পদার্থের ধারণা একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভব হয়...... আবার ঐ একই নামে পরিচিত আর এক ধরণের বস্তু আমরা পাই যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহার সৃষ্টি হয়, যাহা সর্বদাই চঞ্চল, একস্থানে দেখা দিযা পরক্ষণেই আবার যাহা লীন

হইয়া যায়, এবং যাহা লৌকিক ধারণা (opinion) ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায়।"[১৬] এই ধরণের উক্তি দেখিয়া মনে হইতে পারে এরিষ্টটল প্লেটোর সার্বিকের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই ঠিক। পরবর্তীকালে বহু শতাব্দী ধরিয়া জেলার (Zellar) পর্যন্ত সকল পণ্ডিতই এই ধরণের ব্যাখ্যাই মানিয়া নিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালে নূতন নূতন ভাষ্য দেখা দিয়াছে এবং এই সব নবীন মতানুসারে প্লেটোর তত্ত্ব এরিষ্টটলের নিজের মতবাদ হইতে ভিন্ন কিছু নয়। এই সব নূতন ভাষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলিতেছি।

১। প্লেটোর বিভিন্ন 'কথোপকথনের' মধ্যে সার্বিক সম্বন্ধে নানারকম কথাই পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে সবসময় সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তাই বলা যাইতে পারে প্লেটোর মতবাদের দুইটি স্তর আছে। একটি প্লেটোর প্রথম জীবনের অপরটি পরিণত কালের। জ্যাকসন, ভিনডেলব্যাণ্ড ও অধ্যাপক বার্ণেট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইরূপ ধারণাই পোষণ করেন—অবশ্য ইঁহাদের সকলের মতও যে অবিকল এক তাহা নয়। বিভিন্ন স্তরের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মূল কথা এই যে প্লেটোর প্রথম দিকের রচনাগুলি তাঁহার অপরিণত মনের লেখা, তাই সেখানে তিনি সক্রেটিসকে যেন একটু অন্ধের মত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জগতের সঙ্গে সার্বিকের পার্থক্যটিই তিনি যেন সেখানে ফুটাইতে ব্যস্ত। তাই অধ্যাপক বার্ণেট কতগুলি কথোপকথনকে আখ্যা দিয়াছেন 'সক্রেটিক' বা সক্রেটিসপন্থী, আর কতগুলিকে বলিয়াছেন 'প্লেটোনিক' বা প্লেটোপন্থী। এই শেষোক্ত কথোপকথনগুলিতে প্লেটো তাঁহার গুরুর সম্মোহনী প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নিজস্ব চিন্তা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই ফলস্বরূপ আমরা পাই তাঁহার 'থিয়েটিটাস' (Theaetetus), 'পারমেনাইডিস' (Parmenides), 'সোফিসটেস' (Sophites), 'দি ষ্টেটসম্যান' (The Statesman), 'ফিলেবাস' (Philebus) প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্যামূলক রচনা। এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় কারণ দেখা যায় শিষ্য কোন না কোন সময়ে ভিন্নমত পোষণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। সে যুগে স্বয়ং এরিষ্টটলই এইরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বর্তমান যুগেও ইয়ং (Jung) এবং এডলার (Adler) প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। তবে এক্ষেত্রেও সমস্যা এই যে শেষের রচনাগুলিতেও ত পূর্বের মতই সক্রেটিস চরিত্রই প্রাণকেন্দ্র। এখানেও প্রধান বক্তা সক্রেটিস। এখানে সক্রেটিসের মুখ হইতে সার্বিকের যে ব্যাখ্যা আমরা পাই তাহা পূর্ববর্ণিত অতীন্দ্রিয় জগতের স্বতন্ত্র সার্বিক হইতে সম্পূর্ণই ভিন্ন। এরূপ কল্পনায় সার্বিকের স্থান বস্তুর মধ্যেই। সার্বিকের মূলসূত্রটি অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব হয়। এই সার্বিক বলিতে বুঝা যায় জাতি বা

'সামান্য'; জাতি ব্যক্তির ভিতরেই থাকে, এবং ব্যক্তির বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহাতে কি আমরা ধরিয়া লইব সক্রেটিস নিজেই নিজের পূর্ববর্তী ধারণাগুলি সমালোচনা করিয়াছেন? অথবা প্লেটো নিজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু বিদ্রোহ প্রকাশ্যে ঘোষণা না করিয়া পূর্ববর্তী ধারণাগুলির সমালোচনাও সক্রেটিসের মুখেই বসাইয়া দিয়াছেন। এই মত দুইটির কোনটিকেই সহজে গ্রহণ করা চলে না। যদি আমরা মনে করি প্লেটো যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা গুরুর মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় স্পষ্ট সে কথা বলিতে সাহস পান নাই, তবে বলিতে হইবে গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তিনি নহেন। এরূপ দুর্বলতা যার থাকে তার পক্ষে এপলজি রচনা করাই বৃথা বলিতে হইবে। আবার যদি মনে করা যায় সক্রেটিস পরবর্তী রচনায় নিজেই নিজের খণ্ডন করিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়াই নিজের সমালোচনা নিজে করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রশ্ন এই, এ কথাটি তিনি একটিবারও প্রকাশ্যে স্বীকার করিলেন না কেন? কাজেই এই মতটিও যেন বাস্তব বলিয়াই মনে হয়।

২। এই সব কারণে আমরা জায়োয়েট সমর্থিত দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণযোগ্য মনে করি। এই মত অনুসারে প্লেটোর নীতিতে কোন কালিক পরিবর্তন ঘটে নাই এবং প্লেটো বিভিন্ন সময়ে যে সব ব্যাখ্যা ইহার দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধও নাই। প্লেটোর সব কথাই মূলতঃ এক। তবে একথা ঠিক যে প্লেটোর সার্বিক সম্বন্ধীয় নীতিটি বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়া একটা ক্রম পরিণতিলাভ করিয়াছে, এবং তাহারই ফলে এই সব লেখার মধ্যে একটা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাহাকে বিরোধ বলিয়া মনে হয় তাহা প্রধানতঃ ভাষাগত, ভাবগত নয়। সার্বিক সত্তার বিভিন্ন দিক তিনি বিভিন্ন ভাষায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন—প্রসিদ্ধ সেই ভারতীয় কাহিনীর চারিটি অন্ধ যেমন একটি হাতীর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করিয়াছিল,—ইহাও যেন কতকটা তাই। এই সব বিভিন্ন বর্ণনার ভিতরে বিরোধ থাকিলেও বাস্তব সত্যের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই।

'সার্বিক সম্বন্ধীয় প্লেটোর মতবাদ' (Plato's Doctrine of Ideas) নামক গ্রন্থে এই কথাটিই স্টিউয়ার্ট (Stewart) আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্লেটোর সব কথাই মূলতঃ এক ও সঙ্গতিপূর্ণ। প্লেটোর ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর যে বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে অসঙ্গতির আভাস নিয়া দেখা দেয় তাহার মূল কারণ এই যে প্লেটো শুধু দার্শনিকই নন, প্লেটো একজন কবি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। অলঙ্কারবহুল ভাষায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া কথা বলা কবির স্বভাবসিদ্ধ; তিনিও অনেক সময়ই কাব্যময় ভাষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। দার্শনিকের ভাষায় কথা বলার মতই

কবির ভাষায় কথা বলা প্লেটোর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার রিপাবলিক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের শেষ অংশটুকুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সক্রেটিস সেখানে তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্রের মহিমা বর্ণনায় উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। গ্লাউকন এমন সময়ে মন্তব্য করিল, "কিন্তু এমন আদর্শ দেশের অস্তিত্ব কোথাও আছে কি? পৃথিবীতে কোথাও এমন আদর্শ স্থান আছে বলিয়া আমার ত বিশ্বাস হয় না।" সক্রেটিস বলিলেন, "স্বর্গরাজ্যে আছে এমন দেশ—ইহাই আমার বিশ্বাস। যাহার ইচ্ছা হয় সে এই দেশ দেখিতে পারে এবং ইহা দেখিয়া নিজের দেশ গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু এমন দেশ সত্যই যদি কোথাও না থাকে, ভবিষ্যতেও সম্ভব না হয়, তাহাতেও কিছু যায় আসে না, কারণ তখনও সে ঐ আদর্শ নগরের অনুসরণেই জীবনের পথে চলিবে। অন্য কিছুর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ থাকিবে না।"[১৭] অনুচ্ছেদটি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। ইহার প্রথমাংশের অর্থ এইরূপ করা যায় যে সক্রেটিসের স্বপ্নের নগর সত্যই স্বর্গরাজ্যে বর্তমান। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দার্শনিকের মত কথা বলিয়া ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এরূপ নগর বাস্তবে কোথায়ও না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ উন্নততর জীবনের আদর্শ হিসাবেই ইহার মূল্য। সকল আদর্শেরই প্রকৃত মূল্য এইখানে। ইহাদের প্রকৃত মূল্য বাস্তব অস্তিত্বে নয়। প্রেরণার উৎসরূপে। সক্রেটিসের আদর্শমূলক কল্পনা প্লেটোর ভিতরে রূপ নিয়াছে পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদে। প্লেটোর প্রথম দিকের লেখায় সার্বিকগুলিকে আদর্শের আচ্ছাদনে মণ্ডিত করিয়া দেখার একটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার শেষের দিকের দার্শনিক 'কথোপকথন'গুলিতে অত অলঙ্কারবহুল ভাষার বাহুল্য নাই, আছে যথেষ্ট যুক্তিসম্মত কঠিন আলোচনা। এই সব লেখায় তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সার্বিক ও তাহার বিচিত্র প্রকাশের সম্বন্ধটি। সার্বিকের ঐক্যসূত্রটি বাদ দিলে বস্তুপুঞ্জ হয় অর্থহীন। আবার বস্তু বাদ দিয়া স্বতন্ত্র একটি সার্বিক কল্পনা মাত্র। বহু ও একের ভাব ও রূপের সম্বন্ধটি প্লেটো এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অস্তিত্বশীল সকল পদার্থের মূলে রহিয়াছে চিন্তা ও ভাব। সকল দর্শন এইরূপে বিজ্ঞানবাদে পরিণত হয়।

বস্তু সমূহের মধ্যে সার্বিক স্বীকার করিবার পর আর এক রকমের বহুত্ব থাকিয়া যায়। বহুকে একে পরিণত করাই বিজ্ঞানবাদের লক্ষ্য। প্লেটো এইরূপ পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুপুঞ্জের বহুত্ব লীন হয় সার্বিকের মধ্যে, আবার সার্বিকও একটি নয়, সার্বিক বহু। প্রতি শ্রেণীর বস্তু ঐক্য লাভ করে ঐ শ্রেণীগত জাতি বা সামান্যরূপ সার্বিকে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরূপ সার্বিক ঐক্য লাভ করে বৃহত্তর সার্বিকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সবকিছুই ঐক্যলাভ করে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক যে

পরাসামান্য তাহার ভিতরে—ইহাই 'পরম শ্রেয়' বা 'পরমকল্যাণ'রূপ (Idea of the Good) সার্বিক। 'পরম কল্যাণে'র আদর্শটি প্লেটোর তত্ত্ববিদ্যার সবচেয়ে বড় কথা ; প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক' গ্রন্থে ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'রিপাবলিকে' তিনি বলিয়াছেন "তোমাদের অনেকবার বলিয়াছি 'পরমকল্যাণে'র আদর্শ জানিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, অন্যান্য সকল জিনিসের মূল্য ততটুকুই যতটুকু পরিমাণে তাহারা পরম কল্যাণ লাভের সহায়ক" ১৮। জগতে বহুরকম পদার্থ, জটিল ইহার বৈচিত্র্য, ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের বুদ্ধি যেন ঝাপসা হইয়া আসে। আর ইহারই ফলে দেখা দেয় কতগুলি লৌকিক মত (opinion); বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। চারটি অন্ধ যেমন হাতী সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করিয়া নিয়াছিল, লোকায়ত মতগুলিই অনেকটা সেইরকমের। কিন্তু যখন আমাদের বুদ্ধি উন্নত স্তরে উঠিতে পারে, যখন আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে সার্বিকটিকে ধরিতে পারি তখনি লাভ হয় আমাদের প্রকৃত জ্ঞান। "জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ের মূলে যে সত্তা বর্তমান—যাহা জ্ঞেয়কে সৎরূপে প্রতিভাত করে আবার জ্ঞাতাকে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা দান করে, তাহারই নাম আমি দিতে চাই 'আইডিয়া অফ দি গুড' বা 'পরমকল্যাণ'রূপ সার্বিক ; আবার বিজ্ঞানের মূল কারণও ইহাই ; সত্য যেটুকু পরিমাণে আমাদের জ্ঞানগম্য হয় তাহা এই সার্বিকেরই জন্য ; সত্য ও জ্ঞান উভয়ই স্বরূপতঃ সুন্দর, তাই এই শ্রেষ্ঠ সার্বিক আরও অনেক বেশী সুন্দর ; এবং পরবর্তী উদাহরণটিতে যেমন বলা হইয়াছে, আলো ও দৃষ্টিশক্তি দুইই সূর্যের মত কিন্তু কোনটিই সূর্য নয়, তেমনি এই অপর লোকে বিজ্ঞান ও সত্য উভয়ই কল্যাণ সদৃশ হইতে পারে কিন্তু কল্যাণরূপ নয় ; 'কল্যাণে'র আসন ইহাদের অনেক উপরে।"১৯ সংক্ষেপে বলা চলে দৃশ্য জগতে সূর্যের যে স্থান, সার্বিকের জগতে 'কল্যাণে'র সেই স্থান। সূর্য সকল বস্তুকে দৃশ্যমান করে 'কল্যাণ'রূপ সার্বিক ও সকল পদার্থ জ্ঞানগম্য করে।

রিপাবলিক (Republic)—প্লেটোর সকল রচনার মধ্যে 'রিপাবলিকের' সুনাম সকলের উপরে। প্লেটোর বহুমুখী প্রতিভা এই 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যেভাবে প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে তাঁহার রচিত অন্য কোন 'কথোপকথনে' তাহা সম্ভব হয় নাই। তাই 'রিপাবলিক' বিশ্বসাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দর্শনশাস্ত্রের যে কোন দিকে যে কোন শাখায় প্রথম প্রবেশার্থীর পক্ষে রিপাবলিক অতি সুন্দর পুস্তক। 'রিপাবলিক' নামের মধ্যেই ইহার কিছু পরিচয়, রিপাবলিক বা গণতন্ত্র নাম হইতেই বুঝা যায় ইহা রাষ্ট্রনীতির বই। কিন্তু শুধু রাষ্ট্রনীতিই না, ইহার মধ্যে আছে অনেক কিছুই। প্রথমতঃ ন্যায়-পরায়ণতা বা সুবিচারের প্রশ্ন আলোচনা করিলে দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনে সুবিচার

(justice) বা ন্যায়পরায়ণতার তাৎপর্য রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিলে বুঝা যায় না। সুবিচার নীতিশাস্ত্রের বিষয়। তাই রিপাবলিকের মূলে আছে নীতিশাস্ত্র। দেশশাসন পদ্ধতির প্রশ্ন স্বভাবতঃই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। কাজেই শিক্ষাপ্রসঙ্গও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। শরীর চর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ শিক্ষার অঙ্গীভূত। এই সবই এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, আবার ইহারই সঙ্গে আমরা পাই কাব্যালঙ্কার ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা। আবার উন্নত রাষ্ট্রের জন্য সবল জাতি চাই, তাই মানুষের জাতিগত উৎকর্ষের প্রশ্নও রাষ্ট্রীয় সমস্যা। জাতির দৈহিক উন্নতির সমস্যাও যে ভাবে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে বলা যায় সুপ্রজনন বিদ্যার (Eugenics) ইহা আদি গ্রন্থ। মানুষের জীবন ও সমাজের যতকিছু সমস্যা তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে চাই সার্বিক ও কল্যাণ-এর জ্ঞান; ইহা তত্ত্ববিদ্যার বিষয়, কাজেই রিপাবলিক তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক পুস্তক বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

এই মহান গ্রন্থখানা আমাদের দিয়াছে এক কল্পলোকের ছবি। সাধারণের ধারণা প্লেটো ছিলেন ভাবুক স্বপ্নবিলাসী মানুষ, কিন্তু তাঁহার রচনাবলী ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝা যায় জীবনের সকল রকম বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁহার সবরকম মৌলিক কল্পনাই রিপাবলিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া যে সব ভাবের স্ফুরণ হইয়াছে সে সব সম্বন্ধে তাঁহার বিভিন্ন রচনায় আলোচনা পাওয়া যায়। রিপাবলিকের সারমর্ম আলোচনা করিলেই সমগ্র প্লেটো-বাদের একটা ধারণা আমরা পাইতে পারি। রিপাবলিকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে সুবিচার (Justice) বা ন্যায়পরায়ণতার লক্ষণ। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাই সক্রেটিসের প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গোক্তির চমৎকার নিদর্শন—বিশেষতঃ গর্বিত সোফিষ্ট থ্রাসিমেকাসের বড় বড় বুলি তিনি যেরূপ ব্যঙ্গোক্তির আঘাতে অসার প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক বাদানুবাদের পরে আমরা পাই প্রকৃত আলোচনা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নীতিগত অর্থে সুবিচার বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গেল ব্যাপারটি জটিল। তাই বৃহত্তর সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রীয় অর্থে সুবিচারের তাৎপর্য স্থির করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় রাষ্ট্র সমষ্টিগত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শাসক বা অভিভাবক (guardians), (২) সৈনিক, (৩) জনসাধারণ ও ক্রীতদাস। তৃতীয় বিভাগের লোকেরা জীবনযাত্রার সাধারণ কাজগুলি করিয়া যাইত। আর

স্বাধীন নাগরিকেরা শ্রমসাধ্য কাজের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া রাজনীতি ও জ্ঞান চর্চায় মন দিত। সমাজের এই বিভাগের মূলে ছিল মানবাত্মার ত্রিধা বিশ্লেষণ। প্লেটোর মতে মানব মনের তিনটি দিক আছে—একটি জ্ঞান বা বিচারের দিক (reason), একটি তেজ বা কর্মের দিক (the spirited part), এবং আর একটি তমোময় প্রবৃত্তির দিক (appetitive part)। শাসক বা অভিভাবকদের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, তেজ বা রজোভাবের প্রকাশ সৈনিকদের মধ্যে এবং অবশিষ্টদের মধ্যে প্রকাশ শুধু তমোপ্রধান প্রবৃত্তির। রাষ্ট্র তখনই সুপরিচালিত হয় যখন এই তিনটি বিভাগের কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে চলে। শাসক বা অভিভাবক সম্প্রদায়ের জ্ঞান, সৈনিকদের সাহস ও জনগণের সংযম—এই তিনের মিলনে দেখা দেয় রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং এই ধর্মই সুবিচার (justice)। ব্যক্তিজীবনে সুবিচারের অর্থও আমরা এইরূপ বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝিতে পারিব। যখন কোন মানুষের জীবনে বিবেকের প্রাধান্য দেখা যায়, যখন তাহার ইচ্ছাশক্তি বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলে, যখন তৃষ্ণা সংযমের বাঁধন মানিয়া চলে তখনই তাহার জীবনে হয় সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। মানবাত্মার সকলদিকের সুষমভাবই সুবিচার।

অভিভাবক (guardian) হইবেন কাহারা? স্বভাবতঃই তাহারাই হইবার উপযুক্ত যাহাদের জীবনে দেখা যায় জ্ঞান ও বিবেকের প্রাধান্য। কেহ বা মনে করিতে পারেন সাধারণ পুরুষসুলভ অহমিকাবশে প্লেটো অভিভাবকত্বের অধিকার শুধু পুরুষদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে গ্রীসে পুরুষের ভিতর এরূপ অহমিকা ছিল বটে তবে তাহা প্লেটোর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সেকালের সাধারণ গৃহিণী থাকিত অজ্ঞানের অন্ধকারে, তাই তাহাকে থাকিতে হইত পুরুষের শাসনে। কিন্তু ঠিক সেই দিনেই আবার বুদ্ধিমতী গ্রীক রমণীরা পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার যে করিতেননা এমন নয়। তখন এমন গ্রীক মনীষী কমই ছিল যাহার প্রেরণার উৎসরূপে আমরা একজন নারীকে না পাই। পেরিক্লিসের প্রেরণার উৎস ছিল বিখ্যাত এস্‌পেসিয়া (Aspasia), আর সক্রেটিসের ছিল ডিয়োটিমা (Diotima)। এই সব রমণী ছিলেন শিক্ষিতা ও মার্জিতরুচিসম্পন্না, ইহাদের জ্ঞানও ছিল বেশ গভীর এবং ইহারাই প্রেরণার উৎস। নারীর যদি এতটা জ্ঞান ও বিচক্ষণতা থাকিতে পারে তবে তাহারা দেশসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন, আর দেশই বা ইহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? তিনি বলিয়াছেন একটি মেয়ে কুকুর পুরুষ কুকুরের চেয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ খারাপ করে না। উপমাটি অবশ্য একটু অশোভন কিন্তু এই উপমাটি দিয়াই প্লেটো নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগত অবশ্য

তাঁহার এই মত মানিয়া নেয় নাই, এবং এই বিংশ শতাব্দীতেই মাত্র তাঁহার কথা গৃহীত হইতে যাইতেছে। কিন্তু ইহা ত প্লেটোর দোষ নয়, বরং ইহাতে প্লেটোর মনের আধুনিকতাই প্রকাশ পায়।

রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে শাসকদের জ্ঞানের উপব। তাই তিনি শাসক নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন এক শিক্ষাক্রম অতিক্রম করিতে পারিলেই শাসক হইবার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। রিপাবলিকে এই প্রসঙ্গে যে আলোচনা রহিয়াছে তাহাতে এই পুস্তকখানাকে ইউরোপের শিক্ষা-বিষয়ক আদিগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। 'প্রোটাগোরাস' নামক রচনায় তিনি তীব্র সমালোচনার স্বরে বলিয়াছেন যে সব পিতামাতা সোফিষ্টদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না জানিয়াই তাহাদের হাতে সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহারা নিতান্তই বুদ্ধিহীন। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতেন "বিদ্যা ক্রয় করা মাংস বা খাদ্য ক্রয় করা অপেক্ষা অনেক বেশী বিপজ্জনক"[২০] কারণ "জ্ঞানেই আত্মার কল্যাণ।" একমাত্র যাহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদের কাছ হইতেই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। 'লস' বা 'আইন' নামক রচনায় তিনি বলিয়াছেন, যে শিক্ষা "জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে না, সুবিচার শিখায় না কেবল ধন আহরণ, দৈহিক বল ও চতুরতা লাভ করিতে শিখায়" তাহা "হীন ও সঙ্কীর্ণ এবং শিক্ষা নামেরই অযোগ্য"।[২১] বর্বর জাতিদের প্রতি গ্রীকদের একটা স্বাভাবিক প্রতিকূল মনোভাব ছিল, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু প্লেটো তাঁহার 'এলকিবিয়াডিস' গ্রন্থে পারসীক শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। যে ব্যবস্থায় অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যা শিখায়, যে ব্যবস্থায় সত্য ভাষণের উপর জোর দেয় যে ব্যবস্থা সাইরাসের (Cyrus) মত লোক সৃষ্টি করে তাহা উত্তম সন্দেহ নাই।

শিক্ষা (Education):—'রিপাবলিকে' প্লেটো শাসকশ্রেণীর শিক্ষা সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কারণ তাঁহার আদর্শ কল্পরাজ্যের সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে ইহাদের উপর। ফ্রয়েবেল (Froebel) ও মন্টেসেরীর (Montessori) বহু শতাব্দী পূর্বেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন শৈশবের শিক্ষার ও স্বাধীন চিন্তার মূল্য কত গভীর। তিনি বলিয়াছেন "জ্ঞান অর্জন করিতে গিয়া কোন মানুষ যেন দাস হইয়া না যায়। শারীরিক ব্যায়াম ইচ্ছার বিরুদ্ধে করান হইলেও শরীরের ক্ষতি করে না কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া শিখান জ্ঞান মনের কোনই উন্নতি করে না"।[২২]

স্বর্ণাভ শিশুদেরই বিশেষ ভাবে বাছিয়া নেওয়া হইত ভবিষ্যৎ শাসকরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য। স্পার্টার আদর্শ দেখিয়া তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন শরীর গঠন

করা কত প্রয়োজন, তাই প্রথম বিশ বৎসরের ভিতর শারীরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার উপরে জোর দিয়াছেন। দশ বৎসর ধরিয়া শিখান হইত বিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ। তাহার পর পাঁচ বৎসর চলিত দর্শন চর্চা অথবা চিন্তা পদ্ধতির অনুশীলন। এই ভাবে গড়িয়া উঠিত দেশের শাসক, এবং উপযুক্ত প্রস্তুতির পর পনর বৎসরকাল তাহারা দেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহার পরে শাসনভার মুক্ত হইয়া এই দার্শনিক রাজাগণ (Philosopher Kings) সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দর্শন চর্চায় নিয়োগ করার স্বাধীনতা পাইত। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহারা সাময়িক ভাবে রাজনীতির আবর্তে যোগ দিত মাত্র।[২৩]

প্লেটোর 'কল্যাণ' আদর্শের যে বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, তাহা তিনি অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন শাসক সম্প্রদায়েব শিক্ষা প্রসঙ্গে। দার্শনিক রাজার যে মহান কল্পনা তাঁহার ছিল তাহার সঙ্গে এই কল্যাণাদর্শের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। দার্শনিক-রাজার এই আদর্শ সাধারণ বাস্তবপন্থী মানুষ প্লেটোর কল্পনাবিলাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। "যে পর্যন্ত না দার্শনিকেরা রাজা হইবেন, অথবা পৃথিবীর রাজা ও রাষ্ট্রনায়কগণ দর্শনের তত্ত্ব ও তেজ অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যতদিন না রাজনৈতিক ও প্রকৃত মহত্ত্ব একাধারে মিলিত হইবে, এবং যতদিন যে সব সাধারণ স্তরের মানুষ দর্শন ও রাজনীতির শুধু একটির চর্চা করেন তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য না হইবেন, ততদিন আমাদের নগরগুলি, শুধু নগর নয়, আমার বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতি অমঙ্গল হইতে মুক্তি পাইবে না—আর যখন ইহা সম্ভব হইবে, একমাত্র তখনই আমাদের এই আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবরূপ নিয়া পৃথিবীর আলোকে মূর্ত হইয়া দেখা দিবে।"[২৪] যাহারা নিছক রাজনীতির চর্চা করেন তাহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন, আর সমাজের সাধারণ মানুষ—রাজনৈতিক পাণ্ডাদের ছল চাতুরীতে যাহারা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছেন—তাহারা হয়ত ইহা শুনিয়া হতাশায় হাত তুলিয়া দাঁড়াইবেন, কিন্তু মূলতঃ প্লেটোর কথাটি খুবই সত্য। দেশশাসনের কাজ সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ ; একমাত্র দেহে যাহাদের বল আছে, তাহারাই পৃথিবীকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। প্লেটো নিজে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ। পেরিক্লিসের গণতন্ত্র যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা দেখিয়া স্বভাবতঃই তিনি সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়েন নাই। তিনি ছিলেন সার্বভৌম রাষ্ট্রতন্ত্রের (State Absolutism) একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁহার কল্পিত রাষ্ট্রে শাসক বা অভিভাবকেরা ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষমতার মূলে ছিল তাহাদের চরিত্রগত অনাসক্তি ও রাষ্ট্রের প্রতি গভীর আনুগত্য, আর্থিক ক্ষমতা বা স্বৈরাচারের কোন স্থান এখানে

ছিল না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়—"যতদিন বাঁচিব শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করিব"[২৫] এই আদর্শ রূপায়নের জন্য। এই রাষ্ট্রে উচ্চনীচের ভেদ থাকিবে না, থাকিবে সর্বজনীন প্রীতির সম্পর্ক। 'দি লস' (The Laus) গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন: "পৌরবাসী সকলে পরস্পরকে জানিবে, পরস্পরকে বুঝিবে, ইহা হইতে উত্তম ব্যবস্থা রাষ্ট্রে আর কিছু হইতে পারে না।" এই রকম ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিতে পারে আদর্শ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। অবশ্য গ্রীকদের একান্তপ্রিয় নগররাষ্ট্রের ভিতরেই এইরূপ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠা সম্ভব।

কমিউনিজম (Communism) :—নগর রাষ্ট্রের মত ক্ষুদ্র পরিসরে বন্ধুদের যৌথ সম্পত্তি রাখার কথা স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে। এবং প্লেটো তাঁহার বিভিন্ন রচনার মধ্যে এ বিষয়টি অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটো বলিয়াছেন অভিভাবকদের স্ত্রী ও সম্পত্তি সবই হইবে যৌথ। এরূপ কল্পনা অনেকের কাছেই অত্যন্তই বিসদৃশ মনে হইয়াছে। যৌথ সম্পত্তি আদিম মানব সমাজে প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক কমিউনিষ্টদের ইহাই আদর্শ। আর ইহাকে আবার এখন একটা উচ্চদরের নৈতিক মর্যাদাও দেওয়া হইতেছে। বলা হইতেছে এই আদর্শানুযায়ী মানুষ তাহার নিম্নতম প্রয়োজন মিটিলেই খুসী থাকিবে এবং অপরের দ্রব্যের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রমাগত নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিবে না। যৌথ স্ত্রীর প্রথাও আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল কিন্তু কোন সভ্য সমাজ উহা বরদাস্ত করে নাই। স্বভাবতঃ মনে হয় দার্শনিক প্লেটো, নীতিধর্ম প্রচারক প্লেটো এমন একটা মত তাহার রিপাবলিকে সমর্থন করিলেন কি করিয়া? যৌন সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে এই মতের তাৎপর্য বুঝা যায় না। যে সাধু উদ্দেশ্য নিয়া প্লেটো এই কথা বলিয়াছেন তাহাই এখানে বিবেচ্য। প্লেটো বলিতেন অভিভাবকদের পরিপূর্ণ রূপেই রাষ্ট্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। এ জীবনে ত্যাগের ভাবটিই প্রধান। পরিবার থাকিলে দেশের ঐকান্তিক সেবায় বিঘ্ন হইতে পারে, এরূপ যে হয় তাহার বহু উদাহরণ রহিয়াছে। একটি সুন্দর উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। লর্ড নেলসনের সময়ে নিয়োপলিটান নৌবাহিনীর কুমার কেরাকিয়ালির (Prince Carraciolli of the Neopolitan fleet) বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল যে তিনি তাহার রাজাকে ত্যাগ করিয়া শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করিতেছেন। তিনি নিজের সমর্থনে যে কথা বলিলেন তাহা আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন হইলেও তাহার একটি করুণ মানবিক দিক আছে। "স্বয়ং রাজা কর্তৃক প্রজাদের কাপুরুষোচিত পরিত্যাগের" কথা উল্লেখ করিয়া কুমার বলিতে লাগিলেন: "মহাশয়েরা জানেন আমার পৈতৃক সম্পত্তি সবই ঐ সহরে

এবং আমার পরিবারও বেশ বৃহৎ। যদি আমি শাসকশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ না করিতাম তাহা হইলে আমার সন্তানগণ (এই কথা বলার সময়ে তাহার গলার স্বর পরিবর্তিত হইল, ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল ও চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, মুহূর্ত পরেই তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন এবং পূর্ববৎ কঠিন কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন) নিজেদের পিতৃভূমিতেই আশ্রয়হীন হইয়া অসহায়ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। মহাশয়গণ আপনাদের মধ্যে অনেকের সন্তান আছে। আমি আপনাদের অন্তরের পিতৃত্বের কাছে আবেদন জানাইতেছি—একবার ভাবিয়া দেখুন আমার অবস্থায় পড়িলে আপনারা কি করিতেন।"[২৬] পরিবারবর্গের প্রতি প্রেম ত শুধু স্ফীতকায় আত্মপ্রেম। পারিবারিক প্রেমকে আঘাত করিলে স্বার্থপরতাকেই আঘাত করা হয়। রোমান ক্যাথলিক, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠবাসীদের জীবনেই দেখা যায় পরিবারের মোহ হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস। অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়াই প্লেটো অভিভাবকদের বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্মীয় মঠ-জীবনের সঙ্গে অবশ্য প্লেটোর কল্পনার একটি স্থানে বিশেষ পার্থক্য ছিল।

মানব জাতির রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি তিনি বিশেষভাবে কামনা করিতেন। যে সব সুনির্বাচিত শিশুদের দীর্ঘকাল শিক্ষা দিয়া মানুষ করা হইয়াছে উন্নত জাতি সৃষ্টির কাজে তাহারা যে মূল্যবান ইহা তিনি বুঝিতেন। ইহাদের বংশধর ইহাদের মত উন্নত শ্রেণীর মানুষ হইবে আশাকরা স্বাভাবিক। ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করার অর্থ যে উৎকৃষ্ট বীজ নষ্ট করিয়া ফেলা তাহা প্লেটো বুঝিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন মাঝে মাঝে নরনারীর মিলনোৎসবের ব্যবস্থা থাকিবে, এখানে অভিভাবকশ্রেণীর নর ও নারীদের মিলন হইবে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরই তাহাকে মায়ের কাছ হইতে সরাইয়া নেওয়া হইবে। ফলে মাতাপিতা তাহাদের সন্তানদের চিনিবে না এবং সন্তানেরাও জানিবে না তাহাদের পিতা ও মাতা কে; বিশেষ একশ্রেণীর শিশুপালন কেন্দ্রে ইহাদের অতি যত্নের সহিত মানুষ করিয়া তোলা হইবে। এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে বিচিত্র ও অদ্ভুত। এ প্রস্তাবের সমর্থক আজ পর্যন্ত কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে ইহার সহিত অশ্লীলতার সম্পর্ক নাই। বরং বলা চলে রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে সম্পাদিত বলিয়া প্রজনন ক্রিয়াটি ও যেন মহিমান্বিত হইয়া দেখা দেয়। পরবর্তীকালে প্লেটো তাঁহার মতবাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পরে 'লস' বা 'আইন' নামক গ্রন্থ রচনাকালে যে যৌথ স্ত্রীর কল্পনা অভিভাবকশ্রেণীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি স্বাভাবিক পথে প্রজননের অর্থ বিবাহের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন, "যেরূপ

বিবাহ নিজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুখপ্রদ যেরূপ বিবাহ না করিয়া যে বিবাহ রাষ্ট্রের কল্যাণের দিক দিয়া কাম্য তাহাই করা উচিত।"[২৭] প্লেটোর দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যাপারটি পুরাপুরিই সমাজ বা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যই দরকার। এদিক দিয়া তিনি এতটাও বলিয়াও গিয়াছেন যে কোন স্বাস্থ্যবান লোকেরই অবিবাহিত থাকা উচিত নয়। তিনি বলিয়াছেন, "যদি কোন লোক একথা না মানে, যদি সে অসামাজিক থাকিতে চায় এবং তাহার অপর নাগরিকদের মত আচরণ না করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও অবিবাহিত থাকিয়া যায় তবে তাহার উপর বাৎসরিক একটা জরিমানা ধার্য করা উচিত।"[২৮] পরবর্তীকালে অবিবাহিতদের উপর কর ধার্য করার চমকপ্রদ পূর্বাভাষ বটে।

সুপ্রজনন বিজ্ঞান (Eugenics) :—ইউজেনিক্স বা সুপ্রজনন বিজ্ঞানটির সঙ্গে প্লেটোর পরিচয় ছিল না। 'ইউজেনিকস' শব্দটি বহু পরবর্তীকালে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্যার ফ্রানসিস গ্যালটন সৃষ্টি করেন। স্পার্টাবাসীগণ শারীরিক উন্নতিকে এত অতিমাত্রায় মূল্য দিতেন যে তাহারা পঙ্গু দুর্বল শিশুকে বাঁচিতে দিতেই চাহিতেন না। তাহারা বরং উহাকে উন্মুক্ত স্থানে শীতাতপে ফেলিয়া রাখিয়া মারিয়া ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য স্বাস্থ্যবান শিশুদেরই পালন করার দরকার। সন্তান বাৎসল্যকে এখানে কোন মূল্য দেওয়া হইত না। প্রজনন বিজ্ঞানের এই ধ্বংসাত্মক দিকটি প্লেটো মানিয়া নিতে দ্বিধা করেন নাই। রিপাবলিকে তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের শরীর ব্যাধি-যুক্ত তাহারা কিছু (সন্তান) না রাখিয়াই মরিয়া যাইবেন।"[২৯] খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে ভিন্ন পরিবেশে যাহারা মানুষ হইয়াছেন তাহাদের কাছে এই ধরণের কথা নিষ্ঠুর মনে হইবে সন্দেহ নাই। তবুও একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে প্লেটোর মতের সমর্থনেও অনেক কথা বলার আছে। তবে প্লেটোর সমর্থনে কিছু বলিবার সময়ে ধরিয়া নিতে হইবে যে প্রজনন বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা এতই অগ্রসর হইয়াছি যে, কোন শিশু বা রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থদেহে বাঁচিতে পারিবে আর কেইই বা তা পারিবে না তাহা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানিয়া ফেলিয়াছি। এতটা ধরিয়া নেওয়া অবশ্য কঠিন। তবে যদি তাহাই সম্ভব বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'কোমল মৃত্যু'র (cuthanasia) ব্যবস্থা সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। আরোগ্যাতীত ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মৃত্যু ঘটাইয়া মুক্তি দেওয়া নিষ্ঠুরতা বটে কিন্তু এ নিষ্ঠুরতা গভীর দয়ার সমগোত্রীয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজে খৃষ্টীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অতিমাত্রায় প্রভাব। এ সমাজে প্রতিটি ধর্ম-প্রাণ লোক মনে করিত এ জীবন ক্ষণিক, স্বর্গলোকের আনন্দলাভের জন্য এ জীবন শুধু প্রস্তুতির ক্ষেত্র। এইরূপ সামাজিক পরিবেশে প্লেটোর মহান কল্পনা-

গুলি দানা বাঁধিবার সুযোগ পায় নাই। যে সমাজে প্রতিটি মানুষ শুধু নিজের মুক্তির জন্যই কাঁদিয়া বেড়ায়, যেখানে মানুষ শুধু নিজের স্বর্গলাভের সহায়ক হইবে মনে করিয়া অপরকে মুক্তিলাভে সাহায্য করিতে যায় সেরূপ সামাজিক পরিবেশে প্লেটোর সুপ্রজনন সম্বন্ধীয় মতামত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক বলিয়া মনে হইবেই। কিন্তু আধুনিককালে ইউরোপীয় সমাজে নির্বিচারে যে অসংখ্য ভ্রূণ হত্যা হইতেছে, অথবা অসভ্য সমাজে যে অসংখ্য বালিকাকে মারিয়া ফেলা হয় তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে প্লেটোর মতবাদের নৈতিক মূল্য বুঝা যাইতে পারে।

প্লেটো এমন কথাও আবার বলিয়াছেন যে পুরুষের উচিত তাহার বিরুদ্ধ স্বভাবের মেয়েকে বিবাহ করা, কারণ তাহা হইলে উভয়ের মিলনে সুষম স্বভাবের সন্তান লাভ করা যাইবে। প্লেটোর এসব কথার পিছনে কোন যুক্তি নাই, এবং এসব কথাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়াও অর্থহীন কারণ এই বিংশ শতাব্দীতেও জন্ম ও যৌন সম্পর্কিত রহস্যগুলি আমাদের কাছে অন্ধকারে আবৃত। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে যখন তাঁহার প্রজনন সম্বন্ধীয় কথার মূল্য প্রমাণিত হইবে। যেমন অতীত কালে তাঁহার রাষ্ট্র ও নারী সম্বন্ধীয় দূর দৃষ্টির মূল্য বুঝা গিয়াছে। প্লেটোর দর্শন সজীব ও প্রাণবান; অসার কল্পনা নিয়া তিনি কালক্ষেপ করিতেন না; তাঁহার দর্শন "শূন্য" দিবসের অলস কল্পনা নয়। তিনি যে সমস্যা ধরিতেন তাহা গভীরভাবে আলোচনা করিতেন, তিনি মানুষকে শিখাইয়াছেন কঠিন সমস্যার মুখামুখি দাঁড়াইতে, পাশ কাটাইয়া এড়াইয়া না গিয়া সাহসের সহিত সমাধানের চেষ্টা করিতে।

সৌন্দর্যতত্ত্ব (Aesthetics) :—প্লেটোর সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি সঙ্গীতের মূল্য দিয়াছেন ইহার ব্যাপক অর্থে—যে অর্থে সঙ্গীত মানবিকতা বিকাশের সহায়ক হয়। তিনি ছিলেন প্রাণবান বীররসাত্মক সঙ্গীতের সমর্থক। তিনি চাহিতেন সেই গান যাহা আমাদের উৎসাহ দেয়, তিনি চাহিতেন এমন কাব্য যাহা বীরত্বব্যঞ্জক, তিনি চাহিতেন এমন দর্শন যাহা আমাদের মানুষ করিয়া তোলে। বিপরীত ভাবে বলা যাইতে পারে যে গান শুধু কোমল ও নিস্তেজ আর যে কাব্য দেবদেবীর দুর্বলতা ও পাপের দিক প্রকাশ করে, ইহাদের তিনি রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণরূপেই বহিষ্কার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু ঐরূপ কাব্যই নয়, উহার রচয়িতা কবিদেরও তিনি রাষ্ট্রের বাহিরে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। একজন কবি অন্য কবিদের নির্বাসনের নির্দেশ দিতেছেন—ইহাই প্লেটোর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার। প্লেটোর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলির মধ্যে এই অংশটিই

দুর্বল এবং অনেকেই ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ও কবি সম্বন্ধে প্লেটোর আলোচনা তাঁহার মত চরিত্র ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের পক্ষে অশোভন। যদিও লাইসিস (Lysis) গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, কবিগণ "আমাদের জ্ঞানের জনক।"[৩০] রিপাবলিকে আবার তিনি কবিদের সম্বন্ধে লঘুমনোভাবের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে কবিরা সমাজে প্রয়োজনহীন। তাহারা না করেন আইন প্রণয়ন, না করেন যুদ্ধ পরিচালনা, না করেন কোনো সত্য আবিষ্কার। মানবজাতির উন্নতির দিকে তাঁহাদের কোনই দান নাই। কবি সম্পর্কে তিনি এই যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহা কাব্য ও দর্শনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে তাহার বিপরীত। কবিদের সম্বন্ধে প্লেটো পরে যে কথা বলিয়াছেন তাহাও সমর্থন যোগ্য নয়। তিনি বলিয়াছেন যে শিল্পী ও কবিগণ শুধু সত্যের অনুকরণ করে। ইহারা সত্য হইতে তিন স্তর দূরে। কবিদের প্রতি প্লেটোর বিরূপ মনোভাবের কারণ তাঁহার নৈতিক গোঁড়ামি। সকল যুগেই কিছু লোক থাকে অন্ধ গোঁড়ার দলের, তাহারা মনে করে নৈতিক জীবন যাপনের একমাত্র পথ হইল এ জীবনকে ম্লান, নিরানন্দ ও উৎসাহ-হীন করিয়া তোলা। যুগে যুগে শুষ্কতার সঙ্গে পূর্ণতার আদর্শগত সংঘাত চলিয়া আসিতেছে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম বা দোলকের মত সমাজ একবার শুষ্কতার দিকে আবার পূর্ণতার দিকে দোল খাইতেছে। মানুষ এ সত্যটি এখনও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ রূপায়ণের পথ পরিপূর্ণ জীবন যাপনের মধ্যে, মনের মধ্যে আনন্দময় সুকুমার বৃত্তিগুলির উচ্ছেদের মধ্যে নয়।

প্লেটো মনে করিতেন মানুষের সমগ্র জীবনই একটি শিক্ষার প্রবাহ সুতরাং জীবনের প্রতি স্তরেই পাঠ্য বিষয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে শিল্প বা কলামাত্রই কল্যাণজনক নয় আবার সুন্দরও নয়। এমন অনেক পুস্তক এমন অনেক চিত্র আছে যাহা কিশোরদের উপযোগী নয়। লস বা আইন গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীতে যত রকম জীব আছে তাহার মধ্যে বালকই সবচেয়ে অশান্ত ও অবাধ্য, কাজেই বালককে মাতা ধাত্রী ও শিক্ষকগণ শাসনে রাখিবেন।[৩১] কিন্তু একথা সত্য হইলেও ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে মানুষের জীবনের প্রতি পদেই তাহাকে পাঠশালা বা বালিকা বিদ্যালয়ের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যে শিক্ষানীতি অনুসারে বহু বৎসর কঠোর নিয়মাধীনে চলিবার পরও মানুষ পছন্দমত দু'খানা বই পড়িবার স্বাধীনতা পায় না, ইচ্ছামত সকল ধরণের বই নাড়াচাড়া করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে না সে শিক্ষানীতি মূল্যহীন। ওভিডের কবিতা (Ovids poems) বা রুশোর কনফেসনস (Confessions) বা স্বীকারোক্তি তরুণ

মনের পক্ষে আদর্শ পাঠ্য পুস্তক না হইতে পারে কিন্তু যদি কোন বয়স্ক ব্যক্তিও উহা পড়িয়া চাঞ্চল্য দমন না করিতে পারে তবে বলিতে হইবে সে লোকের নৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে পশমের বস্ত্রে আবৃত করিয়া বিধিনিষেধের প্রহরাধীনে চিরকাল রাখিয়া দিলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

রিপাবলিকের প্রধান ত্রুটি এই যে যদিও ইহাতে আমূল পরিবর্তনের কথা আছে তবু ইহা যেন কিছুটা গতিহীন, নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতা এখানে বেশী। প্লেটোর মনে সব সময় ভয় ছিল কোথায়ও সামান্য একটুখানি শৈথিল্য তাঁহার কল্পনার আদর্শ রাষ্ট্রের অঙ্গহানি না ঘটায়। "সঙ্গীতের রীতিতে পরিবর্তন আসিলে রাষ্ট্রের মৌলিক নিয়মেও পরিবর্তন আসে।"৩২—এই প্রবাদ বাক্যে তিনি খুব বিশ্বাস করিতেন। এই প্রবাদ বাক্যটিতে কিছুটা সত্য থাকিতে পারে কিন্তু কথাটিকে তিনি একটু বেশীরকম রক্ষণশীল অর্থে গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন "সঙ্গীতের ধারায় সামান্য পরিবর্তনও রাষ্ট্রের অমঙ্গল ডাকিয়া আনে, সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ করা দরকার।"৩৩ আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্লেটো যখন সমাপ্ত করিলেন গ্লাউকন তখন অশোভন সরলতার সঙ্গেই মন্তব্য করিয়া উঠিল: "সক্রেটিস তুমি একজন ভাস্কর আমাদের শাসকদের তুমি নিখুঁত সুন্দর প্রস্তর মূর্তিতে পরিণত করিয়াছ"৩৪—সবদিক দিয়াই নিখুঁত বটে, একমাত্র ত্রুটি ইহাতে প্রাণের স্পন্দন নাই।

কবিদের বিরুদ্ধে প্লেটোর সমালোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে প্রধানতঃ হোমার ও হেসিয়ডই ছিল তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। কারণ এইসব কবি দেবচরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছিলেন। কতগুলি পাপাসক্ত ব্যক্তিকে অমরতা দিলে যাহা হয় এইসব কবিদের লেখায় দেবচরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাই। ইহারই বিরুদ্ধে ছিল প্লেটোর প্রতিবাদ। গ্রীক পুরাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে মনে হয় প্লেটোর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তাঁহার ত্রুটি এই যে, যে কথা শুধু গ্রীস সম্বন্ধেই প্রযোয্য তাহাকে তিনি একটি সার্বিক নিত্য সত্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাদেশিকতা থাকিতে পারে কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ কবি তাহাদের বক্তব্যে থাকিবে একটি বিশ্বজনীন আবেদন। সেকালের গ্রীক কবিদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার হয়ত প্রয়োজন ছিল, গ্রীক কাব্যের যে সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন তাহার সমর্থনেও হয়ত কিছু বলা যাইতে পারে, তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি কাব্যের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতা প্লেটোর প্রতিভাকে অনেকখানি ম্লান করিয়াছে। 'শিল্প শুধু শিল্পের জন্যই' এ মতবাদ আমরা গ্রহণ না করিতে পারি, ইহাও স্বীকার করিতে পারি যে সব শিল্পকে নীতিসম্মত হইতে হইবে, কিন্তু

নীতিসম্মত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ইহাকে শুষ্ক কঠোর বৈরাগ্যের আবরণে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। নিতান্ত জড়বুদ্ধির লোক না হইলে কেহ 'ম্যাকবেথ' পাঠ করিয়া বলিবে না যে ইহা বিশ্বাসঘাতকতার ইন্ধন যোগায়, বলিবে না যে 'ওথেলো' পারিবারিক অবিশ্বাস প্রচার করে, 'আন্না কারেনিনা' পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে বা 'ভ্যানেটি ফেয়ারে' শুধু বেকীর ঔজ্জ্বল্যেরই খেলা। যে বিশুদ্ধ নৈতিক আদর্শের দিকে প্লেটোর লক্ষ্য তাহা বিদেহী আত্মার মত ; এই পৃথিবীতে ইহার আবাস নয়। যে জগত হইতে পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে সেখানেই ইহা পক্ষ বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতে পারে। ইহা প্লেটোর ত্রুটি। কিন্তু সব ত্রুটি মানিয়া লইয়াও যখন আমরা ভাবিয়া দেখি তখন আদর্শ রূপায়ণের জন্য যে অপরিসীম আগ্রহ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা শ্রদ্ধায় নতজানু না হইয়া পারি না। 'লস' পুস্তকে এথেন্সের নবাগত ব্যক্তিটি অধীর আগ্রহে বলিয়া উঠিয়াছিল "আমি একটু বেশী উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কারণ আমি অসৎ লোক সহ্য করিতে পারি না ; প্রিয় ক্লেইনিয়াস, আমি কেন এমন হইলাম তাহা তোমাকে বলিব। দুষ্ট লোকেরা যুক্তিতর্কের চাতুর্য দেখাইয়া যেমন খুসী চলিবে, দেবতা সম্বন্ধে ইচ্ছামত কল্পনা করিয়া যেমন ইচ্ছা কাজ করিয়া যাইবে ইহা আমি কিছুতেই হইতে দিব না। এসব ব্যাপারে আমার আবেগ বড় তীব্র তাই খুব তীক্ষ্ণভাবেই আমি কথা বলিয়াছি।"[৩৫]

পৌরাণিকী কথা (Myths) :—কবিদের উপর প্লেটোর আক্রমণ আমরা দেখিয়াছি, এবারে কবির ভূমিকায় প্লেটোকে আমরা দেখিব। প্লেটোর কবিরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিখ্যাত উপমা ও কাহিনী গুলিতে। সকল দার্শনিকই নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করিতে গিয়া কোন না কোন সময়ে বুঝিতে পারিয়াছেন ভাষার দৈন্য, বুঝিয়াছেন উচ্চতম চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা পাওয়া যায় না। প্লেটোর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যেখানে তাঁহার ভাষা হার মানিয়াছে সেখানে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন। রিপাবলিকে উল্লিখিত গুহার কাহিনীটি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক। প্লেটো বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে 'আইডিয়ার' বা সার্বিকের জগতই সত্য এবং ইহার তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজগত নিম্নস্তরের। একজন সাধারণ মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ অপেক্ষা সত্য আর কিছু নাই, তাহাকে কি করিয়া বুঝান যায় তাহার ধারণা ভুল? একটি রূপকের সাহায্যে প্লেটো কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধরা যাক একটি গুহার একটি দিক খোলা আর একটি লোক ঐ উন্মুক্ত পথটিকে পিছনে রাখিয়া ভিতরে বসিয়া আছে ; ফলে যেসব লোকজন গুহার বাহিরে

চলাফেরা করিতেছে তাহাদের ছায়া শুধু সে গুহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে, ছায়া যাহার সেই লোকদের সে দেখিতে পায় না। যতক্ষণ একটি লোক শুধু ছায়া দেখে প্রকৃত বস্তু যে কখন দেখে না, সে ঐ ছায়াগুলিকেই সত্য বলিয়া মনে করিবে। ঐ লোকটিও তাহাই মনে করিয়াছে। এখন ঐ লোকটিকে যদি গুহার বাহিরে আনিয়া প্রকৃত বস্তুগুলির সামনে দাঁড় করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে প্রকৃত বস্তুর সত্যতায়ই সন্দেহ করিয়া বসিবে কারণ তাহার সত্যের জগত ত শুধু ছায়া নিয়া গঠিত। পৃথিবীর সাধারণ লোকের অবস্থাও ঐ গুহার লোকটির মত। সাধারণ লোকে ত শুধু তাহাই দেখে যাহা তাহার ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকেই সে সত্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু সার্বিকের সত্য জগত তাহার বুদ্ধির বাহিরে থাকিয়া যায়। গুহার লোকটির কাছে ছায়ার যে মূল্য সাধারণ লোকের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরও তাহাই। তত্ত্ববিদ্যার সূক্ষ্ম সব কথা এখানে ছবির মত পরিষ্কার ও বুদ্ধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে।[৩৬]

পরলোক তত্ত্ব (Eschatology) :—মানবাত্মার অমরতা সম্বন্ধে গ্রীকদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রেতলোক (Hades) বলিতে তাহারা বুঝিত এমন একটি স্থান যেখানে মৃত্যুর পরে প্রেতগুলি ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রেতলোকের কল্পনার ভিতরে স্বর্গ বা নরকের কোন নৈতিক তাৎপর্য স্বয়ং সক্রেটিসও পুরাপুরি বুঝিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্লেটোর চেতনা ছিল এ বিষয়ে খুবই জাগ্রত। অপর কোন ইউরোপীয় দার্শনিক আত্মার অমরতা প্রমাণ করিবার জন্য এত অধিক সংখ্যক যুক্তির অবতারণা করেন নাই। ইহাদের সবকয়টি সমান গ্রহণীয় না হইলেও সবই যে বেশ মনোরম তাহাতে সন্দেহ নাই। অমরতার প্রসঙ্গটি তাঁহার মেনো (Meno), ফিডো (Phaedo), রিপাবলিক (Republic), সিম্পোজিয়াম (Symposium), লস (Laws) প্রভৃতি রচনার মধ্যে বারবার দেখা দিয়াছে। প্লেটো জানিতেন আত্মার অমরতা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাসটিকে একটি রূপকে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। রিপাবলিকে আর এর অনুভূতির (The Vision of Er)[৩৭] বর্ণনা আছে। সেখানে আমরা পাই মৃত্যুর পরে আর এর ভ্রমণের কাহিনী এবং পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগের পর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের কথা। এই সব জন্মান্তরের মধ্য দিয়া একই আত্মার একটি যোগসূত্র রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আত্মাকে বিস্মৃতির নদীর (river of unmindfulness) জল পান করিতে হয়। তাই পূর্বজন্মের সব স্মৃতি সে হারাইয়া ফেলে।

নীতিবাদী হিসাবে প্লেটো কবির কল্পনার মূল্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু

তিনি নিজেই আবার কল্পনার সাহায্য নিয়া ইহাকে স্বীকৃতি দিয়া গিয়াছেন। কবির দৃষ্টি দার্শনিকের মতই গভীর কিন্তু কবি যুক্তিতর্কের ভার হইতে মুক্ত। তাই তিনি ব্যঞ্জনাময় রূপকের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা পান।

প্লেটোর রচনাবলীর মধ্যে এমন অনেক কথাই আছে যাহা ভারতীয় মনকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। কথিত আছে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ব্রাহ্মণ ঋষি গ্রীস পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তবে কি প্লেটো এই সব তত্ত্বকথার জন্য ভারতের কাছে ঋণী? অথবা তিনি কি পিথাগোরাসের কাছে ঐ সব পাইয়াছিলেন? পিথাগোরাস জন্মান্তরবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন, আর এই তত্ত্বটির মাধ্যমে আমরা পাই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের একটি যোগসূত্রের ইঙ্গিত। শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসমূহের জন্য ভারতের কাছে ঋণী—এ কথা ভাবিলে ভারত গর্ববোধ করিতে পারে, তবে কথাটি সত্য কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একপুরুষ পূর্বে ডাঃ আরউইক (Dr Urwick) তাঁহার 'মেসেজ অফ প্লেটো' (Message of Plato) বা প্লেটোর বাণী নামক পুস্তকে বেশ প্রশংসনীয় আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রিপাবলিকের অনেক শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের জন্যই প্লেটো ভারতের কাছে ঋণী। প্লেটোর মনোবিদ্যায় মনের তিনটি দিকের উল্লেখ আছে—চিন্তা বা বুদ্ধির দিক (reason), তেজ বা বলের দিক (Spritied part), সংবেদন ও অনুভবের দিক (Appetitive part)। ইহাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এর সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতীয় চিন্তায় 'ত্রিগুণ' কথাটির সঙ্গে যে আধ্যাত্মিক ভাব জড়িত প্লেটোর কথায় তাহা নাই। অবশ্য প্লেটো তাঁহার মনোবিদ্যার বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই নৈতিক গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক আরউকের পথ অনুসরণ করিয়া এই সব সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক অনুমানই করা যাইতে পারে কিন্তু তবুও প্লেটোর উপর ভারতের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়াই যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোকের মনে একই রকম চিন্তা উদিত হইতে প্রায়ই দেখা যায়। বর্তমানকালে বেতার ও বিজ্ঞানের ফলে পৃথিবী যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে, দেশগুলির দূরত্ব দূর হইয়াছে, তবুও ত আজকাল বিজ্ঞানের জগতে প্রায়ই দেখা যায় একই রকম বৈজ্ঞানিক চিন্তা একইকালে বিভিন্ন লোকের মনে উদিত হইতেছে। প্রাচীনকালে গরুর গাড়ীর যুগে এরূপ হওয়া অনেকে বেশী স্বাভাবিক ছিল—কারণ তখন মানুষের চিন্তা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইত অতি মন্থর গতিতে। ভারতে বা ইরাণের প্রভাব প্লেটোর উপর পড়িয়াছিল একথা মানিয়া নিলেও প্লেটোর সমস্ত রচণাবলীর মধ্যে যে তাঁহার একটি নিজস্ব গ্রীক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আমাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। তত্ত্বালোচনা প্লেটোর বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব-বিদ্যার মূলে ছিল আমাদের এই জীবন। তিনি তত্ত্বালোচনার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিতেন কারণ তাঁহার মতে ইহা ভিন্ন দেশের অভিভাবকদের শিক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তত্ত্ববিদ্যাই মানুষকে আদর্শ অভিভাবকরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। দার্শনিকের ভূমিকা শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। প্লেটোর সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। যখন তিনি বুঝিলেন কাজটি কত শক্ত তখন তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ও দীর্ঘতম সাধনায় রচনা করিলেন 'লস' (Laws) নামক গ্রন্থ। ইহাতে রাষ্ট্রের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা 'রিপাবলিকে' বর্ণিত রাষ্ট্রের মত সর্বাঙ্গসুন্দর নয় বটে কিন্তু ইহা কার্যোপযোগী ও মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম। একজন খাঁটি গ্রীকের মত প্লেটো এই জীবনটিকেই যথাসম্ভব সার্থক ও সুন্দর করিতে চাহিয়াছিলেন।

উপনিষদের ঋষিদের লক্ষ্য কিন্তু এরূপ ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল মোক্ষ—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন হইতে মুক্তি। পার্থিব জীবনই বড় কথা নয়, পরম আদর্শ ত নয়ই। এ জীবন মহত্তর কোন লক্ষ্যে পৌঁছিবার সোপান মাত্র। উপনিষদের ঋষিগণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কাজে তেমন উৎসাহ বোধ করিতেন না। এই মূলগত পার্থক্য হইতেই বুঝা যায় যে শেষ পর্যন্ত গ্রীক প্লেটো গ্রীক ও ভারতীয় ঋষি ভারতীয়। নব্য-প্লেটোবাদের সঙ্গে ভারতীয় মর্মকথার নৈকট্য কিছুটা বেশী কিন্তু নব্য-প্লেটোবাদ (No-Platonism) প্লেটোবাদ নয়। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করেন গ্রীক দর্শনের গৌরবের যুগ এরিষ্টটলের দেহাবসানের সাথেই অস্তমিত হয় এবং তাহার পরই সুরু হয় গ্রীক দর্শনের ক্রমিক অবলুপ্তি, আর এই অবলুপ্তিরই শেষ পর্যায়ে আমরা পাই নব্য-প্লেটোবাদ।

৩। এরিষ্টটল : ৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ

যে ভাবসম্পদ সক্রেটিসের ভিতরে ছিল বীজাকারে তাহাই প্লেটোর প্রতিভার স্পর্শে বর্ধিত হইয়া উঠিল একটি দার্শনিক মতবাদে। ঠিক তেমনি আবার প্লেটোর মতবাদে যাহা কিছু নিহিত ছিল সে সব পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল এরিষ্টটলের পূর্ণাঙ্গ দর্শনে। যতকিছু বিষয় এরিষ্টটলের জানা ছিল বা পরবর্তীকালে মানুষ জানিতে পারিয়াছে তাহার সব বিষয়ের উপরই এরিষ্টটল একখানা করিয়া বই রাখিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর কল্পনা শক্তি আমাদের অভিভূত করে। এরিষ্টটলের অদ্ভুত পরিশ্রম আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রতিভা

আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করিয়া দেয়। "যাহারা জানেন তাহাদের পিতা" (the father of them that knows) এই বিশেষণটি দান্তে দিয়াছিলেন এরিষ্টটল সম্বন্ধে। সত্যই এই বিশেষণটি এরিষ্টটল সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমন আর কাহারও সম্বন্ধে নয়। তাঁহার মত বহুমুখী প্রতিভা নিয়া এ পৃথিবীতে আর কেহ আজ পর্যন্ত আসেন নাই।

প্লেটোর বিভিন্ন কথোপকথনের প্রত্যেকটিই যদিও কোন একটি বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়া রচিত তবুও তাঁহার আলোচনাগুলি সব অবিন্যস্ত ও বিভিন্ন লেখায় ছড়ান। ফলে যদি কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে প্লেটোর মতামত কেহ জানিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ খান পাঁচছয় বই ঘাটিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এরিষ্টটলের পদ্ধতি অন্য রকম। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়া পৃথক পৃথক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলে তাঁহার মতামত একটু নীরস হইলেও বেশ স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। তাঁহার আলোচনার পদ্ধতিটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোন বিষয়ের উপর লিখিতে গেলে তিনি ঐ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বগামী পণ্ডিতদের মতামত সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেন, তাহার পর সেগুলির বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিতেন এবং শেষে নিজের বক্তব্যটি অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করিতেন। প্লেটোর প্রতিভার বর্ণাঢ্য দীপ্তি তাঁহার মধ্যে আমরা দেখি না কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে যে জ্ঞানটুকু আমরা পাই তাহার মধ্যে অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতার স্থান নাই। প্লেটোর মৌলিকতা ছিল মানবিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আর এরিষ্টটলের মৌলিকতা ছিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায়। প্রকৃতপক্ষে সকল বিজ্ঞানেরই মূলে এরিষ্টটল। শুধু তাহার রচনাগুলির নামোল্লেখ করিয়া গেলেই বুঝা যাইবে কি কঠিন পরিশ্রম তিনি করিতেন আর তাঁহার জ্ঞানের পরিধিও ছিল কত বিস্তৃত। তাঁহার রচিত 'অরগ্যানন' (organan) পরবর্তীকালে ইউরোপের সকল তর্কশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ। এই 'অরগ্যানন' ত বটেই তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত 'মেটাফিজিকস' বা তত্ত্ববিদ্যা, 'এথিক্স' বা নীতিশাস্ত্র, 'ইকনমিক্স' বা অর্থশাস্ত্র, 'পলিটিক্স' বা রাষ্ট্রনীতি, 'রেটরিক' বা অলঙ্কার শাস্ত্র এবং 'পোয়েটিক্স' বা কাব্যনীতি বর্তমানকালেও প্রাণবান গ্রন্থ, এবং এখনও লক্ষ লক্ষ লোক এই সব পাঠ করে। ইহার উপরে তাঁহার রচনাবলীর এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। তবে এগুলির মূল্য প্রধানতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবেই: 'ফিজিকস' বা পদার্থবিদ্যা, 'অন দি হেভেন্স' বা আকাশ বিষয়ক রচনা, 'অন জেনারেশন এণ্ড করাপশন' বা উৎপত্তি ও ক্ষয়প্রাপ্তি বিষয়ক রচনা, 'অন দি সোল' বা আত্মা সম্বন্ধীয় রচনা, 'সর্ট ফিজিক্যাল ট্রিটিস অন মেমরি' বা স্মৃতি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত রচনা, 'অন ড্রিম্স' বা স্বপ্ন বিষয়ক রচনা, এবং 'অন প্রফেসিয়িং বাই ড্রিমস' বা স্বপ্নের সাহায্যে

ভবিষ্যৎ বাণী বিষয়ক রচনা, 'হিষ্ট্রি অফ এনিম্যালস' বা পশুদের ইতিহাস বিষয়ক রচনা, এবং 'অন দি জেনারেশন অফ এনিম্যালস্' বা পশুদের উৎপত্তি বিষয়ক রচনা।

প্রথমদিকে এরিষ্টটল ছিলেন প্লেটোর ছাত্র। সহপাঠিদের মধ্যে এরিষ্টটলই যে সেরা ছাত্র ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে কল্পনাপ্রবণ গুরুর ভাবাবেগ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণানুরাগী ছাত্রের মনে যে বিরূপভাবের সৃষ্টি করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইহাও সহজে বুঝা যায় যে প্লেটোর রূপময় বর্ণনাকে এরিষ্টটল একটু বেশী রকম আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতেন। তিনি যে প্লেটোর অনেক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহারও মূল কারণ ইহাই। একেই ত প্লেটো সরল বা সহজবোধ্য নয়, তাহার উপর স্বয়ং এরিষ্টটলের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্লেটোর দর্শনকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই প্লেটো ও এরিষ্টটলের মধ্যে বিভেদ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং একাডেমীর পাল্টা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এরিষ্টটল গড়িয়া তুলিলেন লিসিয়াম (Lyceum)। এরিষ্টটলের ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাসের দরুণ তাঁহার স্কুলের একটি নূতন নামের সৃষ্টি হইল। এরিষ্টটল মেসিডনের অধিবাসী বলিয়া মহামতি আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় অশান্ত ও উচ্চাভিলাষী মানুষের মনেও জ্ঞানের প্রতি একটা অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। চিকিৎসক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় এরিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আর সবকিছুই তিনি পাইয়াছিলেন প্লেটোর কাছে। মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্লেটোর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ মতভেদ ছিল না। এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বিজ্ঞান চিরকালই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয় এবং এক যুগের বৈজ্ঞানিক পরবর্তী যুগে বিস্মৃত হইয়া যান। কিন্তু এরিষ্টলকে লোকে এখনও যে ভুলে নাই ইহাতেই বুঝা যায় এরিষ্টটলের ব্যক্তিত্ব ও কাজের মহত্ব কত বেশী। তবে ইহাও সত্য যে অল্প যে কয়জন লোক শুধু বিজ্ঞানের ইতিহাস জানার জন্য উৎসুক তাহারা ভিন্ন এরিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক লেখাগুলি বিশেষ কেহ পড়ে না। তাঁহার আলোচনাপদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণস্বরূপ স্বপ্নের মত একটি বিষয় নিয়া তিনি কিভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্ন চিরকালই রহস্যময়। একমাত্র ফ্রয়েডের প্রতিভাই এই রহস্যজাল ভেদ করিয়া অর্থহীন বিষয় হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে পারিয়াছিল। এরিষ্টটল তাঁহার (De Divinatione Per Sumnum—On Prophesying by Dreams) "স্বপ্নের সাহায্যে ভবিষ্যৎবাণী"-নামক রচনা এইভাবে সুরু করিয়াছিলেন : "ভবিষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায় বা স্বপ্নের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায়—এইরূপ ধারণা আমরা খুব তাচ্ছিল্যভরে উড়াইয়া দিতে পারি না, আবার গভীর

বিশ্বাসের সহিত গ্রহণও করিতে পারি না। সকল মানুষের অন্ততঃপক্ষে বেশীর ভাগ মানুষেরই ধারণা যে স্বপ্নের একটা তাৎপর্য আছে। কাজেই এত লোকের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই ভবিষ্যৎ দর্শনের ব্যাপারে আমাদের মনেও একটা বিশ্বাস প্রবণতা দেখা দেয়। কোন কোন ব্যাপারে স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা জানিতে পারা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। কারণ ইহাতে যুক্তির একটা আভাস দেখা যায়, ইহা হইতে অন্য সকল ক্ষেত্রেও স্বপ্ন সম্বন্ধে লোকের মনে অনুরূপ ধারণা জন্মিতে পারে।"৩৮ যেরকম সাবধান ভঙ্গিতে এই আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা এরিষ্টটলের বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রারম্ভের এই সাবধান ভঙ্গিটি আরও প্রকট হইয়াছে তাহার কিছুটা নেতি মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। কারণ তিনি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, যে সব স্বপ্ন ভবিষ্যতে সফল হয় সেগুলি দৈবাৎ মিলিয়া যাওয়ার ব্যাপার মাত্র। স্বপ্ন বিষয়ে এই ছোট রচনাটির মূল্য এই কারণে নয় যে মূল্যবান কিছু বক্তব্য ইহাতে আছে। ইহার মূল্য শুধু এইটুকুতে যে স্বপ্নের মত দুর্বোধ্য ও রহস্যময় ব্যাপার নিয়াও তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন গবেষণা করিতে দ্বিধা করে নাই। স্বপ্ন সফল হইলে সাধারণতঃ ইহাকে ঈশ্বর প্রেরিত কোন ব্যাপার বলিয়া লোকে মনে করে। কিন্তু এরিষ্টটল এইসব কথা আমল দিতেন না কারণ তাঁহার মতে নিম্ন শ্রেণীর জীবজন্তুও স্বপ্ন দেখে। অবশ্য জীবজন্তু যে স্বপ্ন দেখে এ কথা তিনি কি ভাবে জানিতে পারিলেন তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই। তিনি আবার ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে যে সব লোকের স্বপ্ন অনেক সময়ে বাস্তবে ফলিয়া যায় তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক। কাজেই ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় এসব ঈশ্বর প্রেরিত কিছু নয়। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে "ইহাদের একটি ঈশ্বরীয় দিক আছে। কারণ প্রকৃতি (ইহাদের কারণ স্বরূপ) ঈশ্বর পরিকল্পিত—যদিও প্রকৃতিই ঈশ্বরীয় কিছু নয়।"৩৯

আমরা এই ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে আর তিনটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। এই তিনটি বিষয়ের মধ্য দিয়াই এরিষ্টটলের প্রতিভা ও প্রভাব সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয় তিনটি এই, তর্কশাস্ত্র (Logic), তত্ত্ববিদ্যা (Metephysics) এবং নীতি শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি (Ethics and Politics)।

তর্কশাস্ত্র (Logic)—এরিষ্টটল যে তর্কশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই 'ফরমাল' বা 'ডিডাকটিভ লজিক' বা অবরোহানুমান নামে পরিচিত। এরিষ্টটলের পরে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তর্কশাস্ত্রের যে সৌধ তিনি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এখানে সেখানে সামান্য অদলবদল ভিন্ন বড় রকমের কোন পরিবর্তন আজ পর্যন্তও করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার মহত্বই প্রকাশ পায়। তবে যে বিষয়টি আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় তাহা এই যে এতবড় প্রতিভাবান

ব্যক্তিও ইনডাকটিভ বা আরোহানুমানের প্রশ্ন তেমন গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন নাই। এবং বেকন ও মিলের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবত আরোহানুমানের প্রশ্নটি প্রায় অবহেলিতই রহিয়া গিয়াছিল। এরিষ্টটলীয় ন্যায়ের 'সিলোজিসম' নামক ভঙ্গিটির দরুণ ইহার ভিতরে একটা গোঁড়ামির ভাব আসিয়া গিয়াছিল। এই ন্যায় ভঙ্গিটি মধ্যযুগের ধর্মশাসিত দর্শনের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে বেকন প্রভৃতি দার্শনিকেরা ইহার অতি কঠোর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে মনে হয় এই সব বিরূপ সমালোচনা স্বয়ং এরিষ্টটলের বিরুদ্ধে না করিয়া পরবর্তীযুগের এরিষ্টটল-পন্থীদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বেকনের কষাঘাত সত্ত্বেও এরিষ্টটল আজও উজ্জ্বল। এরিষ্টটল সত্তা ও চিন্তার মৌলিক ধারণাগুলি (Categories) সম্বন্ধে যে আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন তাহা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হইলেও (arrived at empirically) প্রকৃত প্রতিভার পরিচায়ক। দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ, স্থান, কাল, অবস্থা, সর্ত, কর্ম এবং নিষ্ক্রিয়তা এইগুলি সৎ বা অস্তিত্বশীল পদার্থের মৌলিক আকার। কোন বস্তুর বাস্তব গুণাবলী বর্ণনা করা এই সব মৌলিক ধারণার উদ্দেশ্য নয়। কোন বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার সময়ে যে সব কথা মনে রাখা দরকার অর্থাৎ যে যে দিক হইতে বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন হয়, সেই সব দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই সব মৌলিক ধারণার কাজ। বিধেয় সম্বন্ধীয় নিয়ম (doctrine of 'Predicables) এবং অবরোহানুমানের নিয়ম (Syllogism) আজও পৃথিবীর প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত আবশ্যিক বিষয়। এরিষ্টটল তর্কশাস্ত্রকে শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি বিশেষ বিষয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি মনে করিতেন ইহা সকল শাস্ত্রপাঠের ভূমিকা বা প্রস্তুতির ক্ষেত্র। কারণ তর্কশাস্ত্র মূলতঃ পদ্ধতিশাস্ত্র (methodology) ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এবং যে কোন শাস্ত্র পাঠের জন্যই পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োজন। তর্কশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের প্রবেশ পথ।

তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)—এরিষ্টটল তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন তাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন আদি দর্শন (First Plilosophy) বা ধর্মশাস্ত্র (Theology)। পরবর্তীকালে ইহাই তত্ত্ববিদ্যা বা মেটাফিজিক্স নামে অভিহিত হইয়াছে। মেটাফিজিক্স নামটি রোডস্ দেশের এনড্রনিকাস নামক এক ব্যক্তির সৃষ্টি। তিনি এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর একজন অন্যতম প্রথম সম্পাদক। মেটাফিজিক্স শব্দের অর্থ যাহা ফিজিক্সের পরে। উক্ত সম্পাদক ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার পরে এরিষ্টটলের 'আদিদর্শন'খানা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন 'মেটাফিজিক্স' অর্থাৎ ফিজিক্সের পরে। পরবর্তীকালে এই নামটিই রহিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানের কাজ পদার্থ সমূহের মূল অনুসন্ধান করা এবং সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের কাজ জগতের আদি কারণ বা মূল অনুসন্ধান করা। এই অর্থে সর্বোচ্চ বিজ্ঞানই আদি দর্শন। অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের আদিতে ইহার স্থান, কিন্তু পুস্তক প্রকাশ করার সময়ে ইহা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এরিষ্টটল তাঁহার 'আদি পদার্থ' বা 'মূল দ্রব্য'কে (Substance) ঈশ্বর (God) নামে অভিহিত করিতেন। এইজন্য এই 'আদি দর্শন' ধর্মশাস্ত্র (Theology) নামেও পরিচিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রভাবে পরবর্তী যুগে ধর্মশাস্ত্র বা থিওলজি কথাটি খৃষ্ট ধর্মের অনুশাসনাদির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িল। এইভাবে থিওলজি তত্ত্ববিদ্যা বা মেটাফিজিক্স হইতে ভিন্ন একটি বিষয়ে পরিণত হইল।

এরিষ্টটলের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা বিজ্ঞানের দিকে। তাই তিনি ব্যক্তি বা বিশিষ্ট বস্তু লইয়া অনুসন্ধান শুরু করিলেন। কিন্তু প্লেটোর উপযুক্ত শিষ্য ও একজন দার্শনিক হিসাবে তিনি বুঝিলেন ব্যক্তিই সব নয়, ইহার উপরে আরও কিছু আছে। "যদি ব্যক্তি ভিন্ন আর কিছু না থাকে তবে চিন্তার কোন বিষয়বস্তু থাকে না। সেক্ষেত্রে সবই হয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং কোন কিছুর জ্ঞান সম্ভব হইবে না যদি না আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই জ্ঞান নামে অভিহিত করি। তাহা ছাড়া কোন কিছুই অচঞ্চল বা নিত্য হইবে না, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বস্তুই চঞ্চল ও ধ্বংসশীল। কিন্তু যদি নিত্য বা শাশ্বত কোন বস্তুই না থাকে তবে সৃষ্টি প্রক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে না, কারণ যে বস্তু সৃষ্টি হইবে ও যাহা হইতে সৃষ্টি হইবে তাহা নিশ্চয়ই কোন অস্তিত্বশীল পদার্থ হইবে; এবং এই প্রবাহ বা ধারার আদি বস্তুটিও 'হইবে' (have come to be) এরূপ হইতে পারে না। কারণ প্রবাহ বা প্রক্রিয়ার একটি সীমা বা আরম্ভ থাকিবে, এবং যাহা নাই তাহা হইতে অন্য কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারেনা।"[৪০] চতুর্থ খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে (Book IV ch 1) তিনি এই বিষয়টির আলোচনা করিয়া ইহা হইতে যে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব তাহাই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "সত্তাকে বিশুদ্ধ সত্তা হিসাবে এবং যে সব গুণ সত্তার স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে তাহাদের বিচার করিবার জন্য একটি বিজ্ঞান থাকিবে। বিশিষ্ট কোন বিজ্ঞানই ঐ কাজ পারে না কারণ,কোন সাধারণ বিজ্ঞান সত্তাকে শুধু সত্তা হিসাবে বিচার করে না।"[৪১] এই সত্তা আর দ্রব্য (Substance) অভিন্ন, তবে এই 'দ্রব্য' কথাটি এরিষ্টটলের লেখায় বেশ পরিচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে দেখা দেয় নাই। কারণ দ্রব্য কথাটি বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ঐ পদটিকে মূল সত্তা বা আদি সত্তা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টে মনে হইবে এই দ্রব্য বা সত্তা আর প্লেটোর 'আইডিয়া' বা সার্বিক একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু এরিষ্টটল বিশেষ যত্ন

নিয়া তাঁহার নিজমতের সঙ্গে প্লেটোর মতের পার্থক্যটি দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন প্লেটোর আইডিয়া বা সার্বিক এক অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে; এরূপ সত্তা শুধু কাল্পনিক পদার্থ—ইহাই ছিল এরিষ্টটলের সমালোচনা। তিনি জোর দিয়াই বলিতেন জগতের সকল বস্তুই অস্তিত্বশীল, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিপদার্থেরই একটা সার্বিক বা জাতিগত দিক আছে। এই সার্বিক বা জাতি বিভিন্ন ব্যক্তিতেই অবস্থান করে—পৃথক ভাবে কোন অতীন্দ্রিয় জগতে নয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্পর্কটি তিনি এইরূপ দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিয়াছেন। আমরা প্লেটো সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে প্লেটোর শেষদিকের রচনা পারমেনিডিস, থিয়েটিটাস এবং সেফিসটেস প্রভৃতিতে যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহা এরিষ্টটলের নিজের তত্ত্ব হইতে অভিন্ন; প্লেটোর প্রথমদিকের রচনাগুলির কাব্যিক ও অলঙ্কারবহুল ভাষার জন্য তিনি তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন।

এরিষ্টটল যে আইডিয়া বা সার্বিক অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাকেই কিন্তু তিনি মানিয়া নিলেন 'ফরম' (Form) বা 'আকার' এর কল্পনার মধ্যে। প্লেটোর আইডিয়া স্বতন্ত্র সত্তাবান পদার্থ, অতএব উহা হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি 'ফরম' বা 'আকার' নামে একটি ভিন্ন পদ ব্যবহার করিলেন। ব্যক্তির ভিতরে যে জাতি বর্তমান তাহাই যখন 'ফরম' এবং সব জ্ঞানই যখন জাতির জ্ঞান তখন ইহাকে আকার বা ফরমের জ্ঞানও বলা যাইতে পারে। বস্তুর 'এসেনস' বা সারতত্ত্ব হইল বস্তুর ফরম বা আকার। কিন্তু এই আকার বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার জন্য প্রয়োজন 'জড়' বা উপাদান। সুতরাং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য চাই আকার ও উপাদান। উপাদান পরিবর্তনশীল পদার্থ—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। যেমন মানুষের বেলায় বুদ্ধিবৃত্তি (rationality) হইল আকার এবং জীববৃত্তি (animality) উপাদান। আবার সাধারণ জীবের বেলায় 'জীবন' (life) আকার এবং দেহ (body) উপাদান। যাহাকে জড় বা উপাদান বলা হয় তাহা স্বতন্ত্রভাবে একটি সম্ভাবনামাত্র, আকারের সাহায্যে সেই উপাদান বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় এখানে আকার ও উপাদানের একটা দ্বৈতভাব রহিয়াছে। তবে এই দুইএর মিলনে ভিন্ন কোন কিছুই বাস্তব সত্যের রূপ নিতে পারে না। আকারহীন উপাদান বা জড় শুধুই সম্ভাবনা, ইহার পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই। তবে এরিষ্টটল একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্বীকার করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন বিশুদ্ধ আকার—যাহার সঙ্গে উপাদানের কোনরূপ সংশ্রবই নাই—তাহাই 'ঈশ্বর' বা 'ঐশী সত্তা' (Divine Spirit)।

পার্থিব জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই কার্য কারণের সমস্যাটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়াই দেখা দিয়াছে। এরিষ্টটলের মতে কারণ চার প্রকার। প্রত্যেক বস্তুই একটি

উপাদানে গঠিত ; তাই উপাদান কারণ (material cause) ভিন্ন কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যাহা ভিন্ন উপাদান বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না তাহা হইল 'আকার', সুতরাং 'আকারগত কারণ' (formal cause) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আকারকে উপাদানের উপর কার্যকরী করাইবার জন্য কোন একটি কর্তা বা প্রযোজক দরকার এবং ইহাকে নিমিত্ত কারণ (efficient cause) বলা চলে। পরিশেষে পাই 'চরম কারণ' (final cause), কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বস্তুসমূহের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা এই 'চরম কারণের' কাজ। পরবর্তী যুগে এরিষ্টটলপন্থীগণ এই চরম কারণটির উপর অত্যধিক মূল্য আরোপ করিয়াছিলেন, ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। দর্শনের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চরম কারণটি বিশ্ব প্রকৃতির মধ্য দিয়া যে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে তাহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। ইহাই আবার প্লেটো ও এরিষ্টটলের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃত ঐক্য দেখাইয়া দিতেছে। এই হিসাবে ইহার দার্শনিক মূল্য যথেষ্ট।

কার্যকারণ বলিতে বুঝা যায় পরিবর্তন বা গতি। আবার পরিবর্তন বুঝিতে গেলে ধরিয়া নিতে হয় আকার ও উপাদানের নিত্যতা। অনবস্থা এড়াইবার জন্য যেমন গতির কল্পনা প্রয়োজন হয়, তেমনি গতি বা পরিবর্তনের শেষ প্রান্তে আমরা পাই এমন এক পদার্থ যাহা স্থির ও পরিবর্তনহীন, এই স্থির অচঞ্চল শাশ্বত পদার্থটির নাম 'বিশুদ্ধ আকার' অথবা 'ঈশ্বর'। অচঞ্চল শাশ্বত পদার্থ ধরিয়া না নিলে কোন রকম পরিবর্তনের অর্থ বুঝা যায় না—এই যুক্তিটি এরিষ্টটলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলির অন্যতম। তিনি এই শাশ্বত অচঞ্চল পদার্থটির কল্পনাটির সঙ্গে জড়িত করিয়াছিলেন একটি উদ্দেশ্য-সাধনের কল্পনা। এই ভাবে আমরা পাই ঈশ্বরের কল্পনা—যে ঈশ্বর "এক জীবন্ত সত্তা, নিত্য, ও সর্বোত্তম ; নিত্য ও বিরামহীন জীবন ও সৃষ্টির ধারা এই ঈশ্বরেই বর্তমান, কারণ ইহাই ঈশ্বর।"[৩৪২] এরিষ্টটলের কল্পিত ঈশ্বর কোন ব্যক্তি পুরুষ নহেন। কাজেই তাঁহাকে 'থিইষ্ট' বা ঈশ্বরবাদী না বলিয়া বরং 'ডিইষ্ট' বা দ্বৈতবাদী বলা উচিত।

মূলতঃ তত্ত্ববিদ্যার ব্যাপারে প্লেটো ও এরিষ্টটলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই আদর্শবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক, তবে ইহাদের কেহই ঈশ্বরকে একটি পুরুষ রূপে (ঈশ্বরের উপরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া) কল্পনা করেন নাই। উভয়ের মধ্যেই বিশ্বকেই ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিবার (pantheism) একটা প্রবণতা রহিয়া গিয়াছে। প্লেটোর লেখায় যদি বা কিছু অস্পষ্টতা থাকে, এরিষ্টটলের চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি সবই বেশ পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট, এবং তাঁহার রচিত তত্ত্ববিদ্যার গ্রন্থখানা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ বিষয়ের আদর্শ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

নীতিশাস্ত্র (Ethics)—এরিষ্টটলের আদর্শবাদ তাঁহার নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি মানবিক বিষয়ের রচনাগুলির মধ্যে বেশী স্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপ নিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অরগ্যানন বা লজিক গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার নীতি শাস্ত্রের গ্রন্থখানিকেও তিনি এমনভাবে রচনা করিয়া গিয়াছিলেন যে ইহা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া মানবজাতি এই গ্রন্থ হইতে শিখিয়াছে নৈতিক সমস্যাগুলির তাৎপর্য কি এবং কি ভাবেই বা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে এই সব প্রশ্নের সমাধান করা যায়। প্রাচ্য দেশে নৈতিক সমস্যাগুলি এমনভাবে ধর্ম ও নৈতিক সমস্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে এখানে নৈতিক প্রশ্নগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা হয় নাই এবং এই জগত ও এই জীবনেরই একটি বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে নীতিশাস্ত্র নিয়া এখানে কোন পুস্তক রচিত হয় নাই।

এরিষ্টটল প্রণীত নীতিশাস্ত্র সুবিন্যস্ত, তবে প্লেটোর আদর্শেই ইহা রচিত। প্লেটোর প্রাচীন মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী মনের তিনটি দিক স্বীকৃত হইয়াছে: বিচার, তেজ ও তমো-ভাব। এরিষ্টটলও এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এরিষ্টটল প্লেটোর মত সুবিচার (justice) নামক ধর্মের মধ্যেই জ্ঞান, সাহস ও সংযম প্রভৃতি সর্বগুণের সমন্বয় ঘটিয়াছে বলিযা মনে করেন নাই। তিনি জ্ঞানগত ঔৎকর্ষ ও নৈতিক ঔৎকর্ষের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন। সৎজীবন যাপন কবিতে হইলে প্রথমে জানা দরকার সততা বলিতে কি বুঝায়। সততার অর্থ বুঝিবার জন্য শুধু প্রয়োজন হয় বুদ্ধি ও বিচারের, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। বিজ্ঞতা ব্যাপক ধর্ম ইহার মধ্যে "ঘটিয়াছে সমন্বয়—যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বিষয় তাহাদেব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক (প্রমাণ মূলক) জ্ঞান এবং (সাক্ষাৎ অনুভবেব উপর প্রতিষ্ঠিত) বিচাবলব্ধ জ্ঞানেব সমন্বয়",[৪৩] বিজ্ঞান হইল "প্রমাণের সাহায্যে দেখিবার ও বুঝিবার একটা মানসিক অভ্যাস বা প্রচেষ্টা."[৪৪] আর বিজ্ঞজনোচিত বুদ্ধিব সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার সম্পর্কই বেশী। কাজেই "ইহার জন্য প্রয়োজন উভয়বিধ জ্ঞান—সাধারণ সত্যের জ্ঞান এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিশেষ বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এবং এই দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানের মূল্যই বেশী"।[৪৫] তিনি ইহার সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন "ইহা একটি চেষ্টার সাহায্যে অর্জিত মানসিক দক্ষতা যাহা বিচার ও বিবেচনার সাহায্যে সত্য বুঝিতে পারে এবং মানবের মঙ্গল ও অমঙ্গলের ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যে পরিণতি লাভ করে।"[৪৬] সক্রেটিস বলিতেন জ্ঞানই নৈতিক ধর্ম এবং এরিষ্টটলও একথা কিছুটা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান ও নৈতিক ধর্মকে তিনি পুরাপুরি এক করিয়া দেখেন নাই, কারণ আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদের বলিয়া দিতে পারে কি আমাদের করা উচিত কিন্তু আমরা ত ঐ জ্ঞান

অনুসারে কাজ নাও করিতে পারি, এবং কাজেরই ত প্রকৃত নৈতিক মূল্য। এরিষ্টটলের গ্রন্থে আমরা যে নৈতিক গুণাবলীর বিস্তারিত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পাই প্লেটোর লেখায় তাহা পাই না। এরিষ্টটল নৈতিক ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুষম মাত্রাজ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন "ইহা একটি অভ্যাস বা মার্জিত নির্বাচনী ক্ষমতা। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল সংযত মাত্রাজ্ঞান, ইহা পাত্র ও অবস্থা বিচার করিয়া যেটি মধ্যপন্থা তাহা গ্রহণ করে এবং এই বিচারের সময় এইরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে যেরূপ বুদ্ধি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ভিতরে দেখা যায়"।[৪৭] সুতরাং নৈতিক ধর্ম হইল যে কোন রকম আতিশয্য পরিহার করিয়া মধ্য পন্থা গ্রহণ করা। তিনি এই মানদণ্ড সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তবে সংযম (temperance) নামক মৌলিক ধর্মটির বিচার করিতে গিয়া তিনি অসুবিধায় পড়িলেন কারণ এই সূত্রানুযায়ী বিচারে বলা উচিত এই ধর্মটি একদিকে ভোগবিলাসের আতিশয্য ও অপর দিকে ইহার বিপরীত কঠোরতার আতিশয্য—এই দুই এর ভিতরে মধ্যপন্থা। কিন্তু খাঁটি গ্রীকের ন্যায় জীবনের সুন্দর দিকের প্রতি তাঁহার ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ ; তাই ভোগের বিপরীত শুষ্ক কঠোর বৈরাগ্যের কল্পনা তাঁহার মনে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। তিনি এমন লোকের কথা ভাবিতে পারিতেন না যে লোক "একটি জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে না",[৪৮] এবং সহজভাবেই বলিয়া দিলেন"এমন জীবের বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন কারণ এরূপ কেহ কোথাও নাই"।[৪৮] তেমনি আবার সত্যের আদর্শটিকেও তিনি মধ্যপন্থারূপে বিচার করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িলেন। কারণ যাহা সত্য একমাত্র তাহাই সত্য। এবং সত্য হইতে কোনরূপ বিচ্যুতিকে সত্যের আতিশয্য বা ন্যূনতা বলা চলে না। তবে তিনি বেশ বুদ্ধি খেলাইয়া ইহারও দুইদিকের দুইটি আতিশয্য বাহির করিলেন—একটি গর্ব অপরটি শ্লেষ বা বিদ্রূপ। গর্ব আর বিদ্রূপবাক্যের সহিত সক্রেটিস তখনকার লোকদের যথেষ্ট পরিচয় ঘটাইয়াছিলেন। সুবিচার (justice) সম্বন্ধে আলোচনাকালেও বড় রকমের অসুবিধা দেখা দিল। রোমকগণ বিচারের সংজ্ঞা যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতরে কোন শিথিলতার স্থান ছিল না। সুবিচারের স্বরূপই এমন যে ইহার মধ্যে ন্যূনতা বা আতিশয্যের কোন স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু এরিষ্টটল ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন ইহা মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া চলে। কাজেই সুবিচারের সংজ্ঞাকেও ঐ মধ্য পথের কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া দেখান দরকার। কাজেই তিনি ইহাকে অবিচার করা ও অবিচার সহ করার মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। কিন্তু যে অর্থে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম তিনি ব্যাখ্যা করিতেন সে অর্থে এই দুইটিকে ব্যবহার করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে অবিচার সহ্য করা যে কোন লোকের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা কখনই পাপ বা লজ্জার বিষয় হইতে পারে না। আইন সম্মত বিচার ও নৈতিক বিচারের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা অবশ্য খুবই সঙ্গত। কিন্তু যে বিরাট পটভূমিকায় যে বিস্তৃত ও গভীরতা নিয়া প্লেটো রাষ্ট্রীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে বিচারের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন এরিষ্টটলের আলোচনায় আমরা তাহা পাই না।

উন্নতমনা মানবের (high minded man) যে-চিত্রটি তিনি দিয়াছেন তাহাতেই আমরা পাই এরিষ্টটলের নীতি শাস্ত্রের পরিণতি। তিনি মনে করিতেন উন্নতমন "নৈতিক ধর্মসমূহের মুকুটমণি, ইহাই অপর গুণগুলিকে মহত্ত্ব প্রদান করে এবং ঐসকল গুণ ভিন্ন ইহা থাকে না।"[৪৯] এই গুণটি অহমিকা ও মানসিক ক্ষুদ্রতার মধ্যবর্তী। উন্নত মনের লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ করা অপেক্ষা এইরূপ একটি আদর্শ চরিত্রের বাস্তবরূপ অঙ্কন করাই এরিষ্টল সহজসাধ্য বলিয়া মনে করেন। ইহার ভিতরে আমরা পাই একটি খাঁটি গ্রীক চরিত্র—তাহার দুর্বলতাটুকুও এখানে বেশ স্পষ্ট। এইরূপ ব্যক্তি সব দিক দিয়াই খুব ভাল হইবেন সন্দেহ নাই। সকল রকম নৈতিক গুণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞতাও তাহার থাকিবে, অর্থবান হওয়া কিছু দোষনীয় বলিয়া তিনি মনে করিবেন না, এবং আচার-ব্যবহারে কোন রকম বক্র বা কুটিল ভাব তাহার থাকিবে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এইরূপ ব্যক্তি আবার তাহার অধীনস্থ লোকদের হীন চক্ষে দেখিবেন, লোক জনের প্রতি তাহার থাকিবে যেন একটু করুণা বা তাচ্ছিল্যের ভাব, কাহারও কাছ হইতে যেন তাহার গ্রহণ করার মত কিছুই নাই। কাহারও দ্বারা তিনি কখনও উপকৃত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া তিনি অপছন্দ করিবেন, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা কোন নৈতিক গুণ নয়। বড়লোকদের সঙ্গে তিনি আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার করিবেন। মধ্য-বিত্তদের প্রতি তিনি ভদ্র হইবেন এবং সর্বদাই নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট থাকিবেন। জনসাধারণের নিন্দাস্তুতির তিনি পরোয়া করিবেন না এবং ইহাও আশা করা যাইতে পারে তিনি বাজে গল্পগুজব বা পরচর্চায় লিপ্ত হইবেন না। এসব ভিন্ন ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং পরিমিত ভাষণ প্রভৃতি যে সব ব্যাপারের মধ্যে নৈতিক ভাল-মন্দের কোন প্রশ্ন নাই—ইহাদেরও এরিষ্টটল তাঁহার আদর্শ চরিত্রের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

এরিষ্টটল তাঁহার আদর্শ চরিত্রের যে কল্পনাটি এখানে দিয়াছেন তাহাতে পাই সকল গুণের সমাবেশ এবং বিশেষতঃ সকল মানসিক প্রবৃত্তিগুলির সুষম বিকাশ। ইহা সুন্দর সন্দেহ নাই কিন্তু এখানেই আবার গ্রীক নৈতিক আদর্শের দুর্বলতাও বেশ পরিস্ফুট। এখানে ঔদ্ধত্য ও অহমিকাকেও নৈতিক গুণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। বিনয়ের

অভাবটিও বড় প্রকট। কিন্তু দয়া প্রেম প্রভৃতি উদার গুণাবলীর কোন উল্লেখ এখানে নাই। তবে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও বন্ধুত্বের যথেষ্ট মূল্য দিয়াছেন এবং এই গুণগুলি থাকিলে পরোপকার প্রবৃত্তির অভাবজনিত দোষ কিছুটা দূর হইতে পারে। একজন খৃষ্টান সাধু বা হিন্দু ঋষির সঙ্গে তাঁহার আদর্শ মানবের পার্থক্য অত্যন্তই স্পষ্ট। নিজের মূল্য সম্বন্ধে একটা সচেতন ভাব বড় বেশী উগ্ররূপে এখানে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই রকম আত্মম্ভরিতা প্রকৃতি উন্নত মনের লক্ষণ নয়, উহার ব্যঙ্গাত্মক প্রতিধ্বনি মাত্র—ভাবটি যেন কিছুটা নাটকের ভীমের মত।

সুখপ্রাপ্তি এরিষ্টটলের নীতিশাস্ত্রের প্রধান কথা। "কিন্তু সুখ যদি ধর্মচর্চা হয় তবে সঙ্গত ভাবেই মনে করা যাইতে পারে যে সুখ শ্রেষ্ঠধর্ম চর্চার ফল এবং ইহাই আমাদের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর চর্চার ফল"।[৫০] সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি এই প্রকার সুখবাদ ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর সুখবাদের সঙ্গে এক করিয়া দেখা চলে না। সুখ কথাটিকে 'উপযোগবাদী' দার্শনিকেরা (Utilitarion) এমন হীন অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে, মনে হয় এরিষ্টটলের মতবাদকে সুখবাদ না বলিয়া 'কল্যাণবাদ'(Eudaemonism) আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।

এরিষ্টটল তাঁহার নীতিশাস্ত্রের ভূমিকাতেই যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার সতর্কতা বা সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জন করিবার বৈশিষ্ট্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, নীতি শাস্ত্রে আমরা "মাত্র ততটুকু নিশ্চয়াত্মক কথাই" পাইতে পারি যাহা এইরূপ একটি বিষয়ের পক্ষে সম্ভব, "কারণ একই প্রকার নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্ত সকল রকম যুক্তিবিচার হইতে লাভ করা যায় না যেমন সকল রকম শিল্পকার্যে একই ধরণের নিপুণতা আশা করা যায় না।"[৫১] তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি যে আদর্শ কাম্য বলিয়া মনে করেন তাহা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোয্য। তাই তাঁহার মতে নীতিশাস্ত্র "একপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক বিচার।"[৫২] এই দিক দিয়া তিনি প্লেটোর রিপাবলিকের সঙ্গে একমত। তবে আলোচনা পদ্ধতিটি তাঁহার প্লেটোর মত নয়। তিনি তাঁহার স্বকীয় ভঙ্গিতে ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের প্রশ্নগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করিয়াছেন। প্রথম দিকে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা বিচার করিয়া শেষের দিকে "তাহা হইলে এইবার আরম্ভ করা যাক" এইরূপ ভূমিকা করিয়া রাষ্ট্রীয় আলোচনায় প্রবেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া গ্রীক চিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—তাহা এই যে ব্যক্তি জীবনের মঙ্গল রাষ্ট্রের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। সুতরাং নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রনীতিরই একটি অংশ—ইহা রাষ্ট্রনীতির ভূমিকা স্বরূপ।

রাষ্ট্রনীতি (Politics)—এরিষ্টটল প্রণীত 'রাষ্ট্রনীতি' নামক গ্রন্থখানা তাঁহার

অন্যান্য রচনারই মত তাঁহার গভীর দৃষ্টি ও অসাধারণ পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। কথিত আছে তাঁহার শাসনতন্ত্র (Constitutions) সম্বন্ধীয় পুস্তকে ১৫০ রকমের শাসনতন্ত্রের আলোচনা ছিল ; কিন্তু সব এখন পাওয়া যায় না, শুধু এথেন্সের শাসনতন্ত্রের যে অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে—তাহারই ভিতরে তাঁহার আলোচনা এখনও কিছুটা বাঁচিয়া আছে। তখনকার দিনে গ্রীসের সমাজ জীবনে রাজনীতির প্রভাব যে খুবই বেশী ছিল তাহার প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজনীতি মূলতঃ প্লেটোরই অনুরূপ, তবে প্লেটোর রিপাবলিকে যে গভীর আদর্শবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে তিনি একমত হইবেন ইহা আশা করা যায় না। এরিষ্টটলের রাষ্ট্রনীতির বইখানাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে আছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় (Books I to III), ইহার আলোচনা প্রধাণতঃ সামাজিক সমস্যাসমূহ নিয়া ; দ্বিতীয় ভাগে আছে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় (Boos IV to VI), ইহাতে আছে সেকালের রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে বাস্তবঘেষা আলোচনা ; শেষ ভাগে আছে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় (Books VII and VIII), এখানে আমরা পাই রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ সম্বন্ধীয় আলোচনা। তাঁহার আলোচনা ছিল ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী এবং এই দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে প্লেটোর অমিল ছিল।· কিন্তু এই পার্থক্যটুকু বাদ দিলে বলা চলে প্লেটোর সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁহার মতের ঐক্যই ছিল বেশী—এই ঐক্য এত বেশী যে এখানে অল্প স্থানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এরিষ্টটলের মধ্যেও দেখা যায় প্লেটোরই মত গণতন্ত্রে অবিশ্বাস, সেই রকমই রাষ্ট্রের ছয়টি শ্রেণী বিভাগ, অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনে (Aristrocacy) সেই রকম আস্থা—এমন কি একজন প্রবল ও মহৎ রাজার শাসনের দিকে সেই একরকম পক্ষপাত, দাসত্ব প্রথার সমর্থন এবং নগর রাষ্ট্রের প্রতি সেই একই রকম অনুরাগ। গুরু বা শিষ্য কেহই কালের লিখন বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে নগর রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কারণ নগর রাষ্ট্রের ভিতরেই রহিয়াছে কতকগুলি কঠিন বাধা। এই প্রসঙ্গে সেবাইন (Sabine) বেশ সুন্দর বলিয়াছেন : "কি অর্থনৈতিক কি রাজনৈতিক কোন দিকেই ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না যদি না ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার নীতি গ্রহণ করে, আর যদি ঐরূপ নীতি গ্রহণ করে তবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং এরিষ্টটল নিজেই সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রাষ্ট্রের গৌরবময় মুকুট বলিয়া মনে করিতেন।"[৫৩] এরিষ্টটলের রাষ্ট্রনীতির মূল্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় তিনি রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন .বটে তবে তিনি মনে করিতেন রাষ্ট্রের

মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাধীনতা সার্থক রূপ পাইবে, বাধা পাইবে না। এরিষ্টটলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান রাষ্ট্রের জীবনের উপরে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাবের স্বীকৃতি। বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের উত্থান ও পতন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাস সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমনই ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে এই দিকটিতে প্লেটো ও এরিষ্টটলের মৌলিকতা যে কত গভীর তাহা আমরা আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। রাষ্ট্রের শ্রেণীভাগ করার ব্যাপারে এরিষ্টটল প্লেটোকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Royalty and Tyranny), অভিজাত-তন্ত্র ও গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র (Aristrocacy and Oligarchy), সজ্জন শাসনতন্ত্র ও জনতা শাসনতন্ত্র (Polity and Democray)—এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্ষেত্রে প্রথমটি সুশাসন ও দ্বিতীয়টি কুশাসনের উদাহরণ। রাজতন্ত্রের মূল্য তিনি স্বীকার করিতেন কিন্তু তিনি মনে করিতেন বাস্তবক্ষেত্রে সজ্জনশাসনতন্ত্রই (Polity) সর্বোত্তম; কারণ ইহাতে জনগণের ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়। অপরদিকে নিছক গণতন্ত্র বা জনতাতন্ত্র তাঁহার মতে অরাজকতা বা শাসনহীন অবস্থারই প্রায় পর্যায়ভুক্ত।

গ্রীসের চিন্তায় ও জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব ও আধিপত্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রোমান ক্যাথলিক চার্চ খৃষ্টীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি আর গ্রীক সংস্কৃতির প্রতিনিধি হইল রাষ্ট্র। ইউরোপীয় জীবনে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহাতে চার্চেরই ঘটিয়াছিল পরাজয়। আধুনিক ইউরোপে নগর রাষ্ট্র বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্রে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে এবং বর্তমান যুগে এই রাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রভুত্বই সবচেয়ে বেশী। আজ যে প্রাচ্যও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতাকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতেছে, প্রাচ্যও যে জীবনের সবরকম সমস্যার সমাধান চাহিতেছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইহাতে সূচিত হয় গ্রীক আদর্শের জয়। মনে হয় গ্রীস এখন দাবী জানাইয়া বলিতে পারে যে গ্রীস আজ পৃথিবীকে যেভাবে জয় করিয়া নিয়াছে আলেকজাণ্ডারের বাহিনী তাহা কখনও পারে নাই।

কাব্য-সমালোচনা (Poetics)—যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাহা যে এরিষ্টটলের লেখায় পাওয়া যায় না এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু তাঁহার নিজের লেখায় মাধুর্য না থাকিলেও সাহিত্যের রস কি করিয়া আস্বাদ করিতে হয় তাহা তিনিই শিখাইয়াছেন। উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের রস গ্রহণ করার জন্য যে জাতীয় সমালোচনার দৃষ্টি দরকার আধুনিক ইউরোপ যদি তাহা শিখিয়া থাকে তবে তাহার গৌরবটুকু এরিষ্ট-টলেরই প্রাপ্য। তাঁহার অলঙ্কার (Rhetoric) ও কাব্যনীতি (Poetics) সম্বন্ধীয় রচনা দুইটিতে সমালোচনার মূল নীতিগুলি আমরা বিধিবদ্ধ দেখিতে পাই। যুগে যুগে সমালোচনার ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে। রোমানটিক ও রিয়ালিষ্ট অর্থাৎ ভাবপ্রধান ও

বাস্তবধর্মী সাহিত্য-সমালোচনা যে পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এরিষ্টটলের সূত্রাবলম্বনে সম্ভব হয় না। কিন্তু সমালোচকেরা যে সব নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা সবই এরিষ্টটলের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আধুনিক সমালোচনার জগতেও এরিষ্টটলের ব্যক্তিত্ব ও মহিমা সমুজ্জল। মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গী আজ আর নাই, সে যুগে লোকেরা এরিষ্টটলকে যে ভাবে পূজা করিত আজ আর তাহা সম্ভব না ঠিকই, কিন্তু এ কথা কোনরকমেই অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান ইউরোপ আজ যাহা এরিষ্টটলকে বাদ দিয়া তাহা কখনই সম্ভব হইত না।

উপসংহার ঃ—সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টল—এই তিনে মিলিয়া যে গুরুশিষ্য পরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছিলেন জগতে তাহার তুলনা মিলে না। ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ! কি ভাবে ইহাদের মহত্ত্বের পরিমাপ করা যাইবে ? এইসব প্রশ্নের কোন পরিষ্কার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেহ উত্তর দিলে বুঝিতে হইবে তিনি ব্যক্তিগত রুচি বা আকর্ষণের জন্যই তাহা করিয়াছেন। সক্রেটিস চরিত্রের বিরাটত্ব, প্লেটোর চিন্তা ও কল্পনার বিপুল প্রসার, এরিষ্টটলের নিখুঁত দক্ষতা ও পিপিলিকার মত শ্রম করিবার ক্ষমতা—ইহাদের পারস্পরিক তুলনা ও মূল্য নিরূপণ কিভাবে সম্ভব ? ইহাদেব মধ্যে যেমন সাদৃশ্য ছিল তেমনি প্রভেদও যথেষ্টই ছিল। সক্রেটিস ছিলেন উৎস ও উদ্‌গাতা। সক্রেটিসের ঐতিহ্যকে প্লেটো দিয়াছিলেন প্রাণের প্রবাহ, দর্শনকে রূপায়িত করিয়াছিলেন জীবন্ত শক্তিতে, আর এরিষ্টল—তিনি নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এক জ্ঞানের বিশ্বকোষ। হয়ত তাঁহারা প্রাচ্যের কাছ হইতে কিছু শিখিযাছিলেন, আবার প্রাচ্যও তাহাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। প্রাচ্যের কাছ হইতে পাশ্চাত্যের যদি শিখিবার থাকে তবে শিখিবে শান্তিলাভের উপায়,—প্রাচ্যের যে আদর্শ পরা শান্তি—যে শান্তি বুদ্ধি মনের বহু উর্দ্ধে—সেই শান্তিলাভের পথ। আবার পাশ্চাত্যের কাছ হইতে প্রাচ্য শিখিবে জীবনকে গ্রহণ করিবার, জীবনের রস আস্বাদন করিবার আগ্রহ। এই আগ্রহ ছিল বলিয়াই গ্রীসের লোক হইতে পারিয়াছিল সুন্দরের অতবড় একাগ্র সাধক, হইতে পারিয়াছিল স্বাধীনতার ঐরূপ বীর সৈনিক, হইতে পারিয়াছিল জ্ঞানের অতবড় পণ্ডিত। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরকালই আছে, রাষ্ট্র সব সময়ই বল প্রয়োগ করিয়াছে, প্রজাদের ইচ্ছাকে নতি স্বীকার করাইয়াছে উদ্ধত শাসকদের ইচ্ছার কাছে। প্লেটো ও এরিষ্টটল যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেন এখনও তাহা সার্থক হয় নাই ;—তাঁহাদেব কল্পনার রাষ্ট্র শুধু জীবনের প্রয়োজনে নয়, শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের জন্য ; তাঁহাদেব আদর্শ স্বাধীনতা রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যে ; তাঁহাদের আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে মানুষ করা এবং ইহা করিতে

পারিলেই হইবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এ আদর্শ এখনও অপেক্ষা করিয়া আছে ভবিষ্যতে রূপায়ণের আশায়। এই আদর্শের জন্ত, এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্ত মিলিতে হইবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে, একযোগে করিতে হইবে সাধনা। জ্ঞানের জগতে আদর্শের রাজ্যে, মানুষকে সুখী করিবার ব্রতে পূর্বও নাই পশ্চিমও নাই—এখানে সবই এক।

দ্রষ্টব্য

১। দি ডায়লগস অফ প্লেটো : এপলজি দ্বিঃ খণ্ড, পৃঃ ১১১, জাওয়েটকৃত অনুবাদ।

			পৃঃ
২।	ঐ মেনো,	দ্বিঃ খঃ	৬৩
৩।	ঐ সিম্পোজিযাম্,	প্রঃ খঃ	৫৯০
৪।	ঐ চারমিডিস্	ঐ	১১
৫।	ঐ সিম্পোজিয়াম্	ঐ	৫৫৩
৬।	ঐ সিম্পোজিয়াম্	ঐ	৫৮৪
৭।	ঐ এপলজি	দ্বিঃ খঃ	১২৯
৮।	ঐ ফিড্রাস	প্রঃ খঃ	৪৩৫
৯।	ঐ এপলজি	দ্বিঃ খঃ	১২৫
১০।	ঐ সিম্পোজিয়াম্	প্রঃ খঃ	৫৯১
১১।	ঐ এপলজি	দ্বিঃ খঃ	১২৩-৪
১২।	ঐ ফিড্রাস	প্রঃ খঃ	৪৭৩
১৩।	ঐ ফিড্রাস	প্রঃ খঃ	৪৮৯
১৪।	ঐ সেন্ট ম্যাথিউ, VI, ৩৩, (এপলজি তুলনীয় দ্বিঃ খঃ ১২৩-৪)		
১৫।	জাওয়েটকৃত অনুবাদ : এপলজি	দ্বিঃ খঃ	১৩৫
১৬।	ঐ টিমিয়াস	তৃঃ খঃ	৪৭২
১৭।	ঐ রিপাবলিক	ঐ	৩০৬
১৮।	ঐ ঐ	ঐ	২০৫
১৯।	ঐ ঐ	ঐ	২০৯-১০

			পৃঃ
২০।	ঐ প্রোটাগরাস্	প্রঃ খঃ	১৩৫
২১।	ঐ লস্	পঃ খঃ	২২
২২।	ঐ রিপাবলিক	তৃঃ খঃ	২৪০
২৩।	ঐ ঐ	ঐ	২৪১-৪
২৪।	ঐ ঐ	ঐ	১৭০-১
২৫।	ঐ লস্	পঃ খঃ	৮৯
২৬।	এনেকডোটস্ অফ লর্ড নেলসন, পেঃ পারসন্‌স্ কৃত		
২৭।	জাওয়েট কৃত অনুবাদ : লস,	পঃ খঃ	১৫৪-৫
২৮।	ঐ ঐ	ঐ	১৫৫
২৯।	জাওয়েট কৃত অনুবাদ : রিপাবলিক,	তৃঃ খঃ	৯৮
৩০।	ঐ লইসিস্	প্রঃ খঃ	৬২
৩১।	ঐ লস্	পঃ খঃ	১৯০
৩২।	ঐ রিপাবলিক	তৃঃ খঃ	১১৩
৩৩।	ঐ ঐ	ঐ	১১২
৩৪।	ঐ ঐ	ঐ	২৪৫
৩৫।	ঐ লস্	পঃ খঃ	২৯৪-৫
৩৬।	ঐ রিপাবলিক	তৃঃ খঃ	২১৪ ও পরবর্তী পৃঃ
৩৭।	ঐ ঐ	ঐ	৩৩০ ও পরবর্তী পৃঃ
৩৮।	দি বেসিক ওয়ার্কস অফ এরিষ্টটল, সম্পাদক রিচার্ড ম্যক্‌কিওন,		৬২৬
৩৯।	ঐ		৬২৮
৪০।	এরিষ্টটল কৃত মেটাফিজিক্স। অনুবাদ : জে, এ, স্মিথ ও ডবলিউ ডি রস্; বুক iii, অধ্যায় iv,		৯৯৯ বি।
৪১।	ঐ বুক iv (†)		১০০৩ এ।
৪২।	ঐ বুক xii		১০৭২ বি।
৪৩।	এরিষ্টটলকৃত নিকোমেকিয়াণ এথিকস। অনুবাদ : এফ, এইচ, পিটারস্		১৯১
৪৪।	ঐ		১৮৫
৪৫।	ঐ		১৯২
৪৬।	ঐ		১৮৭
৪৭।	ঐ		৪৬-৭

গ্রন্থ-বিবরণী :

জেনোফন : মেমোরেবিলিয়া।

ডাযলগ্স অফ প্লেটো : জাওয়েট কৃত অনুবাদ।

এ. ই. টেলর : প্লেটো।

রিটার : এসেন্স্ অফ প্লেটোস ফিলোসফি।

গ্রীকফিলসফি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক :—

জেলার। বার্নেট। বেন্। স্টেস্। ভিন্ডেলব্যাণ্ড।

ষ্টিউয়ার্ট : প্লেটোস্ ডকট্রিন অফ আইডিয়াস্।

এরিষ্টটল : গ্রন্থাবলী।

রস ডবলিউ ডি : এরিষ্টটল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইহুদীয় দর্শন

বাইবেলের যুগ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ইহুদীয় ধর্মের মূল রূপরেখা স্পষ্টরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীয় দর্শনের ইতিহাস আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় ও গ্রীক্ দর্শনের ন্যায় ইহা বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে জন্মলাভ করিয়া প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই; ইহা ইহুদীধর্মের মতগুলিকে ইহুদীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে যে সকল দার্শনিক মতবাদের আধিপত্য ছিল তাহাদের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইতে উদ্ভূত। দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবের অন্তর্নিহিত যে উৎকণ্ঠা তাহা ইহাতে বর্তমান। ইসলামীয় এবং খৃষ্টীয় দর্শনের ন্যায় ইহার প্রধান সমস্যাও সংক্ষেপে একটি সূত্রের আকারে বলা যায় "বিশ্বাস এবং বিচারবুদ্ধি।"

ইহুদীয় দর্শন পালেস্তাইন ভূখণ্ডে জাত বস্তু হিসাবে নয় পরন্তু যে সকল ইহুদী সম্প্রদায় পালেস্তাইন হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং বিকাশলাভ করিয়াছিল। যে সকল ইহুদী আলেকজান্দ্রিয়ার সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বাস করিত তাহারা প্রথমে হেলেনীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিয়াছিল এবং সেই যুগে ও সেই পরিবেশে যে স্টোয়িক—প্লেটোনীয় দর্শনের আধিপত্য ছিল তাহার সহিত তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইহুদী চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সাধনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত এমন একটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহাতে বাইবেলের চিন্তাসমূহ ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে কতকগুলি স্টোয়িক ও প্লেটোনীয় চিন্তাধারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক ফাইলোর (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০-৪০) মনের প্রবণতা রহস্যবাদের অভিমুখী ছিল বলিয়া স্টোয়িক মহাদার্শনিক পসিডোনিয়াস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে যে নব-প্লেটোনীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যে দর্শনে সেই যুগের অন্তরতম চিন্তাসমূহ প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় তিনি উহার প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তেই এই সাহিত্য পূর্ণপরিণতি লাভ করে। ফাইলো পসিডোনিয়াস অপেক্ষাও অধিক দৃঢ়তার সহিত এবং বহু পরিমাণে

অধিক সাফল্যের সহিত দর্শনের এই ধারণাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে ইহুদীয় উপাদান ছিল এবং যাহার জন্য তিনি জগতের একত্বের ব্যাখ্যার জন্য একটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাতীত অথচ সর্ববস্তুতে অনুস্যূত তত্ত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সাফল্যের প্রধান কারণ ইহা বলিলে যুক্তিসঙ্গত হইবে। বাইবেলে ঈশ্বরের যে ধারণা আছে তাহাতে ঐশঃশক্তির বিশ্বাতীত ভাব এবং বিশ্বানুস্যূত ভাব—এই উভয়ের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেইজন্য ফাইলো প্লেটো যেভাবে ঈশ্বরকে "সকল বস্তুর পরিমাপক" মঙ্গলের আদর্শ রূপে চিন্তা করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই আবার স্টোইকরা যেভাবে প্রজ্ঞাকে সর্বানুস্যূত ঐশসত্তা বলিয়া চিন্তা করিয়াছেন তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্লেটোর ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাতীত এবং স্টোইক্ ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বানুস্যূত। পসিডোনিয়াস প্লেটোনীয় সামান্য (Idea)-গুলিকে স্টোইক সম্মত প্রজ্ঞার সহিত একীভূত করিয়া এক মনোমুগ্ধকর অদ্বৈতবাদ গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ বিভিন্ন স্তর-বিশিষ্ট একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তা; ইহা ক্রমান্বয়ে প্রস্তর, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানব, অসুর এবং দেবতা এই সকল বিভিন্ন স্তরের সত্তার ভিতর দিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই অখৃষ্টীয় এবং সর্বাত্মবাদী ছিল। পসিডোনিয়াস যে বিশ্বের কল্পনা করিয়াছিলেন ফাইলো তাহাকে যিনি বিশ্বাতীত অথচ সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া আছেন সেই ঈশ্বরস্বরূপ চরম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্লেটোর মতে যে সামান্য-গুলির অনুকরণে জগৎ গঠিত তাহাদের অস্তিত্ব স্রষ্টার মনের বাহিরে নাই (যেমন প্লেটোর টাইমিয়াসে বর্ণিত আছে)। কিংবা একটি গতিশীল জগৎপ্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহও নয় কিন্তু ঈশ্বর বা সৃষ্টিক্রিয়ায় রত ঐশ মনের ধারণাসমূহ ফাইলো এইরূপ মনে করিতেন। ইহাও বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে ফাইলোর মতানুসারে প্রজ্ঞা ঈশ্বর নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। এই দৃশ্যমান জগতের বিন্যাস বা ঈশ্বরের মনে সৃষ্ট ইহার রেখাচিত্র প্রজ্ঞাতে প্রতিফলিত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত। ফাইলো ঈশ্বরের ধারণাকে সর্বপ্রকার সর্বেশ্বরবাদ হইতে মুক্ত রাখিতে উৎসুক এবং সেইজন্য তিনি একান্তভাবে নেতিবাচক ঈশ্বরতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি ইহা সম্ভবতঃ প্লেটো তাঁহার পারমিনাইডিস নামক গ্রন্থের যে অনুচ্ছেদে এক সত্তাকে নামহীন এবং বাক্য, জ্ঞান, প্রত্যক্ষ কিংবা মতের অগোচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাইবেলে যে বলা হইয়াছে ঈশ্বর তাঁহার নাম "আমি যাহা আমি তাহাই" এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন ফাইলো তাহার অর্থ করিয়াছিলেন "হওয়াই আমার স্বভাব, আমি বাক্যের অগোচর" এবং সেইভাবেই এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করিয়া

এই মতবাদকে বিধিসঙ্গত ইহুদীয় মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফাইলো এই শ্লোকটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিবার পর ইহা যাজকীয় তত্ত্ববিদ্যার একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতিবাক্য হইয়া রহিয়াছে।

প্লেটো ও এরিষ্টটলের সহিত একমত হইয়া কিন্তু বাইবেলের মতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করিয়া ফাইলো তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন জীবনকেই প্রকৃত ধর্মজীবন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্লেটোর বিখ্যাত পর্বত-গুহার রূপকের প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যাহারা 'সামান্য' সম্বন্ধে চিন্তা কবিতে অক্ষম তাহারা চিরস্থায়ী রাত্রিতে বাস করে এবং যাহারা দিবালোকে বাস করে তাহাদেব কথা অবিশ্বাস করে। 'সিম্পোজিয়াম্' এবং 'ফিড্রাস'-এ দার্শনিক অনুরাগের যে সকল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অনুকরণে তিনি প্রকৃত দার্শনিক কিভাবে মঙ্গলের আদর্শের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ কবিয়া থাকেন এবং "ইহার অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া" তাঁহার মন কি ভাবে সমস্ত সদ্‌গুণের মূল আদর্শের প্রতি ধাবিত হয় এবং "আত্মহারা হইয়া ইহাব স্বর্গীষ সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে" তাহা বর্ণনা কারিয়াছেন। কিন্তু প্লেটোর মতে এই অনুরাগ সেই 'এক'-এর চরম সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়, কিন্তু ফাইলোর মতে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, কারণ মনুষ্যের আত্মা সৃষ্ট বস্তুসমূহেব শ্রেণীভুক্ত বলিযা ঈশ্বরকে "কেবলমাত্র ভালবাসিতেই পাবে, কিন্তু দেখিতে পায না।" সক্রেটিসেব উপদেশ "আপনাকে জান", স্টোইক্‌দের মতে যাহার অর্থ "যে নিজেকে জানে সে ঈশ্বরকেও জানে," ইহার ব্যাখ্যা ফাইলো যে ভাবে করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাব চিন্তায রহস্যবাদের অভিমুখী প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগকে 'কেবলমাত্র আত্মায় অবস্থান কবিতে' শিখিতে হইবে, আমাদের মনের শান্তির মধ্যে ঈশ্বরকে পাইবার জন্য আমাদিগকে দেহ, ইন্দ্রিয় এমন কি বাক্য হইতেও নিবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং ধর্ম ও প্রকৃত দর্শন এক। সত্যদ্রষ্টার অনুপ্রেরণা সত্যের জন্য দার্শনিকদের যে অনুসন্ধিৎসা তাহারই পরিণতি এবং ইহাকেই 'উপর হইতে আলোক'-এর রহস্যময় অনুভূতির সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মতকে ফাইলো বিশদভাবে তাঁহার আলোকধাবা সম্বন্ধে রহস্যময় মতবাদ বিবৃত করিয়াছেন। এই আলোকধারা ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত হয় এবং আত্মার চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয়। এই মতের মূল গ্রীস ও মিশরের পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ফাইলোর অনুপ্রেণার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও এই ধারণার মূল পাওয়া যায়। তিনি তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই অনুভূতির বর্ণনা কবিয়াছেন।

ফাইলো ইহুদীয় এবং স্টোইক-প্লেটোনীয় দর্শনের যে সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে বাইবেলেব ধর্মের মূলাংশে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাইবেলে যাহাকে প্রত্যাদেশ

বলা হয় তাহা কোন কালাতীত সত্তা অথবা কোন তাত্ত্বিক সত্যের সম্বন্ধে নহে। ইহা কাল, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, ক্রিয়া এবং অভিপ্রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইস্রায়েলের ভবিষ্যদ্‌বক্তাগণ, অর্থাৎ বাইবেলের প্রত্যাদেশের প্রবক্তাগণ দার্শনিক নহেন, তাঁহারা ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা। "প্রভু ভগবান্ তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ ভবিষ্যদ্‌বক্তাদেব নিকট প্রকাশ 'না' করিয়া কিছু করেন না।" এই ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের মতে ইতিহাস একই বস্তুর অনন্তকালব্যাপী পুনরাবির্ভাব নয়, এক মহাযুগের পৌনঃপুনিক-পুনরাবর্তন নয়, কিন্তু ভগবানের আত্মপ্রকাশ এবং তাহার প্রতি মানবের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র। ভগবানের শাশ্বত সত্তার যে অধিকারী স্বরূপ চিরকালের জন্য মানুষের অগোচর সেই রূপে নয় পরন্তু কালিক পরিস্থিতিসমূহ এবং ভগবানের প্রেম এবং বিচারের প্রকাশ রূপে তাহারা যে অর্থ বহন করে তাহাদের মধ্য দিয়া ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা, পরিবর্তনশীল মুহূর্তেরই স্বভাবত: এমন একটি তাৎপর্য আছে যাহা ভগবানকে নির্দেশ করে। এই ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের চিন্তা এবং গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তার মধ্যে প্রগাঢ় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, গ্রীস ও ভারতবর্ষে কালকে কালাতীত সত্তায বিলুপ্ত বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং ধার্মিক ব্যক্তির মন কালপ্রবাহের অতীত যে অবিকারী শাশ্বত সত্তা বর্তমান তাহার অন্বেষণেই নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। বাইবেলের ধর্মে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা অপেক্ষা নীতিসম্মত কার্যের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মানুষ ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে না, কিন্তু ভগবানের সৎস্বভাব, প্রেম, করুণা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করিয়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা করিতে পারে। ইস্রায়েলের ভবিষ্যদ্‌বক্তাগণ মানুষ যে ভগবান্‌কে জানিবে ইহা জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের জ্ঞান কেবলমাত্র তত্ত্বচিন্তা হইতে নয় পরন্তু আচরণ হইতেই উদ্ভূত এইভাবে ব্যাখ্যা করিযাছিলেন। ফাইলোর দর্শনে বাইবেলের ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন জীবনের আদর্শের মধ্যে বিলীন হইয়া গিযাছে।

ফাইলো দার্শনিক চিন্তাকে যে নূতন রূপ দিয়াছিলেন তাহার প্রভাব মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত লক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা ইহুদীয় ধর্ম, খৃষ্টধর্ম এবং ইস্‌লাম ধর্ম সকলের উপরেই পড়িয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের ক্লেমেন্ট এবং অরিগেন এবং যে ডামাস্কাসের জন্ ইস্‌লামিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মের মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের নিকট হইতে যত্ন সহকারের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই ফাইলোর লেখাগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। এইচ গয়ো (H. Guyot) এবং এফ্‌. হাইনেমান্ (F. Heinemann) দেখাইয়াছেন যে ফাইলোর আরও একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে

তাঁহার ঈশ্বর-প্রজ্ঞা-জগৎ এই ত্রিত্ববাদমূলক মত প্লোটিনাসের পরিণত নব-প্লেটোনীয় মতবাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিল এবং এই নব-প্লেটোনীয় মতবাদ মধ্যযুগের ইসলামীয় এবং ইহুদীয় দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ফাইলো হইতে সাড্যা (Saadya) পর্যন্ত নয়শতাব্দী ধরিয়া ইহুদীদের দার্শনিক চিন্তা স্তব্ধ হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের সৃজনীশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পালেষ্টাইন ও ব্যাবিলোনিয়ার ইহুদী-ধর্মযাজকদের বিদ্যালয়গুলি ইহুদীদের ধর্ম-সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে এবং উহার বিস্তার সাধন করিতে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া দর্শনের প্রতি তাহাদের আগ্রহ মোটেই ছিল না অথবা অত্যল্পই ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে যেটুকু তত্ত্বচিন্তার চেষ্টা ছিল তাহা (গ.) নষ্টিক দর্শনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তালমুদায় এবং মিদ্রাশীয় লেখাগুলিতে, হেকালত রহস্যবাদের ভগবৎ স্তোত্রগুলির আবেগপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহে এবং যাহাতে আত্মার বিভিন্ন স্বর্গভূমিতে উত্থানের বিবরণ আছে এমন কতকগুলি গ্রন্থে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শেফার ইয়াজিরা (সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ)ই এই সময়ের একমাত্র অর্ধ-দার্শনিক পুস্তক। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত এই পুস্তক হেলেনীয় যুগের শেষভাগের অথবা সম্ভবতঃ নব-প্লেটোনীয় রহস্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ তত্ত্বের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। লিও বেক্ মনে করেন যে ইহা হয়ত প্রোক্লাসের "ভগবৎ-তত্ত্বের মূল উপাদানসমূহ' নামক গ্রন্থের ইহুদীয় সংস্করণ।

মধ্যযুগের যে ইহুদীয় দর্শন ইহুদীয় তত্ত্বচিন্তার সর্বাপেক্ষা সতেজ ও সুসংবদ্ধরূপ তাহার উদ্ভব পরিবেশের প্রভাবের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরববাসীয় খলিফাদের শাসনাধীনে প্রাচীন বিদ্যা ও দর্শনের যে বিস্ময়কর পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এবং যাহার ফলে ইসলাম হেলেনীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল তাহা মুসলমান শাসনের অধীনে ইহুদী জাতিদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহুদীরা সংস্কৃতির সকলক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিল এবং শীঘ্রই দার্শনিক চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। এই দার্শনিক চিন্তা বহুল পরিমাণে ইসলামীয় সম্প্রদায়গুলির নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছিল কিন্তু উহার নিজস্ব মৌলিকতা ও প্রভাবেরও অভাব ছিল না।

মধ্যযুগীয় ইহুদীয় দর্শনের প্রাথমিক অবস্থাকে কালামের যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ, এই সময়ে ঐ নামের ইসলামীয় চিন্তাধারার আদর্শেই ইহুদীয় চিন্তা রূপায়িত হইয়াছিল। এ, জে, বেনসিক দেখাইয়াছেন ডামাস্কাসবাসী জনের প্রভাবের ফলেই আরবীয় কালামের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল এবং ফাইলোর চিন্তার বহুলাংশ এইভাবে বক্র পথে ইসলামীয় এবং ইহুদীয় জগতে পৌঁছাইয়াছিল। ইহুদীয় কালাম দর্শনের শ্রেষ্ঠ

প্রতিনিধি ছিলেন সাড্যা (খৃঃ ৮৮২-৯৪২)। তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সুরা (ব্যাবিলন)স্থিত ইহুদীয় ধর্মযাজকদের বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ছিলেন। তাঁহার 'মতবাদ এবং বিশ্বাস' সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বিষয়গুলি যেভাবে বিন্যস্ত ও আলোচিত হইয়াছে তাঁহাতে বুঝা যায় যে কালাম দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যে উদারনৈতিক মুতাজিলা সম্প্রদায় প্রধানতঃ ঈশ্বরের ঐক্য ও ন্যায়পরায়ণতা যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল তাহার প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে। সাড্যা কালামীয় যুক্তিবাদের সহিত ইহুদীয় ঐতিহ্যের পরিণত বিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দর্শন কেবলমাত্র মুতাজিলা সম্প্রদায়গুলির চিন্তার ইহুদীয় আকারমাত্র নহে। ইহার দৃষ্টি আরও ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি তাঁহার যুক্তির সমর্থনে অবাধে প্লেটো, এরিষ্টটল, স্টোয়িকদের এবং নব-প্লেটোনীয় চিন্তা হইতে উপাদান লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র গ্রীক দর্শনের সহিত নয়, পরন্তু (গ)নষ্টিক দর্শন, ভারতীয় দর্শন এবং খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের সহিতও পরিচিত ছিলেন তাহা বুঝা যায়। তিনি মনে করিতেন যে মানুষের বিচারবুদ্ধির অবিরাম এবং সুসংহত চেষ্টার ফলে দার্শনিক সত্য লাভ করা যায়। অপর পক্ষে ভগবানের প্রত্যাদেশ সেই সকল সত্যই যুক্তিদ্বারা সমর্থন না করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করে। তাহা হইলে প্রত্যাদেশের আদৌ প্রয়োজন কি ? তিনি এই প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন যে, মানুষেরা সত্যলাভের চেষ্টা করিতে অবহেলা করিতে পারে এবং প্রত্যাদেশের সাহায্য না পাইলে গন্তব্যস্থলে নাও পৌঁছাইতে পারে। তাহাদের বুদ্ধি ও আত্মাকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল সত্য অত্যাবশ্যক শাস্ত্রসমূহ তাহাদিগকে সেইগুলি শিক্ষা দেয়। সাড্যা বিশ্বাস করেন যে বিচারবুদ্ধি এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে পূর্ব হইতেই সঙ্গতি আছে। যে ভগবান এই দুইয়েরই স্রষ্টা তাঁহাতে কখনও স্ব-বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদীয় প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিলেও সাড্যা জোরের সহিত বলিয়াছেন যে ধর্ম যাহাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে বলে আমাদের বিচার বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে সাড্যার যুক্তিগুলি এরিষ্টটলের পদার্থ বিজ্ঞানের মূল সূত্রসমূহ হইতে নিঃসৃত, কিন্তু তিনি বাইবেলে শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই এই যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীয় দর্শন প্লেটো কর্তৃক সমর্থিত জড়জগৎ এবং সামান্য-জগতের দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিতে কেবলমাত্র আদিম জড়বস্তুর রূপান্তরকরণই বুঝিত। ইহুদীয় মতবাদ যে প্লেটোর মতের অথবা জগৎ যে অনাদি এবং অ-সৃষ্ট এরিষ্টটলের এই মতের বিরোধী ইহা সাড্যা

স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুপরিসর জ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ একটি পরিচ্ছেদে তাঁহার সময়ে জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল তিনি সে-গুলির সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গীর দার্শনিক তাৎপর্যের উপর জোর দিয়াছিলেন। ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধেও তাঁহার যে মতবাদ তাহাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্লেটো যে নেতিমূলক ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং যাহা খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের অভ্যুত্থানের ফলে গুরুত্বলাভ করিয়াছিল ফাইলো সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইস্‌লামীয় এবং ইহুদীয় কালাম নেতিমূলক ঈশ্বরতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ তাঁহার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ বা ব্যক্তি বলিয়া যাহাতে মনে করা না যাইতে পারে। সাড্যা এই মত পোষণ করিতেন যে প্রাণ শক্তি এবং জ্ঞান এই তিনটি গুণ স্রষ্ট' ঈশ্বরের ধারণার মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানুষের ভাষার অক্ষমতার জন্য একটি মাত্র শব্দদ্বারা ঐ গুণগুলিকে প্রকাশ করা যায় না।

বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ও ধর্মমত সম্পর্কে ইহুদীয় মতবাদ বিবৃত করিয়া সাড্যা মধ্য যুগের ইহুদীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হইযাছিলেন। প্রাচীনপন্থী ইহুদীধর্মের দুর্গস্বরূপ ব্যাবিলনিযার ধর্মযাজকদের বিদ্যালযগুলিতে পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। স্বরা বিদ্যালয়ের আচার্য সামুয়েল বেন হফনি (মৃঃ ১০১৩ খৃঃ) এবং পুম্বেদিতা বিদ্যালযের আচার্য হায গায়োঁ সাড্যার যুক্তিমূলক ঈশ্বরতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহুদীয় কালাম পূর্বদেশীয় ইহুদীদের—বিশেষ করিয়া যাহারা ধর্মযাজকদের ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিত সেই কারাইট সম্প্রদায়ের মধ্যে—পথ প্রদর্শক হইযা রহিল। জোসেফ আলবাসির এবং তাঁহার শিষ্য যশুয়া বেন যেহুদা (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) মুতাজিলীয় আদর্শকে সাড্যা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। এমন কি পরে চতুর্দশ শতাব্দীতেও কারাইটীয় কালাম পূর্বভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত আরন বেন ইলাইজার যে গ্রন্থ এজ হায়িম (জীবন বৃক্ষ) পরবর্তী ইহুদীয দর্শনে নবপ্লেটোনীয এবং এরিষ্টটেলীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে কালামের সতেজ যুক্তিবাদকে সমর্থন করিয়াছিল তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যাবিলনের প্রখ্যাত বিদ্যালয়গুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে পূর্বাঞ্চলের ইহুদীসমাজ ইহুদীজীবনের উপর প্রাধান্য হারাইয়াছিল এবং ইহুদীজীবনের ভারকেন্দ্র পশ্চিম দিকে বিশেষ করিয়া স্পেনে চলিয়া গিয়াছিল। পালেষ্টাইনের বাহিরে অবস্থিত ইহুদীজাতি এইস্থানে চার শতাব্দীরও অধিক ধরিয়া তাহাদের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অবস্থা ভোগ করিয়াছিল। এইস্থানেই মধ্যযুগের ইহুদীয় দর্শনের সর্বাপেক্ষা উন্নতি

হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ অবনতিও ঘটিয়াছিল। যে যুগে মুস্ প্রকৃতির কালাম যুক্তিবাদ প্রচলিত ছিল, সেই যুগের পরিবর্তে প্রথমতঃ প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা এবং রহস্যবাদসম্পর্কিত উন্মাদনার যুগ আসিল। যে নব-প্লেটোনীয় দর্শনের প্রভাব সেই সময়ে এরিষ্টটলের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা হইতেই এই যুগের মূল সুরটি আসিয়াছিল। রেনান্ দেখাইয়াছেন যে, এরিষ্টটলের বিদ্যালয় লুপ্ত হইয়া যাইবার পর নব-প্লেটোনীয় অধ্যাপকেরা যে কেবলমাত্র এরিষ্টটলকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা নয়, পরন্তু তাঁহার দর্শনকে নব-প্লেটোনীয় আকার দান করিয়া ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত যে সকল ভাষ্য বহু ইস্‌লামীয় এবং ইহুদীয় দার্শনিক পাঠ করিতেন সেইগুলি মধ্যযুগে বহুপ্রচলিত নব-প্লেটোনীয় ছাঁচের এরিষ্টটেলীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাছাড়া, অপেক্ষাকৃত অকৃত্রিম নব-প্লেটোনীয় মতবাদ। কয়েকটি কৃত্রিম গ্রন্থ যেমন, আরিষ্টটলের তথাকথিত ঈশ্বরতত্ত্ব, প্লোটিনাসের এনিড্‌সের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ খণ্ডের সঙ্কলন এবং প্রোক্লাসের একটি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতাংশ-বিশিষ্ট লাইবার্ দে কসিস্ নামে একটি গ্রন্থ এই সকলের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। লাইবার দে কসিস্ গ্রন্থখানি ইহুদীদের নিকট বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিল এবং অন্ততঃ চারবার হিব্রুভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। আল্‌কিন্দি, আল্‌ফারাবি এবং আভিসেন্না এরিষ্টটেলীয় এবং নব-প্লেটোনীয় দর্শনের উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া চিত্তাকর্ষক মতবাদ গঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই সকল মতবাদের প্রভাব খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহুদী দার্শনিকদের মধ্যে অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এরিষ্টটেলীয় মতবাদ অপেক্ষা নব-প্লেটোনীয় রহস্যবাদমূলক মনোভাবেরই প্রাধান্য অধিক ছিল। সেই সময়ে (গ.) নষ্টিক এবং হারমীয় দার্শনিকদের প্রভাবও বহুল পরিমাণে সক্রিয় ছিল।

নবপ্লেটোনীয় দর্শন সমগ্র সত্তাকে সর্বোচ্চ বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন বস্তুতে পর্যন্ত প্রকাশিত একটি সর্বব্যাপী সুসংহত সমষ্টি বলিয়া উপস্থাপিত করিত বলিয়াই উহা এত চিত্তাকর্ষক ছিল। এই মতবাদে জড়কে পূর্বের ন্যায় ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বস্তু বলিয়া মনে করা হইত না কিন্তু ইহাকে জাগতিক সোপানের সর্বনিম্ন ধাপ বলিয়া মনে করা হইত। এই বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট জগতে কোন বস্তুর মূল্য এবং সার্থকতা তাহা যে স্তরে অবস্থিত তাহার উপর নির্ভর করে। সব কিছুই 'এক' হইতে নির্গত হইয়াছে এবং সব কিছুকেই সেই আদিম উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মানুষ জড়ের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া আধ্যাত্মিক জগতের আনন্দ লাভ করিবে ইহাই তাহার ভাগ্য। প্লেটোর নিকট হইতে প্রাপ্ত মতাবাদপুষ্ট পূর্ববর্তীকালের ফাইলোর মতবাদ অপেক্ষা তত্ত্ব-

চিন্তামূলক এই আদর্শের সহিতই ইহুদী চিন্তাধারার অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইহা সত্তার রহস্যকে কেবলমাত্র বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নয়, পরন্তু আধুনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া বলা যায় যে 'অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও দেখিতে শিক্ষা দিয়াছিল এবং মানুষকে তাহার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে হইলে তাহার জীবনের আন্তর সত্তাকে নবরূপ দিতে হইবে, ইহা বলিয়াছিল, ইহুদী নব-প্লেটোনীয়গণ রহস্যবাদীদের আদর্শের সহিত ইহুদীয় শিক্ষার যাহা সার সেই ধর্মাচরণকে মিলাইতে সক্ষম হইযাছিলেন। তাঁহাদের দর্শনে তত্ত্বচিন্তা এবং কর্ম এক অবিভাজ্য সমগ্র বস্তু। কর্মের মধ্য দিয়াই জীব তাহার চরিত্রের নিকৃষ্ট উপাদানগুলি পরিহার করিযা ঈশ্বরচিন্তা হইতে উদ্ভূত শাশ্বত আনন্দরূপ যে লক্ষ্যস্থল তাহা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্মবিহিত কর্মই মানুষের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য অপরিহার্য অধ্যাত্মসাধনার রূপ ধারণ করে।

কবি এবং দার্শনিক সলোমন ইব্‌ন্ গাবিরল (আঃ খৃঃ ১০২০—১০৫০, সম্ভবতঃ ১০৭০)-এর লেখা এই নব-প্লেটোনীয় দর্শনের গভীর প্রতিধ্বনিস্বরূপ। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের নাম 'মেকব হাযিম্' (জীবনের উৎস)। ডমিনিকাস্ গান্‌ডিসালিনাস্ টলেডো নগরীর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ইহুদী আবেন্‌ডীথের সাহচর্যে 'ফন্‌স ভিটী' নাম দিয়া ইহার যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমেই ইহা লাটিন জগতে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। গাবিরলের নাম বিকৃত হইয়া আভিসব্রন অথবা আভিসেব্রল আকার ধারণ করায় মধ্যযুগের ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর যাজকীয় দর্শনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। গাবিরলের দর্শন দুইটি কারণে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ ইহা ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত দ্বৈতভাব হইতে জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে যে দ্বৈতভাব দেখিতে পাওযা যায তাহা নিঃসৃত করিযা এরিষ্টটলোক্ত উপাদান ও আকারের প্রভেদ ঈশ্বরতত্ত্বের ঠিক কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিযাছে। এই সাহসিক পন্থাবলম্বন সম্বন্ধে গাবিরলের মনে অস্বস্তি থাকিলেও তিনি যে যুক্তি দ্বারা ইহা করিতে বাধ্য হইযাছিলেন তাহা হইতেছে এই যে উপাদান এবং আকার এই দুইযেরই আদিম উৎস অবশ্যই চরম সত্তায থাকিবে। দ্বিতীযতঃ ঈশ্বরের মধ্যে যাহা উপাদানকে রূপায়িত করে তাহাকে তিনি ঐশ্বরীয ইচ্ছাশক্তি বলিযা বর্ণনা করিযাছেন। প্লোটিনাসের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের স্বাধীনতা এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্যের অবশ্যম্ভাবিতা এই দুইকেই বুঝায। ঈশ্বর স্বাধীন বলিলে ইহা বুঝায না যে তিনি যাহা করিযাছেন তাহা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে পারিতেন। ডীন ইঙ্গ-এর ভাষায "চরমতত্ত্ব অবশ্যম্ভাবিতার অধীন নয় বলিয়াই ইহার প্রত্যেক ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।" চরমস্বাধীনতা এবং চরম অবশ্যম্ভাবিতা একই। বাইবেলে

যে স্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণা আছে ইচ্ছা এবং শক্তিই তাঁহার স্বরূপ, তিনি তাঁহার বাক্য এবং আদেশ দ্বারা জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ধারণার সহিত এই ধারণার কোন মিল আছে বলা যায় না। সেই জন্য গাবিরল নব-প্লেটোনীয়দের নিয়ন্ত্রণবাদের মধ্যে বাইবেলে প্রদত্ত ঈশ্বরীয় ইচ্ছার ধারণা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি এই ঈশ্বরীয় ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মধ্যে যাহা বস্তুকে আকার প্রদান করে তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ এবং যাহা হইতে বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে পৃথক করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁহার স্বরূপের অজ্ঞাত প্রকৃতি দ্বারা সীমিত। মানব শিল্পীর সৃষ্টিতে বস্তুর পক্ষ হইতে আকারকে বাধাদান এবং বস্তুর উপর আকারের আধিপত্য স্থাপন এই যে দ্বন্দ্ব তাহার আভাস ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছা এই দুইয়ের মধ্যে গাবিরল যে পার্থক্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কখনও কখনও তিনি ইচ্ছাকে বস্তু এবং আকারের মিলন সংঘটনাকারী বলিয়া বর্ণনা করিযাছেন। আবার কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরের এই দুই গুণের যে দ্বৈতভাব আছে তাহার বিলোপসাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় শব্দটি স্বভাবতঃ ঈশ্বরের স্বরূপকে বুঝাইতেছে ইচ্ছাকে নয়, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান বা বুদ্ধিতেই সকল বস্তুর সারাংশের পূর্বাভাষ থাকে। তাহা হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে গাবিরলের যে ধারণা ছিল তাহা অস্পষ্টতায আচ্ছন্ন হইলেও ইহা জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে নব-প্লেটোনীয় মত এবং বাইবেলের মতের মধ্যে যে মূল পার্থক্য আছে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে।

মধ্যযুগের ইহুদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন গাবিরলের সমসাময়িক বাহ্‌য়া ইব্‌ন্ পাকুডা। তাঁহার প্রণীত "হৃদয়ের কর্তব্য" (খৃঃ ১০৮০—১০৯০র মধ্যে লিখিত) ইহুদীয় নীতি শাস্ত্রের একটি সর্বজনমান্য গ্রন্থ এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। হৃদয়ের যে সকল কর্তব্য, যথা—বিশ্বাসের আন্তরিকতা, দীনতা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এইগুলির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কর্তব্যকে (অর্থাৎ আচারানুষ্ঠানগুলিকে) অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত। আদর্শ ধর্মজীবন সম্বন্ধে বাহ্‌য়ার যে মত তাহাতে কিছু পরিমাণে সন্ন্যাসবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা কিয়দংশে ইস্‌লামীয় রহস্যবাদের প্রভাবে ঘটিয়াছে এবং আই হাইনুম্যান দেখাইয়াছেন যে হার্মীয় সম্প্রদায়ের একটি আরবী গ্রন্থই ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উৎস। বাহ্‌য়া খ্যাতনামা ইস্‌লামীয় রহস্যবাদী গজালি দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা বহু আলোচিত এই প্রশ্নের সমাধানে স্থির হইয়াছে যে এই ধারণা সত্য নহে।

'আত্মার প্রকৃতি' নামক যে গ্রন্থকে ভুল করিয়া বাহয়া কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করা হইত এবং যাহা সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহাতে (গ)নষ্টিক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে আছে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন স্বর্গলোক এবং বস্তুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আত্মা কি করিয়া অবতরণ করে এবং পরিশেষে মর্তে আসিয়া পৌঁছায় তাহার বর্ণনা আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহার উপর (গ)নষ্টিক মতবাদের, বিশেষ করিয়া হার্মীয় সম্প্রদায়ের (গ)নষ্টিকবাদের প্রভাব আছে।

মধ্যযুগের ইহুদী দার্শনিকদের মধ্যে বার্সিলোনার অধিবাসী এব্রাহাম বার হিজ্যা সর্বপ্রথমে হিব্রুভাষাকে দার্শনিক চিন্তার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে এই উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র আরবী ভাষাই ব্যবহৃত হইত। তিনি নবপ্লেটোনীয় মতানুযায়ী জগৎ, আত্মা এবং বুদ্ধি এই ত্রয়কে স্বীকার করিতেন, কিন্তু তিনি আলোকের জগৎ এবং বাক্যের জগৎ বলিয়া আরও দুইটি ধাপ ইহাদের সঙ্গে যোজনা করিয়াছিলেন। জুলিয়াস গুট্‌মান বলিয়াছেন যে এ এই দ্বিতীয় শব্দটি প্রজ্ঞা (Logos) শব্দটির প্রকারভেদ মাত্র। তাল্‌মুদীয়, (গ্‌) নষ্টিক, খৃষ্টীয় এবং ইসলামীয় চিন্তার অনুকরণে তাঁহার একটি ইতিহাস-দর্শন প্রণয়ন করার চেষ্টা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার মতে জগতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকে বর্ণিত সৃষ্টির সাতদিনের সহিত তুলনীয়। আদমের বংশধরগণের মধ্যে একটিমাত্র শাখায়, অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিতেই বিচারশক্তি সম্পন্ন আত্মা এখনও তাহার আদিম পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং আদমের পতনের মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহা ইহুদীদের মধ্যেই শোধিত হইয়াছে। ইহুদীরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি তাহাদের এই বৈশিষ্ট্যের আব্রাহাম হিজ্যা যে স্বভাব-বাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা (গ্‌) নষ্টিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানব সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহারই ইসলামীয় সংস্করণ-দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং ইহাকে একটি ইহুদীয় রূপ দান করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যেহুদা হালেভির ন্যায় কবি-দার্শনিক (আনুমানিক খৃঃ ১০৮৫-১১৪১) যাঁহার কুজারি নামক কথোপকথন ইহুদী ধর্মের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দার্শনিক বিবরণ বলিয়া পরিচিত তাঁহার আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ গ্রন্থেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল আরবীগ্রন্থের নাম "অবজ্ঞাত ধর্মের সমর্থনে যুক্তি ও প্রমাণসমূহ"। ইহা আবেলার্ডের "একজন ইহুদী, একজন দার্শনিক এবং একজন খৃষ্টানের কথোপকথন" নামক পুস্তকের প্রায় সমসাময়িক। গজালির ন্যায় যেহুদা হালেভিও দার্শনিকের চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানের তুলনায় ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞানকেই উচ্চস্থান দিয়াছেন। 'এরিষ্টট্‌লের ঈশ্বর' যুক্তিমূলক ঈশ্বরতত্ত্বের ঈশ্বর জগতের আদিকারণ

মাত্র, আর আব্রাহমের ঈশ্বর যিনি ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন সেই ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট জীবন্ত ঈশ্বর, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে-যাঁহাকে জানা যায়। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি অনুভবশক্তি আছে; এই শক্তিই তাঁহাকে দেবদূতের স্তরে লইয়া যায় এবং ঈশ্বরের সহিত ভাব-বিনিময় করিতে সাহায্য করে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আল্ফারাবি এবং আভিসেন্নার প্রভাব অধিক প্রবল হইতেছিল এবং ইহুদীয় দর্শন বিশুদ্ধতর এরিষ্টটলীয় মতবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল। প্রথম যে গ্রন্থে এই নূতন প্রবণতা দেখা গিযাছিল৷ তাহা হইতেছে আব্রাহাম্ ইব্‌ন দাউদের গ্রন্থ "শ্রেষ্ঠ ধর্ম" (খৃঃ ১১৬১)। ইহাতে গাবিরলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইযাছে। কিন্তু শীঘ্রই ইহা-মধ্যযুগের ইহুদীয় দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মোসেস মেমনাইডিস (খৃঃ ১১৩৫-১২০৪) কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত মোরেহ্‌ নেবুখিস (দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পথপ্রদর্শক)এর নিকট ম্লান হইযা গিয়াছিল। এই শেষোক্ত গ্রন্থ পরবর্তী সমস্ত ইহুদীয় চিন্তাধারা এবং লাটিন অনুবাদসমূহের মাধ্যমে খৃষ্টীয় যাজকদের দর্শন এবং পুনরুজ্জীবন ও মুক্তির আলোকের যুগের আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহা কালামের সরল যুক্তিবাদকেও গ্রহণ করে না, বরং ইহার মূল নীতিগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে এবং খণ্ডন করে, আবার পূর্বযুগের নব-প্লেটোনীয়দের রহস্যবাদকেও গ্রহণ করে না, কিন্তু যুক্তি দ্বারা প্রমাণযোগ্য সত্য এবং প্রত্যাদিষ্ট সত্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে সীমারেখা নির্দেশ করে। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ইহা ঈশ্বরতত্ত্বে নূতন আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে। ঠিক সেইরূপ জগতের নিত্যত্ব সম্বন্ধে এরিষ্টটলের মতের বিবোধিতা করিয়া জগৎ-তত্ত্বে এবং তুলনামূলক ধর্মের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাবন করিয়া ইহুদীয় আইন এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইহা নূতন আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে। তাঁহার পূর্বগামী দার্শনিক আব্রাহাম্ ইব্‌ন দাউদের ন্যায় মেমনাইডিস্ ও এরিষ্টটলকেই প্রধান প্রামাণ্য দার্শনিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি এরিষ্টটলের যুক্তিগুলি যে ধরণের সেইরূপ। এইগুলি ছাড়াও আভিসেন্না কর্তৃক প্রথম সূচিত তিনি অপর একটি যুক্তিও ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই যুক্তি তর্কশাস্ত্রসম্মত নিয়মের ভিত্তিতে এমন একটি আবশ্যিক সদ্বস্তুকে স্বীকার করিয়া লয় যাহার অস্তিত্ব তাহার স্বরূপ হইতে নিঃসৃত হয় এবং যাহা সকল পরতন্ত্র বস্তুকেই অতিক্রম করিয়া আছে। এই আবশ্যিক সদ্বস্তু নির্বিশেষ এক। নব প্লেটোনীয় ঐতিহ্যানুযায়ী নিষেধাত্মক ঈশ্বরতত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া মেমনাইডিস্ ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহার বহু-বিস্তৃত মতবাদে বলিয়াছেন যে, 'ঈশ্বর আছেন' ইহা ব্যতীত ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোন অস্তিবাচক বাক্য প্রয়োগ করা যায় না।

কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর বিশেষণ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—নেতিবাচক বিশেষণসমূহ, যেগুলি ঈশ্বরে কোন দোষ নাই ইহা সূচিত করে এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষণসমূহ, যেগুলি তাঁহার স্বরূপের রহস্য সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণনা করে মাত্র। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষণগুলির মধ্যে নৈতিক বিশেষণগুলিও অন্তর্ভুক্ত এবং ধর্মের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জগতের সৃষ্টি সমস্যা সম্বন্ধে এরিষ্টটলের সহিত মেমনাইডিসের বিরোধ। জগৎ নিত্য এরিষ্টটলের এই মত এবং জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট হইযাছে ইহুদীদের এই মত—এই দুইযেব মধ্যে একটি বিকল্পকে গ্রহণ করার অর্থ হইতেছে এই যে, এক নির্ব্যক্তিক ঈশ্বর হইতে এই জগৎ অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হইযাছে অথবা একজন ব্যক্তিস্বভাববিশিষ্ট এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর স্বেচ্ছায এই জগৎ সৃষ্টি করিযাছেন ইহা স্থির করা। এই দুইটি মতের কোনটিকেই বুদ্ধির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের প্রমাণ্য বাণীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। এরিষ্টটলের বিরুদ্ধে মেমনাইডিস্ এই যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন যে কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের নিয়ম সৃষ্ট জগতে ক্রিয়া করিলেও সৃষ্টির পূর্বে ক্রিয়া করে না। তাঁহার মতে জগতের প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। ইহাতে অপ্রাকৃত ঘটনার সম্ভাব্যতা সংরক্ষিত হইল কিন্তু মেমনাইডিস বাইবেলে বর্ণিত অপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে রূপকাকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মেমনাইডিসের দর্শনের সারাংশ হইতেছে—ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ। তাঁহার মতে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ দার্শনিক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিন্তু যেহুদা হালেবি যেমন বলিয়াছেন যে এই শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন অনুভব-শক্তির জন্য, তিনি তাহা বলেন না। বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও মানসিক বৃত্তি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং দেবদূতদেব চিন্তায নিবিষ্টচিত্ত, বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং নৈতিক সদাচরণের ফলে তাঁহার মনে কখনও কখনও সাক্ষাৎ অনুভূতি-রশ্মির স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং এইগুলি তাহার আত্মাব বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাবৃত্তিগুলিকে আলোকিত করে এবং যে সকল চরম সত্য সাধারণ দার্শনিকের যুক্তিমূলক চিন্তার নিকট প্রতিভাত হয় না সেইগুলি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া থাকে। যে দৃষ্টি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে অভিভূত করিয়া দেয় তাহার মর্মগ্রহণ করিতে হইলে এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে প্রতীকধর্মী মানসচিত্রের প্রয়োজন। সেইজন্য এইরূপ ব্যক্তিদের ভাষা চিত্রের ন্যায় এবং ইহাকে রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা কবিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ সর্বোত্তম দার্শনিক হওয়া ছাড়া আদর্শরাষ্ট্রেব নিয়মকর্তাও বটে। আল্‌ ফারাবি এবং শেষ পর্যন্ত ফাইলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া

মেমনাইডিস্ দার্শনিক রাজা সম্বন্ধে প্লেটোর যে ধারণা ছিল তাহা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মেমনাইডিস যদিও আভেরুরসের সমসাময়িক এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ছিলেন তাহা হইলেও তিনি যখন 'পথপ্রদর্শক' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি যে ইস্লামীয় এরিষ্টটল-পন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদারমতাবলম্বী এই দার্শনিকের গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। উহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে ঐগুলি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। কারণ আভিসেন্না এবং আভেরুরসের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ ছিল সেই সকল বিষয়েই তিনি প্রথমোক্ত লেখকের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের ইহুদীয় দর্শনের শেষ পর্যায়ে কিন্তু আভেরুরস ক্রমেই অধিক খ্যাতিলাভ করিতে থাকিলেন। তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একাধিকবার হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ইহুদীরা এইগুলির বহুভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই ইহুদীদের মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধ্যযুগের শেষাংশে আভেরুরসের অনুবর্তী প্রখ্যাত ইহুদী দার্শনিক ছিলেন লেভি বেন গারসম্। তিনি গারসনাইডিস্ (খৃঃ ১২৮৮-১৩৪৪) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ "ভগবানের যুদ্ধসমূহ"—যাহাকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা উপহাস করিয়া "ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বলিত—বিশুদ্ধ এরিষ্টটলীয় মতবাদের ভিত্তিতে ইহুদীধর্ম ও দর্শনের মধ্যে এক নূতন সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার মতে ঈশ্বরের মধ্যে যে সামান্যগুলি আছে সেইগুলি মুক্ত হইয়া জগতের মূল-উপাদান আদিম জড়বস্তুর উপর প্রযুক্ত হওয়ার নামই সৃষ্টি। গারসনাইডিস সৃষ্টি যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে হইয়াছিল তাহা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সাড্যা হইতে মেমনাইডিস পর্যন্ত ইহুদী দার্শনিকগণ বাইবেলোক্ত "শূন্য হইতে সৃষ্টি" সম্বন্ধে যে মতবাদ আগ্রহের সহিত সমর্থন করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টিকার্যেই ব্যয়িত হয়; জগতের শাসনকার্য প্রাকৃতিক কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা নির্বাহিত হয়। কোন বাস্তব ক্ষেত্রে কার্য-কারণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিভাবে কাজ করে তাহার জ্ঞানই প্রেরিত পুরুষের জ্ঞান। এরিষ্টটলের ন্যায় গারসনাইডিসও মনে করিতেন যে ঈশ্বর জগতের আদিম চালক এবং তিনি আপনার চিন্তাতেই সমাহিত। এই ধারণার সহিত বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রিত্বের ধারণার সমন্বয় কিভাবে হইতে পারে এই সমস্যা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈশ্বর যদি কেবলমাত্র আত্ম-চিন্তায় সমাহিত বুদ্ধি হন তাহা হইলে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান তাঁহার কি করিয়া হইতে পারে? গারসনাইডিস এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কোন বিশেষ বস্তুকে বিশেষ বস্তু

হিসাবে জানেন না, এক সুসংহত বস্তুসমষ্টির অন্তর্গত এবং তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বস্তু হিসাবেই জানেন।

ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়াও গার্‌সনাইডিস এরিষ্টটলের মতবাদেই ফিরিয়া গিয়াছেন। ইস্‌লামীয় এবং ইহুদীয় দর্শনে এই সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং লাটিন চিন্তায় 'সামান্যে'র সমস্যার যে স্থান এক্ষেত্রে ইহাও সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। মেমনাইডিসের নেতিমূলক ঈশ্বরতত্ত্ব নবপ্লেটোনীয়দের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়াছিল। আল্‌ ফারাবি এবং আভিসেন্না বস্তুর স্বরূপ ও তাহার অস্তিত্বের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছিলেন ইহা তাহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এরূপ পার্থক্য করিলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্ট বস্তুদের স্বরূপের সহিত তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধ আকস্মিক, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ এবং অস্তিত্ব একই। সুতরাং ঈশ্বরের স্বভাব আমাদের স্বভাব হইতে মূলতঃ পৃথক এবং অস্তিত্ব, একত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে মানুষের সম্বন্ধে ব্যবহৃত ঐ শব্দগুলির সহিত উহাদের উচ্চারণ-সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের কোন অস্তি-বাচক অর্থ নাই। ইহা সত্য যে এরিষ্টটলই পূর্বে বস্তুর স্বরূপ এবং অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ডব্লিউ জেগার মনে করেন যে ইহার মধ্যে এরিষ্টটলের প্রাক্তন প্লেটোনীয় মতবাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ইস্‌লামীয় নব-প্লেটোনীয়গণ দৃশ্যমান্‌ জগতের বাহিরেও স্বরূপের নিজস্ব সত্তা স্বীকার করিয়া এরিষ্টটল এই দুইয়ের মধ্যে যৌক্তিক প্রভেদ করিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা ছাড়া আরও অধিক কিছু বলিয়াছিলেন। আভেরুরস এই প্রভেদ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অস্তিত্ব স্বরূপের আগন্তুক উপাধিমাত্র নয়। প্রত্যেক বিশেষ বস্তু এবং তাহার স্বরূপ অভিন্ন। সুতরাং নেতিমূলক ঈশ্বরতত্ত্বে যেরূপ মনে করা হয় যে ঈশ্বর এবং সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে ঐকান্তিক বিভেদ আছে তাহা ঠিক নয়। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং সৃষ্ট জীবসমূহের স্বরূপের পার্থক্য গুণগত নয়, ইহা পরিমাণগত অনন্ত পার্থক্য। মানব তাহার সত্তা এবং বুদ্ধি ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছে, ঠিক এই কারণেই ঈশ্বর এবং মানব উভয়েই সত্তা এবং বুদ্ধিরূপ সাধারণ ধর্মের অধিকারী। ঈশ্বরের মূলস্বরূপ এইগুলি দ্বারাই গঠিত এবং ইহারা অন্য-নিরপেক্ষ। মনুষ্যদের ক্ষেত্রে ইহারা বাহির হইতে আসিয়াছে এবং অন্যসাপেক্ষ। সুতরাং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সদর্থক অথচ তাঁহার স্বরূপের অঙ্গীভূত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার্য। আভেরুরসের মতবাদের অনুসরণ করিয়া গার্‌সনাইডিস ইহুদীয় দর্শনে নব-প্লেটোনীয় মতবাদের একাধিপত্যের অবসান ঘটাইলেন এবং বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত যাহার অধিকতর সঙ্গতি আছে এমন একটি অস্তি-বাচক ঈশ্বরতত্ত্বের জন্য পথ প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু এই

ঈশ্বরতত্ত্বে ইহুদী ধর্মের গ্রহণযোগ্য কিছুই বলিলেন না। কারণ, তিনি যে ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন তিনি মূলতঃ এরিষ্টটল কল্পিত ঈশ্বর। আত্ম-চিন্তায় সমাহিত থাকাই তাঁহার স্বভাব, জগতের সহিত সক্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন নয়।

হিসডে ক্রেস্কাস্ (আনু-খৃঃ ১৩৪০—১৪১০) এর গ্রন্থ 'ভগবানের আলোক' মধ্যযুগের ইহুদীয় দর্শনের গভীর চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম। তিনি গার্সনাইডিসের উগ্র এরিষ্টটলীয় মতবাদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রেস্কাস গার্সনাইডিসের তত্ত্বালোচনার ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন কিন্তু অক্লান্তভাবে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে এই আলোচনা যে সকল সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়াছিল সেইগুলির সমাধান করা দূরে থাকুক সেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র। তিনি বলেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান কেবলমাত্র জগৎ-ব্যবস্থার জ্ঞান গার্সনাইডিস ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ইহা সত্য হইলে কেবলমাত্র বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তু নয়, পরন্তু বিভিন্ন জাতির এবং নক্ষত্রসমূহের গতির জ্ঞানও ঈশ্বরের জ্ঞানের বহির্ভূত বলিতে হয়। ক্রেস্কাসের মতে বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং ঘটনা বর্তমানে যেরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে। এইভাবে ক্রেস্কাস বাইবেলের মতানুযায়ী ঈশ্বরের জগৎ-নিয়ন্ত্রিত্বকে দার্শনিক ভাষায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র মানবের স্বাধীনতার ধারণা পরিত্যাগ করিয়াই ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ব্যবহারের ফলে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি সম্ভবপর সেগুলিকে কেবলমাত্র সম্ভবপর বলিয়াই জানেন না, যে ইচ্ছা-শক্তি নিজেই নিয়ন্ত্রিত তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই জানেন, সুতরাং প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই তাঁহার যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আছে।

ঈশ্বরের গুণাবলীর সমস্যা সম্বন্ধেও ক্রেস্কাসের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং গার্সনাইডিসের ঈশ্বরতত্ত্বের বিরোধ আছে। ঈশ্বরের সদর্থক গুণাবলী থাকার সম্ভাবনা সমর্থন করিতে গিয়া তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দার্শনিকের অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। সাড্যা হইতে গার্সনাইডিস পর্যন্ত ইহুদীয় দর্শনে জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক নিরংশ এবং বর্ণানাতীত। এ বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত ছিলেন যে ঈশ্বরে তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক অন্য কোন গুণ নাই। ক্রেস্কাস বলেন যে ঈশ্বরে তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন অথচ উহার সহিত একীভূত গুণাবলী বর্তমান ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের একত্বের কোন হানি হয় না। ঈশ্বরের গুণসমূহের মধ্যে যদি মূলগত ঐক্য থাকে এবং তাঁহার স্বরূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে গুণগুলি সংখ্যায় অনেক হইলেও ঈশ্বর যে স্বরূপতঃ বহু অথবা অংশবিশিষ্ট ইহা বুঝায় না। ঈশ্বর

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গুণের সমষ্টিমাত্র নয় কিন্তু তাঁহার যে গুণগুলি আছে সেগুলি মূলতঃ একই। এইভাবে ক্রেস্কাস ঈশ্বরকে বুদ্ধিমূলক ঈশ্বরতত্ত্বে যে ভাবে সবস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেভাবে চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে একটি ঐক্য বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের গুণসমূহ তাঁহার একটিমাত্র গুণ মঙ্গলময়ত্বের কাল্পনিক প্রকার মাত্র। তাহারা যেন একই বিষয়ের বিভিন্ন বর্ণনা এবং তাহারা বিভিন্ন শব্দদ্বারা সমস্ত শ্রেষ্ঠগুণের সমাবেশকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ক্রেস্কাস এই সকল গুণের পিছনে ঈশ্বরের এক অজ্ঞেয় স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন এবং এইভাবে ঈশ্বরের জ্ঞেয় মৌলিক গুণসমূহের পশ্চাতে সম্পূর্ণ গুপ্ত ও জ্ঞানের অগোচর ঈশ্বরের স্বরূপ আছে, এই অদ্ভুত ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ক্রেস্কাস কেবলমাত্র গার্সনাইডিসকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই কিন্তু যুক্তির সাহায্যে এরিষ্টটলের তত্ত্ববিদ্যার সমগ্র সৌধকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য সাহসের সহিত চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন। তিনি এরিষ্টটলের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা জড়বস্তু, দেশ ও কাল সম্বন্ধে এরিষ্টটলের মূল ধারণাগুলিকে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের যুগের আগমন সূচিত করিয়াছিল। পিকো ডেলা মিরান্দোলা বহুস্থানে তাঁহার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং স্পিনোজা ও সম্ভবতঃ জিওর্ডানো ব্রুণোও তাঁহার নিকট ঋণী। ক্রেস্কাস দেশ এবং কালকে অসীম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে এরিষ্টটল প্রদত্ত ঈশ্বরের (অর্থাৎ প্রথম চালকের) অস্তিত্বের প্রমাণ অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এক অসীম জগতের পক্ষেও মূল ভিত্তি হিসাবে এক আবশ্যিক সত্তার প্রয়োজন আছে। সৃষ্টিকে কালে নিষ্পন্ন ক্রিয়া বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই, শূন্য হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

ক্রেস্কাসের লেখায় মধ্যযুগের ইহুদীয় দর্শন সর্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং ইহার গতি ভিন্নপথে গিয়াছিল। ইহা ইস্‌লামীয় চিন্তার মাধ্যমে হেলেনীয় যুগ হইতে নবপ্লেটোনীয় এরিষ্টলের দর্শ., উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিল। ইহা ক্রমশঃ প্রথমে নবপ্লেটোনীয় মতবাদ এবং শেষে উদারপন্থী এরিষ্টটলীয় মতবাদকে বর্জন করিয়াছিল। পুরাতন এবং জীর্ণ মতবাদের স্থানে কোন দর্শন আসিবে অথবা কোন দর্শন আদৌ আসিবে কি না তাহা বুঝা কঠিন হইয়াছিল। কিছুকাল ধরিয়া লোকেরা যেন দর্শনের ক্ষেত্রে কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই এইরূপ মনে করিত। ক্রেস্কাসের পরবর্তী দার্শনিকগণ অল্পাধিক পরিমাণে এরিষ্টটলীয় ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সাইমন বেন জেমা ডুরান (খৃঃ ১৩৬১—১৪৪৪)

মূলতঃ মেমনাইডিসের মতবাদেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। জোসেফ, আল্‌বো (মৃত্যু খৃঃ ১৪৪৪) মেমনাইডিস্ এবং ক্রেস্কাসের মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্পেন দেশের শেষ ইহুদী দার্শনিক ডন আইজাক্ এ্যাবারবানেল (খৃঃ ১৪৩৭—১৫০৯) তাঁহার স্বজাতীয় ব্যক্তিদের সহিত নির্মমভাবে স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তিনি মেমনাইডিসের গ্রন্থগুলির বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন মধ্যযুগের ইহুদীদর্শনের কাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বিচারবুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এই দুইটির ক্ষেত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টায় যে সকল কষ্টকল্পিত আলোচনার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতেই উহা যেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল তেমন আর কিছুতে নয়। মধ্য যুগের ইহুদীদর্শনের শেষ অবস্থায় এই সমস্যা ক্রমাগত কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যাদেশে যাহা বলা হইয়াছে আমাদের বিচার বুদ্ধি তাহা সমস্তই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে কালামের এই সাহসিক দাবী মেমনাইডিস্ পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দার্শনিকদের মধ্যে বিচার বুদ্ধির দাবীকে ধর্মসম্বন্ধীয় অল্প কয়েকটি মাত্র মৌলিক সত্যে নিবদ্ধ রাখিবার প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় অল্পাংশমাত্রই প্রমাণ করিতে পারে এইরূপ মনে করা হইত। সাইমন বেন জেমা, ডুরান, যোসেফ আল্‌বো প্রভৃতি ইহুদী দার্শনিকগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরীয় প্রত্যাদেশ এবং ঈশ্বরীয় শাস্তি এই-গুলিই ইহুদীধর্মের মূল সত্য। এইভাবে তাঁহারা স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম এবং ইহুদী-ধর্ম যে এক ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আইজাক্ আলবালাগ (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে), ইলাইজা ডেলমেডিগো (খৃঃ ১৪৬০—১৪৯৩) প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনিকগণ আভেরয়েসের পরবর্তী অনুগামীদের মধ্যে প্রচলিত দ্বৈতসত্যের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইভাবে প্রত্যাদিষ্ট সত্য এবং বিচারবুদ্ধি সম্মত সত্য যে মূলতঃ এক এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে বিচারবুদ্ধি এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রত্যাদেশকে বিচারবুদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কেবলমাত্র অল্প গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সত্যগুলিকে বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধর্ম এবং দর্শন ইহাদের মধ্যে একটির অপরের প্রয়োজনানুযায়ী গঠিত হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব এইরূপ বলিতে হইবে।

যাঁহাকে লিওন এব্রীও (আনুঃ খৃঃ ১৪৬০-১৫৫১) বলা হইত, আইজাক আবার-বানেলের সেই পুত্র জুডা ফ্লরেন্সের পরিষদের সহিত সংস্পর্শে আসিবার ফলে ইহুদী

দর্শনে পুনরুজ্জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার 'ডায়ালঘি দ'আমোর' সে যুগের সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত দার্শনিক গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থে জগৎ প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সত্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি জীবদেহ এইভাবে যে একটি বিরাট কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সাহসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু ইহা কোন নূতন দর্শনের সূত্রপাত করিতে পারে নাই। স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে ইহুদীয় দর্শন নবজীবন লাভ করিয়াছিল। এইচ. এ উল্‌ফসন দেখাইয়াছেন যে স্পিনোজার দর্শন মধ্যযুগের ইহুদীয় চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত এবং ইহুদীয় দর্শনে যে সকল আলোচনা প্রচলিত ছিল সেইগুলি হইতেই ইহার চরম সিদ্ধান্তগুলি আসিযাছে। কিন্তু ইহুদী ধর্মেব সহিত ইহার আর কোন সামঞ্জস্য নাই এবং ইহা এইরূপ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াও দাবী করে না।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেন হইতে বহিষ্কৃত হইবাব পর আধুনিক যুগের প্রথম পর্যন্ত ইহুদীসম্প্রদায় যে দুবদৃষ্ট ভোগ করিযাছিল তাহাব ফলে তাহাদেব মধ্যে দর্শনচর্চা একেবারে বন্ধ হইযা গিযাছিল এবং তাহাব পবিবর্তে যে সকল রহস্যবাদী চিন্তাধারাব মধ্যে মানবমনের বুদ্ধিবিবোধী বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে সেইগুলিব বিকাশের সুবিধা হইযাছিল। চিন্তাধারাব এই ক্রমবিকাশ কিভাবে মধ্যযুগের ইহুদীয দর্শন হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ কবিযা ও আপনাব গতি অনুসরণ কবিযা কাবালার অদ্ভুত মতবাদগুলিব জন্ম দিযাছিল তাহাব জটিল এবং চিত্তাকর্ষক ইতিহাস বিবৃত কবাব স্থান ইহা নয। প্রাচীন যুগের শেষভাগে এই চিন্তাধাবাব উৎস দেখিতে পাওয়া যায় এবং (গ) নষ্টিক চিন্তার সহিত ইহাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফ্রান্সে এবং স্পেনে (গ্‌) নষ্টিক্ দার্শনিক চিন্তা কতকগুলি অজ্ঞাত খাত বাহিয়া হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল এবং কালক্রমে কতকগুলি নবপ্লেতোনীয মতবাদের সহিত মিলিত হইয়া 'জোহার' (ঐশ্বর্য) নামক গ্রন্থেব রহস্যবাদী ঈশ্বরতত্ত্বেব জন্ম দিযাছিল। পূর্ববর্তী পণ্ডিতদেব অনুসবণ কবিযা জি, সোলেম বলেন যে মোসেস্ দ্য-লীঁয় তাঁহাব সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিদেব মধ্যে যুক্তিবাদের অগ্রগতি রোধ কবিবার জন্য জোহাব লিখিযাছিলেন। প্রাচীনপন্থী ইহুদি পুরোহিতগণ মেমনাইডিস্ এবং তাঁহার অনুগামীদেব যুক্তিবাদের যে প্রচণ্ড বিবোধিতা করিযাছিলেন তাহার পিছনে যে শক্তি ছিল তাহাব অধিকাংশই তাঁহারা এই অস্ফুট কাবালার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা হইতে সংগ্রহ কবিযা-ছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহুদীগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইবার পব পালেষ্টাইনের সফেদ নগর রহস্যবাদী চিন্তার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল এবং একটি নূতন কাবালার অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং ইহাতে ঈশ্বর হইতে কিভাবে বিভিন্ন বস্তুসমূহ

অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় জোহার গ্রন্থে প্রদত্ত সেই বর্ণনার পরিবর্তে মোসেস্ কর্ডোভেরো এবং আইজাক লুরিয়ার লেখায় যাহার উৎপত্তি সেই জটিল এবং কল্পনামূলক পৌরাণিক উপাখ্যান·স্থান পাইয়াছিল। ইহা হায়িম্ বিতাল প্রমুখ কয়েকটি নিষ্ঠাবান শিষ্য কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহুদীজীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহার ফলে মুক্তির উপায় স্বরূপ কঠোর সন্ন্যাসী জীবন যাপনের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্রায়েল বাল শেমতাব যে সাধারণগম্য হাসিদীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্ন্যাস-জীবনের পরিবর্তে সানন্দচিত্তে ঈশ্বরের সেবা করাই অধিক কাম্য এই মত গৃহীত হইয়াছিল এবং কাবালীয় মতবাদকে একটি সরল আকার দিয়া উহাকে একটি জনসাধারণের ধর্মমতে পরিণতি করা হইয়াছিল। যে সকল নাগরিক ও রাষ্ট্রীয নিষম ইহুদীদের অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের পর সেইগুলি হইতে মুক্ত হইবার ফলে অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চায় যোগদান করিবার নূতন ও অধিক সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। ইহাতে ইহুদীদের সাংস্কৃতিক জীবনে সহসা যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে উপরে বর্ণিত আধ্যাত্মিক পটভূমিকার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দেকার্তে এবং তাঁহার পররর্তী সময়ে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে মৌলিক পবিবর্তন আসিষাছিল তাহা আধুনিক ইহুদীয দর্শনে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রত্যাদেশ এবং বিচারবুদ্ধি পরস্পর হইতে পৃথক্ দুইটি সত্য-সমষ্টি এইরূপ ধরিয়া লইযা আধুনিক ইহুদী দর্শনে এখন আর উহাদের মধ্যে সমন্বযসাধনের চেষ্টা করা হয় না, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। মোসেস্ মেণ্ডেলসন্ (খৃঃ ১৭২৯-১৭৮৬) জার্মানীর নূতন আলোকের যুগের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন। এই দিকে তাঁহার চেষ্টা এই যুগের বৌদ্ধিক আবহাওয়া হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। লাইবনিজ্ ঘটনা সম্পর্কিত সত্য এবং বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সত্য এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছিলেন মেণ্ডেল্সনের ইহুদীয় দর্শন তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে ইতিহাসে ঈশ্বরের যে প্রত্যাদেশের কথা শুনা যায় তাহা হইতে নয় কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক হইতে ধর্মীয় সত্য লাভ করা যায়। ধর্ম যে সকল মৌলিক সত্য শিক্ষা দেয়—যথা ঈশ্বর আছেন, মানবাত্মা অমর—এইগুলি বিচারবুদ্ধি সম্মত বলিয়াই সর্বজনগ্রাহ্য। তাহাদের সত্যতা কোন বিশেষ যুগে প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করে না, সর্বকালেই উহাদের প্রকাশ। স্পিনোজা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া তিনি এই মত প্রকাশ

করিয়াছিলেন যে বিশেষ যুগে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ব্যবহারিক নীতি এবং ধর্মীয় বিধিসম্বন্ধেই সার্থক। ইহুদীয় মত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম নয়, প্রত্যাদিষ্ট বিধি—ইহা তাঁহার একটি বিখ্যাত উক্তি। এই দৃষ্টিতে ইহুদীয় মত সঙ্কুচিত হইয়া ঈশ্বর কর্তৃক বিহিত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টিমাত্র হইয়া পড়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারলাভ করিযা বিচারবুদ্ধিসম্মত একটি সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়।

কান্টীয মতবাদের অভ্যুদয়ের ফলে মেণ্ডেলসন্ চিন্তার ক্ষেত্র এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রেব মধ্যে যে পার্থক্য স্বীকার কবিযাছিলেন তাহা অধিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। কেবল-মাত্র বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির উপব যে ঈশ্বরতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত কাণ্ট কর্তৃক তাহাদের অসারতা প্রতিপাদনের ফলে ধর্ম নীতিতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল এবং ব্যবহারিক প্রজ্ঞার প্রকাররূপে পরিগণিত হইল। এই যুগের ইহুদী চিন্তানায়কদেব নিকট কাণ্টের নৈতিক এবং ধর্মীয় দর্শন অত্যন্ত সমাদৃত হইত। নৃ-জাতি সম্বন্ধীয মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মরিট্জ লাজাবাস্ (খৃঃ ১৮২৪-১৯০৩ খৃঃ) কাণ্টের 'সর্তহীন আদেশ' সম্বন্ধে মতবাদের অনুসরণ কবিযা ইহুদী-মতকে একটি স্ব-তন্ত্র নীতিশাস্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মারবাগেব নব্য-কান্টীয় সম্প্রদাযের প্রতিষ্ঠাতা হারমান্ কোহেন (খৃঃ ১৮৪২-১৯১৮) তাঁহার নিজ মতবাদে স্বীকৃত হেতুবাক্যগুলি হইতে ইহুদীয় ধর্ম-বিষয়ক দর্শন গড়িয়া তুলিযাছিলেন। হেগেল নীতিশাস্ত্রকে তাঁহার সর্ব-প্রজ্ঞাবাদী তত্ত্ববিগ্যার অঙ্গীভূত করিযাছিলেন। এই মতেব প্রতিবাদ করিয়া কোহেন নীতি এবং তত্ত্ববিগ্যার মধ্যে যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তাহা জোরের সহিত বলিয়াছিলেন। কাণ্ট যে জড়জগৎ এবং নীতির ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি সোৎসাহে সমর্থন করিযাছিলেন এবং স্পিনোজা যে মানুষেব কর্মকে জ্যামিতিক রেখাচিত্রগুলির সদৃশ বলিযা মনে করিতেন এবং মানুষের বুদ্ধি এবং কর্মশক্তিকে অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই মতের বিরুদ্ধে ইহাকে জোরেব সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎ-কর্তৃক অদ্বৈত-তত্ত্বের বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান তাঁহার ইহুদীয দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্ভূত। বাইবেলে বিশ্বাতীত পবিত্র ঈশ্বরের যে ধারণা আছে তাঁহার মতবাদে তাহারই ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতে ঈশ্বর এবং জগৎকে অভিন্ন মনে করা উচিত নয। ঈশ্বরের ঐক্য সম্বন্ধে ইহুদীদের যে ধারণা ছিল তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বর অনন্যসাধারণ এবং তুলনারহিত। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা জড়জগতের সহিতও সংশ্লিষ্ট। ঈশ্বর আছেন বলিয়াই যে আমাদের নৈতিক জীবনের শাশ্বত মূল্য আছে শুধু তাহাই নয় কিন্তু আমাদের নৈতিক আদর্শগুলি রূপায়িত করিবার ক্ষেত্র হিসাবেই জড়জগৎ রক্ষিত হইবে ইহার নিশ্চয়তা আছে। এইভাবে কোহেন ইহুদীধর্মে ত্রাণকর্তার আদর্শকে দার্শনিক রূপ দিয়াছেন। সমগ্র

মানবজাতি যে নৈতিক নিয়মের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং মানবের ইতিহাস সেই অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্র এই যে ধারণা ইহা ঈশ্বরের ধারণা 'হইতেই উদ্ভূত। 'ইহুদীধর্মের বিভিন্ন মূলগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিচারবুদ্ধি সম্মত ধর্ম' নামক গ্রন্থে (লেখকের মৃত্যুর পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) কোহেন বুঝিতে পারিয়াছেন যে মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে অর্থমণ্ডিত করিতে মানবজাতি এবং সার্বজনীন ইতিহাসের ধারণাই যথেষ্ট নয়। সেইজন্য তিনি সার্বজনীন নীতির ধারণার উপরে নয় পরন্তু ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনার উপর ভিত্তি করিয়া ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এইভাবে তাঁহার অধ্যাত্মবাদী দর্শনের মোহময় চক্র ভেদ করিয়াছেন।

সলোমন ফর্মষ্টেকার (খৃঃ ১৮০৮-১৮৮৯) এবং সামুয়েল হার্শ (খৃঃ ১৮১৫-১৮৮৯) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যে সকল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল সেইগুলি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া ইতিহাসের দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে ইহুদী-ধর্মের যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে শেলিং এবং হেগেলের মতবাদকে নূতন রূপ দিয়াছিলেন। শেলিং বলিয়াছিলেন যে চৈতন্য এবং জড় পরস্পরের প্রকাশক এবং চরমতত্ত্বের দুইটি বিভিন্নরূপ হিসাবে ইহারা উভয়েই সমান। এই মত তাঁহার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদের দিকে লইয়া গিয়াছিল। অনুরূপভাবে হেগেল জড়জগৎকে বিশ্ব-মনের পরিপূর্ণতা লাভের একটি নিম্ন অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই মতানুসারে যাহা কিছু যথার্থই আছে তাহাই মূলতঃ যুক্তিসঙ্গত এবং ভাল। ফর্মষ্টেকার এবং হার্শ চৈতন্য এবং জড়জগৎ যে সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ এক তাহা অস্বীকার করেন এবং জড়জগৎ চৈতন্যের অধীন এইরূপ বলেন। তাঁহাদের মতে চৈতন্য জড়জগতের আত্মসংবিৎ। সেই জন্য ইহা জড়জগৎকে জানিতে পারে এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু ইহা আবার নিজেকেও জানে এবং ইহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নৈতিক আদর্শের জ্ঞানও আছে। প্রকৃতির উপাসনামূলক ধর্ম সুন্দরের আদর্শকে গ্রহণ করে, জড়জগৎকে দেবতা-রূপে দেখে এবং দেবভাবাপন্ন হওয়াই মানুষের পক্ষে চরমশক্তি বলিয়া মনে করে। খৃষ্ট ধর্মও এই প্রকৃতি উপাসনার মনোভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। ইহুদী ধর্মে আত্মাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঈশ্বরকে জড়জগতের উর্ধ্বে স্থাপিত করিয়াছে এবং ইহা মনে করে যে, ঈশ্বরের ন্যায় মুক্ত হইতে চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য কিন্তু মানুষকে দেবতা বলিয়া মনে করে না। ইহুদী ধর্ম প্রকৃতি-উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ আত্মা জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হেগেলীয় বিচার পদ্ধতির ভাষায় বলিতে হয় যে মানুষের মনে আদর্শানুভূতির আবির্ভাবই প্রত্যাদেশ। মানবেতিহাসের প্রথম স্তরে যখন

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ সময়ে আসিয়া থাকে তখন আদর্শটি বাহির হইতে মানুষের কাছে আসে এরূপ মনে হয়; ইহা প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে প্রচারিত প্রত্যাদেশ এবং সেইজন্যই ইহা ভ্রান্তি মাত্র। দ্বিতীয়স্তরে প্রেরিত পুরুষদের উপদেশ শাস্ত্রে নিবদ্ধ হয় এবং এক ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তৃতীয় এবং সর্বশেষ স্তরে মানব-মন আপনাকেই আদর্শের উৎস বলিয়া উপলব্ধি করে এবং আপন সন্তানের ন্যায় ইহাকে আলিঙ্গন করে। বিচারবুদ্ধি এবং প্রত্যাদেশের এই পুরাতন বিরোধ যুক্তি-দ্বারা ইহাদের পরস্পরের মিলন ঘটাইয়া নয় পরন্তু ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারণার সাহায্যে লোপ করা হইয়াছে। সলোমন ষ্টাইনহাইম (খৃঃ ১৭৮৯—১৮৮৬) এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিযা বলিয়াছেন যে, ধর্মীয় সত্য কেবলমাত্র প্রত্যাদেশের মধ্যেই পাওযা যায়। বিচারবুদ্ধিকে আত্মবিলোপ করিয়া প্রত্যাদেশের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিচারবুদ্ধির সহিত প্রত্যাদিষ্ট উপদেশসমূহের কোন সঙ্গতি নাই এবং ইহাদিগকে বিচারবুদ্ধিসম্মত বলিযা প্রমাণও করা যায় না। তাঁহার মতবাদ কির্কেগার্ড হেগেলের অগভীর শুভপ্রাধান্যবাদের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহাকে মনে করাইযা দেয়।

মেণ্ডেলসন্ হইতে হার্মান্ কোহেন পর্যন্ত আধুনিক ইহুদীদর্শনকে মোটের উপর ইহুদীধর্মকেই একমাত্র বিচারবুদ্ধি সম্মত ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার অবিরাম চেষ্টা বলা যাইতে পারে। ইহুদীয় দর্শনের সর্বশেষস্তরে এই মত পরিত্যাগ করা হইয়াছে এবং ধর্মকে অস্তিত্ববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ইহা একদিকে অধ্যাত্মবাদী দর্শনেব পক্ষে প্রত্যাদেশ এবং বিচারবুদ্ধিকে অভিন্ন বলিয়া প্রতি-পাদন করার চেষ্টা এবং মধ্যযুগের ধর্মীয় এবং দার্শনিক সত্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা এই উভয়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ! ফ্রান্‌জ্‌ রোসেনজীগ (খৃঃ ১৮৮৬—১৯২৯) তাঁহার "The star of Redemption" নামক গ্রন্থে এবং মার্টিন বিউবার (জন্ম ১৮৭৮ খৃ) তাঁহার "I and Thou" নামক গ্রন্থে এমন একটি দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা প্রেরিত পুরুষদের মূলতঃ যাহা মনোভাব ছিল তাহাতেই ফিরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মতানুসারে, তর্কশাস্ত্র সম্মত কালাতীত, বিমূর্ত সত্তা বিশিষ্ট আকরীয় সত্যগুলি নয়, পরন্তু মানবদের পরস্পরের মধ্যে এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে সকল সম্বন্ধ আছে তাহাদের মধ্য দিয়া যে সকল সত্য প্রকাশিত হয় সেইগুলিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয়। এই সত্যগুলি কালের বর্তমান উপস্থিতি হইতে উদ্ভূত। পরম্পরা-গত দর্শন চিন্তাকে প্রাধান্য দেয় বলিয়া ঈশ্বরকে একটি 'বিষয়' অর্থাৎ জ্ঞেয় 'একটা' কিছু' রূপে দেখিয়াছে। রোসেনজীগ এবং বিউবার যে 'নূতন চিন্তাপ্রণালী' সমর্থন করিয়াছেন

তাহা 'আমি তুমি' সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তিত এবং তাহাতে চিন্তার পরিবর্তে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই অস্তিত্ববাদের অর্থ ইহা নয় যে মানুষের অস্তিত্বকেই সকল বস্তুর পরিমাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা অধ্যাত্ম-বাদের ছদ্মবেশে পুনরাবির্ভাব নয়, বরং ঈশ্বর মানব এবং জগতের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ আছে সেইগুলি ব্যাখ্যা করাই যে দর্শনের কাজ তাহাই ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধগুলির যথার্থ প্রকৃতি সৃষ্টি, প্রত্যাদেশ এবং উদ্ধার এই শব্দগুলি দ্বারাই পরিস্ফুট হয়। পৌরাণিক দেবগণের ন্যায়ই ঈশ্বর জীবন্ত ; শিল্পক্রিয়াদ্বারা বস্তুগুলির ন্যায়ই জগৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং মানুষ তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রীক্ বিয়োগান্তক নাটকের নায়কের ন্যায় ইচ্ছাপূর্বক দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ। প্রাচীন গ্রীক চিন্তার গুরুত্ব এই যে ইহা ঈশ্বর, জগৎ এবং মানব ইহাদের প্রাথমিক সম্বন্ধের এক নিখুঁত চিত্র দিয়াছে। রোসেনজীগ এইখানেই প্রকৃতি-উপাসনামূলক ধর্মের আংশিক সত্যতা দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা সত্যের প্রাথমিক অস্পষ্ট আকার এবং ইহা সমগ্র এবং পূর্ণাঙ্গ সত্য বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ঈশ্বর, জগৎ এবং মানবের মধ্যে যখন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় কেবল তখনই তাহারা নিজেদের পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এই আত্মপ্রকাশ কালে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির অগোচর। সত্য নিজেই কালের উপর নির্ভরশীল এবং আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি সেই নাটকের তিন অংশীদার এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবে কি না ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে।

নির্বাচিত গ্রন্থবিবরণী

ইহুদীয় দর্শনের ইতিহাস

Husik, Isaac : History of Medieval Jewish Philosophy ২য় সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩০।

Guttmann, Julius : Die Philosophie des Judentunms, মুঞ্চেন, ১৯৩৩।

Altmann, Alexander : Judaism and World Philosophy ; L. Finkelstein কর্তৃক সম্পাদিত The Jews, Their History, Culture and Religion (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৯) এ প্রকাশিত।

বিশেষ বিশেষ দার্শনিক এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ

Ramberger, Fritz : Das system des Maimonides, বার্লিন, ১৯৩৫

Kaufmann, David : Geschichte der Attributenlenre in der Judischen Religious Philosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimuni, গোথা, ১৮৭৭।

Strauss Leo : Philosophie und Gesetz, বার্লিন, ১৯৩৫।

Strachek, Joseph : Faith and Reason : The Conflict over the Rationslism of Maimonides, উইলিয়ামসপোর্ট, পেন্না, ১৯৩৫।

Vajda Georges : La Theologie Ascetique de Bahya Ibn Paquda, প্যারিস, ১৯৪৭।

Ventura M : La Philosophie da Saadia Gaon, প্যারিস, ১৯৩৪।

Wolfson, Harry Austryn : Crescas' Critique of Aristotle কেম্ব্রিজ, ম্যাসা, ১৯২৯।

Wolfson Harry Austryn : The philosophy of Spinoza, দুইখণ্ড কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৩৪।

Wolfson Harry Austryn : Philosophical Foundations in Relgious philosophy in Gudaism, Christianity and Islam, দুই খণ্ড কেম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯৪৭।

পুরাতন গ্রন্থসমূহের অনুবাদ

Philo : Loeb Classical Library, F. H. Colson, G. H. Whitaker কর্তৃক সম্পাদিত।

Philo : Selections—Hans Lewy কর্তৃক সম্পাদিক, অক্সফোর্ড ১৯৪৬

Saadya Goan : The Book of Beliefs and Opinions—Sammuls কর্তৃক আরবী হইতে অনুদিত ; নিউহাভেন, ১৯৪৮

Saadya Goan : The book of Doctrines and Beliess. সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, আরবী হইতে অনুদিত, Alexander Altmann এর ভূমিকা এবং টীকা সহিত, অক্সফোর্ড, ১৯৪৬

Bachya Ben Josph Ibn Paquda, Duties of the Heart ;—Moscs Hyamson কর্তৃক অনুদিত, নিউ ইয়র্ক।

Sehuda Ha-Levi : Das Buch Kusari, David Cassel কর্তৃক সম্পাদিত, লাইপজিগ, ১৮৬৯

Jehuda Ha levi : Kuzari : The book of Proof and Argument সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, Isaac Heinemann এর ভূমিকা এবং টীকা সহিত, অক্সফোর্ড, ১৯৪৭।

Maimonides. The Guide of the Perplexed, মূল হইতে অনুদিত, M, Friedlander এর টীকা সহিত, নিউ ইয়র্ক।

Goseph AIbo : Book of Principles, Isaac Husik কর্তৃক সম্পাদিত চার খণ্ড, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৪৬

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম পর্যায় ঃ প্লটইনাস্

নব্য-প্লেটোবাদ

নব্য-প্লেটোবাদ গ্রীক (হেলেনিক) চিন্তাধারার শেষ স্তর। ইহা তিনটি পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। প্লটইনাস্ এবং তাঁহার রোমস্থ সম্প্রদায় প্রবর্তিত নব্য প্লেটোবাদের প্রথম পর্যায় মূলতঃ ছিল হেলেনিক। পরবর্তীকালে জাম্‌ব্লিকাসের নেতৃত্বে সিরীয় সম্প্রদায় এবং প্রোক্লাসের এথেনীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বহু দেববাদের একটি পূর্ণাঙ্গ গোষ্ঠীগত মতে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ইহা এক অতিপ্রাকৃত রহস্যবাদে পরিণত হয় তাঁহাদেরই হাতে যাঁহারা যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা-অনুধ্যান অপেক্ষা অলৌকিক জাদু-কৌশল অভ্যাসই জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পূর্ববর্তীদের রচনাবলীর নীরস, মিথ্যাপাণ্ডিত্যপ্রকাশক ও প্রায় উপহাস্যকর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস-প্রণেতাদের নিকট আকর্ষণীয় হইতেছে নব্য প্লেটোবাদের প্রথম পর্যায় এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পাকর্ষণীয় ইহার দ্বিতীয় পর্যায়—তৃতীয় পর্যায় আলোচনাযোগ্যই নয়।

নব্য-প্লেটোবাদের প্রবর্তক প্লটইনাস (খ্রীঃ ২০৪ বা ৫—২৭০) খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁহার জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রায় সকল তথ্যই তাঁহার শিষ্য পর্‌ফিরি রচিত সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপর নির্ভরশীল। প্লটইনাসের জীবনের শেষ ছয়বৎসর পর্‌ফিরি তাঁহার বক্তৃতাবলী শুনিয়াছিলেন এবং ঘনিষ্ঠরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলেন। প্লটইনাস্ মিশরে এবং অনেকের মতে লাইকো অথবা লাইকোপোলিস্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর প্রচলিত শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার জন্য তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠানো হইল। সেখানে তরুণ শিক্ষার্থীরূপে তিনি বিভিন্ন দার্শনিকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। অবশেষে আঠাশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সন্ধান পান এ্যামনিয়াস্ সাক্‌কাস্-এর (খ্রীঃ ১৭৫-২৪২) মধ্যে। অনেকের মতে এ্যামনিয়াস্ সাক্‌কাস্ই নব্য-প্লেটোবাদী

ভাবধারার প্রথম চিন্তানায়ক। তিনি খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় অধ্যাপনা করিতে আসিলেন এবং সেখানেই তিনি প্লটইনাস্, ওরিজেন, লংগীনাস্ ও অন্যান্যদের স্বীয় শিষ্যরূপে পাইলেন। প্লটইনাস্ দশবৎসর তাঁহার অধ্যাপনা শ্রবণ করেন। এই সময়ে শেষদিকে প্রাচ্য জ্ঞান-দর্শনের প্রতি আকর্ষণ-হেতু তিনি সম্রাট গার্ডিয়ান পরিচালিত পারস্যরাজের বিরুদ্ধাভিযানের সঙ্গে পূর্বদেশ পরিভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের সেনাবাহিনী মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিত হইলে সম্রাট আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং প্লটইনাস্ বহুকষ্টে এন্টিয়কে উপনীত হন। খ্রীঃ ২২৪-এ তিনি রোমে যান এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করেন ও অধ্যাপনায় নিরত থাকেন। তিনি ছিলেন সাধক প্রকৃতির ব্যক্তি এবং একজন রহস্যবাদী দার্শনিক। তিনি দেহধারণকেই লজ্জাকর মনে করিতেন ; পার্থিব জীবনের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত হইতে নিজেকে উন্নত রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন এবং এক আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে তিনি সর্বদাই দিব্য-দর্শনের সন্ধানে নিরত থাকিতেন—অথচ সমাজ ও কর্তব্যবোধ তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি।

প্লটইনাসের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য পর্‌ফিরি সংকলিত, সংগ্রথিত এবং সম্পাদিত প্লটইনাসের রচনাবলী "এনীড্‌স্" যদিচ সরল তথাপি এখানে হয়তো অস্পষ্ট ও কঠিন, অন্যত্র অসংস্কৃত বা অপরিমার্জিত—আবার কোথাও কোথাও বা সাহিত্যিক সৌন্দর্যের একান্ত উদাহরণ। এই রচনাবলীতে তিনি প্লেটোর বক্তব্যের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—প্লেটোর "মঙ্গল" (Good), এরিষ্টটলের "আত্মা" এবং 'ষ্টোয়িক্'দের "বিশ্বাত্মা"-র সমন্বয় সাধন করিয়াছেন ; অধিকন্তু এরিষ্টটল্ পরবর্তী যাবতীয় দার্শনিক প্রবণতার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ষ্টোয়িক ও এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায়ের জড়বাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার অধ্যাত্মবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন, 'নব-একাদেমী'র সংশয়বাদের বিরুদ্ধে জ্ঞানের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী আশাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নষ্টিক্ সম্প্রদায়ের নৈতিক দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তিনি স্বীয় অদ্বৈতবাদ প্রণয়ণ করেন এবং এক্‌লেক্‌টিক্‌দিগের প্রয়োগবাদের বিপরীত প্রয়োগ-নিরপেক্ষ মূল্য ও পরম সত্য স্বীকার করেন। জ্যোতিষীদের পূর্বনিয়ন্ত্রণবাদের পরিবর্তে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে অমঙ্গলের মূল ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা।

তাঁহার দর্শনে বিষয়-বিষয়ী দ্বিত্ব গৃহীত হয় নাই। পরসত্য চিন্ময়, কিন্তু ইহা কখনোই মানসসৃষ্ট কিংবা মনের বাহিরে এবং মন-নিরপেক্ষ সত্তা নয়। আত্মচেতনার একত্বেই জ্ঞাত চিন্ময় জগৎ এবং জ্ঞান-বৃত্তির দ্বিত্ব চিন্তার বিষয়বস্তু এবং চিন্তনক্রিয়ার

ভেদ নিহিত। যিনি চৈতন্যরূপে দর্শন করেন এবং চিন্ময় এই জগৎ পরস্পর সাপেক্ষ, একটি ব্যতীত অপরটির কোনো অর্থ হয় না।

প্লটইনাস্ মানুষের দেহ, আত্মা ও চৈতন্য এই তিন অংশ পৃথক করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেহ নিছক জড় উপাদানে গঠিত নয়। জড় অনির্দেশ্য। ইহা সৃষ্ট, কিন্তু ইহার সৃষ্টি কালের অধীন নয়। স্বরূপে ইহা বস্তু-আকারহীন, অর্থাৎ ইহা বস্তু নয়, কেননা বস্তু জড় ও আকারের সমবায়। জড় কেবল আকার পরিগ্রহণের আধার, সকল বস্তুর নিহিত সম্ভাব্যতা—কিন্তু সম্ভব করিবার শক্তি ইহার নাই। যেহেতু অনির্দেশ্য সেই হেতু ইহাকে 'সৎ' বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং 'অসৎ'ও বলা যায়। ইহা অস্তিত্বের সর্বনিম্ন স্তরে এবং মূল্যবিচারে ইহা নিকৃষ্ট। ইহা আলোকের অভাব, ইহা 'তমস্'—'মঙ্গলের অভাবসূচক', ইহাই 'আদিপাপ'। ইহা আত্মারই সৃষ্ট—যেমন আলোক তাহার অভাব দ্বারা তমসের সৃষ্টি করে। কিন্তু অন্য অর্থে 'জড়' একটি আপেক্ষিক পদ। যাহা তুলনায় উচ্চস্তরের এবং যাহা জড়ের আকার দান করে, জড় তাহার আধার। এইরূপে আত্মা চৈতন্যের আধার বা উপাদান, এবং চৈতন্য ব্রহ্মের "দিব্য আধার-উপাদান।"

অনেকে দেহ ও আত্মা অভিন্ন মনে করেন এবং আত্মাকে দেহরূপে ধরিয়া লন। কিন্তু আত্মা যৌগিক পদার্থ নয়। দেহ যৌগিক। আত্মা ইহার কোনো অংশ বর্জন বা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু দেহ পারে। পরিমাণগত বিচার দেহ সম্পর্কে গ্রাহ্য কিন্তু আত্মা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু আত্মা হইতে দেহে যোগসূত্র স্থাপন অসম্ভব। আত্মার গুণাবলী, যথা, ন্যায়ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতিকে 'বিস্তৃতি' দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না এবং আত্মার কোনো আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের (যথা, প্রজ্ঞা) সহিত দেহের অনুরূপ কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার যেভাবে আত্মা চিন্তা ও অনুভব করে, দেহ তাহা পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে আত্মা দেহ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু যাহা নিম্নস্তরের তাহা হইতে উচ্চস্তরের উদ্ভব হইতে পারে না। আত্মা দেহ হইতে উদ্ভূত হওয়া তো দূরের কথা বরং স্বরূপতঃ ইহা অ-জড় এবং অ-দেহী। ইহা একক ও অনন্য। পরিমাণ এবং বিস্তৃতি-সূচক লক্ষণ ইহার প্রতি প্রযোজ্য নয়। ইহা অংশে বিভাজ্য নয় কিংবা ইহা কোনো সমবায়ের অংশও নয়। ব্যবহারিক স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি-আত্মার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথাপি তাহারা স্বতন্ত্র। এই আপাত স্বাতন্ত্র্য আত্মা ও দেহের সংযোগ হেতু। প্রকৃতপক্ষে এই পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে নিহিত আছে একত্ব। দেহ-সংযোগছিন্ন বিভিন্ন আত্মা একটি ধারানুক্রম রচনা করে। আত্মা নিম্নস্তরের এবং

উচ্চস্তরের হইতে পারে। নিম্নাত্মা হইতেছে দৈহিক জীবনের নিহিত সূত্র। তদূর্ধ্ব জীবনের সূত্র উচ্চতর আত্মা—যদিও এই আত্মা জীবনের সর্বনিম্ন দেশ পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট।

আত্মা সৃষ্টিশীল। ইহার সৃষ্টি-শক্তির নীচে কেবল অনির্দেশ্য জড়। অনির্দেশ্য জড়ের উর্ধে আত্মিক জীবনের ক্রমোন্নীত ধারা। সমগ্র জীবনধারাটি এইরূপ যে প্রতিটি নিম্নস্তরের সূত্র তাহার পরবর্তী উচ্চস্তরেই নিহিত।

যখন আত্মা নিজের শক্তি-সৃষ্ট দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন ইহা সংবেদন ক্ষমতা সমন্বিত হয়। সংবেদন কেবল মনের উপরে বাহ্যবস্তুর নিষ্ক্রিয় রেখাপাত নয়। বরং সংবেদন হইতেছে সক্রিয় শক্তি যাহা বিষয়কে আকার দান করে। সংবেদন সাহায্যে জ্ঞাত 'বিষয়' সত্য-স্বরূপ নয়—ইহা কেবল চিন্ময় সত্যের একটি প্রতিরূপ। সংবেদন হইতেছে স্তিমিত চৈতন্যের জ্ঞান; চৈতন্যের জ্ঞানই স্বচ্ছ সংবেদন।

সুখ ও দুঃখ দেহাবলম্বী আত্মার ক্ষণস্থায়ী অনুভব। যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এবং যেহেতু সত্য জগতের সহিত ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত, সুতরাং অধিকতর স্থায়ী কিছুর জন্য ঐ সুখদুঃখ-বোধ জয় করা যাইতে পারে বা করা উচিত।

স্মৃতি আত্মার অন্যতম শক্তি। স্মৃতি এবং পূর্বসংস্কারজ্ঞান (Recollection) পৃথক। স্মৃতি সর্বদা কাল সংশ্লিষ্ট এবং অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বিষয় সম্পর্কিত। 'সামান্য ধারণার' (Ideas) সংস্কার জ্ঞান হয়। উচ্চ এবং নিম্নতর আত্মা উভয়েরই নিজস্ব স্মৃতি আছে। মৃত্যুর পর দুই আত্মা পৃথক হয়, কিন্তু একের মধ্যে যাহা ছিল তাহার অস্পষ্ট জ্ঞান অপরের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। যদিচ উচ্চতর আত্মা মূলতঃ উচ্চতর অভিজ্ঞতারই স্মৃতি রাখে এবং মহৎ 'সামান্যধারণাবলীর' সংস্কারই স্মরণ করে। বন্ধুবান্ধব দেশ, স্ত্রী, সন্তানসন্ততির স্মৃতি উচ্চ এবং নিম্ন উভয় আত্মায় বর্তমান, কিন্তু যতই উচ্চতর আত্মা বিকাশ লাভ করিতে থাকে সেইসকল স্মৃতি ততই হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া যায়।

আত্মার কল্পনাবৃত্তি দুই প্রকার: (১) ইন্দ্রিয়জ (২) বুদ্ধিগত। প্রথমটি হইতেছে নিম্নতর বা মননহীন আত্মার উপর বহিরাগত অভিঘাতের ফল এবং দ্বিতীয়টি উচ্চতর এবং মননশক্তিসম্পন্ন আত্মার উপর বাহিরের অভিঘাত সৃষ্ট। ইহা সংবেদন এবং যুক্তি-চিন্তার মধ্যবর্তী। উন্নত হইলে ইহাই 'অভিমতে' রূপান্তরিত হয়।

যুক্তিনিষ্ঠ তর্কালোচনাই আত্মার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। আত্মচৈতন্যই আত্মার আত্মজ্ঞান। যেরূপ একটি দর্পনের প্রতিবিম্বে "আমরা নিজেদেরই অমর বলিয়া দেখি" সেইরূপ আত্ম-চেতনায় আত্মা বিম্বিত হয়। ব্যক্তির কাম্য, যথা, সামাজিক ন্যায়, পরস্পরের সহানুভূতি প্রভৃতি আত্মিক জগতেরই অন্তর্গত; তাহার বাহিরে এইরূপ কোন কাম্য নাই।

আত্মা যেহেতু অপরাপর আত্মার সহিত সম্পর্কযুক্ত সেইহেতু ব্যক্তিত্ব আত্মারই বৈশিষ্ট্য। আত্মা স্বরূপতঃ উদ্দেশ্যসাধক' (teleological) এবং আত্মা সামান্য ধারণা বা আদর্শাবলীকে মূর্ত করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে। আত্মার নিজস্ব বিশেষ কার্যাবলী আছে, কিন্তু যখন ইহা 'ইচ্ছা করে' ইহার ঐচ্ছিক কার্য উপর হইতে অনুপ্রাণিত হয়। যাহা ইহার নীচে থাকে তাহাকে আত্মা প্রত্যক্ষ সৃষ্টি শক্তিদ্বারা পরিচালিত করে। ব্যক্তি-আত্মা উচ্চতর জীবন হইতে নিম্নতর জীবনে আগমন করে এবং পুনরায় উচ্চতর জীবনেই প্রত্যাবর্তন করে। ইহা স্বেচ্ছায় নামিয়া আসে যাহাতে নিম্নতম পর্যায় অবধি ইহার বৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হয়। এই পদ্ধতিতে আত্মা নিজের শক্তি প্রকাশ করে এবং ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু ইহা ক্ষতিগ্রস্তও হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়াই ইহার নিম্নতর জীবনে আগমন দোষজনক। যত স্বল্পস্থায়ী এই নিম্নাগমন ততই ক্ষতি কম। অবশ্য এই নিম্নাগমন সত্ত্বেও আত্মার মর্মকোষ সদা শুদ্ধই থাকে।*

সকল আত্মা নিত্য এবং শাশ্বত। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। দেহের মৃত্যু হইলে আত্মা শাশ্বত জগতে বাঁচিয়া থাকে। মৃত্যুর পর যে জীবন তাহাই আত্মার জাগরণ। কিন্তু এই জাগরণ দেহের সহিত আত্মার জাগরণ নয়, দেহ হইতে আত্মার জাগরণ। দেহের পুনর্জাগরণ হয় না। শাশ্বত পরজগতে ব্যক্তির বিশিষ্টতা লোপ পায় না। সেখানে বিদেহী বিভিন্ন আত্মা পরস্পরের নিকট স্বচ্ছ এবং যদিচ প্রত্যেকটি বিশিষ্ট তথাপি তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। পাপীজনের নিম্নতর আত্মাসমূহ শাস্তিলাভের জন্য আবার দেহরূপ ধারণ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে কিন্তু উচ্চতর সকল আত্মা নিত্যই শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ থাকে।

প্লটইনাস্ বিবৃত মানুষের তিনটি অংশের তৃতীয় অংশ চৈতন্য। ইহা আত্মার মতই জীবন নিহিত সূত্র। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়েই ইহা নিহিত। যদিচ আত্মা চৈতন্যের নিম্নস্তরে, তথাপি চৈতন্যের জন্য ইহার মধ্যে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ—আত্মা চৈতন্যাপেক্ষী, চৈতন্যের স্পর্শ-সংস্কার গ্রহণ করে এবং সুন্দরতর হইয়া উঠে, কারণ, চৈতন্য এবং চৈতন্যাগত বৃত্তিসকলই ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য। যখন আমাদের বিচারশক্তি চৈতন্যের স্পর্শ-চিহ্ন পায় তখন কেবল আমাদের সৌন্দর্যই বর্ধিত হয় না, আমরা নিজেরাই চৈতন্যের সহিত একাত্ম হইয়া যাই।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের 'বিষয়' আছে আমাদের নিম্নস্তরে, যুক্তি-বিচারের 'বিষয়' থাকে আমাদের সমস্তরে ; এবং চৈতন্যের 'বিষয়' আমাদের উচ্চস্তরে ; এবং এই শেষোক্ত বিষয় আমরা দেখিতে পাই তখনই যখন চৈতন্যের আলোক আমাদের উপর আসিয়া পড়ে। চৈতন্যসম্ভূত জ্ঞান বা চৈতন্য-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ এবং যুক্তি-

বিচার উভয় হইতে স্বতন্ত্র। ইহা 'সামান্য ধারণা' বা আদর্শ জানিবার বৃত্তি এবং চৈতন্য এই ধারণাবলী জানিবার সময় নিজেকেই জানে। সুতরাং যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে আত্মা অপর 'বিষয়' সম্পর্কে চিন্তা করে, চৈতন্য নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে। আত্মজ্ঞানই ইহার স্বরূপ-বৃত্তি। চৈতন্যের স্বরূপ যেহেতু জ্ঞান, সুতরাং ইহার জ্ঞান এবং সত্তা অভিন্ন।

চৈতন্য-প্রত্যক্ষের সকল 'বিষয়' (সামান্য ধারণাবলী) সর্বদাই একত্রে অর্থাৎ এক 'নিত্য বর্তমানে' তাহাদের নিত্য স্বরূপ লইয়া চৈতন্যে বিধৃত হইয়া আছে, কিন্তু এই 'বিষয়'গুলি চৈতন্য-বহির্গত নয়। উক্ত বিষয়গুলি লইয়াই চৈতন্য, যেমন বিভিন্ন অংশকে লইয়া সমগ্র। প্রতিটি সামান্যধারণাই চৈতন্যরূপ এবং সমগ্র চৈতন্য প্রকৃত প্রস্তাবে সকল সামান্যধারণা। চৈতন্যের মধ্যেই সত্য এবং পরতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ইহা স্বীকৃত। পরম সত্য অমর কিছুর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ইহা নিজের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। ইহা সৎ এবং ইহার স্বরূপ কী তাহাও ইহার অবহিত। সুতরাং সত্তা, চৈতন্য-জ্ঞান এবং চৈতন্য এক এবং অভিন্ন। ফলতঃ চৈতন্য, প্রকৃতজগতের জ্ঞান এবং প্রকৃত জগৎ অভিন্ন। তাহাদের পারস্পরিক পৃথক আলোচনা সম্ভব হইলেও তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সত্তা নয়। প্লটইনাস্ মানুষের ত্রি-অংশ বিভাগের অনুরূপ দিব্যতত্ত্বেরও ত্রিধা-বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। প্লেটোর 'টাইম্যুস' অনুসরণে তিনি বিশ্বাত্মা, দিব্যচৈতন্য এবং অদ্বৈতসত্তা বা পরমব্রহ্ম[১] এই ত্রয়ী স্বীকার করিয়াছেন।

যেমন মানবাত্মা দেহের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ বিশ্বাত্মা প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জগৎ অস্পষ্ট অনুধ্যানে জানা যায় এবং এই অস্পষ্ট অনুধ্যান একটি অস্পষ্ট ধেয়বস্তু সৃষ্টি করে। এই জগৎ পৃথকত্ব, বিরোধ সমন্বিত, কাল, দেশ, পরিবর্তনের অধীন; কিন্তু অপরপক্ষে 'নিত্য' বস্তুসকল (চৈতন্যজ্ঞানের 'সামান্য ধারণাবলী') পরস্পর সন্নিবিষ্ট, সামঞ্জস্যে বিধৃত, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জগৎ জড় ও আকার উভয় লইয়া গঠিত। কিন্তু জড়ের ন্যায় প্রত্যক্ষের জগতে 'আকার'ও নিষ্ক্রিয় এবং সেইজন্য আকার অংশতঃ অসত্য। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সত্য বলিতে গেলে প্রকৃত সত্যের অংশীমাত্র—অর্থাৎ ইহার প্রতিরূপ মাত্র; এবং যেহেতু প্রতিরূপ সুতরাং মূলের প্রতিরূপ বলিয়া যতটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব ইহা ততটুকু সৌন্দর্যসম্পন্ন। প্লেটোর অনুসরণে প্লটইনাস্ও প্রত্যক্ষ জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে 'অভিমত' মাত্র বলিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষ জগৎ বিশ্বাত্মাস্পৃষ্ট, ঠিক যেরূপ ব্যক্তির দেহ ব্যক্তি-আত্মাস্পৃষ্ট।

প্রকৃতি হইতেছে বিশ্বাত্মার সৃষ্টিশক্তি। প্রকৃতির শক্তি বিস্তার জড়কে আকার-

সমন্বিত করিয়া বিচ্ছুরিত করিয়া দেয়। প্রকৃতি-শক্তি যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্যযুক্ত। সত্য 'কারণ' একমাত্র 'উদ্দিষ্ট কারণ' (Final Cause)। 'নিমিত্ত কারণ' হইতেছে আত্মা যে সকল বস্তু প্রয়োগ করে তাহাদেরই অংশ। বিশ্বাত্মার পদচিহ্ন প্রত্যক্ষজগতের মধ্যে পরিলক্ষিত। আত্মা এই জগতে যে সকল সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে তাহা এই জগতের উপর সেই বিশ্বাত্মা চিহ্নিত 'আকার' মাত্র।

'দেশ' এবং ইহার বিভাগ হইতেছে জড়ের উপর আত্মা নির্ণীত খণ্ডতা—যে খণ্ডতা দেশ ও কালের জগৎকে আমাদের নিকট সীমাবদ্ধ করিয়া উপস্থাপিত করে। 'কাল' হইতেছে একটি প্রতিরূপ (copy) যাহার সাহায্যে বিশ্বাত্মা অনন্তকে রূপান্তরিত করেন, যখন তিনি নিত্য সামান্যধারণাবলীকে (Ideas) প্রাকৃতিক নিয়মাবলীতে রূপান্তরিত করিতে চাহেন। সুতরাং 'কাল' 'একটি উদ্দেশ্যযুক্ত আকার (Category) এবং সেইজন্য ইহা জগৎ-অতিক্রান্ত উদ্দেশ্যাভিমুখী এক জাগতিক শক্তির দৃষ্টান্ত। কাল একটি আকার যাহার সাহায্যে বিশ্বাত্মার সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি ও জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একরূপ হইতে অন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগতি চৈতন্য-নিহিত সেই গতিরই প্রতিরূপ যাহা পরিবর্তনহীন, নিত্য এবং সামান্যধারণা বা ভাবজগতের। জগৎ-ব্যাপার সৌরমণ্ডলীয় পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয় যতদিন পর্যন্ত সকল ব্যক্তির সৃষ্টি বিশ্বাত্মা সম্পন্ন না করে। তারপর সূত্রপাত হয় আরেক নূতন জগৎ-সংস্থার। সুতরাং বিশ্বকে অনন্ত বলা যায় এই অর্থে যে ইহা বিভিন্ন আদি মধ্য-অন্ত সমন্বিত সসীম জগৎ-সংস্থার অনন্ত পারম্পর্যধারা। প্লটইনাসকৃত এই প্রত্যক্ষ-জগতের বিভিন্ন আকার বা রূপ পরিকল্পনায় এরিষ্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট। উক্ত বিভিন্ন আকার—(১) জড়, আকার এবং উভয়ের সমাহার, (২) সম্পর্ক (৩) গুণ (৪) পরিমাণ (৫) দেশ (৬) কাল এবং (৭) গতি।

বিশ্বাত্মা কেন জগৎ সৃষ্টি করিলেন অথবা অনুরূপ প্রশ্ন—স্রষ্টা কেন আদৌ সৃষ্টি করিলেন জিজ্ঞাসা করা অযৌক্তিক, কেননা ঐ প্রশ্নাবলী ভ্রান্ত ধারণাশ্রিত যে অনাদির আদি আছে অথবা সৃষ্টিক্রিয়া যেন অনিত্য কোনো সত্তার ক্রিয়া। "প্রত্যক্ষজগৎ একটি সুসংবদ্ধ জীবনধারা, ক্রিয়াশীল, জটিল, সর্বব্যাপ্ত, এক অজ্ঞেয় প্রজ্ঞার প্রকাশ। ইহা চৈতন্য-জগতের সুন্দর এবং স্পষ্ট একটি প্রতিচ্ছবি। নিঃসন্দেহে এই জগৎ একটি প্রতিরূপমাত্র, মূলসত্য নয়; বরং ইহাই এই জগতের স্বরূপ; এই জগৎ একত্রে মূলসত্য এবং প্রতীক হইতে পারে না। কিন্তু ইহাকে একটি অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ বলাও ভ্রান্ত; কেননা এই বস্তুজগতের মধ্যে একটি সুন্দর প্রতিরূপে যাহা থাকা উচিত এক্ষেত্রে তাহার কিছুই অপূর্ণতা নাই। সুতরাং এই জগৎ হীন নয়। এমন কিছু

উৎকর্ষ নাই যাহা ইহাতে রূপায়িত হয় নাই। এই প্রত্যক্ষ-জগৎ সুন্দর এবং শ্রেয়ঃ, যদিচ মূল অপেক্ষা ইহা শ্রেয়ঃ বা সৌন্দর্যে ন্যূন, কারণ প্রতিরূপ বলিয়াই ইহার এই ত্রুটি। ইহার একাধিক আশ্রয়ও আছে—তাহা ব্যক্তি-আত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ফলশ্রুতি।

এইরূপে বিশ্বাত্মা প্রত্যক্ষ জগতের স্রষ্টা। এই বিশ্বাত্মা ইহার নিম্নাভিমুখী গতিতে চৈতন্য-জগতের প্রতিরূপ হিসাবে এই জগৎকে সৃষ্টি করে। উক্ত চৈতন্য-জগৎ ইহা প্রত্যক্ষ করে ইহার ঊর্ধ্ব গতিপথে।

চৈতন্য-জগৎ বিশ্বাত্মার উপরিপর্যায়ে এবং ইহা সর্বোচ্চ পরম এক বা ঈশ্বর, পরমশ্রেয়ঃ বা পর-ব্রহ্মের প্রতিরূপ। বস্তুতঃ ইহা পরব্রহ্মের আত্ম প্রতিফলন। ইহা ব্রহ্মেরই বিচ্ছুরিত আলোক যাহার সাহায্যে ব্রহ্ম নিজেকেই দেখেন। 'চৈতন্য-জগৎ হইতেছে ভাবজগৎ, সামান্যধারণার জগৎ—ইহা প্রত্যক্ষ জগতের আদর্শরূপ। ব্রহ্মের প্রতিরূপ বলিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত—এই চৈতন্য-জগতে দেশের খণ্ডতা নাই, এবং ইহা অনন্ত কেননা ইহার মধ্যে কোন অতীত, ভবিষ্যৎ নাই, আছে কেবল এক নিত্য বর্তমান।

চৈতন্য-জগতে তিন জোড়া জ্ঞানের রূপ বা আকার (Categories) আছে। যথা, চৈতন্য এবং সত্তা (চিন্তা এবং বস্তু), ঐক্য এবং পার্থক্য, স্থিতি এবং গতি, (অপরিবর্তনীয়তা এবং পরিবর্তন)। কিন্তু এই মত সত্ত্বেও অসঙ্গতভাবে প্লটইনাস্ কখনও চৈতন্যের উল্লেখ করেন না, কখনো আবার জ্ঞানের আকারগুলির তালিকায় চৈতন্য ও সত্তা উভয়েরই উল্লেখ করেন না।

চৈতন্য পৃথক পৃথকরূপে সত্তা, স্থিতি এবং গতি প্রত্যেকটি জানিতে পারে। ইহাদের জানিতে গিয়া চৈতন্য ইহাদের সম্মুখে স্থাপন করে; কেননা এইরূপ জানার মধ্যেই তাহাদের সত্তা। চৈতন্যের আত্মজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত গতি, কেননা জানা একটি ক্রিয়া এবং ক্রিয়াই গতি। এই ক্রিয়া যে নিজের অভিমুখী তাহাতেই নিহিত আছে ইহার সত্তা, কেননা জানা-ক্রিয়াই সত্তা নয়, বরং সত্তা হইতেছে যাহা অস্তিত্বশীল বলিয়া জ্ঞাত। সত্তা হইতেছে চৈতন্য-জ্ঞানের উৎস এবং লক্ষ্য, কারণ জ্ঞানই গতি (অর্থাৎ কালাতীত ইচ্ছার ক্রিয়া) এবং গতি অন্য গতি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কিংবা গতিতে শেষ হইতে পারে না। কিন্তু সত্তাই ক্রিয়া, কেবল ক্রিয়া-সম্ভাবনা নয়। সুতরাং চৈতন্য-জ্ঞানের ক্রিয়াই সত্তা। এইরূপে তিনটি জ্ঞানের আকারের মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্য উভয়ই আছে। অতএব 'ঐক্য' ও 'পার্থক্য' এই দুইটি আকারও জ্ঞানের আকার (Categories) বলিয়া সংযোজিত হওয়া উচিত।

চৈতন্য সরল নয়। চৈতন্যের অন্তর্নিহিত ভেদ আছে; নতুবা চৈতন্য-জগতে বিভিন্ন

চেতন সত্তার মধ্যে সংযোগ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকিত না। কিন্তু বিভিন্ন চেতনসত্তা কেবল পরস্পর ভিন্ন তাহাই নহে, তাহারা পরস্পর অভিন্নও বলা যায়। কেননা তাহারা একে অপরের মধ্যে বর্তমান। তাহারা একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক, বহুর সমন্বয়ে এক।

সমস্ত বিশেষ চেতনসত্তা এক সর্বব্যাপক চৈতন্যে বিধৃত। সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য স্ব-নির্ভর এবং বিশেষ চেতনসত্তাসকলও স্ব-নির্ভররূপে থাকে, কিন্তু তথাপি ঐ সর্বব্যাপক চৈতন্যের উপর নির্ভরশীল উক্ত চেতন সত্তাসমূহ আবার চেতন সত্তাসমূহে বিধৃত সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য। এইভাবে প্রত্যেক বিশেষ চেতন সত্তা একত্রে স্ব-নির্ভর এবং সর্বব্যাপক চৈতন্যে বিধৃত এবং সেই সর্বব্যাপক চৈতন্যও স্ব-নির্ভর এবং বিশেষ চেতনসত্তা সমূহে বিধৃত। সর্বব্যাপক চৈতন্য হইতেছে প্রকৃত বিদ্যমান সকল বিশেষ চেতন সত্তাসমূহের সমষ্টি এবং উহাদের প্রত্যেকটি নিহিতরূপে থাকে উক্ত সর্বব্যাপক চৈতন্যে। ব্যক্তির চৈতন্য (spirit) সেই সর্বব্যাপকচৈতন্যের অন্তর্মুখী ক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তিআত্মা ইহার বহির্মুখী ক্রিয়ার ফল।

বিশেষ চেতন সত্তাসমূহের অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন মুক্ত ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই—সেই ক্রিয়াশীলতা বিশ্লেষণ প্রধান তর্কালোচনা নয়, ইহা প্রশান্ত অনুধ্যান, দিব্য-দৃষ্টির ক্রিয়াশীলতা। তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন আনন্দময়। তাঁহারা 'সত্য'-কে পায় মাতা, ধাত্রী, অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের ধারকরূপে। তাহারা দেখিতে পায় সকল বস্তু, যে সকল বস্তুর প্রকৃত সত্তা আছে—অর্থাৎ যেগুলি জন্ম-মৃত্যুর অধীন নয়। তাহারা সকল কিছুর মধ্যে নিজেদের দেখিতে পায়; কেননা সকল কিছুই স্বচ্ছ, কোনো কিছুই তমসাচ্ছন্ন নয়, কোনো কিছুই অজ্ঞেয় নয়; প্রত্যেক সত্তাই অন্যান্য সত্তার নিকট সুস্পষ্ট; আলোক যেন আলোকের মধ্যে সঞ্চারিত; এবং প্রত্যেক চেতন সত্তা নিজের মধ্যে সকল বস্তু ধরিয়া রাখে ও অপর প্রত্যেকের মধ্যে সকল কিছু দেখিতে পায়। অতএব সর্বত্র সকল কিছু বিদ্যমান, সকলের মধ্যেই সকল এবং প্রত্যেক সত্তাই সকল, এবং তাহার মহিমাও অনন্ত। তাহারা প্রত্যেকে মহৎ; ক্ষুদ্র ও মহৎ; সেখানে সূর্য হইতেছে সকল তারকা সমন্বয় এবং প্রত্যেকটি তারকাও সকল তারকা সমন্বয় এবং তৎসহ সূর্যও। যদিও কোনো বিশেষ দিক প্রত্যেকের মধ্যে হয়তো মুখ্য কিন্তু সকলই অপরাপর প্রত্যেকের মধ্যে বিম্বিত। উপরিউক্ত 'ভবিষ্যৎ জীবন' বলিতে কোন ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বোঝায় না—বোঝায় নিত্য পরম সত্তা (Reality) এবং তাহার বিভিন্ন রূপ। যথা—অস্তিত্বরূপী পরমসত্তা (চেতন পদার্থের আঁধার), সেই সকল চেতন পদার্থের গতিস্বরূপ (তাহাদের জীবনের ক্রিয়াশীলতা), তাহাদের স্থিতিস্বরূপ (অপরিবর্তনীয়তা), তাহাদের বহুত্ব-

স্বরূপ (পার্থক্য) এবং তাহাদের নিহিত ঐক্য-স্বরূপ (ঐক্য)—সকলকিছুই প্রত্যেকের মধ্যে দৃষ্ট এবং প্রত্যেক পদার্থ সকলের মধ্যে দৃষ্ট, এক সদা-প্রবহমান বর্তমানে বিধৃত।

যে বিজ্ঞান চেতন-জগৎ লইয়া আলোচনা করে তাহা দ্বান্দ্বিক বিজ্ঞান (Dialectic) বলিয়া পরিচিত। এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির উৎপত্তি চৈতন্য হইতে। মানবাত্মা এই বিজ্ঞান অনুশীলন করে, মানবাত্মা যে সূত্রাবলী গ্রহণ করিতে সমর্থ চৈতন্য সেই সূত্রাবলী আত্মাকে দেয়। এই সূত্রাবলী গ্রহণ করিয়া মানবাত্মা উক্ত বিজ্ঞান প্রদত্ত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে, সংগ্রথিত করে যতক্ষণ না চৈতন্য-জ্ঞানে আসিয়া উপনীত হয়। যে অনুপাতে মানবাত্মা ঐ মূলসূত্রাবলী গ্রহণ করিতে সমর্থ সেই অনুপাতে মানবাত্মাই চৈতন্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি একটি যৌক্তিক পদ্ধতি, কিন্তু ইহা যুক্তিশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া স্বজ্ঞান্তরে (intuition) উন্নীত হয়।

চৈতন্য এবং চৈতন্য-জগৎ দুইয়ের মধ্যে এক এবং একটি অপরটি ব্যতীত থাকিতে পারে না। এই 'দুইয়ের মধ্যে এক' নির্দেশ দেয় উচ্চতর আর একটি ঐক্যের—যাহা বিশুদ্ধ ঐক্য বা এক, যাহার মধ্যে কোন দ্বিত্ব নাই। প্লটইনাস্ এই দ্বিত্ব বর্জিত ঐক্য-কে বলেন 'পরম এক,' ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং প্লেটোর মত তিনিও সেই 'পরম এক' এবং 'পরম শ্রেয়র' (The Good) অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পরম এক কথাটি সংখ্যা বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা এক ও একে যে দুই হয় সেই এক নয়, কেননা সংখ্যাবাচক একত্ব ও বহুত্ব পরস্পর সাপেক্ষ। ঈশ্বর অন্যকিছু সাপেক্ষ নন। তিনি উৎস-স্বরূপ যেখান হইতে একত্ব ও বহুত্ব উৎসারিত। তিনি সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে, চেতন সত্তা এবং সামান্য ধারণার (Ideas) চৈতন্য-জগতের উর্ধ্বে আমরা বলিতে পারি তিনি কী নন, কিন্তু তিনি কী তাহা বলিতে পারি না, কারণ তিনি সকল গুণ এবং বর্ণনার উর্ধ্বে। এমন কি আমরা যদি অন্য নিরপেক্ষ রূপে নয় অন্যসাপেক্ষরূপে তাহাতে সর্বোচ্চ গুণাবলীও আরোপ করি তবে অধিকন্তু বলিতে হইবে যে "ইহারাও যথেষ্ট নয়, ইহাদের তুলনায় উচ্চতর গুণাবলী প্রয়োজন।" তিনি অসীম। জ্ঞাত জগৎ হইতে পৃথক তাঁহার কোন জ্ঞান নাই, কেননা তাহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্পর্ক অতিক্রান্ত। তিনি কেবল সাধারণ চৈতন্যযুক্ত নন, তিনি মহত্তর চৈতন্য সম্পন্ন। কারণ তিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তাঁহার জ্ঞান সাধারণ বিশ্লেষণ যুক্তির এমনকি চৈতন্যের স্বজ্ঞা-প্রত্যক্ষের তুলনায় উচ্চতর। আমরা তাঁহাতে ইচ্ছা শক্তিও আরোপ করিতে পারি না যদি ইচ্ছাশক্তি বলিতে অবর্তমান কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা বোঝায়। কিন্তু তিনিই ইচ্ছাশক্তি এই অর্থে যে তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই এবং তাহাতে এমন কিছু নাই যাহা তাহার ইচ্ছার পূর্ববর্তী। তিনি কোনো আবশ্যিকতার (necessity) অধীন নন, তাহাতে সবকিছুই আবশ্যিক। তিনি সর্বৈব

মুক্ত, চৈতন্য-জগতের মুক্তির উৎস তিনি। যে উদ্দেশ্যময়তা বিবর্তনশীল জগতের লক্ষণ তিনি তাহার অধীন নন। তিনি আদি কারণ-স্বরূপ এবং পরম শ্রেয়ঃরূপে তিনি যাহা কিছু বর্তমান তাহার লক্ষ্য-কারণ (final cause)। কিন্তু আদি ও লক্ষ্য-কারণরূপে তিনি যাহা কিছু ঘটান তাহার সহিত তিনি সমান নিত্য। কেননা তাহার উর্ধ্বে কিছু না থাকায় তিনি অন্যকিছুর অন্তর্গত নন—বরং তাঁহাতেই সকল কিছু বিধৃত। তিনি সকলের মধ্যে বিভক্ত নন অথচ সূর্য যেরূপ নিজে ক্ষয়িত না হইয়া আলোক ও উত্তাপ বিকিরণ করে সেইরূপ তিনিও অব্যয়রূপে সকল লইয়া গঠিত। আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি আদি ক্রিয়াস্বরূপ, অথবা আদি শক্তি। কেননা, তিনি শক্তি ও ক্রিয়া এই দুইয়ের পার্থক্যের উর্ধ্বে। সেই পরম এক অথবা পরম শ্রেয়ঃ কেবল সাধারণ অর্থে শ্রেয়ঃ নন বরং সকল শ্রেয়ের উৎস। তিনি সৌন্দর্যসমন্বিত নন বরং তিনি সকল সৌন্দর্যের সৌন্দর্যস্বরূপ (Beauty)। তিনি আদি সৌন্দর্য—যাহা কিছু সুন্দর তাহার উৎস। সেই পরম একের শেষোক্ত দুইটি গুণের মধ্যে শ্রেয়ঃই মৌলগুণ।

সেই 'পরম এক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'জড়' পর্যন্ত এবং 'জড়' হইতে বিপরীত দিকে 'পরম এক' পর্যন্ত সর্বস্তরে ধারাবাহিক এমন নির্ভরতার সম্পর্ক আছে যে প্রতিটি স্তরে তদূর্ধ্ব সকল স্তর নিহিত। সকল নিম্নতর স্তরপরম্পরা সেই পরম একের উপর নির্ভরশীল কিন্তু 'পরম এক' অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না।

পরম শ্রেয়ঃ সকল অস্তিত্বশীল দ্রব্যের উৎস এবং লক্ষ্য। ইহা সকল দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষিত এবং কাম্য আদর্শ। কোনো বস্তু তখনই আকাঙ্ক্ষিত হয় যখন পরম শ্রেয়ঃ একদিকে সেই বস্তুর উপর করুণা বর্ষণ করে অপরদিকে অভিলাষী ব্যক্তির মধ্যে প্রেম সঞ্চার করে। যখনই আত্মার সম্মুখস্থিত বস্তুর সৌন্দর্যের উপর করুণার লীলা প্রকাশিত হয় এবং আত্মা পরম শ্রেয়ের আলোকে রঞ্জিত হয় তখনই আত্মা দিব্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রেমে রূপান্তর লাভ করে। চৈতন্যের সৌন্দর্যের উপর যদি করুণার লীলা প্রকাশ না পায় তবে সেই চৈতন্য তাহার সকল সৌন্দর্য সত্ত্বেও আত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না। এমন কি স্বর্গেও আত্মা নিজেকে লইয়া তৃপ্ত নহে; ইহা তখনও আদর্শ অভিমুখী এবং প্রেমোন্মুখ; এবং ইহার প্রেম সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও তীব্র হয় যখন ইহা পরম ব্রহ্মের পূর্ণ দৃষ্টিতে বিরাজ করে—যে পরম ব্রহ্ম জীবন ও চৈতন্যের স্রষ্টা এবং যিনি সকল চেতন পদার্থে চৈতন্য ও সকল জীবিত পদার্থে জীবন সঞ্চারিত করিয়াছেন। চেতন পদার্থসমূহ চৈতন্য সম্পন্ন হইলে চৈতন্যবিযুক্ত অবস্থার তুলনায় অধিকতর শ্রীসমন্বিত হয় এবং জীবিত পদার্থসমূহ জীবন লাভে ধন্য হইলে জীবনহীন অবস্থার তুলনায় অধিকতর শ্রীসমন্বিত হয়।

সেই পরম এক যিনি সকল কিছুর মূলাধার; আমাদের অজ্ঞেয়। এমন কি চৈতন্য

যখন নিজস্ব স্বজ্ঞা (intuition) এবং চৈতন্যজগৎ লইয়া ব্যাপৃত থাকে তখন ইহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু প্রেমাকাঙ্ক্ষায় যখন চৈতন্য নিজেকে অতিক্রম করে তখন সেই মুহূর্তের জন্য ইহা 'পরম একে' রূপান্তরিত হয়, যাহাকে অবশ্য সে কখনও জানিতে পারিবে না। এই সকল মুহূর্তে দ্রষ্টা এবং দৃষ্টের, অন্বেষণকারী এবং অন্বিষ্টের একাত্মতা এতই সম্পূর্ণ হয় যে ইহা জ্ঞাতা—জ্ঞেয় পার্থক্য অতিক্রম করিয়া যায় এবং ফলতঃ জ্ঞানের বা জ্ঞানের সম্ভাবনার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এইসকল মুহূর্ত তখনই আসে যখন আমরা সেই পরম একের প্রতি প্রদীপ্ত প্রেমে নিজেদের নিরাবরণ করিয়া ফেলি, এমন কি চৈতন্য-জগতের সব কিছু যখন স্খলিত হইয়া যায়। কারণ পরম একের উপলব্ধি তখন অসম্ভব যখন আমরা 'অপর'-কে লইয়া ব্যাপৃত থাকি। মানবাত্মা কোনো কিছুর জন্য এমন কি স্বর্গের স্বর্গলাভের পরিবর্তেও সেই পরম একের সহিত নিজের একাত্ম অবস্থা ত্যাগ করিবে না। তখন আত্মা এত উন্নতশীর্ষে আরোহণ করে যে ইহা পূর্বে যে চৈতন্য-স্বজ্ঞাকে (spiritual intuition) অতিমূল্যবান মনে করিয়াছিল তাহাকে তুচ্ছ ভাবে—যেমন একজন পথিক কোনো প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রশংসা করে সজ্জিত সুন্দর সামগ্রীগুলি কিন্তু যখন গৃহপতি আসেন তখন তিনিই পথিকের সকল মনোযোগ আকর্ষণ করেন। চৈতন্য চিন্তার মাধ্যমে চৈতন্য-জগতকে জানে। চৈতন্য কোনো কোনো মুহূর্তে পরম একের প্রেমে সেই একেই রূপান্তরিত হয়। মানবাত্মা এবং 'পরম এক' দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ন্যায় যখন পরস্পর মিলিয়া যায় তখন তাহারা অভিন্ন এবং পৃথক হইলেই দুই।

আত্মা যখন পরম ব্রহ্মের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তখন ইহার যে দিব্য প্রত্যক্ষ হয় (vision) তাহা এতই সাক্ষাৎ যে বর্ণনা করা যায় না, কেননা যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা যদি প্রত্যক্ষকারীর সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় তবে তিনি তাহাকে আপন হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন না। অপর ব্যক্তি যিনি নিজে সেই দিব্য প্রত্যক্ষের আনন্দ লাভ করেন নাই তাঁহাকে তুমি ইহা দেখাইতে পার না। এইরূপ দিব্য-প্রত্যক্ষের সামর্থ্য যদিচ সকল ব্যক্তিরই আছে তথাপি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ইহা কার্যে প্রয়োগ করিতে পারেন।

প্লটইনাস্ মূলতঃ চৈতন্যের শীর্ষস্তরে অনুধ্যানের মধ্যে (contemplation) যে জীবন তাহার প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন বলিয়া সামাজিক নীতিবোধের সমস্যার দিকে অল্পই মনোযোগ দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো গ্রন্থও রচনা করেন নাই। তিনি রাজনৈতিক জীবনের উৎকর্ষ ও আদর্শ লইয়া স্বল্পই আলোচনা করিয়াছেন —যদিও তাঁহার মতে আত্মা যে শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উন্নীত হইতে আরম্ভ করে তাহার

পূর্বে উক্ত রাজনৈতিক জীবনের উৎকর্ষ লাভ করা উচিত। এই উৎকর্ষগুলি জীবনে আচরণ উচিত কারণ ইহারা মন হইতে ভ্রান্ত মতামত দূর করে এবং আমাদিগকে সঙ্গতি-বোধ, মাত্রা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। আত্মার শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির অর্থ দেহ হইতে আত্মার সংযোগ ছেদ এবং চৈতন্য-জগতে উন্নীত হওয়া। আত্মা যখন নিজের মধ্যে সংবৃত অবস্থায় ফিরিয়া যায়, ইহার সকল নিম্নতর রূপ পরিহার করে, এবং বহিরাগত সকল চিহ্ন মুছিয়া যায় তখন ইহা চৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবিরূপে থাকে। তুমি যদি এইরূপ তোমার নিজের মধ্যে সংবৃত হইয়া "তারপরও সেখানে সৌন্দর্য দেখিতে না পাও তবে ভাস্কর যেমন পাথর কোঁদে, সমতল করে, মসৃণ করে যতক্ষণ না সে তাহার মূর্তিটি সকল সৌন্দর্যগুণসম্পন্ন করিযা তোলে তেমনি তুমিও করিবে। তেমনি তুমিও নিজের আত্মা হইতে যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহা ছিন্ন করিয়া ফেল, যাহা বক্র তাহা সরল কর, যাহা তমস তাহাকে আলোকিত কর, শুদ্ধ কর এবং আত্মমূর্তি গড়িবার কার্যে থামিও না যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম (virtue) তোমার নেত্রসম্মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া না ওঠে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না দেখিতে পাও তোমার হৃদয়ে সংযম (temperance) পবিত্র শুদ্ধতায় গভীরে প্রবিষ্ট।"

সর্বোচ্চ আদর্শ হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ বা পরম ব্রহ্মের অনুধ্যান ও ক্রমশঃ তাহার সহিত একাত্মতায় উপনীত হওয়া ; এবং এই আদর্শ-অন্বেষায় যে পরিতৃপ্তি মানুষ পায় তাহাকে আত্মকেন্দ্রিক অথবা এমন কি পরার্থে কাম্য সুখের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ভুল হইবে, কেননা 'সুখ' পরম শ্রেয়ের সূচক নয়, ইহা আমাদের শ্রেয়ঃ বা আপেক্ষিক শ্রেয়সূচক। এই আপেক্ষিক অর্থে জড়ের শ্রেয়ঃ হইতেছে আকার (form) ; আকারের শ্রেয়ঃ দেহ ; দেহের শ্রেয়ঃ আত্মা ; আত্মার শ্রেয়ঃ ধর্ম এবং ধর্মোপরি যে চৈতন্য আছে তাহা ; এবং চৈতন্যের শ্রেয়ঃ সেই পরম শ্রেয়ঃ (The Good)।

এইরূপে প্লটইনাসের মতে অগ্রবর্তী এক জগতের দিকে, অন্য এক জগতের অর্থাৎ চৈতন্য-জগতের দিকে এবং তাহা অতিক্রম করিয়াও সেই পরম একের অন্যনিরপেক্ষ ঐক্য, যাহা সকল কিছুর আদি উৎস, তাহার দিকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে উন্নীত হওয়ার মধ্যেই সকলকিছুর শ্রেয়ঃ নিহিত। তাঁহার অন্য জগতাভিমুখিতা যদিও কৃচ্ছ্রতাবাদী এবং প্রাচীন খ্রীষ্টানদিগের মতের সহিত এক নয়, কেননা তাহারা অবিবাহিত জীবন যাপন সমর্থন করিতেন ও দেহগত সকল ব্যাপার বর্জন করিতে বলিতেন। কিন্তু প্লটইনাসের মতে দাম্পত্যপ্রেম হইতেছে পরম একের সহিত চৈতন্যের যে একাত্মতা তাহারই প্রতিচ্ছবি এবং হয়তো চৈতন্য-জগতাভিমুখে উন্নীত হওয়ার প্রথম সূত্রপাত। যদিচ দেহের সহিত সংযোগ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তথাপি দেহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত

নয়। মানুষ তাহার দেহকে "যাহা কিছু প্রয়োজন এবং দেয়া সম্ভব দেবে যদিও সে নিজে অন্য এক জগতের অন্তর্গত।" একজন সঙ্গীতজ্ঞ যেরূপ তাহার তার যন্ত্রটি ব্যবহার করে—যন্ত্রটি জীর্ণ হইয়া গেলেও সে যেরূপ বিনা যন্ত্রে গান গাহিতে পারে সেইরূপ মানুষও তাহার দেহের ব্যবহার করিবে।

প্লটইনাসের মতে জড় হইতেছে অশ্রেয়ঃ (evil) কিন্তু জড় হইতে মুক্তিলাভের জন্য আত্মহত্যার যে আদর্শ ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ দেন তাহা প্লটইনাসের সমর্থন পায় নাই। এই মুক্তি লাভ করিতে হইবে জড়-কে আকারের (form) অধীন করিয়া—জড়ত্বগ্রস্ত মানুষ ও তাহার দৈহিক কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চতর এক মানবসত্তা ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত করিয়া।

মানুষের সর্বাত্মক নৈতিক নীচতা সম্পর্কে যে নষ্টিক (Gnostic) মতবাদ আছে প্লটইনাস তাহার বিরোধী মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে নৈতিক অপরাধ সর্বদা কিছু না কিছু মঙ্গলের সহিত মিশিয়া থাকে এবং কোনো মানুষই সম্পূর্ণতঃ মন্দ নয়। দোষ-প্রবণতা চরিত্র হইতে আসে এবং চরিত্রের ভিত্তি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। সর্বব্যাপক আত্মা স্বাধীনতা ও আবশ্যিকতা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে।

প্লটইনাস্ 'এনীডস্-'এর একটি অধ্যায়ে তাঁহার সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। সৌন্দর্যতত্ত্বকে দর্শনের একান্ত অন্তর্গত একটি অংশরূপে পরিচিত করান, দেহী ও আত্মিক সৌন্দর্যের এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শিল্পের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য খ্যাতি তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার মতে সৌন্দর্য কেবল অনুপাত বা সুসঙ্গতিই (harmony) নয়; কারণ তাহা হইলে সৌন্দর্য কেবল বিভিন্ন সমগ্রের মধ্যেই থাকিবে, সমগ্রের কোনো অংশে থাকিবে না, যথা এক একটি সরল রঙে তাহা থাকিবে না। সৌন্দর্য তাহা হইলে সমভাবে কোনো কুশ্রী সমগ্রেরও গুণ হইতে পারে—যাহার হয়তো আভ্যন্তরিক অনুপাত আছে কিন্তু সৌন্দর্যের সহিত যাহার বিরোধ। সৌন্দর্য হইতেছে প্রকৃতই বস্তুর গুণ আত্মা যাহা স্বীয় স্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যের সমধর্মীয় মনে করে এবং কুশ্রীতা বস্তুর সেই গুণ যাহা আত্মা নিজের প্রকৃত স্বরূপের অন্যধর্মীয় মনে করে। সুতরাং বস্তু যেহেতু চৈতন্য-জগতের ভাব বা আকারে (forms) অংশ গ্রহণ করে সুতরাং সৌন্দর্য জানিতে গেলে আমরা এই আকারগুলিই সম্পর্কেও অবহিত হই। কুশ্রী বস্তুতে যে পরিমাণে এই আকারের অভাব সেই পরিমাণে তাহা কুশ্রী এবং সুন্দর বস্তুর মধ্যে যে অনুপাতে এই আকার উপস্থিত সেই অনুপাতে তাহা সুন্দর। যাহা চরম কুশ্রী তাহা সকল আকার বর্জিত, "সকল দিব্য তাৎপর্যহীন"। এই আকারগুলি সকল অংশকে সংগ্রাহিত ও একত্রিত করিয়া এক একটি সমগ্র বা

ঐক্য গড়িয়া তোলে এবং এইরূপে সৃষ্ট সমগ্র সুন্দর; ইহার অংশগুলিও সেইরূপ সুন্দর।

বিদেহী বস্তুমাত্রেরই সৌন্দর্য নির্ভর করে ইহার কলুষমুক্তির উপর। কুশ্রী চরিত্র মলিন কামনাসক্তি। কলঙ্কিত। শুদ্ধ আত্মা একটি ভাব বা আকারে রূপান্তরিত হইয়া যায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণতঃ চৈতন্যময় হইয়া যায়।

শ্রেয়ঃ এবং সুন্দর একই। পরম এক, পরম শ্রেয়ের সদৃশ হওয়াই আত্মার প্রকৃত সৌন্দর্য। যিনি সেই পরম একেকে দেখেন নাই তিনি পরম শ্রেয়ঃরূপে তাহাকে কামনা করেন; যিনি দেখিয়াছেন তিনি তাহাকে পরম সুন্দর বলিয়া অভিনন্দিত করেন। 'পরম শ্রেয়ঃ' বা 'পরম সুন্দর' তাঁহাদেরই সৌন্দর্য মণ্ডিত করে যাঁহারা ইহাকে ভাল-বাসেন। যিনি 'দিব্য-দর্শন' লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার উচিত দেহী সৌন্দর্যের প্রতি চক্ষু বন্ধ করা। যদিচ সত্য যে তিনি এই জগতের মহৎ বিষয় লইয়া বিশেষতঃ মহৎ কার্যাবলীর অনুধ্যান মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং নিজে ক্রমশঃ সুন্দরতর হইয়া উঠিতে পারেন। আত্মা নিজে সুন্দর হইয়াই সৌন্দর্য দেখিতে পায়।

একজন শিল্পী সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করে অনুকরণ দ্বারা-এরিষ্টটলের এই অভিমত গ্রহণ-যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে অনুকরণ নহে কল্পনা দ্বারাই শিল্পী সুন্দর সৃষ্টি করে এবং সেই শিল্পী অধিকতর জ্ঞানী স্রষ্টা। কেননা কেবল যাহা দেখা হইয়াছে তাহারই প্রতিরূপ গড়িতে পারে অনুকরণ কিন্তু কল্পনা যাহা দৃষ্ট হয় নাই তাহাও সৃষ্টি করিতে পারে। শিল্পী অনুপ্রাণিত হন চৈতন্য-জগতের ভাব বা আকার দ্বারা। অতএব তাঁহার ক্রিয়াশক্তি নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলে সেই সৃজনশীল 'পরম ক্রিয়াশক্তি'র (formative Activity) সহিত যে ক্রিয়াশক্তি সকল সৌন্দর্যের উৎস ও মূল। সেইজন্যই শিল্পের মধ্যে যে স্বতস্ফূর্ততা দেখা দেয় তাহা কোনো কৃত্রিম দক্ষতার ফল হইতে পারে না কিংবা এমনকি চেষ্টিত কাজের মধ্যেও প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রকৃতি সুন্দর কেননা ইহা চৈতন্য-জগতের 'ভাব' বা 'আকারে' অংশ গ্রহণ করে।

যদিও প্লটইনাসের দর্শন অত্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক তথাপি তিনি প্রকাশ্য পূজা-অর্চনার প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে প্রত্যেক মানুষের উচিত স্বর্গীয় করুণা লাভের জন্য ঊর্ধ্বাভিসারী প্রেমের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করা; অবশ্য "দেবগণই আমাদের নিকট আসিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের যাইতে হইবে না।" প্রার্থনা হইতেছে পরম একের সহিত সাযুজ্য লাভের জন্য মানবাত্মার নীরব আর্তি।

এরিষ্টটলের মত প্লটইনাসও মানুষ অপেক্ষা অধিকতর দিব্য শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন সত্তায় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ইহারা হইলেন বিভিন্ন দেবতা যাঁহাদের বলা যায়

উচ্চতর পর্যায়ের অপ্রাকৃত শক্তি, সাধারণ অপ্রাকৃত শক্তিসমূহ এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পৃথিবী প্রভৃতি সৌরজাগতিক অন্যান্য সত্তা। ইঁহারা সকলেই বিশ্বাত্মার সৃষ্টি। উক্ত দেবগণ সকলেই চৈতন্য-জগতের নিম্নতর এক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেন এবং তাঁহারা সকলে মূলতঃ এক অথবা বলিতে গেলে একই সকলের মধ্যে বিরাজমান। চন্দ্র অবস্থান করেন চৈতন্য-জগৎ এবং তন্নিম্নতর জগতের সীমান্তরেখায়। চন্দ্র অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর যে কোনো সত্তাই দেবতা। বিভিন্ন অপ্রাকৃত এবং সৌরজাগতিক শক্তিসমূহ চৈতন্য জগতের নিম্নতর পরিমণ্ডলে অবস্থান করে। অপ্রাকৃত শক্তিসমূহ বিশ্বাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে বাস করে। তাঁহারা চিরন্তন এবং চৈতন্যের উপাদানে তাঁহাদের দেহ গঠিত। তাঁহারা ঊর্ধ্বস্থিত চৈতন্য-জগৎ দেখিতে পান; তাঁহাদের অনুভবশক্তি ও স্মৃতিশক্তি আছে এবং তাঁহারা মানুষের আবেদন শুনিতে পান; অধিকন্তু তাঁহারা নিজেদের আগ্নেয় এবং বায়বীয় আচ্ছাদনে নিজেদের আবৃত করিতে পারেন। সূর্য নক্ষত্ররাজি এবং পৃথিবী আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং ভবিষ্যৎ সংঘটনের পূর্বাভাষ দেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুগ বলিয়া কোনো কার্য ঘটাইতে পারে না।

২। দ্বিতীয় পর্যায়

প্লটইনাস্ ছিলেন প্রাচীনকালের শেষ মহৎ দার্শনিক। মধ্যযুগে তাঁহার প্রভাব এমন কি এরিষ্টটল অপেক্ষাও অধিক ছিল। মুসলমান সংপ্রদায় গ্রীক সাহিত্য চর্চা করিয়া এরিষ্টটলের ভাষ্য রচনা করার পূর্বে এরিষ্টটল কেবল প্লেটোর একজন শিষ্যরূপেই পরিচিত ছিলেন। প্লটইনাসের মতবাদই প্রথমত প্যাগান ধর্মের, তারপর খ্রীষ্টধর্মের এবং অবশেষে ইসলামীয় রহস্যবাদ ও ও নব্য প্লেটোবাদের একটি দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। প্লটইনাসের পরে কোনো নব্যপ্লেটোবাদী তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। যাঁহারা ঐ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ম্যালকাস্, জ্যামব্লিকাস্ এবং প্রোক্লাসই প্রধান।

ম্যাল্‌কাস্‌

ম্যাল্‌কাস্‌ ২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফিনিসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে অধ্যয়ন করেন লংগীনাসের নিকট। এই সময়ে তিনি তাঁহার নামের পরিবর্তিত গ্রীক রূপ পর্‌ফিরি নাম গ্রহণ করেন। যখন তিনি ত্রিশ বৎসরের তখন তিনি প্লটইনাসের শিষ্য হন এবং প্লটইনাসের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার সহিত ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর খ্রীঃ ৩০৪ পর্যন্ত তিনি রোমে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্লটইনাসের রচনাবলী সংগ্রহ করেন এবং 'এনিডস্‌' নামে সুসংবদ্ধ সংকলনটির সম্পাদনা করেন। তিনি সেই রচনাবলীর সহিত একটি জীবনীতথ্যমূলক মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত করিয়া দেন। অধিকন্তু তিনি পিথাগোরাস্‌-এরও একটি জীবনী রচনা করেন। যদিচ মোটামুটি তিনি গুরুর শিক্ষায় বিশ্বাসী তথাপি এরিষ্টটলীয় জ্ঞানের আকার (Categories) সম্পর্কে প্লটইনাসের সমালোচনার সহিত তিনি একমত ছিলেন না এবং 'এরিষ্টটলীয় জ্ঞানের আকার আলোচনা'তে তিনি উক্ত আকারগুলির সমর্থন করেন। এই গ্রন্থে তিনি পাঁচটি যৌক্তিক ধারণা বা 'বিধেয়ক' (Predicables) লইয়াও আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে এই বিধেয়কগুলির পার্থক্য নির্ণয় সুস্পষ্ট করিয়া তোলে যে 'দ্রব্যত্ব' বা 'সত্তা (being) হইতেছে সর্বোচ্চ ধারণা এবং ইহা 'পর্‌ফিরির বিভাগ নামে খ্যাত দ্বি-কোটিক বিভাগের (Division by Dichotomy) সূচনা করে। এই দ্বি-কোটিক বিভাগ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ধারণা 'দ্রব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্যক্তি-মানুষ' পর্যন্ত আসিতে গেলে মধ্যবর্তী কতগুলি ধারণা, যথা, 'পদার্থ,' 'চেতন-পদার্থ,' 'প্রাণী,' এবং 'মানুষ,' পরপর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। ম্যালকাস্‌ অধিকন্তু এই সমস্যা উত্থাপন করেন যে সামান্য, উপজাতি, জাতি (Genus) প্রভৃতি কেবল মনোগত ধারণা কিংবা ইহাদের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। পুনরায় যদি ইহাদের বহির্জগতে অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য : ইহাদের স্বরূপ কি জড়বস্তুর মত অথবা ইহারা কি নিরবয়ব? যদি নিরবয়ব (incorporeal) হয় তাহা হইলে ইহাদের বস্তু-নিরপেক্ষ নিজস্ব সত্তা আছে না ইহারা বস্তুতেই নিহিত? এই সমস্যাটি মধ্যযুগে দার্শনিক আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্লটইনাসের মধ্যে সেইটুকু কুসংস্কার ছিল যেটুকু সেই সময়ে থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু পর্‌ফিরি সম্পর্কে ইহা বলা যায় না—অন্যান্য নব্য-প্লেটোবাদী সম্পর্কে আরো বলা যায় না। পর্‌ফিরি স্বীয় শিক্ষাগুরুর যে জীবনী রচনা করেন তাহাতে অপ্রাকৃত জাদু-শক্তি এবং দুষ্কৃতি-শক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন পর্‌ফিরির অন্যথায় বিশ্বাসযোগ্য সত্য পরিচয়টি বিকৃত করিয়া দিতে পারে।

জ্যাম্‌ব্লিকাস্

কলি-সিরিয়ার অন্তর্গত ক্যাল্‌সীস্ নিবাসী (আনুমানিক ৩৩০ খ্রীঃ) জ্যাম্‌ব্লিকাস্ পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা, 'প্লেটোর সংলাপ' এবং এরিষ্টটলের 'Analytica'-র উপর তাঁহার ভাষ্য পাওয়া যায় নাই। পিথাগোরাস্ সম্পর্কে একটি বৃহৎ রচনার অংশবিশেষ যদিচ পাওয়া গিয়াছে। জ্যাম্‌ব্লিকাস্ রোমে পর্ফিরির অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং তারপর সিরিয়ায় চলিয়া যান ও সিরিয়ার নব্য-প্লেটোবাদী গোষ্ঠীর মুখ্যব্যক্তি হইয়া উঠেন। এই গোষ্ঠী প্রখ্যাত ছিল পিথাগোরাস্ প্রণীত মতবাদের প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গীসম্মত বিশ্লেষণ এবং অপ্রাকৃত জাদুরহস্যবাদী প্রবণতার জন্য। অথচ প্লটইনাস পরিচালিত রোমের দার্শনিকগোষ্ঠী তখনও গভীরভাবে গ্রীক মনোভঙ্গীসম্পন্ন ছিল, কেননা ইহার জগৎ-বিকিরণবাদ (emanation) এবং কৃচ্ছ্রতাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিতত্ত্ব সত্ত্বেও এই গোষ্ঠী 'অনুধ্যান'কেই (Contemplation) সর্বোচ্চ স্থান দিতেন এবং সার্বিক যুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।

জ্যাম্‌ব্লিকাসের দর্শন পিথাগোরাস্, প্লেটো এবং মিশর ও প্রাচ্যের ধর্মাবলী এবং জাদুরহস্যতত্ত্বের প্রভাবাচিহ্নিত। ইহা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অপেক্ষা প্যাগান দেবগোষ্ঠী, অপ্রাকৃত জাদু-রহস্যের প্রভাব এবং অলৌকিক বিভিন্ন শক্তি সম্পর্কিত বিশ্বাসকেই অধিক সমর্থন করে। তিনি ত্রয়ী (Triad) সমন্বিত একটি যৌক্তিক পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন যাহা দ্বারা তিনি হোমার উল্লিখিত এবং অন্যান্য দেবতাবর্গের একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। প্লটইনাস্ কথিত 'আত্মা'র 'চৈতন্যে' অংশ গ্রহণ এবং 'চৈতন্যে'র 'পরম এক'-এ অংশ গ্রহন সম্পর্কে তিনি বিপরীত মত পোষণ করিতেন। কেননা উক্ত পদ্ধতি সেই অনির্বচনীয় 'এক'-এর অন্যনিরপেক্ষ অদ্বয়সত্তার ব্যাঘাত ঘটায়। এই যুক্তির সহায়তায় তিনি খ্রীষ্টীয় 'মানুষ-ঈশ্বর' তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি ঈশ্বরের অন্য নিরপেক্ষ অদ্বয়সত্তা হইতে গৌণ ত্রয়ী-সত্তা নির্ণয় করেন যাহা হইতে আবার তিন পর্যায়ের দেবতার আবির্ভাব, যথা, বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতিপ্রাকৃত এবং জগৎ-নিহিত দেবতা। প্রথমোক্ত দুই পর্যায়ের দেবতাগণ জগৎ-অতিক্রান্ত, তৃতীয় পর্যায়ের দেবতাগণ পিথাগোরাসের 'সংখ্যা', প্লেটোর 'সামান্য ধারণা' বা এরিষ্টটলের 'বিমূর্ত আকার' ইত্যাদির সহিত অভিন্ন এবং তাঁহারাই আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করেন। আত্মা এবং চেতনসত্তা কেবল তৃতীয় পর্যায়ের দেবতাগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে কিংবা অংশগ্রহণ করিতে পারে।

প্রোক্লাস্

প্রধান নব্য-প্লেটোবাদী দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে তৃতীয়জন হইতেছেন প্রোক্লাস্। তিনি বাইজান্টিয়ামে জন্মগ্রহণ করেন (৪১২—৪৮৫খ্রীঃ), প্রথমতঃ লিসিয়া-তে এবং তারপর আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেন। অল্পকাল তিনি এথেন্সে নেস্‌টোরিয়স্-এর পুত্র প্লুটার্ক-এর নিজস্ব স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখানে শিক্ষা সমাপ্তির পর প্লুটার্ক-এর পরবর্তী সিরিয়ানাসের সহযোগিতা করেন, তারপর তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার মধ্যে বিশ্লেষণী চিন্তার সম্যক ক্ষমতার সহিত পুরাণতত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং তিনি জ্যাম্‌ব্লিকাসের তুলনায় পুরাণতত্ত্বের সমর্থনে বিশ্লেষণী যুক্তির প্রয়োগ অধিক পরিমাণে করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গ্রীক প্যাগান মতবাদের তিনি ছিলেন প্রকৃত স্কলাষ্টিক চিন্তাবিদ। সিরিয়ানাস-এর মত তিনিও 'অর্‌ফিকা' এবং অন্যান্য নব-পিথাগরীয় রচনাবলীকে উচ্চস্থান দিতেন। তিনি সমস্ত গূঢ়তত্ত্বে নিজে দীক্ষিত হইলেন এবং নিজেকে তিনি সমগ্র জগতের রহস্যবাদের প্রবক্তা মনে করিতেন। জ্যাম্‌ব্লিকাসের মত তিনিও খ্রীষ্টধর্মকে ঘৃণা করিতেন এবং তাহার বিরোধিতা করেন। খ্রীষ্টধর্ম এই সময়ে সম্প্রসারণশীল এবং অত্যাচারী হইবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রোক্লাস দর্শন ব্যতীত গণিত ও ব্যাকরণশাস্ত্র সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্লটইনাস্ এবং জ্যাম্‌ব্লিকাস্ অপেক্ষা এরিষ্টটলকে গভীরতর শ্রদ্ধা করিতেন। এরিষ্টটলের 'অরগ্যানন্' তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। প্লেটোর রচনাবলী সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্যসকল যদিও ভ্রান্তব্যাখ্যামূলক, তথাপি সূক্ষ্ম ও দক্ষতাসূচক। তাঁহার Institutis Theologica প্লটইনাসের মতবাদের মূলগত আলোচনা এবং Theologia Platonica-র মধ্যে আছে সেই মতবাদের জ্যাম্‌ব্লিকাসকৃত সংশোধনী ব্যাখ্যার বিবরণ। তাঁহার নিজস্ব দর্শন উভয়ের সমন্বয়। এইজন্য তাঁহার দর্শন অনেক কম মৌলিক হইলেও নব্য-প্লেটোবাদের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ। তিনি প্লটইনাসের মত এরিষ্টটলের এই মতবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন যে বাহ্য বস্তুসকল আকার ও উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্লেটো-এরিষ্টটল কৃত দেহ, আত্মা ও চৈতন্যের পার্থক্য তিনি স্বীকার করিতেন।

অনির্বচনীয় 'পরম এক' হইতে জগতের উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া প্রোক্লাস জ্যাম্‌ব্লিকাসের অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পরম এক' হইতে বহুপদার্থের জগৎ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারাটি দ্বান্দ্বিক। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি এই সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কার্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মূলতঃ অভিন্ন; সুতরাং কার্য সেই স্বতন্ত্র অবস্থা হইতে কারণে ফিরিয়া যাইতে চায়। সেইহেতু প্রত্যেক সংঘটনে তিনটি পর্যায় আছে—

ইহারা হইল কারণের স্থায়ীত্ব, ঘটনার উদ্ভব এবং তাহার স্থায়ী কারণে প্রত্যাবর্তন ও একাত্মতালাভ। সমগ্র পদ্ধতিটি এইরূপ বিভিন্ন 'ত্রয়ী'-র (triad) শৃঙ্খল। প্রোক্লাস তাঁহার তত্ত্ববিদ্যাগত ধর্মশাস্ত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিভাগে এই ত্রয়ীপদ্ধতি অনুসরণ করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার এই ছকের সাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যাহাকে কেবল রূপকার্থে এক পরম শ্রেয়র, পরম ব্রহ্ম এবং আদি কারণ বলা যাইতে পারে, সেই পরম এক হইতে দিব্য উপাদানের প্রকাশস্বরূপ সত্তা (being), জীবন এবং তাহাদের ঐক্য, অর্থাৎ চৈতন্য, এই তিনটি তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পুনরায় সত্য হইতে উদ্ভূত হয় অসীম, আদর্শ (The end) এবং তাহাদের ঐক্য অর্থাৎ সসীম। জীবন হইতে উদ্ভূত হয় সম্ভাবনা। অস্তিত্ব এবং তাহাদের ঐক্য বোধগম্য জীবন। চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হয় নিষ্ক্রিয় চিন্তা সক্রিয় চিন্তা (প্রত্যক্ষ) এবং তাহাদের ঐক্য অর্থাৎ বিচারশীল চিন্তা। প্রথম 'ত্রয়ী' দিব্য উপাদানরূপে ঈশ্বরের পরিমণ্ডল। দ্বিতীয় ত্রয়ী অপ্রাকৃত শক্তিগুলির এবং তৃতীয় ত্রয়ী চৈতন্য-জগতের পরিমণ্ডল। এই তিনপ্রকার 'ত্রয়ী'-র সাহায্যে প্রোক্লাস্ বহুদেববাদের একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দিব্য উপাদানের এই দ্বান্দ্বিক পরিকল্পনাটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটি অবশ্য আমাদের নিকট কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের স্বরূপ প্রকাশের জন্যই রচিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই 'অনির্বচনীয়' হইতেছেন অতিপ্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত উপায় মাধ্যমেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ধর্মীয় সত্য আবিষ্কার করা যায় অলৌকিক জাদু-শক্তির সাহায্যে।

প্লটিনাসের সহিত একমত হইয়া প্রোক্লাসও মনে করেন যে 'অনির্বচনীয় ঐক্য' হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হয় সকলই দিব্য উপাদানের ক্রমাবনতি অথবা ক্রমক্ষয়, যাহাতে নিম্নতর পদার্থসমূহ সর্বদা উচ্চতর পদার্থসমূহের অধীন হয়। কিন্তু যখন তিনি বলিলেন যে অন্যান্য 'ত্রয়ী'গুলিতেও চৈতন্যের তিনটি পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন তিনি মনে হয় অন্তত পরোক্ষভাবে এই অধীনতার সম্পর্ক অস্বীকার করেন।

প্রোক্লাসের নীতিতত্ত্ব প্লটিনাসের নীতিতত্ত্ব হইতে পৃথক নয়। আমাদের নৈতিক আদর্শ হইতেছে সেই অনির্বচনীয় পরম একের দিব্যদর্শন। মানবাত্মা তখনই কেবল ইহা লাভ করিতে পারে যখন আত্মা নিজের অন্তরতম স্বরূপে প্রবেশ করে যেখানে সেই পরম একের অবস্থিতি। যখন ইহা ঘটে তখন আমরা দিব্যানন্দে অথবা ভাবোন্মত্ত অবস্থায় থাকি। কেবল এই অবস্থাতেই আমরা পরম একের সহিত একাত্ম হইতে পারি এবং এই একাত্মতার মধ্যেই আমরা পরম অভীষ্টে উপনীত হই। একটি বিষয়ে তিনি

প্লটইনাস্ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন—যেহেতু তিনি স্বর্গীয় শক্তি এবং অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের করুণালাভের উপায়রূপে জাদু-কৌশল চর্চা এবং ধর্মসম্মত বিধি ও অভ্যাসাদি পালনের নির্দেশ দেন।

৩। তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ের নব্য-প্লেটোবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রোমক স্কুলের এ্যামেলিয়াস্ এবং ইয়ুস্টেকিয়াস্; সিরিয়া স্কুলের থিয়োডোরাস্, ক্রিসানথিয়াস্, ঈডিসিয়াস্, ঈউসেরিয়াস্, ম্যাক্সিমাস্, এবং হাইপটিয়া; এথেন্স স্কুলের ম্যারিনাস্, ঈসিডোরাস্, জেনোডোটাস্ এবং ড্যামাস্কিয়াস্। শেষোক্ত স্কুলের প্রধান ছিলেন ড্যামাস্কিয়াস্। তারপর খ্রীঃ ৫২৯-এ সম্রাট জাষ্টিনিয়ান ঐ স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেন এবং এথেন্সে গ্রীক দর্শনের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ড্যামাস্কিয়াস্ সিম্প্লিকিয়াস্ এবং অন্যান্য নব্য-প্লেটোবাদী দার্শনিকদের সহিত দেশান্তরিত হইয়া পারস্যে চলিয়া যান। যদিও সেই দলের কেহ কেহ জুন্দি-শাহপুরস্থ নওসেরওয়ান্ প্রবর্তিত স্কুলে থাকিয়া যান। তাহা হইলেও অবশিষ্ট অন্যান্যেরা অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। গ্রীক দর্শন অন্তর্নিহিত বিকার এবং অবক্ষয়ী-প্রবণতার জন্য ক্ষয়িষ্ণু হইয়া আসিতেছিল এবং হয়তো ক্রমশঃ আপনা হইতেই অবলুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু উক্ত সম্রাটের অসহনীয়তা হেতু এই দর্শনচিন্তা পূর্বদেশে প্রেরিত হইল। সেই দেশে এই চিন্তাধারা মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করিল এবং পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে এই চিন্তাধারাই ফিরিয়া আসিল অধিকতর সজীবতা এবং গৌরব সমন্বিত হইয়া।

টীকা :—

তুলনীয় মাণ্ডুক্য উপনিষদ্।

গ্রন্থপঞ্জী

Heinemann, F	:	Plotin, Leipzig, 1921.
Mackenna, S	:	The Enneades of Plotinus, London, 1917-19.
Inge, W. R.	:	The Philosophy of Plotinus, 2 Vol., 2nd ed. London and NY. 1929.
Brigg, C.	:	The Christian Platonists of Alexandria, Oxford, 1913.
Taylor, A. E.	:	Platonism and its influence.
Elomer. Paul	:	Platonism.
Walter Pater	:	Plato & Platonism.
Brehier, E	:	La Philosophie de plotin, Paris, 1928.
Brehier, E	:	(Bude) : Plotin, Enneades, Gr. Text and Fr, Trans 6 Vol, Paris, 1930-40.
Arnou	:	Le Desir de Dien Dans La Philosophie de Plotin, Paris.
Dodds	:	Select passages illustrating Neo Platonism, S. P. CK. 1923.

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেণ্ট অগাষ্টিন ও তাঁহার পূর্বসূরীগণ

১। ভূমিকা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দর্শনের ইতিহাসে সেণ্ট অগাষ্টিন এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রোমীয় আফ্রিকার টাগাষ্টেতে ৩৫৪ খৃষ্টাব্দেতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিপ্পো সহরের বিশপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বহুদূর প্রসারিত রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন এবং ইওরোপ-নিকটবর্তী ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর বহু দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তাঁহার চরিত্রকে গঠন করিয়াছিল এবং চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়াছিল। তাঁহার জীবনে হিব্রু সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ রক্ত সম্পর্কে বা ফোনেশীয় সমাজের মাধ্যমে এই প্রভাব তাঁহার জীবনে প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি ফোনেশীয় ভাষা ও ভাবধারার সহিত সমধিক পরিচিত ছিলেন। ম্যানি প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং নয় বৎসর ধরিয়া তিনি ইহার অনুশীলন করিযাছিলেন। তাঁহার ধীশক্তি বিকাশে ল্যাটিন ও গ্রীক ক্ল্যাসিক গ্রন্থের অবদান অসামান্য। বাল্যকাল হইতে তিনি ল্যাটিন ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং কেবল-মাত্র ঐ একটি ভাষার মাধ্যমেই তাঁহার সমস্ত শিক্ষালাভ সম্পন্ন হইয়াছিল। বালক বয়সে তিনি টেরেন্স, হোরেস, ক্যাটাশাস, ওভিদ, জুভেনাল, পার্সিয়াস এবং মার্শাল প্রভৃতি ল্যাটিন কবির নির্বাচিত অংশসমূহ পাঠ করিতেন। ভার্জিলের গ্রন্থ তিনি বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যপাঠে তিনি প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার লেখাতে ল্যাটিন কবিদের সহিত পরিচিতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এই পরিচিতি তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে শুরু হয়। এই বয়সে তিনি সিসেরোর হোর্‌টেন্‌সিয়স পাঠ আরম্ভ করেন এবং ইহা তাঁহার মনে দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগের সৃষ্টি করে। বাল্যে তিনি গ্রীক ভাষাও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ ভাষার জটিলতা আয়ত্তে আগ্রহই না থাকায় বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। পরে এই জন্য তিনি অনুশোচনা করিয়াছিলেন এবং নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ বুঝিবার জন্য যতটুকু গ্রীক তিনি জানিতেন তাহার সদ্ব্যবহার

করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীস দেশীয় নব্য প্লেটোবাদ এই দার্শনিক মতবাদটির নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই মতবাদটি তাঁহার চিন্তার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য এই মতটিকে তিনি তাঁহার পরিণত মনের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে বিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস তাঁহার মাতার প্রভাবে শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তবে সাময়িকভাবে এই বিশ্বাসের লালন পালনে কিছুদিনের জন্য অবহেলাও হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এই ধর্ম বিশ্বাস যখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর তখন যাজকত্ব গ্রহণে মানসিক পরিবর্তনের সময়ে এক নবতর শক্তিতে তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং আমৃত্যু তাঁহার জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইহার ব্যাপক আধিপত্য দেখা গিয়াছিল। এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের দার্শনিক মতবাদের ভিতরকার এক নিগূঢ় সংযোগের প্রমাণ তিনি তাঁহার আপন জীবনের মত ও পথের মধ্য দিয়া এক আশ্চর্য সহজ উপায়ে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেণ্টপলের পর শ্রেষ্ঠ খৃষ্টধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে তাঁহার নাম সর্বজনস্বীকৃত। আর সেই সুদূর অতীতকাল হইতে এই বর্তমান কাল পর্যন্ত খৃষ্টীয় জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাঁহার গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। ইহা এক নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য যে আফ্রিকা, পারস্য, গ্রীস, রোম প্যালেস্টাইনের মত পৃথিবীর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া খৃষ্টধর্মের আদিযুগের একজন চিন্তাবিদ পৃথিবীর সর্বযুগের শ্রদ্ধাস্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়া আছেন। সেইজন্য তিনি পূর্ব-পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

২। সেণ্ট অগাষ্টিন এবং মানিসীয়বাদ

মানসিকতার তারুণ্যে অগাষ্টিন মানিসীয়বাদী দর্শনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। মেন্‌স্ বা মানী নামক এক পারস্য দেশীয় ব্যক্তি এই মতবাদটির প্রবর্তক ছিলেন। ২৪০ হইতে ২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে এই মতবাদটি প্রচারিত হইয়াছিল। এই দার্শনিক মতটির প্রধান প্রধান সূত্রগুলি ফাউণ্ডেসন নামক লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং মানী ইহা লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সেণ্ট অগাষ্টিনের সমসাময়িক ও মানিসীয় ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ফাউস্টাসের রচনাতেও উক্ত মতবাদটির প্রধান প্রধান সূত্রগুলির উল্লেখ ও আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেণ্ট অগাষ্টিনের রচনাতেও এই মতবাদটির সম্বন্ধে অজস্র মন্তব্য ও আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনা ও তথ্য হইতে মতবাদটির প্রধান প্রধান নীতিগুলির স্বরূপ সহজেই জানিতে পারা যায়। মানিসীয়বাদীদের মতে পৃথিবীতে চিরকালের বিপরীত দুইটি অবস্থা আছে। একটি হইতেছে পরমপিতা ঈশ্বর পরিচালিত "আলোর সাম্রাজ্য"। আর একটি হইতেছে ভয়ংকর রাজপুত্র শাসিত "অন্ধকারের সাম্রাজ্য"। এই রাজপুত্র যদিও দেবতা নন তবুও ঈশ্বরের মতই তিনি অবিনশ্বর, অমর। "অন্ধকারের সাম্রাজ্য" বস্তুগত সত্তা বিশিষ্ট এবং "আলোর সাম্রাজ্য" আধ্যাত্মিক সত্তা বিশিষ্ট। সেইজন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ ও বৈরীতা লাগিয়াই থাকে। মানিসীয়বাদে এইভাবে পৃথিবীতে পাপ ও শয়তানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই দ্বৈতবাদ পারস্যের ধর্মগত এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত। পাপের অস্তিত্বগত সমস্যা পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে ব্যর্থ করিয়াছে। অথচ এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবেই পারস্যে কেমন করিয়া বৈশিষ্ট্যমূলক অবদান সৃষ্টি হইল তাহার কারণ অন্বেষণ নিঃসন্দেহে এক চমকপ্রদ ও অনুধ্যানসাপেক্ষ বিষয়।

মানুষের অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে মানিসীয়বাদীরা বলেন যে, নির্বাচিত ব্যক্তিসত্তা দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু নিকৃষ্ট আত্মাগুলি এই মুক্তিলাভে অক্ষম বলিয়া পুনর্জন্মের মধ্য দিয়া ইতর প্রাণীতে পদাবনতি প্রাপ্ত হইবে এবং পৃথিবীর নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে। মানিসীয় মতবাদের প্রধান অংশ একটি বিশিষ্ট পৌরাণিক কাহিনী হইতে গঠন লাভ করিয়াছে।

মানিসীয় মতবাদীরা খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অতি উচ্চ সমালোচনাপূর্ণ ধারণা পোষণ করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহারা অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন! আবার ঐ গ্রন্থের বক্তব্যের সহিত যে স্থলে তাহাদের দৃষ্টিকোণের অসংগতি দেখা গিয়াছে সেইস্থলে বিনাদ্বিধায় ঐ বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ অংশকে অস্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাহারা বাইবেলের নবতর অংশটিকে (New Testament) নানাদিক দিয়া শোচনীয় কলুষিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে খৃষ্টধর্মের মৌলিক উপাদান হইতেছে নীতিমূলক আচরণ, যুক্তিবিহীন গোঁড়া বিশ্বাস নহে। মানী দাবী করিয়াছেন যে তাঁহার মতবাদ ও খৃষ্টীয় মতবাদ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এবং তিনি যীশুখৃষ্টের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন এবং সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে তিনি বিধিসংগত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মানী নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মানীসিউস, স্বয়ং

পরমপিতা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রেরিত একজন খৃষ্টধর্ম প্রচারক।" মানিসীয়বাদ প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টধর্মের বিশুদ্ধ ও একান্ত রূপ এই কৌতূহলজনক দাবী সেণ্ট অগাষ্টিনের সময়কার মানিসীয়বাদের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

খৃষ্টান পরিবারে জন্মাইয়াও মানিসীয় মতবাদের আশ্চর্যজনক পরস্পর বৈপরীত্যে সেণ্ট অগাষ্টিন কেন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে বহুতর কারণ রহিয়াছে। যে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা তিনি যৌবনে লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত, অস্থির, জিজ্ঞাসু মনের সমস্থার সমাধানের পক্ষে সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত ছিল। খৃষ্টধর্মের অপরিহার্য সূত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল হইতে পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে খৃষ্টধর্ম ঈশ্বরকে অন্যায়ের উৎস রূপে স্বীকার করে না। অমংগলের অস্তিত্ব তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল এবং তাঁহার মনে হইয়াছিল খৃষ্টধর্মে এই সমস্যার প্রতিকারের কোন পথ নাই এবং মানিসীয়বাদে এই সমস্থার সুষ্ঠু সমাধানের পথ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার যৌবনের ভাবনাগুলি ছিল আশ্চর্য বস্তুনির্ভর। সেইজন্য পাপের বাস্তব সত্তা আছে এবং উহা শাশ্বত অস্তিত্ব বিশিষ্ট এবং উহার সহিত ঈশ্বরের এক অশেষ বৈরীতা আছে, এই কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই। তবে বিশ্বাস-গৌণ যুক্তিনিষ্ঠার জন্যই তিনি এই মতবাদটির প্রতি প্রধানতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "সত্য" এই শব্দটির উপর মানিসীয় মত প্রচারকরা অত্যধিক জোর দিতেন এবং দাবী করিতেন যে তাঁহাদের অনুসারীদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন কিছুকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ঐ মতবাদটির সূত্রগুলির স্বরূপ বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই তাহা স্বীকার করা উচিত। বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বাসের স্বরূপ উন্মোচন করা যাইতে পারে এমন মতবাদ সেইজন্যই সেণ্ট অগাষ্টিনের মত প্রতিভা-দীপ্ত তরুণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

তবে এই মতবাদটির সংগে কোথাও কোথাও তাঁহার মতানৈক্যও ঘটিয়াছিল। তিনি পরিপূর্ণভাবে এই মতবাদটির উৎসরূপ পৌরাণিক কাহিনীটিকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানিসীয়রা সূর্যের উপাসনা করিত। কিন্তু তাঁহার কাছে সূর্য-উপাসনা এক গুহ্যসত্যের প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তাঁহার মনে হইয়াছিল যে এই প্রতীকের স্বরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্রমোন্নয়নে তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন মানিসীয়রা মানীর জন্মোৎসব অত্যন্ত সমারোহ সহকারে উদযাপিত করিত। অথচ যীশুর পুনরভ্যুত্থান দিবসের (Easter Day) গুরুত্ব সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তিনি বুঝিতে পারেন নাই

যে মানিসীয় মতবাদে যীশু কেবলমাত্র একজন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি যাঁহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তাঁহার পুনরভ্যুত্থানও অবিশ্বাস্য। সেইজন্য প্রভাবিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তিনি ঐ মতবাদে বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই। তিনি শুধু ঐ মতবাদের শ্রোতাই ছিলেন। মাংস ভক্ষণ, জমি কর্ষণ এবং বিবাহ কোন বিষয়েরই তিনি বিরোধী ছিলেন না। অথচ একজন প্রকৃত মানিসীয়বাদীর পক্ষে এই সকল সুবিধাভোগ অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত। মতবাদটির বৈশিষ্ট্যে আগ্রহী হইয়া তিনি তাঁহার পাঁচজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে এই মতবাদ গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

মানিসীয়বাদীদের সহিত সেণ্ট অগাষ্টিনের নিজস্ব সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য। "অনরেটাস, তুমি জানিয়া রাখ যে যাহাদের মধ্যে আমি ঘটনাচক্রে গিয়া পড়িয়াছিলাম তাঁহাদের জীবিকা হইতেছে প্রভুত্বের ভীতি হইতে মুক্ত করিয়া এবং সর্বপ্রকার ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিয়া মানুষকে সহজ ও সরল উপায়ে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করা।......কিন্তু তাহাদের সহিত একান্ত হইতে গিয়া আমার এই কথাই স্মরণ হইয়াছিল যে তাহাদের মতানুযায়ী আমি কেবল মাত্রই "শ্রোতা", যেহেতু পার্থিব আশা আকাঙ্খাকে আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে তাহারা নিজেদের মতকে যথার্থ ও স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপেক্ষা অপর্যাপ্তভাবে অপরের মতকে খণ্ডন করিতেই অধিকতর সচেষ্ট।"১

কার্থেজে মানিসীয় মত প্রচারকদের সহিত হেল্‌পেডিউস নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারকের এক প্রকাশ্য আলোচনার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাইবেল হইতে কিছু বিশেষ যুক্তি হেল্‌পেডিউস সর্বসমক্ষে সংস্থাপিত করেন। মানিসীয়বাদীরা ঐ যুক্তিগুলি উপযুক্তভাবে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হন। উপরন্তু তাঁহারা দাবী করেন যে হেল্‌পেডিউস সংস্থাপিত যুক্তিগুলি যে অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা আদৌ বাইবেল অন্তর্গত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর স্বপক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শনে অসমর্থ হন। মানিসীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ঘটনা সেণ্ট অগাষ্টিনের মনে এক গভীর আঘাতের সৃষ্টি করিল। মানিসীয়রা মনে করে যে পাপের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, এই বিষয়েও তাঁহার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইল। আরও বহু সন্দেহ তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। কিন্তু মানিসীয়রা তাহাদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ফাউস্টাসের মতে না আসা পর্যন্ত তাঁহাকে ঐ সন্দেহগুলি সম্বন্ধে চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিল। ফাউস্টাসের আগমণের পর সেণ্ট অগাষ্টিনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু অবশেষে ফাউস্টাস বিনা

দ্বিধায় খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিলেন যে সেণ্ট অগাষ্টিনের বহু প্রশ্নের উত্তরই তিনি নিজেও জানেন না।

৩। সেণ্ট অগাষ্টিন এবং নব্য প্লেটোবাদ

সন্দেহজাত নৈরাশ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করিবার পর অগাষ্টিন নব্য প্লেটোবাদের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হন।

প্লোটিনাসের প্রচারিত উপদেশানুযায়ী চরম বা পূর্ণ বর্ণনাতীত। তবে তাহাকে অস্তিত্ব বা অদ্বিতীয় নামে কেবলমাত্র অভিহিত করা যাইতে পারে। "চরম বা পূর্ণ কোন কিছুরই উৎস নহে। ইহার প্রকৃতি হইতেছে এমনই যে ইহা হইতে কোন কিছুই নিশ্চিতভাবে লব্ধ হইবে না—অস্তিত্ব নহে—উপাদান নহে—জীবন নহে—যেহেতু ইহা এই সমস্ত কিছুকেই শ্রেষ্ঠত্বে অতিক্রম করিয়া যায়।" ২ অন্তিম বাস্তব হইতেছে ভাল মন্দের অতীত। নৈতিক গুণগুলি সীমা সৃষ্টি করে এবং পূর্ণের বা চরমের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব। এই বর্ণনাতীত পূর্ণ বা চরমকে প্রাপ্তি হইতেছে আধ্যাত্মিক সাধনার মূল লক্ষ্য এবং প্লোটিনাস ইহাকে পাওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ছাত্র মাত্রেই সহজেই বুঝিতে পারিবে যে প্লোটিনাসের দর্শনের সহিত ভারতীয় 'অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের' ৩ কত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

৪। সেণ্ট অগাষ্টিনের দীক্ষালাভ

মিলান সহরে ৩৮৪ খৃষ্টাব্দে অগাষ্টিন অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা তখন বুদ্ধির প্রখরতায় অস্থির। ইতিপূর্বে তিনি মানিসীয় মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরিত্যাগও করিয়াছেন। এযাবৎ তিনি সন্দেহবাদী ছিলেন; কিন্তু সন্দেহবাদের নেতিবাচকতা তাঁহার আত্মার গভীরে তৃপ্তি আনিতে পারে নাই। নব্য প্লেটোবাদ তাঁহার মনে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু এই মতবাদের প্রতি তাহার মন পরিশেষে সর্বান্তঃকরণে আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে নাই। তাঁহার গভীর ধর্মবিশ্বাসী প্রকৃতি পূর্ণ বা চরমকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই। নব্যপ্লেটোবাদ পরিত্যাগ করিলেও পূর্ণের মধ্যে অস্তিত্বের ভাবনা তাঁহার মনে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহা স্পষ্টতর হইয়াছিল।

সেই সময় সেণ্ট অ্যামব্রোস মিলানের বিশপ ছিলেন। অগাষ্টিন তাঁহার উপদেশমূলক বক্তৃতা নিয়মিত শুনিতে যাইতেন এবং উহা তাঁহাকে যথার্থই আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথমে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহার বাগ্মীতা ও অনবদ্য ভাষণ দানের রীতির জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার ধর্মপ্রচারের বক্তব্যের মধ্যেও তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন। ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিগত মতবাদের উপর অধিকতর প্রাধান্য আরোপনের জন্যই অগাষ্টিন সেণ্ট অ্যামব্রেসের প্রতি আরো অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। অগাষ্টিন নিঃসন্দেহ হইলেন যে মানিসীয়রা যে বস্তুবাদের ধারণা পোষণ করেন তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। নব্য প্লেটোবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতিকে সজীব চেতনারূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময় আবেগ ও বুদ্ধির সংঘর্ষে তাঁহার জীবন এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সময়ের দীক্ষালাভের কথা সেণ্ট অগাষ্টিন স্বয়ং তাঁহার "কন্‌ফেসন্‌স" নামক আধ্যাত্মিক আত্মজীবনীতে অনবদ্যভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই গ্রন্থটি একটি ধ্রূপদী পারমার্থিক সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়। এই স্বল্প পরিসরে তাহা হইতে মাত্র দুই একটি অনুচ্ছেদই উদ্ধৃত করা সম্ভবপর :—"আমি জানিনা যে অশ্রুধারার মধ্য দিয়া আমার মনের সমস্ত ভাবনা উজাড় করিয়া দিয়া কেমন করিয়া বিশেষ একটি ডুমুরবৃক্ষের পাদদেশে আমি নিজেকে সমর্পণ করিলাম। আর এই বাঁধভাঙা অশ্রুধারাই তোমার নিকট উৎসর্গ করিবার যোগ্য আমার একমাত্র সামগ্রী। আর বাস্তবিকই এই কথাই সমস্ত কিছু নহে তথাপি এইভাবেই আমি তোমাকে বহু কিছু বলিতে চাহি। আর হে প্রভু, আর কতদিন? তুমি আর কতদিন আমার উপর রুষ্ট থাকিবে? হে প্রভু, তুমি কি তবে আমার উপর চিরদিন রুষ্ট থাকিবে? তুমি আমার পূর্বপাপের কথা ভুলিয়া যাও যেহেতু আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে উহাদের দ্বারা আমি আবদ্ধ হইয়াছিলাম। আমি আমার এই বিষণ্ণ প্রার্থনা তোমার নিকট জানাইতেছি। কতদিন? আর কতদিন, 'আগামী কাল এবং আগামীকাল'? এখনই নহে কেন? কেন আমার পাপমুক্তির দিন শীঘ্র আসিতেছে না?"

"যখন আমি তিক্ততম অনুতাপে ক্রন্দিত হৃদয়ে এই প্রার্থনা জানাইতেছিলাম তখন আমি প্রতিবেশীর গৃহে বালক এবং বালিকার কণ্ঠ হইতে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, একটি কথার বারংবার আবৃত্তি শুনিতে পাইলাম। "গ্রহণ কর এবং পড়ো, গ্রহণ করো এবং পড়ো।" তৎক্ষণাৎ আমার চিন্তার পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমি

গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম যে ঐ কথাগুলি সুর করিয়া বারংবার আবৃত্তির কোন রীতি প্রচলিত আছে কিনা। কিন্তু যতদূর মনে পড়িল তাহাতে এই ধরণের কোন রীতি আছে বলিয়া মনে হইল না। অবাধ্য চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা মনে করিয়া ঠিক করিলাম যে বাইবেল খুলিয়া যে অধ্যায় পাইব তাহাই পড়িব। আমি অ্যান্টনীর কথা পড়িয়াছিলাম। ইনি যে উপদেশ পাঠ করিতেন তাহাই স্বয়ং তিনি অন্য কণ্ঠে সংগে সংগে শুনিতে পাইতেন ; যাও, তোমার নিকট যাহা কিছু আছে তাহা বিক্রয় কর এবং সব অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে দান করিয়া দাও এবং স্বর্গ-সম্পদ লাভ কর। এসো, আমাকে অনুসরণ কর। আর এই দৈববাণীর দ্বারা তিনি তৎক্ষণাৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত হইযাছিলেন। তখন আমি সাগ্রহে আলিপিউস উপবিষ্ট রহিয়াছেন এই অংশে ফিরিয়া গেলাম। কারণ যখন আমি উঠিয়াছিলাম তখন সেইখানে ঈশ্বর প্রেরিত দ্বাদশ ধর্মপ্রচারকের গ্রন্থটি রক্ষিত হইয়াছিল। গ্রন্থটি হাতে লইলাম। উহা খুলিলাম। যেস্থলে প্রথমেই চোখ পড়িল সেই অংশ পাঠ করিলাম ; হৈ-হল্লা মদ্যপান নহে, আশা ও বিলাসে নহে, দুর্দশা ও ঈর্ষাযও নহে : বরং যীশুখ্রীষ্টে নিজেকে সমর্পণ কর এবং দেহ ও ইন্দ্রিয় সুখের স্থান জীবন হইতে মুছিয়া ফেল : আর আমি পড়িতে পারিলাম না। আর পড়িবারও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঐ বাক্যটির সমাপ্তির সংগে সংগে এক জ্যোতির স্পর্শে এক পরম প্রশান্তি হৃদযে অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং হৃদয়ের সমস্ত সন্দেহ অন্ধকার তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল।”[৪]

৫। সেন্ট অগাষ্টিনের উপদেশাবলী

সেন্ট অগাষ্টিনের দীক্ষালাভের এক বৎসর পর যখন তাঁহার বয়স তেত্রিশ তখন তাঁহার মাতা পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মাতা মৃত্যুর আগেও কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত নিত্যকালের বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই স্মরণীয় কথোপকথন সেন্ট অগাষ্টিন স্বয়ং অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাবলীর মূল সূত্রগুলি সহজে অনুধাবন করিবার জন্য এইখানে ঐ কথোপকথনের সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল। “তখন আমরা বলিতেছিলাম—যদি কোন কিছুতে এই মাংসল দেহের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়, পৃথিবীর রূপ, জল-বায়ু শান্ত হইয়া যায়, দিকচক্রবাল অদৃশ্য হইয়া যায়, আহা আত্মা যদি আত্মস্থ হইয়া যায়, নিজের কথা না চিন্তা করিয়াই আপনি যদি আপনাকে অতিক্রম করিয়া যায়,

সমস্ত স্বপ্ন এবং কাল্পনিক পরিক্রমণ স্তব্ধ হইয়া যায়, সমস্ত বাক্য, সংকেত এবং সমস্ত কিছু যাহাদের কেবলমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে অস্তিত্ব থাকে তাহা যদি শান্ত হইয়া যায়, যদি কেউ ইহাদের সকলকেই আবৃত্তি করিতে শুনিতে পায়, 'আমরা আমাদের সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তিনি আমাদের চিরকালের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন'—আর এই কথা আবৃত্তি করিবার পর যদি ইহারাও নিস্তব্ধ হইয়া যায়, শুধু তাঁহার স্পষ্ট শ্রবণ যদি তাহার জন্য জাগিয়া থাকে, এবং তাহাদের দ্বারা নহে, যদি তিনি নিজেই নিজের প্রতি কথা বলিতে থাকেন, কাহারও জিহ্বার দ্বারা নহে, দৈবকণ্ঠের মধ্য দিয়া নহে, বজ্রধ্বনিতেও নহে, প্রহেলিকার দুর্বোধ্য সংকেতও নহে,—কিন্তু উহা শুনা যাইতে পারে যাহাকে এই জিনিষগুলির মধ্য দিয়া আমরা ভালবাসি, তাঁহার যথার্থ আপনাকে এইগুলি ব্যতীতই শুনা যাইতে পারে (কারণ আমরা দুইজনে নিজেদের কাছে টানিয়া আনিয়াছি এবং সমস্ত কিছুর উর্ধে যে শাশ্বত জ্ঞান দ্রুত ধ্যান ধারণায় তাহার উপর স্পর্শ রাখিয়াছি); অপর অসম প্রজাতীয় কল্পনা প্রত্যাহৃত হইয়া ইহা কি ক্রমাগত চলিতে পারে এবং ইহা কি উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া বিলীন হইয়া যায় এবং ইহার দর্শককে এইসব আভ্যন্তরিক আনন্দের মধ্যে কি লুপ্ত করিয়া দেয়, যাহাতে এক মুহূর্তের উপলব্ধির মত জীবন চিরকালের হইতে পারে আর এই জীবনের জন্যই পরবর্তীকালে আমরা এই কথা বলিয়া কি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকি : 'তোমার মধ্যে তোমার প্রভুর আনন্দ প্রবেশ করুক ?' এবং কবে তাহা ঘটিবে ? যদিও সমস্ত কিছুই আমূল পরিবর্তিত হইবে না তবুও কবে আমরা জাগিয়া উঠিব ?"[৫]

শরীরের উত্তেজনা শান্ত হইয়া যায়। যখন আমরা আমাদের প্রার্থনায় বা ধ্যানে নিবিষ্ট করি তখন ইন্দ্রিয়সমূহের পথ দিয়া অসংখ্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। সুমিষ্ট গীতস্বর শুনিলে আমরা খুসী হই, কর্কশ ধ্বনিতরংগ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। যদি আকর্ষণীয় দৃশ্য আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, আমরা উহা ভাল করিয়া দেখি এবং আমাদের একটানা চিন্তাপ্রবাহে এখন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আমাদের অবিচ্ছিন্ন ধ্যানপ্রবাহে আমাদের মধ্যে অনেকাংশে প্রকৃতিগত সুখ আনিয়া দেয়। এইরূপে, এই সমস্ত উপায়ে দেহের ক্ষুধা ও তাহার অনুভূতি আমাদের ধ্যানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। যথার্থভাবে প্রার্থনা করিলে ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ শান্ত হয় এবং দেহের উত্তেজনাময় চাহিদাও স্তিমিত হইয়া যায়। আর তখনই আমরা পরম শান্তির সহিত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি। এইখানে ধ্যানের যে পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার সহিত নব্য প্লেটোবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধ্যান পদ্ধতির

যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। "হিন্দুদের আধ্যাত্মিক সচেতনতার মধ্যে অনুপ্রবেশের পদ্ধতি নব্যপ্লেটোবাদেও স্বীকৃত। ধ্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মাকে দেহের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারি এবং সবার উর্ধে যিনি তাহার সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হইতে পারি। প্লোটিনাস উপদেশ দিয়াছেন যে সেই বিশেষ দৃষ্টির প্রাপ্তি পর্যন্ত যাহা কিছু বাহ্যিক তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত। যাহা আত্মপ্রকৃতির যথার্থ স্বভাববিশিষ্ট নহে তাহা হইতে আমরা আমাদের দেহ, দেহরূপদানকারী আত্মা, ইন্দ্রিয়, উপলব্ধি, স্পৃহা, আবেগ, এমন কি দ্বৈততাসহ বুদ্ধি হইতে অবশ্যই পৃথক করিয়া লইব। তবেই আত্মা সবার উর্ধে যিনি তাঁহার জ্যোতিকে দেখিতে পাইবে এবং স্পর্শ করিতে পারিবে।"৬

অনিত্য পৃথিবীর বস্তুসমূহ আমাদের এই কথা বলে, "আমরা আমাদের সৃষ্টি করি নাই: যিনি চিরকাল সমস্ত কিছুর উর্ধে থাকেন তিনিই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।" পৃথিবী, সাগর, আকাশ এই সমস্ত সুন্দর বস্তুগুলি আমাদের ঈশ্বরের কথাই বলে। সেণ্ট অগাষ্টিনের বৈশিষ্টমূলক অন্বেষণ পদ্ধতির যাত্রা সুরু হইয়াছে বহিঃবিশ্ব প্রকৃতি হইতে এবং ঐ অন্বেষণ তাহার পর মন্ময় পৃথিবীর গভীর দিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে গিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার যুক্তিবাদের এই তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ এই অংশে স্পষ্টই করা হইয়াছে।

সেণ্ট অগাষ্টিন বলিয়াছেন, "আমরা ঈশ্বরকে খুঁজিয়া কি করিব? আমি পৃথিবীর কথাই ভাবিব; এই পৃথিবী তো তাহারই সৃষ্টি। এই পৃথিবী কত সুন্দর, কিন্তু ইহার একজন সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছে···আমি আকাশের দিকে তাকাই, নক্ষত্রের সৌন্দর্য অবলোকন করি; দিবসের জন্মদাতা সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, রাত্রির অন্ধকারে প্রশান্তিদাত্রী চন্দ্রের স্নিগ্ধতা আমায় মুগ্ধ করে। এই সমস্ত দৃশ্যগুলি রমণীয় এমনকি বিস্ময়করও, যেহেতু এগুলি স্বর্গীয়, পার্থিব নহে। কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য দেখিয়াও আমার তৃষ্ণার শান্তি হয় না: আমি বিস্মিত হই, প্রশংসা করি কিন্তু আমি খুঁজি তাঁহাকেই যিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন! ··আমার ঈশ্বর, যিনি এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে আমি যে চোখ দিয়া দেখি তাহা এই চোখ নহে। তবে কি ঈশ্বর এমনই এক সত্তা যেমন আত্মা? না. এই অম্বিষ্ট বস্তুটির মধ্যে কয়েকটি অপরিবর্তনীয় সত্য রহিয়াছে, ইহা দোষত্রুটি শূন্য হইয়া জীবনধারণ করে। আত্মা কিন্তু এইরূপ নহে। আত্মা উন্নতি ও অবনতি, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, স্মরণ ও বিস্মরণ এবং কখনো ইচ্ছা আবার কখনো অনিচ্ছার পরিবর্তন দোষে দুষ্ট। এই পরিবর্তন-শীলতা ঈশ্বরের মধ্যে নাই। সেইজন্য, আমার ঈশ্বরকে দৃষ্টিগোচর ও দেহধারী

বস্তুর মধ্যে খুঁজিয়া এবং তাঁহাকে না পাইয়া, তিনি যেন আমারই মতন কোন প্রাণী এই কথা ভাবিয়া নিজের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া এবং তাহাতেও না পাইয়া ; আমি এই কথা উপলব্ধি করিয়াছি যে আমার ঈশ্বর আমার আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু। হ্যাঁ, আমি পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত বস্তুর মধ্যে খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাই নাই ; আমি তাঁহার প্রকৃতি আমার মধ্যে খুঁজিয়াও পাই নাই, তবুও বুঝিতে চাহিয়া এবং ঈশ্বরের দৃশ্যাতীত বস্তুগুলি যাহাদের দ্বারা সমুদয় বস্তু স্রষ্ট হইয়াছে তাহাদের বিচার করিয়া আমি আমার আত্মাকে আমার উপর স্থাপন করিয়াছি এবং এখন আমার ঈশ্বর ব্যতীত আর অন্য কোন কিছুকেই স্পর্শ করিবার নাই।" ৭

ঈশ্বরের সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ কথোপকথন শব্দের আওতার এবং এমনকি শব্দের প্রতিবিম্বেরও উপলব্ধির অতীত। যখন আমরা সূর্যাস্তের সুন্দর দৃশ্যটি দেখি এবং যখন তাহার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি তখন দেখা যায় উহা দেখিয়া মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে শব্দের ক্ষমতা কত সামান্য, কত সীমায়িত। লেখকের বর্ণনা করিবার মত ভাষার যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন সূর্যাস্তের জীবন্ত একটি ছবি স্বয়ং দেখার যে আনন্দ এবং উহার বর্ণনা কোন এক গ্রন্থ হইতে পাঠ করার যে আনন্দ ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকিয়া যায়। অন্যান্য মানুষের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করিবার জন্যই আমরা সর্বদা ভাষা বা শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। যদি আমরা ওষ্ঠের সাহায্যে কথা না বলি, তখন আমরা আমাদিগকে কল্পনা করি যে শব্দের প্রতিরূপের মধ্য দিয়া আমরা কথোপকথন সম্পাদন করিতেছি। যখন আমরা উচ্চস্বরে প্রার্থনা করি তখন সর্বদাই শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করি। যখন নিঃশব্দে নীরবে প্রার্থনা করি তখন আমরা উহা শব্দের প্রতিরূপের সাহায্যে করিয়া থাকি। কিন্তু শব্দ বা উহার প্রতিরূপ ইহাদের উভয়ের ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ। ইহারা কখনই আমাদের গভীরতম অনুভূতি এবং ভাবনাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না। যদি বহুদিন অদর্শনের পর কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়েই বাক্যহারা হইয়া পড়ে, কারণ উভয়ের মানসিক আনন্দ সেইখানে এত গভীর যে তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে না। মানবিক চেতনা এবং স্বর্গীয় চেতনা এমন এক উচ্চমার্গে মিলিত হয় যেখানে ভাষা কোনক্রমেই পৌঁছাইতে পারে না।

সেণ্ট অগাষ্টিন লিখিয়াছেন, "তখন নিজের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা স্মৃত হইয়া, আমি আমার গভীরে প্রবেশ করি। তোমাকে করে রাখি আমার পথপ্রদর্শক।

আর তোমার সহায়তায় আমি সাফল্য অর্জনও করি। আমি প্রবেশ করি এবং আত্মার চক্ষু দিয়া দেখি যে আমার আত্মার ঐ চক্ষুর উর্ধেও আমার মনের উর্ধে সেই পরিবর্তনাতীত আলোকবিভা। ইহা সাধারণ আলো নহে যাহা রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া দেখা যায়; ইহা সাধারণ আলো অপেক্ষা কোন বিশিষ্টতর আলোও নহে অথচ ইহার উজ্জ্বলতা যেন উজ্জ্বলতর এবং ইহা যেন ইহার বিরাটত্ব লইয়া সমস্ত মহাশূন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। ইহা আমার আত্মার উর্ধে নহে, যেমন তৈল জলের উর্ধে কিংবা স্বর্গ পৃথিবীর উর্ধে; কিন্তু তবুও ইহা আমার আত্মার উর্ধে কারণ ইহাই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে। আর আমিও ইহার নিম্নে যেহেতু আমি ইহা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। যে এই সত্যকে জানে সে ঐ আলোককেও উপলব্ধি করিতে পারে এবং যে ঐ আলোককে জানে সে অমরতাকেও জানে।"৮

ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভ ও কথোপকথন এ এক সত্যই শুভ অভিজ্ঞতা। ইহা আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আনন্দের সৃষ্টি করে। মানবাত্মার সহিত দেবতাত্মার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভজাত আনন্দের অভিজ্ঞতার আয়ুষ্কাল ক্ষণকালের নহে। এই অভিজ্ঞতার আনন্দ অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকে। অনন্ত-জীবনের প্রকৃতি যে কিরূপ হইবে তাহা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সেণ্ট অগাষ্টিন বলিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরের সাহচর্যে আনন্দ অভিজ্ঞতা লাভ করি; সেই অভিজ্ঞতা লাভের শুভ মুহূর্তগুলির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাই হইবে অনন্ত জীবন। এই জীবন স্বর্গীয়ের সহিত আমাদের সংগ লাভের সুযোগ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। পরকালে ঈশ্বর-সংগের সুখ এক অবিচ্ছিন্ন ও চিরকালীন অভিজ্ঞতা হিসাবে পরিগণিত হইবে।

সেণ্ট অগাষ্টিন রচিত এই ক্ষুদ্র অংশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি নব্য প্লেটোবাদের নিকট গভীরভাবে ঋণী ছিলেন। কিন্তু এই মতবাদের পরিণতিগত ব্যর্থতাও তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "তুমি আমার জন্য সাফল্যলাভ করিয়াছ, একজনের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে গর্বিত, প্লেটোবাদীদের কিছু কিছু গ্রন্থ গ্রীক হইতে ল্যাতিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে: আর সেইখানে ঠিক একবারে অবিকল এই ভাষায় নহে, তবে উদ্দেশ্য অভিন্ন, নানা কারণে বাধ্য হইয়া আমি পড়িয়াছি, যে সুরু হইবার সময় অর্থাৎ আদিকালে শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরের সহিত ছিল এবং শব্দই ঈশ্বর ছিল। ঈশ্বরের সূত্রপাতের বেলায়ও ঠিক একই কথা: সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্ট, আর তিনি ব্যতীত কোন কিছু সৃষ্টি হয় নাই। যাহা তাঁহার

সৃষ্টি তাহাই জীবন, জীবন মানুষের আলো, ঐ আলো অন্ধকারে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে, অন্ধকার ইহাকে অধিকার করিতে পারে না এবং মানবাত্মা যদিও ইহা আলোর সাক্ষ্য বহন করে তবু ইহা নিজে সেই আলো নহে ; কিন্তু ঈশ্বর স্বরূপ সেই ঈশ্বরের শব্দই হইতেছে সেই যথার্থ আলো যাহা যে মানুষ পৃথিবীতে আসে তাহাকেই আলোকিত করে। আর ঈশ্বর এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং এই পৃথিবী তাঁহারই সৃষ্টি ; অথচ পৃথিবী তাঁহাকে জানিত না। কিন্তু ইহা সেইখানে পড়ি নাই যে তিনি তাঁহার মধ্যে আসিলেন, কিন্তু নিজের মধ্যে তিনি গৃহীত হইলেন না। কিন্তু অনেকে তাঁহাকে গ্রহণ করিল এবং তাঁহার নাম বিশ্বাস করিল, তিনি তাহাদের ঈশ্বরের পুত্র হইবার ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। সেইখানে আমি পড়িয়াছি যে ঈশ্বর শব্দটি রক্ত মাংসের সৃষ্টি নহে, মানুষের ইচ্ছার সৃষ্টি নহে, রক্তমাংসের ইচ্ছার সৃষ্টি নহে, বরং তাহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। কিন্তু ঐ শব্দটি যে অস্থিমজ্জায় রূপলাভ করিয়া আমাদের মধ্যে জীবিত ছিল ও আছে, তাহা আমি গ্রন্থগুলিতে পড়ি নাই।" ৯

টীকা

১। St. Augustine, "On the Benefit of Believing" (quoted in *Confessions*, Everymans' Library, p. 37)

২। Plotinus, *Enneads, III.* 8-10 (translated by Mckenna, II. 134).

৩। S. Radhakrishnan, *Eastern Religions and Western Thought*, P. 215

৪। *The Confessions of St, Augustine*, pp. 170-1

৫। St. Augustine, *Confessions*, p. 195

৬। S. Radhakrishnan, op. cit., P. 214

৭। Joseph Rickaby, *Readings from St. Augustine on the Psalms* pp. 49, 50

৮। The Confessions of St. Augustine, pp, 132, 133

৯। ঐ pp. 129-31

গ্রন্থ বিবরণী

St Augustine : *Confessions*, Everyman's Library.

,, : *The city of God*, ,,

Rickaby, Joseph : *Readings from St. Augustine on* the *Psalms.*

Pryzywara, Erich : *An Augustine Synthesis.*

Sparow Simpson W. J. : *St. Augustine's Conversion.*

Radhakrishnan, S. : *Eastern Religious and Western Thought.*

Butler, Cuthbrt : *Western Mysticism.*

D'arcy M. C,, and others ; *A Mounment to St. Augustine.*

Mc Dougall, E. : *St. Augustine, a Study in His Personal Religion*

Burnaby, John : *Amor Dei*

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইস্‌লামীয় দর্শন

[এক]

ইস্‌লামীয় দর্শনের সাধারণ পটভূমিকা

১। সমস্যা

আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় ইস্‌লামীয় দর্শনের এক সুনিশ্চিত ইতিহাস প্রণয়ন করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই; অনেক ঘটনা এখনও পর্যন্ত অবিদিত, অনেক রচনা কয়েক শতাব্দী যাবৎ অবহেলিত ও অপঠিত রহিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাগারগুলিতে সেগুলিকে কেবলমাত্র ক্রমশঃ পুনরুদ্ধার ও সম্পাদন করিবার পর পাঠ করা হইতেছে। বিষয়টি আলোচনা করিবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সম্পর্কেও পণ্ডিতেরা একমত নন। কয়েকজন ইস্‌লামীয় দর্শনকে কেবল মাত্র আরবদেরই কৃতিত্ব মনে করিয়া গ্রীক্ উপাদানের গুরুত্ব লাঘব করিতে চেষ্টা করেন—যদিও এই গ্রীক উপাদান যে ইস্‌লামীয় দর্শনের সর্বত্র বর্তমান একথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না, অন্যেরা গ্রীক্ উপাদানগুলির উপরই বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহারা একথা বুঝেন না যে যদিও ইস্‌লামীয় দার্শনিকগণ গ্রীক্ ঐতিহ্য অনুসরণ করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের নিজেদের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাঁহাদের গ্রীক্ পূর্বসূরীদের বক্তব্য হইতে যাহা ভিন্ন হইতে পারে এইরূপ বক্তব্যের জন্যই তাঁহারা আলোচিত ও প্রশংসিত হইবার দাবী করিতে পারেন।

আমাদের বর্তমান যুগের পক্ষে ইস্‌লামীয় দর্শনের গুরুত্ব যে কী সে বিষয়ে প্রায় কিছুই বলা হয় নাই। আরবীয় দর্শন শাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলির অতি অল্পসংখ্যক সুলিখিত ভাষ্য পাওয়া যায় এবং সেগুলিও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সুগম নয়। গবেষণার এক আশাজনক ক্ষেত্র হইলেও ইহার নিতান্ত অল্পাংশেরই চর্চা করা হইয়াছে। অতএব বর্তমান সন্ধিক্ষণে দর্শনের মূল ভাবধারার এক প্রাথমিক বিবরণ মাত্র দেওয়া যাইতে পারে।

ইস্‌লামীয় দর্শন যে কেবলমাত্র ঈশ্বর, স্ব-প্রতিষ্ঠ দ্রব্যসমূহ প্রকৃতি ও মানব, মানবের আচরণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধীয় সহস্র বৎসরের গ্রীক্ চিন্তার উপর নির্ভরশীল তাহা

নহে, কাস্পিয়ান সাগর হইতে পিরেণীজ পর্যন্ত যে ইসলাম নবধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পূর্বে তিনশত বৎসর ব্যাপিয়া যে খৃষ্টীয় ধর্ম সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল এই জীবন-ধারার সহিত তাহার সংমিশ্রণ ইহার (ইস্লামীয় দর্শনের) ঐতিহাসিক পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছে। রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টানগণ তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত প্রকৃতি পূজার চিন্তাধারাকে বর্জন না করিয়া তাহাদের নিজস্ব শিক্ষণ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল বলিয়াই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ধারা অবিচ্ছিন্ন ছিল। সুতরাং আরবীয় দর্শন বুঝিতে হইলে খৃষ্টধর্মের প্রথম যুগের অর্থাৎ রোমক সাম্রাজ্যর শেষ কয়েক শতাব্দীর এবং সমসাময়িক বাইজান্টিয়াম সভ্যতার সময়কালীন গ্রীক্ দর্শন এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা প্রয়োজন। এইজন্য আরবীয় দর্শনের ছাত্রের পক্ষে কেবল মাত্র প্লেটো, এরিষ্টটল, প্লটিনাস ও আরও কয়েকজন অখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিকদের সহিত পরিচয় থাকিলেই চলিবে না, কিন্তু সাধু অগাষ্টিন বা যিনি এরিষ্টটলীয় দর্শন ও খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের প্রথম সংমিশ্রণ করিযাছিলেন সেই জন্ ফিলোপোনাস প্রমুখ চিন্তা-নায়কদের সহিতও পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

২। গ্রীক্ উপাদান

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীকৃগণ জীবন নির্বাহের এক বিশেস উপায় হিসাবে দর্শন আবিষ্কার করেন এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ইহাকে বিশ্ব ও মানব বিষয়ক এক বিস্ময়কর, সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যায় পরিণত করেন। ইহাকে দূর হইতে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে মানবের বিচার বুদ্ধির শক্তিতে অবিচলিত আস্থা থাকার ফলে জগৎ ও জগতে মানবের স্থান সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য যত প্রকার আলোচনা সম্ভব সমস্তই ইহাতে আছে। গ্রীকৃদের সভ্যতা তাহাদের পূর্বেকার প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার, যথা মিশরীয় ও আসিরীয় সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, কিন্তু মনুষ্যের বিচার বুদ্ধিতে তাহাদের যে আস্থা তাহা মূলতঃ এক অভিনব ব্যাপার। যে বুদ্ধিগ্রাহ্য ঈশ্বরতত্ত্বের আবেদন আজ পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়ই সতেজ ও চিত্তাকর্ষক তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই প্লেটো মানুষের অবৌদ্ধিক উপাদানকে অগ্রাহ্য করেন নাই এবং মনুষ্য স্বভাবের বিরোধিতা না করিয়া এবং সেই উপাদানকে উচ্ছেদ না করিয়া তিনি চিন্তার দাসরূপে তাহাকে তাহার যথার্থ স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর দার্শনিকেরা

এত সতর্ক ছিলেন না, তাঁহারা যুক্তিবাদকে অতি সঙ্কীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ইহা সংশয়বাদ, বিশ্বাসবাদ ও মরমীবাদের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্ দর্শনের ঐতিহ্য কখনও সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই এবং যখন ইহা পাশ্চাত্যে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ইহা মুসলিম সভ্যতার মধ্যে নবজীবন লাভ করে। গ্রীক্ কাব্য তাহার স্বদেশে ও বাইজান্টিয়ামে অবহেলিত হয় আর লাতিন জগতে প্রায় বিস্মৃত হইয়া পড়ে এবং ইতালীয় নব জাগরণের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে তাহাকে পুনরায় আবিষ্কার ও তাহার মূল্যায়ন করিতে হয়। তবে গ্রীক্ দর্শন জীবিত থাকিয়া ধারাবাহিকভাবে পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ইহার সংরক্ষণের মূলে যে বিপুল আরবীয় অবদান ছিল তাহা জ্ঞানীমহলে আদৌ যথাযোগ্যভাবে বিবেচিত হয় নাই। যদি আরবীয় দার্শনিকগণ মধ্যযুগে গ্রীক্-দর্শনকে পরিপূর্ণ বিস্মরণের কবল হইতে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই না করিতেন তাঁহারা অবশ্য আরও কিছু করিয়াছিলেন—তাহা হইলে কেবলমাত্র এই কারণেই—তাঁহারা বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের আগ্রহের পাত্র হইবার উপযুক্ত হইতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবগণ অধিক পরিমাণে গ্রীক সংস্কারপ্রাপ্ত মিশর ও সিরিয়া এবং কিছু অপূর্ণাকারে গ্রীক্‌সংস্কার প্রাপ্ত মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন তখন সমগ্র গ্রীক্‌ভাষী অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ধারাবাহিক পাঠ পরম্পরায় লব্ধ সহস্রাধিক বৎসরের গ্রীক দর্শন বিদ্যমান ছিল। যে সময়ে উহা আরবদের অধিকারে আসিল তাহার বহু-পূর্বেই গ্রীক্ দর্শন সৃষ্টির যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তাহার শিখাও স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা আরবীয় দার্শনিকগণকে তাঁহাদের স্বকীয় পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের একথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক্ দর্শন কিরূপ ছিল। পরবর্তী কালে দার্শনিক চিন্তায় যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সেগুলির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং মুসলমানগণ যে সকল গ্রীক্ সম্প্রদায়ের পরবর্তী ব্যাখ্যাতাগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন সেই সকল সম্প্রদায়ে প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শন কিভাবে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইত তাহা না জানিয়া মুসলমান দার্শনিকগণের সঙ্গে প্লেটো ও এরিষ্টটলের তুলনা করা অসঙ্গত হইবে ইহা বুঝা উচিত। কোনও কোনও দিক হইতে এই কার্যটি দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, কারণ পরবর্তী গ্রীক্ সম্প্রদায়গুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা কেবলমাত্র আরবীয় উৎপত্তিস্থল হইতেই জানিতে পারি, এবং বাইজান্টাইম গ্রীক্ সভ্যতার শেষ কয়েক শতাব্দীতে সেগুলিকে আকর্ষণহীন বলিয়াই বিবেচনা করা হইত।

৩। হিব্রু উপাদান

যে ইহুদীচিন্তা হইতে খৃষ্টীয় ও ইস্‌লামীয় ধর্ম মূলতঃ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই চিন্তাও মিশরীয় ও আসিরীয় সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাহা পরে সম্পূর্ণ ভিন্নগতি লাভ করে। ইহুদী চিন্তা অনুযায়ী পরমেশ্বর ও ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞানের মর্যাদা মানুষের বিচারবুদ্ধির মর্যাদা অপেক্ষা অধিক বলিয়া গণ্য হইত এবং গ্রীকেরা যে জ্ঞানকে মানুষের পূর্ণতাস্বরূপ বলিয়া প্রশংসা করিতেন তাহার পরিবর্তে আস্তিকতাকেই একমাত্র সত্য ও সুনিশ্চিত শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য হইত। যখন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম সমগ্র রোমক সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল তখন ইহুদীধর্ম ইহুদীজাতির বিশিষ্ট ধর্মরূপে প্রচলিত ছিল। ধর্ম-বিশ্বাসের যে ধারণা কোরাণে আছে তাহা মূলতঃ সমসাময়িক ইহুদী ও খৃষ্টিয় ধারণা সমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম-প্রবক্তার ক্ষমতার প্রশংসা এবং এই ধরণের অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে সাক্ষাৎভাবে তত্ত্ব-লাভ ইস্‌লামধর্মে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইলেও ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে অজ্ঞাত নয়। যে যুগে মুস্‌লিমগণ একটি মূলতঃ বিভিন্ন অন্তর্জগৎ হইতে আহৃত নূতন জ্ঞানকে বুঝাইতে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে নিজেদের গ্রীক্ শব্দ 'Philosophers' দ্বারা অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে শুনা যায় সেই যুগে এই জাতীয় ধর্ম হিসাবে ইস্‌লাম কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছিল তাহা সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৪। গ্রীক দর্শন আত্মসাৎ করিবার ইহুদী ও খৃষ্টান প্রয়াস

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে আরব-দর্শনের অভ্যুদয় ঘটে তাহা গ্রীক্ চিন্তা কর্তৃক কোনও হিব্রু ধর্ম আক্রমণের প্রথম উদাহরণ নয়। ঐ শতকে গ্রীক্ দর্শন যে স্তরে উপনীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় ও ম্যানিকীয় সমালোচনা ও আঘাতের সম্মুখীন হইয়া মুস্‌লিম ধর্ম নিজের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে যে বিশেষ অবস্থায় আসিয়াছিল তাহা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে পূর্বের নানাবিধ পরিণতি হইতে এই পরিণতি কিছু ভিন্ন ধরণের। কিন্তু গ্রীক্ দর্শনের প্রতি ইহুদী ও খৃষ্টীয় মনোভাবের তুলনা করিলে মুস্‌লিম জগতে গ্রীক্ দর্শনের যে ভিন্ন এক ইতিহাস আছে তাহা আমরা আরও উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো যে সমসাময়িক গ্রীক্ দর্শনকে মধ্যপন্থীয় প্লেটোনীয় মতবাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন সেই দর্শনের ভাষায় ইহুদী মতের সারাংশ ব্যাখ্যা করিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহুদী ধর্মের ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশের দিক হইতে উহা বিফল হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট ও ওরিগেন তাঁহার রচনা হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়া তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফিলো, ক্লেমেণ্ট এবং ওরিগেন তখনও পর্যন্ত নব-প্লেটোনীয় দর্শনের সংঘাত হইতে মুক্ত ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে এই দর্শন প্রধান অ-খৃষ্টীয় দর্শনে পরিণত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় চিন্তার উপর উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে ব্যক্তি নিজেকে Dionysius the Areopagite নামে পরিচয় দিতেন তাঁহার রচনাসমূহ হইতে এই কথার প্রমান পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে দর্শনের যে পাঠ্যসূচী অল্পবিস্তর সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল তাহা এরিষ্টটলের বক্তৃতাবলী, প্লেটোর রচনাসমূহ হইতে সঙ্কলিত অংশসমূহ ও নব-প্লেটোনীয় তত্ত্ববিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইত। কিন্তু অতীতকালের খ্যাতনামা লেখকগণের রচনা বহু পরবর্তী নব-প্লেটোনীয় ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠ করা হইত। এই ব্যাখ্যাকারগণ Alexander of Aphrodisias এবং Themistius প্রভৃতি প্রথম যুগের ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া এরিষ্টটলকে একজন সুসঙ্গত, নিয়মানুরক্ত, নির্বিচারবাদী দার্শনিক হিসাবে দেখাইতে সচেষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময়েই খৃষ্টান শিক্ষাগুরুরা নব-প্লেটোনীয় এরিষ্টটলীয় ছাঁচের অখৃষ্টীয় দর্শনের প্রকৃত শিক্ষা অধিগত করিয়াছিলেন। ইহা একটি নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল অথবা অন্ততঃ যে সমস্যা পূর্বেই জানা ছিল তাহাকে আরও অধিক গুরুত্ব দান করিয়াছিল—তাহা হইতেছে এই দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধের সমস্যা। আমাদের সম্প্রদায়ে John Philoponus এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি এরিষ্টটলের একজন খৃষ্টের একস্বরূপে বিশ্বাসী ভাষ্যকার, এরিষ্টটলের অনুবর্তীদের বিরুদ্ধে জগৎ-গঠনের দার্শনিক সমর্থক এবং মুস্‌লিম বিচারপটু ঈশ্বরতত্ত্ববিদের (মুতাকালিম) ন্যায় একজন ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখক। যে আরবীয় দর্শন খৃষ্টীয় শিক্ষা সূচীর অন্তর্গত পরবর্তী গ্রীক দর্শনের প্রভাবান্বিত আকারে বিশ্বাস ও যুক্তি, ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং বিচারের আলোকে প্রাপ্ত ঈশ্বরতত্ত্বের পার্থক্যের চিরন্তন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল ইহাকে তাহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা বলা যায়। পরবর্তী গ্রীক্ দর্শন সর্বত্র একরূপ ধারণ করে নাই, যত অল্প পরিমাণেই হউক তাহা বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, আর তদনুসারে প্রথম যুগের ইস্‌লামীয় দর্শনের ক্রমবিকাশও আদৌ একরূপ ছিল না। মুস্‌লিম সাম্রাজ্যভুক্ত সিরীয় ও মিশরীয় গ্রীক্ শিক্ষাপীঠগুলি

হইতে বাগ্‌দাদ, পারস্য ও ক্রমবর্ধমান ইস্‌লামীয় জগতের সকল স্থলেই একাধিক যাত্রাপথ ছিল।

[দুই]

গ্রীক উত্তরাধিকার

১। আরবীয়গণ কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রীক গ্রন্থকারদের রচনা সমূহ

আরব ভাষাভাষী মুস্‌লিম দার্শনিকগণ যে সকল গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিতেন এবং সেজন্য যাঁহাদের রচনাবলী গ্রীক্ বা সিরীয় ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল তাঁহারা ছিলেন সেই সকল গ্রন্থকার যাঁহাদের রচনা উত্তরকালীন গ্রীক্ বিদ্যাপাঠগুলিতে পঠিত হইত। ইহার অর্থ এই যে, আরবীয় অনুবাদে সংরক্ষিত গ্রীক্ গ্রন্থকারদের দর্শনগ্রন্থগুলির মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহারা বাইজান্টিয়ামের শেষ কয়েক শতাব্দীর লেখকগণের আগ্রহ সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অপরপক্ষে ইহাও স্পষ্ট যে পূর্বেকার যে সকল গ্রীক্ গ্রন্থ নবপ্লেটোনীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই এবং যাহাদের মূল গ্রীক্ লিপিগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল আরবীয় অনুবাদেও সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা যাইবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখি যে আরবীয় ভাষায় গ্যালেনের লুপ্ত দর্শন গ্রন্থ সমূহ, প্লোটিনাসের ভিন্নাকারে রূপায়িত রচনার অংশ সমুহ প্লেটোনীয় দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞাত লেখকদের রচনাবলী বা এরিষ্টটলীয় দর্শন বিষয়ে গ্রীক্ ভাষ্যগুলি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাক্ সক্রেটীয় দার্শনিকদের রচনা, এরিষ্টটলের কথোপকথনগুলি অথবা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ষ্টোয়িকগণের রচনাসমূহ প্রভৃতি অন্বেষণ করিলে নিরাশ হই। গ্রীক্ গ্রন্থকারগণের মূল গ্রন্থাবলীর আরবীয় অনুবাদসমূহের মূল্য সচরাচর যতটা অল্প বলিয়া মনে করা হয় ততটা নয়, এবং এইসকল গ্রন্থকারদের রচনা বস্তুতঃ কি আকারে আরবীয় লেখকদের নিকট পৌঁছাইয়াছে সে সম্বন্ধে আরবীয় অনুবাদগুলি হইতে অনেক কিছু শিক্ষা করা যায়। আরবগণের নিকট সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থকার ছিলেন এরিষ্টটল এবং তাঁহার ভাষ্যকারগণ। আমরা তাঁহাদের উল্লিখিত রচনাগুলির অনুবাদসমূহ অপেক্ষাকৃত ভালভাবে জানি এবং মূল যুক্তিগুলির সূক্ষ্ম মর্মবোধেরও প্রশংসা করি। তাঁহাদের এই মর্মবোধ প্রায় উত্তরকালীন গ্রীক্ লেখকদের মর্মবোধের সমান। এরিষ্টটলের কথোপকথনগুলি (Dialogues) গ্রীক্‌যুগে অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্লেটোনীয় রূপের জন্য

কতকগুলি নব প্লেটোনীয় লেখকদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এগুলি কিন্তু অনূদিত হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে এরিষ্টটলের 'রাষ্ট্রতত্ত্ব (Politics) ব্যতীত প্রায় অন্য সমস্ত গ্রন্থই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। মনে হয় যে এই গ্রন্থখানি সাম্রাজ্যবাদী যুগে গ্রীস্‌দেশের বিদ্যাপীঠগুলিতে সম্যকভাবে অধীত হইত না। সেইজন্য উত্তরকালীন নব প্লেটোনীয়েরা এরিষ্টটলের দর্শন বলিতে যাহা বুঝিত তাহার সম্যক জ্ঞান নবম শতাব্দীর অল্ কিন্দি হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ইবন্ রুশ্‌দ পর্যন্ত সকল আরবীয় দার্শনিকদের মধ্যেই ছিল। কিন্তু এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে ইহার প্রয়োগ বিভিন্ন ছিল। দার্শনিকদের বিরোধী ধর্মশাস্ত্রবিদরাও অবশেষে এরিষ্টটলের আকারনিষ্ঠ তর্কবিজ্ঞানকে ব্যবহার করিতেন। উপরন্তু গ্রীক্‌দের পরিজ্ঞাত অধিকাংশ ভাষ্যই সাগ্রহে পাঠ ও আলোচনা করা হইত, এবং তাহাদের কতকগুলিকে আমরা কেবলমাত্র আরবগণের মাধ্যমেই জানিতে পারিয়াছি। প্লেটোর টাইমিয়াস (Timacus) রিপাব্লিক (Republic) এবং ল'স (Laws) এই গ্রন্থগুলি পাওয়া যাইত এবং অধীত হইত। আল্ ফারাবির বিদ্যালয়ে রিপাব্লিক এবং ল'স এই দুইটি গ্রন্থ রাষ্ট্রতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পঠিত হইত। টাইমিয়াস্ গ্রন্থটির সহিত অনেকেই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ইস্‌লাম জগতে ইহার পাঠের বিশদ ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। আল্-রাজির ন্যায় দার্শনিকগণ আপনাদিগকে প্লেটোনীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টতঃই প্লেটোকে নব প্লেটোনীয় মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করিতেন। পর্‌ফিরি (Porphyry) এবং প্রোক্লস' (Proclus) নামমাত্র ছিলেন না। আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নব প্লেটোনীয় রচনার সহিত আরবগণ পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহারা আরবীয় অনুবাদে Hermius এর রচনাও পাঠ এবং অনুশীলন করিতেন। গ্যালেনের (Galen) দার্শনিক রচনাবলীর সহিত তাঁহাদের যত পরিচয় ছিল খৃষ্টীয় জগতে আর কাহারও তেমন ছিল না। যে গ্রন্থগুলিকে প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আরবীয় গ্রন্থগুলিতে এগুলির পূর্ণ তালিকা রক্ষিত আছে এবং আরবীয় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে তাহাদের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্ গাজালি দার্শনিকদের মর্মস্পর্শী সমালোচনা করিবার সময় প্রোক্লাসের বিরুদ্ধে জন্ ফিলোপোনাসের যুক্তিসমূহ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং 'ভাগ্য' সম্বন্ধে আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডারের গ্রন্থ 'নিয়ন্ত্রণ' ও 'স্বাধীন ইচ্ছা' সম্পর্কিত মুস্‌লিম আলোচনা ধারাকে সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে। এরিষ্টটলীয়

দর্শনের নব প্লেটোনীয় অধ্যাপকগণ যে সকল পারিভাষিক শব্দ ও যে শ্রেণীর যুক্তি ব্যবহার করিতেন সেগুলি সম্যকভাবে জানিলে তবেই আরবীয় দার্শনিকগণ স্বতন্ত্র-ভাবে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা এবং তাহার মুল্য নিরূপণ করিতে পারা সম্ভব।

২। অনুবাদকগণ এবং অনুবাদসমূহ

আব্বাসিদ্ যুগের প্রথম ভাগে গ্রীক্ দর্শনের আরবীয় অনুবাদগুলি আরম্ভ হইয়াছিল এবং প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। কয়েকজন ব্যতীত অনুবাদকদের মধ্যে সকলেই খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীনপন্থী গীর্জার অনুবর্তী আর অধিকাংশই 'নেষ্টোরিয়ান্' বা 'জ্যাকোবাইট'। তাঁহারা সিরীয় ভাষায় অনুদিত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পক্ষেত্রেই মুল গ্রীক্ গ্রন্থগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্তাকর্ষক সাহিত্য-কীর্তির ইতিহাস এখনও দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ইহার সাধারণ রূপরেখা স্পষ্ট। উদাহরণ-স্বরূপ, দার্শনিক আল-কিন্দি (মৃত্যু ৮৭৩ খৃ: অ:) বহুসংখ্যক অনুবাদ পাইয়াছিলেন এবং এরিষ্টটলের 'মেটাফিজিক্স' (তত্ত্ববিদ্যা) এবং এক অজ্ঞাতনামা নব-প্লেটোনীয় লেখকের লেখা "এরিষ্টটলের ঈশ্বরতত্ত্ব" (থিওলজি অফ্ এরিস্টটল) এই দুইটি এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি গ্রন্থ স্পষ্টতঃই তাঁহার ব্যবহারের জন্য অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদকেরা খলিফাদের—বিশেষ করিয়া অল্-ম'মুন্ (খৃ: ৮১৩-৩৩) এবং অল্-মু'তাসিমের (খৃ: ৮৩৩-৪২) রাজত্বকালে রাজসভায় পৃষ্টপোষকতা এবং উৎসাহলাভ করিতেন এবং দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিতেন। খলিফাদের এইরূপ মনোভাব আল্‌মুতাওয়াক্কিলের (খৃ: ৮৪৭-৬১) রাজত্বকালে শেষ হইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মনোভাবের কারণগুলি সুস্পষ্ট নয়। সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে এত অধিকসংখ্যায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার মূলে খলিফাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা অথবা মুতাজিলা আন্দোলনের প্রভাব ছিল ইহা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহার পূর্বেকার অনুবাদগুলি যাহাদের মধ্যে আল্-কিন্দির ব্যবহৃত অনুবাদগুলি ছিল—তত সুবিদিত হয়। আল্-কিন্দির সমসাময়িক নেষ্টরীয় 'হুনাইন ইব্‌ন ইশাক্' (মৃত্যু ৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরে) এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের লেখকেরা যে গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাহাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করিতেন এবং তাহার পর উহাকে গ্রাক্‌ভাষা

হইতে সিরীয় কিংবা আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন। এইভাবে তিনি অনুবাদের এক নূতন মান স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধীয় যে প্রণালীগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবেই সমসাময়িক বাইজান্টাইন পাণ্ডিত্যের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। তিনি মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও মেসো-পটেমিয়া, এমন কি রাজধানী বাগদাদেও গ্রীক্ বিদ্যা-চর্চা অক্ষুণ্ণ দেখিয়াছিলেন। হুনাইনের পুত্র ইশাক্ বিশেষভাবে এরিষ্টটলের গ্রন্থগুলির অনুবাদকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাঁহার অনুবাদগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এবং উচ্চমানের বোধশক্তির পরিচায়ক। অন্যান্য মুস্‌লিম দার্শনিকদের ন্যায় আল্-কিন্দিও গ্রীক্ বা সিরীয় ভাষা জানিতেন না। তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক ও অনুবাদকগণ তাঁহার ব্যবহৃত গ্রন্থগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট মূলগ্রন্থ ব্যবহার করিতে পারিতেন। একটি তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত অনুবাদকগণ মোটেই গ্রীক্ জানিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের আরবীয় অনুবাদগুলির জন্য হুনাইন সম্প্রদায়ের লেখকদের কৃত সিরীয় অনুবাদগুলির প্রভূত ব্যবহার করিতেন এবং পূর্বেকার সিরীয় এবং আরবীয় অনুবাদগুলির মধ্যে যে সকল বিভিন্ন পাঠ দেখা যাইত ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টি হইতে সেগুলির নির্ভুল আলোচনা করিতেন। এরিষ্টটলের দর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহারা এক বিশেষ পাঠ্যসূচীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুনাইনের পূর্বে এরিষ্টটলের গ্রন্থগুলির অনুবাদসমূহের যে সকল পাঠ প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার সম্প্রদায় যে সকল পাঠের প্রচলন করিয়াছিলেন সেইগুলি হইতে সঙ্কলন করিয়া এই পাঠ্যসূচী প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহারা এরিষ্টটলীয় দর্শন শিক্ষা দিবার একটি নিয়মিত ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং এই জন্য তখন যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রীক্‌ভাষ্য পাওয়া যাইত সেইগুলি ব্যবহার করিতেন। এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ ছিলেন দার্শনিক আল্-ফারাবির (খৃঃ ৮৭০—৯৫০) বন্ধু নেষ্টরীয় আবু বিশর মাট্টা এবং আল্-ফারাবি ছাত্র জাকোবীয় খৃষ্টান ইয়াহা ইবন আদি (খৃঃ ৮৯৩-৯৭৪)। তাঁহাদের গ্রীক্‌দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই আল্-ফারাবি তাঁহার দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই আবার পরবর্তী স্পেনীয় দার্শনিকদ্বয় এভেম্পেস এবং আভেরুসের দর্শনেরও ভিত্তি স্থানীয় ছিল, এবং ইহা মনে রাখিলে গ্রীক্ দর্শনে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি আর বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তাঁহাদের রচনার সহিত আভিসেন্নারও পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি এক ভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এইভাবে খৃষ্টান অনুবাদকগণ আব্বাসিদ সাম্রাজ্যের প্রথম দুই শতাব্দীতে সাধারণ চিন্তাধারার অনুগামী হইয়া ইস্‌লামীয় দর্শনের আবির্ভাবের ভূমি প্রস্তুত

করেন। পূর্বে সিসিরো এবং সেনেকার সময়ে রোমে এবং সেণ্ট অগাষ্টিনের পরবর্তী শতাব্দীতে যাহা ঘটিয়াছিল এবং সিরিয়ার খৃষ্টীয় সভ্যতায় পঞ্চমশতাব্দী হইতে যাহার জন্য চেষ্টা হইতেছিল শক্তিশালী ও প্রগতিশীল ইস্‌লামীয় কৃষ্টি-অধ্যুষিত অঞ্চলে তাহারই অধিক ব্যাপকভাবে পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। অনুরূপ শ্রেণীর অনুবাদগ্রন্থগুলি মধ্যযুগের ইহুদীদের কাছে গ্রীক্ এবং ইস্‌লামীয় দর্শন পৌঁছাইয়া দিবার পথ সুগম করিয়াছিল এবং কালক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ শতব্দীতে সর্ব প্রথম এমন একটি ইহুদীয় দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা ফিলোর নিষ্ফল প্রচেষ্টা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। আরবীয় এবং হিব্রু দার্শনিকগ্রন্থগুলি অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। দর্শনের ইতিহাসে অনুবাদকেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের শ্রমসাধ্য কার্য ব্যতীত পাশ্চাত্য চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মূল সংযোগ সূত্রগুলি কখনও একত্র গ্রথিত করা সম্ভবপর হইত না, আর বিশেষতঃ আরবীয় দর্শনের কখনও জন্ম হইত না। মূল গ্রন্থগুলি পরবর্তী কালের লেখকদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই এই অনুবাদকদের একমাত্র কার্য ছিল না। তাঁহারা অংশত আরবীয় ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, অংশতঃ অথবা অধিকাংশতঃ নিজেদের কর্মোদ্যমের প্রভাবে এক জটিল ও সহজবোধ্য আরবীয় দার্শনিক পরিভাষা গঠনে এবং বিমূর্ত চিন্তাপ্রকাশের উপযোগী আরবীয় রচনা-রীতির ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ কালের গ্রীক্ ভাষ্যকারগণ এবং নব প্লেটোনীয় দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত যে পরিভাষা এরিষ্টটল এবং প্লেটোর ব্যবহৃত পরিভাষাকেও অতিক্রম করিয়াছিল এই পরিভাষা তাহারই রূপান্তর। দর্শনের ইতিহাসে আরবদের ইহাই এক বিরাট অবদান। দার্শনিক পারিভাষিক শব্দের একটি পূর্ণাংগ আরবীয় গ্রীক্ অভিধান সঙ্কলিত হইলে তবেই ইহার যথেষ্ট মূল্যোপলব্ধি হইবে।

৩। উত্তরকালীন গ্রীক্ দর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সকল আরবীয় দার্শনিকের এক সাধারণ পটভূমিকা ছিল। ইহা সম্পূর্ণভাবে প্লেটোনীয় কিংবা এরিষ্টটলীয় ছিল না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোভাব এবং প্রবণতার পার্থক্যানুযায়ী এই উভয়বিধ উপাদানের সংমিশ্রণে এই পটভূমিকা নির্মিত হইয়াছিল। এই পটভূমিকা অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার জন্য যে মৌলিকতার আবশ্যক হয় তাহা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। আরবীয় দার্শনিকগণ দার্শনিক

সমস্যাসমূহের যে বিভিন্ন সমাধান দিয়াছিলেন সেগুলিকে বুঝিতে হইলে এই পটভূমিকার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝিতে হইবে।

পূর্বেকার গ্রীক্ এবং লাতিন খৃষ্টানদের ন্যায় আরবীয়েরাও গ্রীকদর্শনকে "প্রাকৃতিক ঈশ্বরতত্ত্বের" অর্থাৎ জগতে যে ঈশ্বর প্রকাশিত এবং যিনি মানুষের বুদ্ধির অবগম্য সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদের উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সত্তা যে কেবলমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তির সহায়তায় ব্যাখ্যাই করা যায় না পরন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যাইতে পারে এই বিশ্বাস চরমপন্থী সংশয়বাদীদের মতবাদ ছাড়া গ্রীক্ দর্শনের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আইয়ামব্লিকাসের নব-প্লেটোনীয় অনুবর্তীরা বলিতেন যে 'কালডীয় ভবিষ্যদ্বাণী' প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যময় গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত সত্য আছে এবং "ইহাদিগকে অবিশ্বাস করা বিধি বহির্ভূত"। তাঁহাদের এই মত কিছু পরিমাণে পূর্বোক্ত বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের অপরোক্ষ জ্ঞানকে হয় কুসংস্কার বলিয়া বর্জন করা হইত নতুবা দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে না করিয়া উহার অনুগামী বলিয়া মনে করা হইত। মুসলিমদিগকে একভাবে বা অন্যভাবে এই দুইটি বিরোধী বিকল্প মতের সহিত নিজেদের মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইত।

গ্রীকদের দার্শনিক ধর্মমত এবং যে তাত্ত্বিক মতবাদের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত তাহারা জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ নক্ষত্র রাজ্যের শাশ্বত ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। এরিষ্টটল এবং যে নব-প্লেটোনীয়েরা তাঁহাদের সকলের স্বীকৃত বিশ্ব-চিত্র আরবদিগকে দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। যে 'প্রথম কারণের' অস্তিত্ব এইভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল তাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হত। এরিষ্টটল পরমেশ্বর এবং নক্ষত্র দেবতাদের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছিলেন তাহা নব প্লেটোনীয় যুগে অধিকতর প্রভাবশালী হইয়াছিল। এই সময়ে দার্শনিকদের আগ্রহ প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের দিক হইতে অতিপ্রাকৃতের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং তাঁহারা এরিষ্টটলের তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠতার তারতম্যানুসারে বিন্যস্ত অতি-প্রাকৃত সত্তাগুলির এক বিরাট সঙ্ঘ কল্পনা করিয়াছিলেন। পরম্পরাগত এই দার্শনিক মতবাদ যে আকারে আরবদের নিকট পৌঁছাইয়া ছিল তাহা নির্দিষ্টভাবেই নব-প্লেটোনীয়; অর্থাৎ এই মতানুসারে সূর্য হইতে যেমন রশ্মিসমূহ নির্গত হয় তেমনই পরম এক হইতে আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহের শৃঙ্খলরূপে সত্তা নিঃসৃত হইয়া থাকে—ইহাই কালাতীত বিশ্বসৃষ্টি। সকল সৃষ্টবস্তু মাত্রকেই প্রথম কারণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। প্রথম কারণ, পরম এক চিরকাল ক্রমাগত সৃষ্টি

করিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহা সত্বেও ইহার কোনও পরিবর্তন বা হ্রাস নাই। এই নব-প্লেটোনীয় ঈশ্বরতত্ত্ব খৃষ্টীয় নব-প্লেটোনীয়গণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল এবং সেই জন্য উদাহরণ স্বরূপ আমররা সেণ্ট অগাষ্টিন এবং ছদ্ম-ডায়োনিসিয়াস এরিও পেজইটে এই তত্ত্বের সন্ধান পাই। একমাত্র না হইলেও যে এক গ্রন্থের মাধ্যমে নব-প্লেটোনীয় ঈশ্বরতত্ত্ব আরবদের নিকট পৌঁছায় তাহা ছিল ছদ্ম-এরিষ্টটলীয় "ডি কসিস্'। ইহা প্রোক্লাসের "ঈশ্বর তত্ত্বের গোড়ার কথা" নামক গ্রন্থের সারসংগ্রহ এবং জনৈক খৃষ্টান কর্তৃক কোনও উপায়ে রূপান্তরিত। একুইনাসের পূর্বেকার যাজক-সম্প্রদায়ের দর্শনের ইতিহাসের জন্য ইহার লাতিন অনুবাদের প্রভূত মূল্য আছে। এই ধরণের তত্ত্ববিদ্যার সূক্ষ্মাংশগুলিতে পার্থক্য থাকিলেও এবং ইহার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইলেও আল্-কিন্দি হইতে ইব্‌ন্ রুশদ্ পর্যন্ত সকল ইস্‌লামীয় দার্শনিকদেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল।

আর একটি বৈশিষ্ট্য যাহা প্রায় সকল ইস্‌লামীয় দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু যাহার মূল এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রীক্ গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই তাহা হইতেছে সক্রিয় বুদ্ধি বা এরিষ্টটলের নুস্ পোয়েটিকস্ (nous poietikos) কে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা। এই বস্তুটিকে চন্দ্রের উপরের আধ্যাত্মিক জগৎ এবং মানবমন এই দুইয়ের মধ্যস্থ বলিয়া মনে করা হইত, যাহার মাধ্যমে মানব-মন এবং মানব-কল্পনা দুইই ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয়। মনে হয় যেন এরিষ্টটলের মৌলিক কিন্তু অস্পষ্ট ধারণার বিরোধিতা করিয়া আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার ইহাকে প্রথম কারণের সহিত একীভূত করিয়াছেন। 'ডি এ্যানিমা'র উপর ছদ্ম-জন ফিলোপোনাসের ভাষ্যে উল্লিখিত কয়েকজন পরবর্তী দার্শনিক ইহাকে এক স্বতন্ত্র অর্ধ ঈশ্বরীয় সত্তা বলিয়া মনে করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আল-ফারাবি এবং ইব্‌ন সিনার বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় মতবাদের গ্রীক্ মূল এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে ইহা নব-প্লেটোনীয় দার্শনিক চিন্তার শেষ সময়ের স্বাভাবিক ফল এবং সম্ভবতঃ ইহার উৎপত্তিস্থল ছিল আলেকজান্দ্রিয়া: ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ মতবাদ কঠোর একেশ্বরবাদের সমর্থকদের নিকট কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই জন্য আরবীয় দার্শনিকেরা সক্রিয় বুদ্ধিকে কোরাণোক্ত 'পবিত্রাত্মা' অর্থাৎ তত্ত্ব প্রকাশের দূত গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে, অথবা অমর আত্মা সমূহের পরম আবাসস্থল স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

মানবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যা দার্শনিকদের সম্মুখে কি আকারে উপস্থিত হইবে তাহা নির্ভর করে তাঁহারা যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানী মতবাদ পোষণ করেন

তাহার উপর। এরিষ্টটলের মনোবিজ্ঞান আলেকজাণ্ডার (তৃতীয় শতাব্দী) এবং থেমিষ্টিয়াসের (চতুর্থ শতাব্দী) ভাষ্যসমূহে এবং সিম্প্লিসিয়াস্ এবং জন্ ফিলো-পোনাস (ষষ্ঠ শতাব্দী) কর্তৃক যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহারই উপর ইস্লামীয় মনোবিজ্ঞান অধিকাংশতঃ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সে সম্বন্ধে এরিষ্টটল একেবারে নির্বাক ছিলেন, সেইজন্য স্টোয়িক মতবাদ প্রভাবিত নবপ্লেটোনীয় মতবাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে—যেমন আল্-ফারাবির দর্শনে অথবা প্লোটিনাসের ব্যবহৃত যুক্তিসমূহের সাহায্য লওয়া হইয়াছে—যেমন ইব্‌ন্ সিনার দর্শনে। আত্মার অমরত্বের যে সমস্যা নব-প্লেটোনীয় এরিষ্টটলানুরাগীদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ছাড়াও মৃতব্যক্তির দেহের পুনরুত্থান যাহা ইস্লাম ধর্মের (এবং খৃষ্টান ধর্মেরও) দৃষ্টিতে প্রমাণের অসাধ্য মতবাদ মুস্লিম দার্শনিকদের পক্ষে এক নূতন অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এইগুলি এবং এইগুলির অনুরূপ অন্যান্য অসুবিধা উত্তরকালীন গ্রীক্ দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিতে ইতঃপূর্বে অংশতঃ অনুভূত হইয়াছিল এবং অংশতঃ মুস্লিমদের পক্ষে হয় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল নতুবা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমার মতে, ইস্লামের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি কোন কোন বিভিন্ন উপায়ে এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সেইদিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা এইগুলিকে আরও সন্তোষজনকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি।

ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যে অতিপ্রাকৃত জ্ঞান আছে বলিয়া মনে করা হয় সেই সম্বন্ধে এবং আত্মার জীবনে বুদ্ধি-বিরোধী উপাদানসমূহ সম্বন্ধে সমস্যাগুলিকে প্লেটোর সময় হইতে কোন গ্রীক দার্শনিক অবহেলা করেন নাই। হেলেনীয় যুগের শেষভাগে এবং যে শতাব্দীগুলিতে নব-প্লেটোনীয় দর্শনের আধিপত্য ছিল সেই সময়ে এই সমস্যাগুলি উৎসাহের সহিত আলোচিত হইত এবং ইহাদের নূতন নূতন সমাধানেরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইস্লামীয় দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়া প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। আল্-কিন্দি সমসাময়িক কালামের ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্-রাজী সমস্ত ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিকেই প্রতারক বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন, আল্-ফারাবি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যাক্তিদের চরিত্রকে দর্শনের অধীন করিতে চাহিয়াছিলেন, আভিসেন্না ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিদের চরিত্রকেই মানবদের সাধন-যোগ্য পূর্ণতা বলিয়া মনে করিতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দী ও তাহার পরবর্তী কালে যে সকল বিভিন্ন নব-প্লেটোনীয় গ্রীক্

সম্প্রদায় ছিল তাহাদের সম্বন্ধে এবং সিরীয় পরিবেশে খৃষ্টধর্ম ও তাহাদের দর্শনের মধ্যে তাহারা কিভাবে সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিল এবং এই যুগে সমগ্র পূর্ব-ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে কিভাবে শিক্ষার সাধারণ অবনতি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এখনও আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। আলেকজান্দ্রিয়া ও এথেন্সের দুইটি বৃহৎ শিক্ষাপীঠের—যাহাদের মধ্যে শেষোক্তটিকে ৫২৯ খৃষ্টাব্দে জাষ্টিনিয়ান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—মধ্যে বিভেদগুলি সুস্পষ্ট এবং আরবীয় দর্শনে তাহারা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। যাহাকে আমরা প্রাচীন গ্রীক্ ঐতিহ্য বলিতে পারি এবং যাহা আমরা প্লুটার্ক ও মার্কাস্ অরেলিয়স্, গ্যালেন ও আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে জানিতে পারি তাহা আলেকজান্দ্রিয়ার নব-প্লেটোনীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ইহার সহিত বাগ্‌দাদের দশম শতাব্দীর দার্শনিক সম্প্রদায় এবং তাহার পর আল্ ফারাবি এবং তাঁহার মাধ্যমে এক দিকে আভিসেন্না এবং সর্বোপরি আরেক দিকে স্পেন দেশীয় আরবীয় দার্শনিকদের সাক্ষাৎ সংযোগসূত্র ছিল। আরবীয় দার্শনিকদের জীবনী সম্বন্ধে ঐতিহ্য ও আরবীয় দর্শন গ্রন্থগুলির স্বাধীন বিশ্লেষণ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকৃত হইত এবং যাবতীয় ধর্মকে প্রতীকাকারে একই দার্শনিক তত্ত্বের বাহক বলিয়া গণ্য করা হইত। এথেন্সীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস ও ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত অ-খৃষ্টীয় গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করিবার অধিক পক্ষপাতী ছিল এবং প্রোক্লাসের ন্যায় দার্শনিকেরা দার্শনিক প্রমাণের অগম্য অতি প্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি হইতে লব্ধ সাক্ষাৎ জ্ঞানের দাবী করিতেন। যে খৃষ্টান এবং মুসলিম দার্শনিকেরা শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে বিচার বুদ্ধির দাবী পরিমাপ করিতে চেষ্টিত ছিলেন তাঁহাদের নিকট এই ধরনের গ্রীক্ দর্শনের আবেদন ছিল এবং আল্-কিন্দি এবং এই নব-প্লেটোনীয়দের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। আমরা অন্য সূত্রেও জানি যে সিরীয় নেষ্টরীয় এরিষ্টটলীয়রা এথেন্সের শিক্ষাপীঠের নিকটস্থ কেন্দ্রগুলি হইতে তাঁহাদের প্রাথমিক দার্শনিক জ্ঞান লাভ করেন। ইহাও সুস্পষ্ট যে এথেন্সের বিদ্যাপীঠে আলেকজান্দ্রিয় বিদ্যাপীঠ অপেক্ষা প্লেটোনীয় উপাদান অধিক প্রবল ছিল এবং ইহাদের অনুরূপ ইসলামীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিতেও এই প্রভেদ লক্ষ্যগোচর হয়। যিনি সম্ভবতঃ প্রথম যুগের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ইস্‌লামীয় দার্শনিক ছিলেন সেই আর্-রাজির দর্শনের গ্রীক্ পটভূমিকা আবিষ্কার করা তত সহজ নয়।

সুতরাং ইস্‌লামীয় দর্শন এক অতি বিভিন্ন ঐতিহ্যের উদারমনা ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গ্রীক্ দর্শনকে আত্মসাৎ করিয়া কিছু সৃজন করিবার চেষ্টা,

এই বিজাতীয় উপাদানকে ইস্‌লামীয় ঐতিহ্যের স্বকীয় অঙ্গরূপে পরিণত করার প্রয়াস। ইহা এক চিত্তাকর্ষক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস। আমরা যতই মনুষ্য-জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করি আমরা ততই উপলব্ধি করি যে ইতিহাসে আকস্মিক উদ্ভব বলিয়া কিছু নাই, এখানে বিদ্যমান বস্তু হইতেই নিয়ত নব নব আকারের উদ্ভব হইতেছে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব সভ্যতার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হইতেছে ইস্‌লামীয় দর্শন তাহারই এক চিত্তাকর্ষক উদাহরণ।

[তিন]

কতিপয় ইস্‌লামীয় দার্শনিক

ইস্‌লামীয় দর্শন চিন্তার কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করার প্রারম্ভে অপর এক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। গ্রীক্ গ্রন্থকারদের যে সকল গ্রন্থ আজ পর্যন্তও টিঁকিয়া আছে তাহাদের বিশ্বাসযোগ্য সমালোচনাপূর্ণ সংস্করণ এবং আধুনিক অনুবাদ গ্রীক্ দর্শনের ছাত্র পাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত অনেক মূল্যবান ভাষ্য গ্রন্থও তিনি পাইয়া থাকেন। যে সকল মূল গ্রন্থে তাঁহার প্রয়োজন তিনি বিনা দ্বিধায় তাহাদের অর্থ লইয়া আলোচনা করিতে পারেন এবং প্রধান প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হইতে পারেন। আরবীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এই ধরণের প্রাথমিক কার্য এখনও করা হয় নাই, সুতরাং ইস্‌লামীয় দর্শনের ছাত্রদিগকে তাহাদের সময়ের অধিকাংশই যাহা অপরিহার্য অথচ কোন ক্রমেই আনুষঙ্গিকমাত্র নয় এমন কার্যে ব্যয় করিতে হয়। আল্-কিন্দি প্রণীত পনেরোটি দার্শনিক প্রবন্ধ কেবলমাত্র সম্প্রতি প্রথমবার সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইস্তাম্বুলের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি ইব্‌ন্ সিনার গ্রন্থগার হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহাদর মধ্যে দুইটি ইটালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আর্ রাজির এগারখানি দার্শনিক গ্রন্থ বারো বৎসর আগে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইটির অনুবাদ হইয়াছে। আল্ ফারাবির রচনাসমূহের কতকগুলি জার্মানী, সিরিয়া, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং স্পেনে সম্পাদিত হইয়াছিল, এই সংস্করণগুলির মধ্যে অধিকাংশই সন্তোষজনক নয়, এবং সেইগুলি এবং তাহাদের ভিত্তিতে লিখিত অনুবাদ গ্রন্থগুলি পুনর্লিখিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। ইব্‌ন্ সিনার প্রধান দার্শনিক বিশ্ব-কোষ আশ্‌ শিফার একটি সমালোচনাপূর্ণ সংস্করণ এতদিন পরে প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহার অন্যান্য

দার্শনিক গ্রন্থের যে সকল সংস্করণ বর্তমান সেগুলির অধিকাংশই অসন্তোষজনক এবং অনেক গ্রন্থেরই এখনও অনুবাদ হয় নাই। আভেরসের তাহাফৎ আৎ-তাহাফৎ (Tahāfut at Tahāfut) নামক যে গ্রন্থে আল্ গজালির আক্রমণ হইতে দর্শনকে রক্ষা করিয়াছেন তাহার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেরও উৎকৃষ্ট সংস্করণ আছে। আভেম্পেসের রচনাগুলির অধিকাংশ অক্সফোর্ডে একমাত্র পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে (বার্লিনের পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে) এবং ইহার অতি অল্পাংশই সম্পাদিত ও পঠিত হইয়াছে।

১। ইয়াকুব ইবন ইশাক আল কিন্দি (মৃত্যু ৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর)

বিভিন্ন ইসলামীয় দার্শনিকগণ কিভাবে গ্রীকদের নিকট তাঁহাদের ঋণ এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অবদানের বিবরণ দিয়াছিলেন সেগুলির তুলনা করিলে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে দর্শনলভ্য সত্য জাতি ও ধর্মসমূহের সীমানা অতিক্রম করিয়া যায় এবং কে ইহা প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাতে কিছু যায় আসে না। ইস্‌লাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করিতেন যে তাঁহার নবধর্ম ধর্মীয় সত্যের নবতম প্রকাশ কিন্তু কোন মতেই প্রথম নয়। দার্শনিকদের মনোভাব তাঁহার এই মনোভাবের সহিত তুলনীয়। গ্রীকরা না থাকিলে দর্শনের জন্ম হইত না এবং যিনি অতীত যুগের সমবেত অভিজ্ঞতা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহস করেন তিনি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না; কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন অল্পস্থায়ী। "সত্যানুসন্ধানে যাঁহাদের প্রচুর অবদান আছে তাঁহাদের ত কথাই নাই যাঁহাদের অবদান অল্প তাঁহাদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।... সত্যকে স্বীকার করিতে এবং যে কোনও উৎস হইতে ইহা আসুক না কেন—অতীত যুগের ব্যক্তিগণ হইতে বা বিদেশীয়দের নিকট হইতে পাওয়া যাক না কেন, ইহাকে আত্মসাৎ করিতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। সত্যান্বেষীর নিকট সত্যের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ আর কিছুই নাই। যে সত্যের অন্বেষণ করে ইহা তাহাকে কখনও লঘু বা হীন করে না কিন্তু তাহার মহত্ত্ব ও সম্মান বৃদ্ধি করে।" আরবীয় ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক যে গ্রন্থ আল্ কিন্দি তৎকালীন খলিফা আল-মুতাসিমকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার ভূমিকায় এই সগর্ব উক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর পরে যখন ইস্‌লামীয় দর্শনের ইতিহাসের অন্তিমকাল

আগতপ্রায় তখন ইবন্ রুশদ্‌ও এই বিশ্বজনীন মনোভাবকে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার রূপে পুনরায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। আল্ কিন্দি যাহা করিয়াছিলেন সেইরূপ করাই প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রথম দার্শনিকের উৎসাহ সর্বস্বীকৃত শিক্ষা প্রণালীতে পরিণত হইয়াছিল।

আল্‌কিন্দিই প্রথমে এই ঐতিহ্য প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, "আমার নীতি হইতেছে প্রাচীনগণ কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রথমতঃ সম্পূর্ণ উধৃতিসমূহের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত আমাদের আরবীয় ভাষার প্রথা আমাদের যুগের রীতি ও আমাদের নিজেদের সামর্থানুসারে প্রাচীনগণ যাহা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ করেন নাই তাহা সম্পূর্ণ করা।" এই উক্তির তাৎপর্য এই যে তিনি কেবলমাত্র গ্রীক্ চিন্তা সমূহ আরবীয় ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন না, কিন্তু যে খালিফ্ আল-মামুন ও খালিফ্ আল্‌মুতাসিমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় তাঁহাদের সমর্থিত ইস্‌লামের ব্যাখ্যার সহিত জ্ঞানের এই নূতন বিভাগের সংযোগ সাধনে তিনি কিছু মৌলিকতার দাবী করেন। স্পষ্টই মনে হয় যে তিনি মু'তাজ্বীলা মতবাদ সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাকে এক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কারিয়াছিলেন। মু'তাজ্বীলা মতবাদিগণকে আমরা একদিকে ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম আরোপ করিবার প্রবণতা ও আক্ষরিকতাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি সংগত মতবাদের পরিপোষকও অপরদিকে সংশয়বাদ এবং নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মূলতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর পরিপোষক বলিয়া মনে করিতে পারি। ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতারূপ আস্থাবাদের দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে তিনি যে মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে স্পষ্টতঃ সেই মতবাদকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই আস্থাবাদ তাঁহার শেষ জীবনে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ঈশ্বরানুপ্রাণিত ধর্মের কয়েকটি প্রধান তত্ত্ব—যথা 'শূন্য হইতে জগৎ-সৃষ্টি' এবং 'শেষ-বিচার দিবসে মৃত-দেহের পুনরুত্থান" প্রভৃতিকে একবার স্বীকার করার পর আল্-কিন্দির পূর্বোক্ত মনোভাবের ফলে তাঁহাকে পরম্পরাক্রমে আগত নব-প্লেটোনীয় এরিষ্টটলীয় দর্শনে কিছু পরিবর্তনসাধন করিতে হইয়াছিল। তদনুসারে আমরা ইস্‌লামে সর্বপ্রথম বিশ্বসম্বন্ধীয় নব-প্লেটোনীয় মতের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি কিন্তু ইহার সহিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ সর্তও সংযুক্ত ছিল। চিরন্তনী সৃষ্টির প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং অন্ততঃ একস্থলে গ্রীক্‌দর্শনের একটি মূল স্বতঃসিদ্ধ সত্য "শূন্য হইতে কোন কিছুর সৃষ্টি হইতে পারে না"—ইহাকে বর্জন করিতে হইবে। সেই স্থল হইতেছে স্বর্গের সর্বোচ্চ লোক যাহার মধ্য দিয়া ঐশ্বরিক সত্তা জগতের নিম্নতম স্তরসমূহে এবং

মনুষ্য-জীবনের আবাসস্থল অর্থাৎ পৃথিবীতে সঞ্চালিত হয়। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তির ফলে এক ক্ষণকালে সর্বোচ্চ লোক শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং ঈশ্বর ইহাকে ধ্বংস করিতে সিদ্ধান্ত করিলে আর এককক্ষণও স্থায়ী হইতে পারে না। এই ভাবে নব-প্লেটোনীয় নিঃসরণ-নিয়মানুসারে জগৎ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে তাহাকে শূন্য হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছিল ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ যে মতবাদকে নিশ্চয়তার সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। সুতরাং যে ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের বাহিরে এবং উচ্চে তাঁহার ক্রিয়ার উপর সৃষ্টি নির্ভরশীল এইভাবে ব্যখ্যা করা হইয়াছিল। ঈশ্বরতত্ত্ব এবং দর্শনের মিলন ঘটাইবার ইচ্ছা প্রবল থাকায় এই মতবাদে যে সকল দার্শনিক ত্রুটী আছে সেগুলিকে অবহেলা করা হইয়াছিল। আল্-ঘাজালী কর্তৃক ঈশ্বরতত্ত্বের যে নূতন ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায় যে পরবর্তী দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির প্রচেষ্টাসমূহ অপেক্ষা এইরূপ ভাবধারা সম্ভবতঃ ইস্লামের প্রকৃতস্বরূপের সহিত অধিক সংগতিপূর্ণ ছিল। ইহা ব্যতীত আল্-কিন্দির তত্ত্ববিদ্যায় উপরে বর্ণিত নব-প্লেটোনীয় এরিষ্টটলীয় মতবাদের ধারা হইতে বিচ্যুতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। প্লোটিনাস্ এবং তাঁহার অনুবর্তীগণকে অনুসরণ করিয়া ঐশ্বরিক প্রথম কারণকে সকল-মানবীয়গুণের অতীতে এবং ঊর্ধ্বে অবস্থিত পরম এক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদ্‌গণ এবং মু'তাজ্জীলামতবাদিগণের মতানুসারে তাঁহাকে কেবলমাত্র নেতিবাচক শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় এইরূপ বলা হইয়াছিল। ইবন্ সিনার ন্যায় আল্-কিন্দিও মোটের উপর প্লেটো ও এরিষ্টটলের সমন্বয়কারী পরবর্তী গ্রীক দর্শনে প্লেটো-সম্পর্কীয় উপাদানের উপরেই বেশী জোর দিয়াছিলেন। তিনি এরিষ্টটলসম্মত যুক্তির আকারগুলিকে উপেক্ষা করিয়া স্টোয়িক এবং প্রোক্লাসের ন্যায় নব-প্লেটোনীয়গণ কর্তৃক সমর্থিত প্রাকল্পিক এবং বৈকল্পিক ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং এইজন্য আল্-ফারাবি এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোবিজ্ঞানকে আরও বিশদভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, কিন্তু ইহার মূল বক্তব্যগুলি সুস্পষ্ট। প্লেটোর ন্যায় তিনিও মানবাত্মাকে দেহ হইতে বিভাজ্য একটি দ্রব্য বলিয়া মনে করিতেন এমন ইউডিমাস হইতে অপর সকলের নিকট বিলুপ্ত অংশকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কথোপকথন গ্রন্থটি এরিষ্টটল যৌবনকালে যখন তিনি তাঁহার গুরুর ন্যায় সমগ্র আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন তখন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সহিত তিনি এরিষ্টটলের 'ডি এ্যানিমা'র সহিতও—হয় সমস্ত গ্রন্থ নতুবা ইহার কোন সংক্ষিপ্তসারের সহিত পরিচিত ছিলেন

এবং এরিষ্টটল আত্মাকে দেহের 'পরিচালক শক্তি' বলিয়া যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইবন্ সিনা'র মনোবিজ্ঞানেও এই অসঙ্গতির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আল্ ফারাবী এবং ইব্‌ন্ রুশ্‌দের দর্শন অপেক্ষা তাহার দর্শনে প্লেটোনীয় উপাদান এবং বিশেষতঃ প্লোটিনাসের প্রভাব অধিক শক্তিশালী ছিল। আল-কিন্দি এবং ইবন্ সিনার মধ্যে এই জাতীয় সাদৃশ্য আরও অনেক আছে—ইবন্ সিনা আল্-কিন্দির এক বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আল্-কিন্দি ও পরবর্তী ইস্‌লামীয় দার্শনিকদের ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দার্শনিকদের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সম্পর্কস্থাপন করিবার সময় এখনও আসে নাই।

ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের মহত্ব সম্বন্ধে আল্-কিন্দির মতবাদ বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত এই ব্যাপারের যৌক্তিক ব্যাখ্যার কোন সন্ধান আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে তাঁহার মতে মানবের পক্ষে যতটা পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব ইহা তাহাই। ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের যে জ্ঞান অর্জন করেন তাহা নিশ্চিতই সাধারণ-মানুষের জ্ঞান যে স্তরে পৌঁছাইবার আশা রাখে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য মু'তাজ্জীলাপন্থীগণ কোরাণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহা দর্শনের অপেক্ষা উচ্চতর সত্যের সন্ধান দিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মৃতদেহের পুনরুত্থানের ব্যাপারে আল্-কিন্দি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের উক্তির উল্লেখ করিয়া এবং বিচারমূলক তর্ক দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সন্তুষ্ট। তিনি যে ইহার সমর্থনে কোন দার্শনিক প্রমাণ দিতে পারেন না সেজন্য তিনি মোটেই উদ্বিগ্ন নহেন। ইহা আমাদিগকে প্লেটোর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যিনি তাহার যে সকল ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাসগুলির কোন প্রমাণ পাইতেন না অথবা তখনও পর্যন্ত পান নাই সেগুলিকে উপাখ্যানের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আল-কিন্দি যখন সর্বপ্রথম গ্রীক দর্শনের আরবীয় প্রতিচ্ছাবি নয়, মুস্‌লিমদের জন্য গ্রীক দর্শন রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার রচনায় প্রত্যাদিষ্ট সত্য প্লেটোর উপাখ্যানের স্থান অধিকার করিয়াছিল। আল-কিন্দির চিন্তার একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তিনি জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেন, এ-বিষয়ে আল্ ফারাবী বা ইব্‌ন্ সিনার সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। মনুষ্য-জীবনের উপর গ্রহগণের যে বাস্তবিক প্রভাব আছে তাহা এথেন্সের নব-প্লেটোনীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের নিকট সন্দেহের বিষয় ছিল না এবং আল্-কিন্দির সহিত এই সম্প্রদায়ের যে সম্পর্ক ছিল এই সাদৃশ্যই তাহার পক্ষে একটি নূতন যুক্তি। কিন্তু আরবীয় সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য স্থিতিকাল

সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার চেষ্টা করিবার সময়ে তিনি জ্যোতিষানুমোদিত পদ্ধতি এবং কোরাণ উভয়ের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কোরাণের কয়েকটি সুরার প্রারম্ভে যে সকল প্রখ্যাত রহস্যময় অক্ষর আছে তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া যে অদ্ভুত গাণিতিক হিসাব করা হয় বিজ্ঞান তাহাই সমর্থন করিয়া থাকে।

২। আবু বক্‌র্‌ মুহম্মদ ইবন্‌ জাকারিয়া অর্‌ রাজী

যখনই আমরা অর্‌ রাজীর লেখা কোন একটি পংক্তি পাঠ করি তখনই আমাদের মনে হয় যে আমরা এমন এক উচ্চমনা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছি যিনি নিরহঙ্কারী হইয়াও নিজের মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাঁহার যে মহান গ্রীক্‌ পূর্বসূরীগণকে তিনি তাঁহার শিক্ষক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদেব অপেক্ষা দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নিজেকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন না। যদি'ও তাঁহার মতে সক্রেটীস, প্লেটো ও এরিষ্টটল, হিপোক্রেটীস ও গ্যালেনকে অতিক্রম করা যায় না তাহা হইলেও যে ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার জ্ঞান ইঁহাদের জ্ঞানের অপেক্ষা বেশী সে ক্ষেত্রে তিনি ইঁহাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির সংশোধন করিতে অথবা তাঁহার নিজের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ আবিষ্কারের সাহায্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। উদাহরণ স্বরূপ, যখনই তিনি কোন রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তখনই তিনি সেই সময়ে আরবীয় অনুবাদ সমূহের মাধ্যমে যে সকল গ্রীক এবং ভারতীয় মূল গ্রন্থ পাওয়া যাইত এবং তাঁহার পূর্বেকার আরবীয় চিকিৎসকদের গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যাইত প্রথমে তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করিতেন। তিনি তাঁহার নিজের মত ও সিদ্ধান্ত সংযুক্ত করিতে বিস্মৃত হইতেন না এবং আপ্তবচনমাত্রকেই স্বীকার করিয়া লইতেন না। তাঁহার দর্শন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তিনি তাঁহার সমকালীন আরবীয় ভাষা-ভাষী জগতেব গণ্ডীর মধ্যে সক্রেটীস এবং হিপোক্রেটীসের কার্য সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিতেন। ইহুদী খৃষ্টান কিংবা ইসলামীয় ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষগণ যে অলৌকিক ক্ষমতা সমূহের দাবী করিতেন অথবা সেগুলি তাঁহাদের আছে বলিয়া লোকেদের যে ধারণা ছিল তাহা তাঁহার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য নাই এবং তাঁহাদের উক্তি-সমূহ বিরোধিতাপূর্ণ। তাঁহারা যে সকল ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেগুলি শত্রুতা, যুদ্ধ ও দুঃখের কারণ হইয়াছে। ইহা আমাদিগকে

প্রচলিত ধর্মের কঠোরতম সমালোচকদ্বয় এপিকিউরাস ও লুক্রেশিয়াসের উক্তি "Tantum religio poltuit suadere malorum" স্মরণ করাইয়া দেয়। প্লেটোনীয় ও স্টোইকগণ নিজেদের মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরম্পরাগত ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য খৃষ্টান ও মুসলিমগণের কাছে তাঁহারা অধিক সমাদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্-রাজীর মনোভাব নাস্তিকতার সমতুল্য ছিল এবং পাশ্চাত্য জগতে পরবর্তী যুগে যে ধ্বনি উঠিয়াছিল "মুশা, যীশু এবং মহম্মদ এই তিন প্রতারক"—তাহারই কাছাকাছি পৌঁছায়। দর্শন এবং তাহার মর্যাদা সম্বন্ধে প্লেটোর অভিজাত ধারণা ঘোষণা করিয়াছিল যে দর্শন মাত্র নির্বাচিত কয়েকজনের জন্য এবং অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিকও প্লেটোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমস্বরে তাহাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু এপিকিউরাসের ন্যায় তিনি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানবেরই দর্শনে অধিকার আছে, ইহাই মুক্তি-লাভের একমাত্র পন্থা। "যে ব্যক্তিই প্রয়াস করেন এবং অধ্যয়ন এবং গবেষণায় রত থাকেন তিনি সত্য লাভের পথে যাত্রা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দর্শন অধ্যয়নের দ্বারাই মানবআত্মাসমূহ এই জগতের পঙ্কিলতা ও অন্ধকার হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং পরজীবনের জন্য রক্ষা পাইতে পারে। যখন কোনও ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করে এবং ইহার কোন অংশের—তাহা আমাদের চিন্তায় ক্ষুদ্রতম হইলেও—অর্থগ্রহণ করিতে পারে, তখন সে তাহার আত্মাকে পঙ্কিলতা এবং অন্ধকার হইতে মুক্ত করে এবং ইহার মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত করে। যাহারা এ পর্যন্ত তাহাদের আত্মাসমূহকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নকে অবহেলা করিয়াছে, তাহারা যদি ইহার প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ দিত, তাহা হইলে ইহার ক্ষুদ্রাংশেরও অর্থবোধ হইলে তাহারা পঙ্কিলতা ও অন্ধকার হইত মুক্ত হইত।" প্লোটিনাস ও পরফীরীর ন্যায় তিনিও দর্শনের শুদ্ধিকরণ শক্তিতে বিশ্বাসী। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর একটি বিখ্যাত উক্তি আমাদের মনে উদিত হয়। "যদি কেহ সাধারণ মাত্রার শ্বেতের সহিত বিশুদ্ধ শ্বেতের সামান্য অংশও মিশ্রিত করে তাহা হইলে ঐ সাধারণ মাত্রার শ্বেত অধিকতর শ্বেত, সুন্দর ও সত্য হয়।" মুসা, যীশু ও মহম্মদের বাণীর প্রতি হয়ত অর্ রাজী বধির ও অচেতন ছিলেন। কিন্তু গ্রীকদের আধ্যাত্মিক ধর্ম-স্বরূপ প্লেটোনীয় মতবাদের সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ ধর্মীয় গভীরতা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অর্-রাজী জগতের নিত্যতায় বিশ্বাস করিতেন না কিন্তু টাইমিয়াস (Timaeus)-এর প্লুটার্ক এর গ্যালেনের ন্যায় কয়েকটি ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়া তিনি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন যে জগৎ কালে সৃষ্ট হইয়াছে

বটে কিন্তু কেবলমাত্র জড়-উপাদান নিত্য। যদিও তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টির সমর্থন করিতেন না তাহা হইলেও তাঁহার মত ইস্‌লামীয় মতের অধিকতর নিকটবর্তী এবং খৃষ্টান জন্‌ ফিলোপোনাস কর্তৃক প্রোক্লাসের উপর আক্রমণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ আক্রমণ পরে আল্‌ গাজ্জালীও জগতের নিত্যতার সমর্থক মুসলিমদের উপরেও চালাইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ পরম জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা রূপেই নয় অনন্ত করুণারূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। প্লেটোর মতানুসারে মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব ঈশ্বরের ন্যায় হওয়া উচিত। সুতরাং ঈশ্বরানুগ্রহের সর্বোচ্চ অধিকারী প্রাণী সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ন, সর্বাপেক্ষা দয়াশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। দর্শন কেবলমাত্র বিদ্যা নয়, কিন্তু জাবন-যাপনের একটি ধারা, জ্ঞানার্জন এবং সেই জ্ঞানানুসারে আচরণ। ইস্‌লামের মূলভাব হইতে এই মতের বিশেষ পার্থক্য নাই।

অর্‌-রাজী নিজেকে প্লেটোনীয় বলিয়া দাবী করিতেন এবং ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার চিন্তার উপর প্লেটোনীয় বা নব-প্লেটোনীয় উপাদানের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং ইস্‌লামীয় দার্শনিকদের অধিকাংশই যে সকল পরবর্তী গ্রীক্‌ মতবাদগুলি অনুসরণ করিতেন সেগুলির সহিত তাঁহার মতসমূহের বহু পার্থক্য ছিল। বিশেষ করিয়া এই কারণে আল্‌-ফারাবী তাঁহাকে তাঁহার দুই গ্রন্থে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই বাক্যাংশটি অনুমোদন-যোগ্য হইলে বলিতে হয় যে তাঁহার মত বিশেষভাবে নব-প্লেটোনীয় মত, ইহার মধ্যে এমন বহু উপাদান আছে যাহা আমাদিগকে 'আস্তিক' (Gnostic) দার্শনিক চিন্তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরপক্ষে ইহাতে জড় দ্রব্যবিষয়ক গ্রীক পরমাণুবাদের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং রোমসাম্রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীর প্লেটোনীয় মত ধারার সহিত এইগুলি খুব সম্ভবতঃ মিশ্রিত হইয়াছিল। অর্‌-রাজীর দার্শনিক চিন্তার অব্যবহিত উৎস সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি প্রোক্লাসের রচনার সহিত উত্তমরূপেই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর অনুবাদও তাঁহার নিকটে ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ন্যায়ই তাঁহার দার্শনিক জ্ঞান বহু বিস্তৃত ছিল। তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত আমাদের অধিক পরিচয় আছে। ইস্‌লাম ধর্মের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে হরান নামক স্থানে যে প্রকৃতি-পূজক গ্রীক দর্শন সম্প্রদায় বর্তমান ছিল প্রচলিত মতানুসারে তাহার সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল, এবং যদিও আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় আমরা এই বিবরণের সত্যতা নির্ণয় করিতে পারি না, তাহা হইলেও ইহাকে সন্দেহ করিবার

কোন কারণ নাই। অন্য সম্প্রদায়ের মতে নিত্য-তত্ত্ব একটি, তাঁহার মতে পাঁচটি: সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বাত্মা, জড়পদার্থ, নিরপেক্ষ দেশ ও নিরপেক্ষ কাল। তিনি জানিতেন যে এরিষ্টটলের সহিত তাঁহার মৌলিক পার্থক্য আছে, কিন্তু তিনি সুচিন্তিতভাবে ও দৃঢ়তার সহিত স্বীয় পন্থা অনুসরণ করিবার দাবী করিতেন: "কিন্তু আমি বলি……" আধুনিক যুগের পণ্ডিতেরা, অতি অল্পকাল হইল তাঁহাকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি এখনও বর্তমান সেগুলি সম্বন্ধে আরও অধিক সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন—এই জন্য তাঁহার জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ আলোচনা করিতে হইলে এবং পরবর্তী ইস্‌লামিক চিন্তায় ইহার কি কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা দেখাইতে হইলে অনেক কিছু বলিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যক্তির মহত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

তিনি এবং অল্‌-কিন্দি উভয়েই গ্রীক্ উপাদানমাত্রকে ভিত্তি করিয়া লৌকিক নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুইজনের রচনারই আধুনিক অনুবাদ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে কে প্লেটোনীয় ঐতিহ্যের সাধারণ বিষয়গুলিকে উজ্জীবিত করিতে অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। অর্‌-রাজী তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন, আর অল্‌-কিন্দির রচনায় আমরা বহু যুক্তি পাই বটে কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে আকৃষ্ট হই না। অর্‌-রাজী এবং ইবন্ সিনা উভয়েই আত্ম-জীবনী লিখিয়াছিলেন। অর্‌-রাজী লিখিয়াছিলেন আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য, ইবন্ লিখিয়াছিলেন তাঁহার এক ছাত্রের অনুরোধে। ইবন্ সিনা বলিয়াছেন যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি যাহা কিছু শিখিবার শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী জীবনে তাঁহার জ্ঞান কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই; ইহা অধিক পরিপক্ক হইয়াছিল কিন্তু পরিমাণে বাড়ে নাই। নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অর্‌-রাজীর মনোভাব মোটেই এইরূপ ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা পড়ি নাই এমন কোন পুস্তক পাইলে অথবা যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই এমন কোন ব্যক্তির কথা শুনিলে সেই পুস্তক অধিগত করিবার পূর্বে অথবা সেই ব্যক্তি যাহা জানে তাহা শিক্ষা করিবার পূর্বে আমার বহু ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন কাজে মনোযোগ দিই নাই।" গ্রীক্ দার্শনিকদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং যাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিতেন ততদিন নূতন জ্ঞানার্জনে ক্লান্তিবোধ করিতেন না। তাঁহাদের মনোভাবের সহিত এই মনোভাবের সঙ্গতি আছে। সোলনের একটি প্রায়শঃ উদ্ধৃত উক্তি হইতেছে "আমি সর্বদাই নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া বৃদ্ধ হইতেছি"।

সর্বশ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম পণ্ডিত আবু' রাইহান্‌ অল্‌-বেরুনি (মৃত্যু ১০৪৮ খৃঃ) যিনি ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় জীবনের গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ তিনি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক এই উভয়রূপেই অর্‌-রাজীর মহত্ত্বের প্রশংসায় অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক শরীর গঠন বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ভেসালিয়াস যিনি কেবলমাত্র তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন তিনি তাঁহাকে মধ্যযুগের প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য গ্রীক্‌ ঐতিহ্যের শেষ শক্তিমান প্রতিনিধি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমত বহুলাংশে যথার্থ।

(৩) আবু নশর অল-ফারাবী (মৃত্যু ৯৫০ খৃষ্টাব্দ)

অল্‌-কিন্দি এক অভিজাত বংশোদ্ভূত আরবীয়। তিনি বস্‌রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কূফার শাসকরূপে এক উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশই বাগ্‌দাদে খলিফার রাজসভায় অতিবাহিত করেন। অর্‌-রাজী পারস্য বংশোদ্ভূত এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশই তেহরাণ নগরের নিকট তাঁহার জন্মস্থান রাইই সহরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল বাগ্‌দাদেও ছিলেন। অল্‌-ফারাবী ট্রান্‌সোক্সালিয়া হইতে আগত একজন তুর্ক ছিলেন। তিনি প্রথমে খোরাসানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর বাগ্‌দাদে আসিয়া বহু বৎসর সেখানে বাস করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি আলেপ্পোর বিখ্যাত হাম্‌দানিদ শিয়াইট শাসক সৈফদ্দৌলার বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন।

অল্‌-ফারাবী দর্শনকে ইস্‌লাম-জগতে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন এবং ইহা ঈশ্বরতত্ত্বের অনুগত হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। অপর পক্ষে, তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে অর্‌-রাজীর প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং ইস্‌লামী বিধি ও তাহা হইতে অনুস্যূত ঈশ্বর-তত্ত্বকে উচ্চতর জীবন হইতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার নিজের রচনা সমূহ এক ভিন্ন পন্থার নির্দেশ দেয়। (তাঁহার মতে) দর্শন সম্পূর্ণভাবে পরম্পরাগত ধর্মের স্থান অধিকার করিবে না, কিন্তু গ্রীক্‌ জগতে প্লেটো যেমন করিয়াছিলেন তেমনই উহার যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করাই দর্শনের কার্য। বাস্তবিকই তিনি তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমগ্র ইস্‌লাম জীবনকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রীক দর্শনকে আলোক-বর্তিকারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহা ইস্‌লাম জীবনের প্রত্যেক

বিভাগে যথা বিচারমূলক ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম বিশ্বাস এবং কোরাণ, আইন ও আইন-তত্ত্ব, ব্যাকরণ, সরস গদ্য ও কবিতার সৌন্দর্যানুভূতি এবং সর্বোপরি আদর্শ সমাজ সংগঠন এবং ইহার শাসকের অতি-প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। সময় উপযোগী হইলে একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইতে পারিত, তাহা না হইলে কয়েকটি ধর্ম পাশাপাশি বাস করিতে পারিত এবং ইহাও অসম্ভব হইলে যে দর্শনে মানুষ চরম পূর্ণতালাভ করে সেই দর্শনের রাজকীয় শক্তির নির্দেশানুসারে ইস্‌লামকে অন্ততঃ পুনর্গঠিত করিতে পারা যাইত। তাহা হইলেও অল্‌-ফারাবী প্লেটোর ন্যায় নিজে কর্মবীর ছিলেন না, বরং একজন চিন্তা-নায়ক ছিলেন, যিনি জগতের সমস্ত ব্যাপার কিরূপ হওয়া উচিত তাহার একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্জন স্থানে বাস করিয়া প্রশান্ত মনে জগৎকে পর্যবেক্ষণ করিতেন।

অল্‌-কিন্দির ন্যায় অল্‌-ফারাবী কেবলমাত্র গ্রাক্‌ দার্শনিকগণকে অনুসরণ করিতেন বলিয়া দাবী করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে গ্রীসে গ্রীক্‌দর্শনের চরম অবনতি ঘটিয়াছে, যে হেলেনীয়গণ অর্থাৎ প্রকৃতি পূজক গ্রীক্‌গণের আর অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্লেটো ও এরিষ্টটলের রচনাসমূহ যাহারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগকে চালিত করিতে পারে এবং ইরাকে কিভাবে ইহার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারে। উত্তরকালীন গ্রীকদের মতে এবং অল্‌-ফারাবীও এই মত গ্রহণ করিতেন—এই ইরাক্‌ হইতেই গ্রীক্‌ দর্শন প্রথমে আসিয়াছিল। বাগ্‌দাদ সম্প্রদায়ের খৃষ্টান অনুবাদক এবং দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ গোলযোগ ছিল তাহা অনেকে দেখাইয়াছেন। তিনি যে তাঁহার হস্তগত এরিষ্টটল এবং প্লেটোর ভাষ্যগুলির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার জন্যই তিনি মুস্‌লিম দার্শনিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই তাঁহার পদ্ধতিকে অতিশয় পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহার সমগ্র দর্শন-চিন্তার চারটি সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এইগুলি সবই অধ্যয়ন এবং সমালোচনার জন্য পাওয়া যায়।

অল্‌-ফারাবীর দর্শনে অল্‌-কিন্দির গৃহীত এরিষ্টটলীয় দর্শন অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠাবান মতবাদের সহিত প্লেটোর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রশস্তির সহিত সংযুক্ত ছিল। উহার সাহায্যে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের উত্তরাধিকারী, মুস্লিম সমাজের

নেতার কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দর্শনই যদি মানবের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি হয় তাহা হইলে ইঁহাকে দার্শনিক রাজা হইতে হইবে। অল্-ফারাবী প্লেটোর 'রিপাব্লিক্'কে রাষ্ট্রনীতির পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করিতেন। এবিষয়ে ইব্‌ন্ রুশ্‌দ (যেমন তাঁহার চিন্তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও) তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইব্‌ন্ রুশ্‌দের সুমার্জিত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত রচনা-সমূহে তাঁহার পূর্বসূরীর সংস্কারমূলক উদ্দীপনা ও মৌল সজীবতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইব্‌ন্ রুশদ্ তাঁহার বক্তৃতা-মালায় 'রিপাব্লিক' ব্যবহার করিতেন, কারণ এরিষ্টটলের 'রাষ্ট্রনীতি'র আরবীয় অনুবাদ ছিল না এবং অল্-ফারাবীও পূর্বে তাহাই করিতেন। অল্-ফারাবীর সম্বন্ধে যে সকল প্রকৃত ইস্‌লামীয় সমস্যা ছিল সেইগুলিই তাঁহার মনে প্লেটো সম্বন্ধে আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল। এবং ইহার ফলেই তিনি ইহাদের মৌলিক এবং চিত্তাকর্ষক সমাধান আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্লেটোর দর্শনের একটি অন্যথা অজ্ঞাত বিবরণ যাহাতে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতের অতি সুষ্ঠু আলোচনা ছিল, প্লেটোর 'রিপাব্লিক' এর এক সমান অজ্ঞাত ভাষ্য এবং তাঁর 'ল' স' (laws) এর একটি ধারাবাহিক অনুলিপি—এইগুলি অল্-ফারাবী মুস্‌লিম পাঠকগণের নিকট আদর্শ খলিফা সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচার করিবার জন্য ব্যবহার করিতেন। প্লেটোর তর্কশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যার যে সকল উপাদান গ্রীক্ দর্শনের পরবর্তী বিকাশের ফলে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন সেইগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই তিনি বর্জন করিয়াছিলেন এবং যে সকল যুক্তি তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারিতেন সেই-গুলিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। ঠিক এইরূপে তিনি দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বিস্তারিত গ্রন্থে এরিষ্টটলের দর্শনের একটি সাধারণ সংক্ষিপ্তসার দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে এরিষ্টটলের তত্ত্ববিদ্যার বিবরণের পরিবর্তে উপরে বর্ণিত এক সাধারণ নব-প্লেটোনীয় মতবাদের বিবরণ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কর্মসূচীতে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে তিনি প্লেটো এবং এরিষ্টটলের নিকট হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের কেবলমাত্র সেই অংশগুলিই নির্বাচন করিয়াছিলেন যেগুলি তাঁহার নিজের প্রয়োজনে লাগিবে। এইগুলি যে কি কি ছিল তাহা সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই এবং তাঁহার কথাগুলি কোন কোন অংশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নিজে নির্ণয় করিবার ভার তিনি বুদ্ধিমান পাঠকের উপর দিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এই ভাবেই নিজের চিন্তা প্রকাশ করিতে পারিতেন এবং এবিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নাই।

অল্‌-ফারাবীর মতে পদার্থ-বিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা পাঠ করার ফলে জগৎ-সম্বন্ধে যে দার্শনিক জ্ঞান জন্মায় এরিষ্টটলের প্রমাণ শাস্ত্র আমাদিগকে তাহার অর্থ বুঝিতে সহায়তা করে। প্রত্যাদিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব (কলাম) নিশ্চয়ই এই স্বভাব-জাত ঈশ্বরতত্ত্বের অধীন এবং ইহার পদ্ধতি এরিষ্টটলের 'টপিক্‌স' (Topics) এ আলোচিত বিচার-পদ্ধতির অনুরূপ। ইহা যে সকল মত সর্বস্বীকৃত অথচ যেগুলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আশ্রয়-বাক্য হইতে পারে না সেইগুলি লইয়া আরম্ভ করে। এই বিচার-মূলক ঈশ্বরতত্ত্ব গঠনে এবং বহু মতের বিষয়ে মূলতঃ গ্রীক ; ইহাকে বর্জন করিতে হইবে না কিন্তু ইহার গুরুত্ব নিশ্চয়ই গৌণ। ধর্মের নিষ্ঠাবান শিক্ষকেরা যে সকল বিশ্বাস এবং নিয়ম মুস্‌লিমদের মনে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং যেগুলি ধর্মীয় বিধি-দ্বারা সমর্থিত সেগুলি এরিষ্টটল যেগুলিকে জনতার বিশ্বাস এবং মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাদের অনুরূপ। অল্‌-ফারাবী অবশ্য এই 'নিয়ম-ভিত্তিক ঈশ্বর-তত্ত্ব'কে নিষিদ্ধ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু ইহা যাহাতে গ্রীক্‌ প্রভাবের নিকটও উন্মুক্ত হইতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দার্শনিক যে সত্য লাভ করিতে পারেন ইহা তাহা হইতে নিশ্চয়ই অনেক দূরে। কোরাণ 'পৌরাণিক ঈশ্বরতত্ত্ব' শিক্ষা দেয়। ইহা কাব্যের ন্যায় জনগণের কল্পনার নিকট আবেদন করে এবং আলঙ্কারিক ভাষায় যাহা সত্য তাহা বুঝাইয়া দেয়। ইহা সুস্পষ্ট যে এই পরিকল্পনা অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অল্‌-ফারাবীর মনে এইরূপ একটা উদার ও সার্বজনীন ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং গ্রীক্‌ চিন্তানায়কগণ পূর্বে এইরূপ মত প্রকাশ করিলেও ইহাকে কম দুঃসাহসিক বলিয়া মনে হয় না। সার্বজনীন ধর্ম এক বটে কিন্তু চরম সত্যের সাঙ্কেতিক অভিব্যক্তির রূপ অনেক। এই সকল অভিব্যক্তি এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পৃথক হইতে পারে, ভাষা, আইন ও প্রথা, প্রতীক ও রূপকের ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। দার্শনিক মনের কাছে কেবল এক ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। সাঙ্কেতিক প্রকাশের কতকগুলি আকার দার্শনিক প্রমাণগম্য সত্যের কাছে যায় আর অপরগুলি তার অনেক দূরে থাকে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলির সম্বন্ধে সরাসরি কল্পনার সাহায্যে অদার্শনিকদের মনেও বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। এই ধরণের কয়েকটি আদর্শ রাষ্ট্র একই সময়ে থাকিতে পারে এবং তাহারা অধিবাসী-দিগকে একই প্রকার সুখ এবং একই প্রকার সৎ জীবন দান করিতে পারে। এইরূপ রাষ্ট্রের শাসক এইরূপ সমাজের জীবনের সকল অঙ্গের প্রতিই উপযুক্ত মনোযোগ দিতে সক্ষম হইবেন, তিনি একাধারে রাজা ও ইমাম, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ এবং

আইন-প্রণেতা হইবেন। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করিতে সক্ষম হইবার পূর্বে প্লেটোর দার্শনিক রাজার ন্যায়ই তাঁর বিশিষ্ট ধর্মের প্রথাসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে এবং তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

প্লেটোর দর্শনে যেরূপ, অল্-ফারাবীর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনাতেও সেইরূপ তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং রাষ্ট্র-নীতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। একই নিয়ম-শৃঙ্খলা বিশ্বে, মানুষের মধ্যে এবং সঙ্ঘবদ্ধ সমাজে বর্তমান—বিশ্বে আবশ্যিকভাবে থাকে, মানুষ যখন বিচারপূর্বক তাহার আত্মায় ক্রমানুসারে বিন্যস্ত বিশ্বের স্তরগুলির অনুসরণ করে এবং তাহার মনকে নিজেকে চালনা করিতে দেয় তখন উহা তাহাতে থাকে; এবং যখন আদর্শ ব্যক্তিরূপ দাশনিক নির্জন স্থানে লইয়া ঐশ্বরিক মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানানুসারে সমাজকে সংগঠন করেন তখন উহা সমাজে থাকে। প্রথম সত্তা, প্রথম কারণ যিনি নিত্য এবং পূর্ণ, যাঁহার উপাদানও নাই আকারও নাই, অন্য কোনও বিশেষ বা গুণবর্জিত সেই পরম একই জগৎ শাসন করেন। অল্-কিন্দির তত্ত্ববিদ্যারও মূলতঃ ইহাই সার-সিদ্ধান্ত ছিল। বিনা প্রশ্নে গৃহীত শতাব্দীব্যাপী দার্শনিক ঐতিহ্য এইরূপ একটি বিসংবাদপূর্ণ এবং সম্ভাব্যতামূলক স্বীকার্য সত্যকে স্বয়ং-সিদ্ধ সত্যের রূপদান করিয়াছিল, এবং ইহা খৃষ্টীয় শাস্ত্রবেত্তাগণ ও তাহাদের সমপর্যায়ভুক্ত মুস্লিম দার্শনিক মু'তাজ্জীলাগণ কর্তৃক বহুলাংশে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছিল। শেষ-যুগের যে আলেকজান্দ্রীয় দার্শনিকদের চিন্তায় এরিষ্টটলের প্রভাবের বৃদ্ধি লক্ষিত হয় তাঁহাদের সহিত অল্-ফারাবীর দর্শনের যোগ আছে এবং সেইজন্য সম্ভবতঃ তাঁহার খৃষ্টধর্মী গ্রীক্ পূর্বগদের ন্যায় তিনি 'ঈশ্বর এক অবিভাজ্য পদার্থ' এই সজ্ঞায় "ঈশ্বর একাধারে চিন্তা, চিন্তনক্রিয়া এবং চিন্তার বিষয় নউস্ (nous), নূন (noon) ও ন্যুমেনন্ (noumenon), আকৃল্ (aql) আকিল্ মা 'কু'ল (aquil, ma quil)" এই সংজ্ঞাও যোগ করিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে প্রথম কারণের এই সাধারণ সংজ্ঞা ইস্লামীয় ঈশ্বর তত্ত্বে ব্যবহৃত ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ও গুণের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। এইভাবেই তাঁহার ছাত্র ইহায়িয়া ইব্‌ন্ অদী দেখাইয়াছিলেন যে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ এরিষ্টটল প্রদত্ত ঈশ্বরের সংজ্ঞার এক সাংকেতিক প্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্রব্যসমূহ, নক্ষত্র দেবতাগণ প্রত্যাদিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বের দেবদূতগণের অনুরূপ, এবং সক্রিয় বুদ্ধি পবিত্রতার স্বরূপের অনুরূপ—পূর্বেই ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মে অন্যান্য প্রতীক থাকিতে পারে, এবং আমরা আল্-বেরুনি হইতে জানিতে পারি যে ঈশ্বরাস্তিত্বে

মানুষের স্মরণের সহায়ক হিসাবে কোন কোন ধর্মে যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত আছে মুসলিম দার্শনিকেরা তাহারও মর্মগ্রহণ ও প্রশংসা করিতে পারিতেন।

ইব্‌ন্ সিনার যে বৃহৎ দার্শনিক কোষগুলির মধ্যে অল্-ফারাবীর অব্যবহৃত স্টোয়িক্ ও প্লেটোনীয় উপাদানসমূহ বর্তমান তাহাদের অনুরূপ অংশ অপেক্ষা অল্-ফারাবীর মনুষ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতবাদ আরও পূর্ণভাবে এবং ঐকান্তিকভাবে এরিষ্টটলের মনোবিদ্যাকে ভিত্তি করিয়াছিল। এই মতবাদে দেহ-পুষ্টির (এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ার), ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের, কল্পনার এবং বুদ্ধির বৃত্তিগুলি বর্ণিত হইয়াছে এবং বিশ্বে বর্তমান শৃঙ্খলা এবং সমাজে যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার সমান্তরালভাবে এক এবং অবিভক্ত আত্মায় তাহাদের যে স্তর-বিন্যাস আছে তাহার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। সক্রিয় বুদ্ধিকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চিন্তার মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণাঙ্গ আনন্দ উপভোগ করে। যদিও প্লোটিনাস্, পর্‌ফিরি এবং প্রোক্লাস নিজেরাই ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহাকেই মনুষ্যলভ্য সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন (অল্ ফারাবীর মতে) বিষয়-সমূহের ঐশ্বরিক সত্তার বৌদ্ধিক অনুভূতির ফলে সক্রিয় বুদ্ধির সহিত আত্মার রহস্যময় ঐক্য স্থাপিত হয় না। ইব্‌ন্‌সিনা অল্-ফারাবী এবং তাঁহার অনুবর্তীগণ অপেক্ষা অধিক রহস্যপন্থী ছিলেন। পরম্পরাগত ধর্মে যেরূপ প্রচলিত আছে অল্ ফারাবী সেইরূপেই ভবিষ্যৎ জগতে মানুষ যে পুরস্কার বা শাস্তি পায় তাহা স্বীকার করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে এই উপায়ে সাধারণ মানুষের আচরণ-উন্নত করা সম্ভব। তিনি মনে করিতেন যে মহম্মদ যখন কোরাণে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনেও এই কথাই ছিল। কিন্তু দার্শনিক হিসাবে তিনি স্টোয়িক্‌দের এই গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসই গ্রহণ করিয়াছিলেন যে কেবল সৎ ব্যক্তিদের, অর্থাৎ যাঁহারা মনুষ্যদের পক্ষে যতটা সম্ভব ঐশ জীবনের ন্যায় জীবনযাপন করিয়াছেন, যাঁহারা মনুষ্যদেহের কোন ক্ষতি না করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মাগুলিই মৃত্যুর পরে বাঁচিয়া থাকে। মৃত্যুর পরে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং তখন তাঁহারা স্বর্গ রাজ্যের সক্রিয় বুদ্ধির অংশীভূত হইয়া যায়। অন্যান্য আত্মাগুলি শরীরের সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, "Wer keinen Namen sich erwarb noch Edles will, gehort den Elementen an." আভিসেন্নার মত আবার প্লোটিনাসের মতের ন্যায়। তিনি অমরত্বকে কতকগুলি বিশেষ আত্মায় সীমাবদ্ধ করেন নাই, তাঁহার মতে প্রত্যেক আত্মাই দেহের মৃত্যুর পর ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়াই বাঁচিয়া থাকে।

যদি কোনও ব্যক্তির কল্পনা সাক্ষাৎভাবে 'সক্রিয় বুদ্ধি'র সহিত সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহার ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের ক্ষমতা জন্মে, এবং তাহার আত্মার এই বৃত্তির ইহাই হইল পূর্ণতা। কল্পনা যেমন বিচার বুদ্ধির অধীন তেমনই ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের ক্ষমতা সমূহ দর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু কোন মতেই ইহাপেক্ষা উন্নত নয়। "যাহা তাহার নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির কাছে পৌঁছায় তাহার সাহায্যে মানুষ জ্ঞানী এবং দার্শনিক হয় এবং তখন তাহার মন পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং যাহা তাহার কল্পনায় পৌঁছায় তাহার সাহায্যে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ হয় (অর্থাৎ এইরূপ পুরুষের ক্ষমতা লাভ করে)। এইরূপ ব্যক্তিই মনুষ্য-স্বভাবের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায় এবং শ্রেষ্ঠ আনন্দের অধিকারী হয়।" এই প্রাথমিক সর্ত পূরণ করিলে তবেই মানুষ শাসন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। (অল্-ফারাবী 'খলিফা' এবং 'ইমাম' এই দুইটি শব্দ পরিহার করিয়াছেন, কারণ, যদিও মুস্লিমদের কথাই তাঁহার চিন্তার পুরোভাগে ছিল তাহা হইলেও তাঁহার পরিকল্পনা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযোজ্য)। তাহার পর তাঁহার সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন এবং তিনি যাহা জানেন তাহা জনসাধারণকে বুঝাইবার এবং তাহাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তাহাদিগকে স্বাচ্ছন্দ্যের পথে এবং যে সকল কর্ম দ্বারা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায় সেইগুলির দিকে চালিত করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তাঁহার শারীরিক ক্ষমতা থাকা উচিত এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও আবশ্যক।

এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অল্-ফারাবীর রাষ্ট্রনীতির সূক্ষ্মাংশগুলির বিবরণ দেওয়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে খলিফা-বংশ সম্বন্ধে সমসাময়িক আলোচনা সমূহের সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং এই প্রশ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ সমাধানের জন্য তাঁহার প্রস্তাবসমূহের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। যদি একজন আদর্শ শাসক না পাওয়া যায় এবং শাসকোচিত গুণসমূহ কেবলমাত্র কয়েকটি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রথম শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনের ভিত্তিতে তাহা-দিগকে দলবদ্ধভাবে শাসনকর্তা বলিয়া গণ্য করা উচিত। যদিও অল্-ফারাবী নিজে ইহা কোথাও বলেন নাই, ইস্লামীয় ভাষায় প্রথম দার্শনিক-ধর্মপ্রবক্তা-রাজা আইনকর্তা কেবলমাত্র মহম্মদ নিজেই হইতে পারেন। তাঁহার গম্ভীর, নির্লিপ্ত ও নিরলঙ্কার রচনা-রীতিতে একটা গুরুত্বের ভাব আছে এবং ইহা আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে অন্তত: একবার সমগ্র প্লেটোনীয় দর্শন ইহার মতবাদগুলির সমস্ত সূক্ষ্মাংশ সমেত না হইলেও ইস্লামীয় দেশগুলিতে মাথা তুলিয়াছিল। "যদি

কোন সময়ে এইরূপ হয় যে শাসনের ব্যাপারে দর্শনের কোন স্থান না থাকে তাহা হইলে শাসনকার্যোপযোগী অন্যান্য গুণ সকল শাসকদের থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে আদর্শরাষ্ট্রে কোন শাসক নাই, ঐ রাষ্ট্রের যিনি বস্তুতঃ শীর্ষস্থানীয় তিনি প্রকৃত রাজা নহেন এবং ঐ রাষ্ট্র ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে; এবং যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এবং রাষ্ট্রে যিনি নায়কের কার্য করিতেছেন তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে" (অল্-ফারাবী)। "অবশেষে······প্রকৃত দর্শনের প্রশংসায় আমি ইহা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে কেবলমাত্র এই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সাধারণের এবং ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব, সুতরাং যত দিন পর্যন্ত না যথার্থ জ্ঞানানুরাগীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্ত করেন অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীগণ কোন দৈব নির্দেশে যথার্থ জ্ঞানানুরাগী হন তত দিন পর্যন্ত মানব-জাতির দুরবস্থার সমাপ্তি ঘটিবে না।"

৪। আবু আলী অল্-হুসেন ইব্ন্ আব্দাল্লাহ্-ইব্ন্-সীনা [আভিসেন্না] (৯৮০—১০৩৭ খৃষ্টাব্দ)

ইব্ন্ সীনার সহিত আমরা ইস্লামীয় দর্শনের এক নূতন ও ভিন্ন যুগে প্রবেশ করি। এ পর্যন্ত যে সকল দার্শনিকদের লইয়া আলোচনা হইল তাঁহারা সকলেই পথিকৃৎ ছিলেন। আমরা যতদূর জানি তাঁহারাই সর্বপ্রথমে গ্রীক্ গ্রন্থগুলির যে সকল অনুবাদ ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছিল সেইগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেই উত্তরকালীন গ্রীক্ প্রকৃতি-পূজক অথবা খৃষ্টীয় দর্শনের কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অল্পাধিক পরিমাণে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আর যে ইস্লামীয় সভ্যতা তখনও বিকশিত হইতেছিল এবং যাহার প্রচুর সম্ভাবনা এবং বিস্তৃতি ছিল তাহার মধ্যে নিজ নিজ উপায়ে গ্রীক্ দর্শনকে এক উচ্চাসন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু ইস্লামীয় জগতের বাহিরের প্রাচীন দর্শনের সহিত সংযোগ শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট ইস্লামীয় দর্শনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দার্শনিকগণ তাঁহাদের যুক্তিগুলিকে গভীরতা ও প্রখরতার দিক হইতে বিকশিত করিতে পারিতেন এবং করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা মৌলিক গ্রীক্ গ্রন্থগুলি ব্যবহার করিতে পারেন নাই, যেমন—পাশ্চাত্যে পরবর্তী কালে দার্শনিকেরা করিয়াছিলেন—কিংবা সিরীয় ভাষার সাহায্য লইতে পারেন নাই, যেমন বাগ্দাদে দশম শতাব্দীতে দর্শনের দ্বিভাষাবিদ্ খৃষ্টীয় শিক্ষকগণ

সর্বদাই সাফল্যের সহিত করিতেন। ইব্‌ন্ সিনা, পারস্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মন্ত্রী হিসাবে উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ অধিকার করিয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তিনি প্রথম যুগের মুস্‌লিম দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি বাগ্‌দাদের খৃষ্টান দার্শনিকদিগকে অপছন্দ করিতেন বটে, কিন্তু অল্-ফারাবীর চিন্তার অধিকাংশেরই গুণগ্রাহী ছিলেন। ইস্‌লামীয় দর্শনের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস এবং গ্রীসদেশে উদ্ভূত যুক্তি এবং মতবাদ সমূহের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এই যুক্তি ও মতবাদগুলি তাঁহার গ্রন্থাদিতেই আমরা সর্বপ্রথম দেখিতে পাই। কেবলমাত্র প্লোটিনাসের দর্শনের মূল্যায়নের ব্যাপারে নয়, পরন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর বহু সাদৃশ্যের ব্যাপারে অল্ কিন্দির সহিত তাঁহার বিশেষ করিয়া মতৈক্য দেখা যায়। এইগুলি ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে অধিক স্পষ্ট হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধীয় মতবাদে কিংবা যে প্রাকল্পিক ন্যায় এরিষ্টটলীয় মতবাদে অধিকতর সুসঙ্গতভাবে বিশ্বাসী অল্-ফারাবী অল্প পছন্দ করিলেও ব্যবহার করিতেন তাহার বহুল ব্যবহার সম্বন্ধেও অল্ কিন্দির সহিত তাঁহার মতৈক্য ছিল। তাঁহার যে সুস্পষ্ট প্লেটোনীয় মতবাদ এরিষ্টটলীয় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান তাহাও তাঁহাকে অল্-কিন্দি এবং তাঁহার গ্রীক্ পূর্বসূরীগণের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে এবং এ্যাকুইনাসের পূর্বেকার পাশ্চাত্য প্লেটোনীয়গণকে তাঁহাদের অগাষ্টিন্‌পন্থী প্লেটোনীয় মতবাদকে দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই 'প্রধান লেখক'-এর দর্শনে রহস্যবাদী উপাদান বিশেষ লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এবং মানবদেহে আত্মার অবতরণের উপর রচিত তাঁহার দীর্ঘ আরবীয় কবিতা ইহার সৌন্দর্য এবং ইহাতে প্রকাশিত গভীর ভাবাবেগের জন্য ন্যায় সঙ্গত ভাবেই প্রসিদ্ধ। দর্শনের নানা স্বীকার্য সত্যানুযায়ী ইস্‌লামকে সংস্কার করিবার প্রয়াস তাঁহার রচনায় দেখা যায় না। অংশতঃ অল্-ফারাবী দ্বারা এবং অংশত: অল্-কিন্দি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি রূপকাত্মক ব্যাখ্যার সাহায্যে দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর ইব্‌ন্ রুশ্‌দ অতি ঘনিষ্ঠভাবে অল্-ফারাবীকে অনুসরণ করিয়া বিনাসর্তে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আভিসেন্নাকে তাঁহার অসঙ্গতির জন্য তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইবন্ সিনা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সুশৃঙ্খল ভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ লেখক। তাঁহার বৃহৎ, ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাকোষ 'কানুন' অর্-রাজীর রচনার তুলনায় মৌলিকতা-বর্জিত, কিন্তু ইহার বিষয়-বস্তুর সুস্পষ্ট, সুবিস্তৃত এবং শ্রেণী-বিভাগানুযায়ী সুবিন্যস্ত আলোচনার জন্য ইহা যুক্তিযুক্তভাবেই প্রসিদ্ধ। ইহা কয়েক

শতাব্দী ধরিয়া আরবীয়, পারসীক ও লাতিন চিকিৎসকগণ কর্তৃক সমভাবেই আদৃত হইত। তাঁহার যে বিরাট দার্শনিক কোষ-গ্রন্থ 'আশ্ শীফা' (sanatio) তে তিনি যাবতীয় দার্শনিক, গাণিতিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ও ঐ একই শৃঙ্খলানুরাগী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূল-গ্রন্থের অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কয়েকটি অংশের লাতিন অনুবাদ প্রচলিত আছে। এই বিরাট গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্তসার 'নজাৎ' (salvatio) কে আমরা সম্পূর্ণাকারেই জানি এবং দ্বিতীয় মুদ্রিত আরবীয় গ্রন্থ 'কানুন'এর সহিত ইহা ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে রোমে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মহামান্য মন্ত্রীমহাশয়ের অতি সমৃদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের সকল দিকের আলোচনা করা এখানে অসম্ভব। অধিক বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে তাঁহার মনোবিদ্যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি অল্-ফারাবী এবং ইব্‌ন্ রুশ্‌দের ন্যায় এরিষ্টটলের 'ডি এ্যানিমা'কে ভিত্তি করিয়া ইহা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অংশতঃ অল্ কিন্দিকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অংশতঃ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত এরূপ কতকগুলি সংশোধন করিয়াছিলেন এবং নিজ মতানুসারে ইহাকে পরিবর্ধিত করিযাছিলেন। অল্ ফারাবী এবং ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্-এর সহিত তাঁহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। তিনি এরিষ্টটল প্রদত্ত আত্মার লক্ষণ সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু একই কালে আত্মাকে বিদ্রোহী দ্রব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক ভারতীয় পণ্ডিত সুন্দর একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে দেখাইয়াছেন কি ভাবে ইব্‌ন্ সীনা'র মতবাদের এই অসঙ্গতি—যাহার প্রভাবে তিনি ব্যক্তি-আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন—এরিষ্টটলের মনোবিদ্যার যে অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার এবং বিশেষ করিয়া এথেন্সের সিম্প্লিসিয়াসের ন্যায় নব-প্লেটোনীয় ভাষ্যকারগণ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন সেইগুলি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এরিষ্টটলীয় দর্শনকে প্লেটোনীয় রূপ দিবার এই প্রবণতা আরবদিগের নিকটেও পৌঁছাইয়াছিল এবং অল্-কিন্দির রচনার সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাতেই প্রথম দেখা যায়। আভিসেন্না অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ও সূক্ষ্মভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। আন্তর ইন্দ্রিয়সমূহ ও আন্তর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনাও অতি বিস্তৃত ও অ-সাধারণ। ইহাতে তিনি কল্পনাসমৃদ্ধ এরিষ্টটলের ধারণাকে পৃথক করিয়া এবং ইহাকে পাঁচটি বিভিন্ন বৃত্তিতে বিভক্ত করিয়া এরিষ্টটলের সাধারণ বোধের ধারণাকে সুপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু সুস্পষ্ট যে ইহা করিয়া তিনি মূলগ্রন্থে বিলুপ্ত কোন এক পরবর্তী গ্রীক্ মতবাদের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। আন্তর

ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা 'পর্চ' (Porch)-এ আছে বলিয়া মনে হয়। যেহেতু মুস্লিম বিশ্বাসানুয়ায়ী আভিসেন্না প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা ঐশ্বরিক মানবীয় বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন, সেই হেতু অল্-ফারাবীর ন্যায় তিনি ইহাকে সর্বোচ্চ ধরণের কল্পনা-শক্তি মনে করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই কিন্তু ইহাকে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচক্ষণতা বা উপস্থিত বুদ্ধি, "প্রত্যক্ষাতীত কালে কোন ন্যায়ের হেতু পদকে আবিষ্কার করিবার শক্তি" বা কল্পনার সাহায্য না লইয়া অভ্রান্ত ভাবে সত্যোপলব্ধি করিবার ক্ষমতার সহিত ইহাকে একীভূত করিয়া সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরিষ্টটলের "পষ্টিরিয়র এ্যানালিটিক্স" গ্রন্থে এই ক্ষমতার উল্লেখ দেখিতে পাই এবং স্টোয়িক্ দর্শনে ইহাকে পরবর্তী সময়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি (ইব্‌ন্ সীনা) ইহাকে নব-প্লেটোনীয় দর্শনের কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন এবং সক্রিয়-বুদ্ধির নিকট হইতে আগত প্রেরণার গ্রাহকরূপে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনিই ইহা প্রথমে করিয়াছিলেন, অথবা উত্তর-কালীন গ্রীক্ দর্শনে এ বিষয়ে তাঁহার কোন পূর্বগামী ছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।

• আভিসেন্নার দর্শনে আল্ ফারাবী কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা হইতে কোন কোন বিষয়ে বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় মতবাদে পার্থক্য আছে। এইগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে ইহাদের সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তা প্লেটোর দিকে ঝুঁকিয়াছে। সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আলোচনা না করিয়া দেখা যাক এই প্লেটোনীয় মতের অর্থ কি। আধুনিক পাঠক যখনই এরিষ্টটলকে ছাড়িয়া প্লেটোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখনই তিনি রচনা রীতির পার্থক্য ব্যতীত আরও অনেক কিছু অনুভব করেন, তিনি এক মহত্তর ও অধিকতর সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব, একজন উচ্চ শ্রেনীর শিল্পী ও মহান্ কবির সহিত পরিচিত হন। সর্বোপরি প্লেটো একজন প্রথম শ্রেনীর ধর্মীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন যে সকল নব-প্লেটোনীয় তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেন তাঁহারা প্লেটোর চিন্তার মধ্য ধর্মীয় উপাদান লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকদের রাজা বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। অর্-রাজী এবং ইব্‌ন্ সীনা ইহা বুঝিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহারা অল্-ফারাবী ও ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্ অপেক্ষা প্লেটোর চিন্তার মর্মার্থের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। এরিস্টটলের দর্শন প্লেটোরই দর্শন এবং যে সকল গ্রীক্ দার্শনিক মুস্লিম চিন্তা নায়কদের নিকট আদৃত হইতেন তাঁহারা যুক্তিযুক্ত ভাবেই তাঁহাকে প্লেটোর সহিত সংযুক্ত করিতেন। এরিষ্টটল তাঁহার গুরুর যে ধর্মীয় চিন্তা তাঁহার মনের উপর প্রথম হইতে সারাজীবন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাকে তিনি

বিচার বুদ্ধির অধিগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা কিছুকাল ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবার পর বুঝিতে পারিয়াছি যে ইহাই তাঁহার তত্ত্ববিদ্যার অর্থ। তাঁহার সংগঠন ক্ষমতা অপেক্ষা বিশ্লেষণের ক্ষমতাই অধিক শক্তিশালী ছিল এবং প্লেটোর কৃতিত্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন নিজস্ব কোন চিন্তা-সৌধ নির্মাণ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে ধর্ম-সম্বন্ধীয় দার্শনিক রূপে প্লেটোকে যথাযথরূপে বুঝিবার সহায়ক রূপে এরিষ্টটলের প্রয়োজন ছিল এবং দার্শনিকেরা ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পক্ষে এই দুজনেরই প্রয়োজন আছে এবং কাহাকেও বর্জন করা যায় না। আভিসেন্নার রচনা রীতি ছিল অবাস্তব, তিনি এরিষ্টটলীয় ভাবধারায় নিমজ্জিত এবং এরিষ্টটলকে বর্জন করিয়া তিনি চিন্তা করিতে পারিতেন না। দার্শনিক রচনা রীতি বিষয়ে প্লেটো বা প্লোটিনাসের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু প্লেটোর দর্শনের যাহা সারমর্ম তিনি এমন একটা কিছু বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যই তিনি ধার্মিক মুসলমানদের নিকট আদৃত হইয়াছিলেন—যেমন প্লেটো সকল যুগেই ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। মানবাত্মার গতি সম্বন্ধে যে কবিতাটির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে এই বিষয়টি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

"গৃহমুখী যাত্রার ক্ষণ সমাগত না হয় যখন
পূর্ণতর ক্ষেত্রে তার যবে আসে বিদায় লগন,
ঘোম্‌টা খুলেছে বলে হয় সে আনন্দ-মুখর ;
জাগ্রৎ দৃষ্টি বলে না দেখিল যে সবে, হয় তা গোচর।
অতি উচ্চলোক হতে গুঞ্জরি তা'র উঠে স্তুতি-গান,
নীচতম জীবও যে উর্দ্ধে তুলি' দেয় তার স্বীয় জ্ঞান।
সে কারণ, সে চলে ফিরি', জানি ফেলি বিশ্বের
সকল গোপন তত্ত্ব ; নাহি রয় তিলমাত্র কলঙ্ক বেশের।"
(ইং অনুবাদক : ই, জি, ব্রাউন)

৫। ইব্‌ন্‌ রুশ্‌দ্‌ (এ্যাভেররুজ ; ১১২৬-১১৯৮ খৃষ্টাব্দ)

এরিষ্টটলের যে সকল ভাষ্যের অনেকগুলি আরবীয় দার্শনিকগণ জানিতেন এবং বাগ্‌দাদে দশম শতাব্দীতে দর্শনের খৃষ্টান শিক্ষকগণ এবং সম্ভবতঃ অল্‌-ফারাবী অনুকরণ করিতেন সেইগুলির রীতি অনুযায়ী ইব্‌ন্‌ সীনা কোন ভাষ্য রচনা করেন

নাই। তিনি সম্ভবতঃ তাহাদের সকলগুলিই জানিতেন কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই পরিচ্ছেদে পূর্বে উল্লিখিত একটি আত্ম-জীবনীর অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিরাট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি প্রধানতঃ এই সকল ভিত্তির উপর তাঁহার আপনার দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন। মূল গ্রন্থগুলি সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সরকারী কর্মজীবনের কঠোর দাবী সত্ত্বেও তিনি তাঁহার নিজের দার্শনিক চিন্তাকে পূর্ণরূপ দিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে তাঁহার দার্শনিক চিন্তার কিছু পরিমাণে ক্রমবিকাশ আছে; কিন্তু মূল মত হইতে কোন বিচ্যুতি নাই, কেবলমাত্র তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে ক্রমশঃ অধিক সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা আছে। প্রসঙ্গক্রমে, আল্-ফারাবীর বিভিন্ন রচনাগুলিকে তুলনা করিয়াও এই জাতীয় মন্তব্য করা যায়।

ইবন রুশদ মুসলিম জগতের পশ্চিমাংশে এক সুদূর স্থানে বাস করিতেন। ইবন সীনার রচনাবলীর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। তাঁহার সাহিত্যিক রচনার অধিকাংশই হইতেছে আলমোহাদ শাসকদ্বয়ের জন্য লিখিত এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর ভাষ্যসমূহ। তিনি এ্যাফ্রোডি-সিয়াসের আলেকজাণ্ডারের রচনা-রীতি অনুযায়ী কতকগুলি ভাষ্য রচনা করিয়া-ছিলেন, থেমিষ্টিয়াসের রীতি অনুযায়ী কতকগুলি সুদীর্ঘ সংক্ষিপ্তসার এবং গ্রীকদের রুচিসম্মত কতকগুলি ক্ষুদ্রতর সংক্ষিপ্তসারও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অল-ফারাবী লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ দুইজন স্পেনীয় দার্শনিক, ইব্‌ন্ বাজ্জা (আভেম্পেস) এবং 'হাইই ইব্‌ন্ ইযাকুজানের ইতিহাস' নামক যথার্থতঃ প্রসিদ্ধ দার্শনিক উপন্যাসের লেখক ইবন্ তুফইলের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়াছিল। এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর ভাষ্যকারগণের সুদীর্ঘ তালিকায় ইব্‌ন্ রুশদের এক সম্মানপূর্ণ স্থান থাকা উচিত এবং তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের ধারক। অল-ফারাবীর ভাষ্যগুলির ন্যায় তাঁহার ভাষ্যগুলিরও অধিকাংশ মূল আরবীয় সংস্করণগুলি হারাইয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে তাহাদের পাঠক সংখ্যা খুব অল্প ছিল; ইবন্‌-রুশদের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর লোকেরা দর্শনের প্রতি উদাসীন অথবা শত্রুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাঁহার রচিত বহু ভাষ্য হিব্রু এবং লাতিনে অনূদিত হইয়াছিল এবং মধ্যযুগের ইহুদী ও বিশেষতঃ পাশ্চাত্য লাতিন-এরিষ্টটলীয় গ্রন্থাদি পাঠের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিন শত

বৎসরের অধিককাল ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানত এ্যাভেরৃরূজের ভাষ্যগুলির সাহায্যে এরিষ্টটলের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন এবং বর্তমানকালেও তাঁহার মন্তব্যকে বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যে অল্প কয়েকটি মূল আরবীয় গ্রন্থ এখনও বর্তমান তাঁহাদের সমালোচনাপূর্ণ সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

. দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে ইব্‌ন্ রুশদের মতবাদ বিচার বুদ্ধির প্রাধান্যে অল্‌-ফারাবীর বিশ্বাসের প্রায় সমতুল্য। প্রত্যক ধর্মসম্প্রদায় এবং প্রত্যক জাতির দার্শনিকদের পক্ষে সাধারণ যে দার্শনিক জ্ঞান প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যেমন একই সত্যকে নির্দেশ করে তেমনই ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতীক সমূহ, যাহারা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন, একই সত্যকে নির্দেশ করে। "দ্বৈত সত্য" কিছু নাই। সেইজন্য দার্শনিক ইব্‌ন্ রুশ্‌দ উচ্চপদস্থ বিচারক হিসাবে দর্শন এবং ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ মতগুলির বিরোধিতা না করিয়াও 'মালিক' প্রথানুযায়ী ধর্মীয় আইন প্রয়োগ করিতে এবং এই আইন সম্বন্ধে একটি নিত্য ব্যবহার্য পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রীক্ দর্শনের সাহায্যে ধর্মীয় আইন সংস্কার করিবার জন্য অল্‌-ফারাবীর যে পরিকল্পনা ছিল তাহা বহুপূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

ইহা আশ্চর্যজনক নয় যে যে, ইব্‌ন্ রুশ্‌দ তাঁহার পূর্ববর্তী অল্‌-ফারাবীর ন্যায় এরিষ্টটলের আলেকজান্দ্রীয় ব্যাখ্যাকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে ইব্‌ন্ সীনার মতবাদ সমূহের অনেকগুলির বিরোধিতা করিতে হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে অল্‌-ফারাবীর সময়ের পরে আ'শারাইটদের যে ধর্মশাস্ত্রীয় সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মশাস্ত্রীয় সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইয়াছিল সেই সম্প্রদায়ের কোন কোন মত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া ইব্‌ন্ রুশ্‌দ অল্‌-ফারাবীকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্‌ন্ সীনার সহিত তাঁহার বিতর্ক এবং অধিকতর এরিষ্টটলীয় নব-প্লেটোলীয়বাদ পুনঃ সমর্থন মুস্‌লিম দর্শনের ইতিহাসের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হইলেও তাঁহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অসামঞ্জস্যের অসামঞ্জস্য', যাহাতে তিনি অল্‌-গজালী'র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সুযোগ্য আক্রমণাত্মক গ্রন্থ 'দার্শনিকগণের অসামঞ্জস্য'-এর বিরুদ্ধে সুক্ষ্মতা এবং শক্তির সহিত দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, উহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। যেহেতু এই গ্রন্থ কেবলমাত্র বিবাদমান মুস্‌লিম দলগুলির বিতর্কের যোগ্য হইতে পারে এমন একটি বিষয়ের সুক্ষ্ম আলোচনার জন্য এরিষ্টটলের দর্শনের সমস্ত অস্ত্রগুলি ব্যবহার করিয়াছে, সেই হেতু ইহা নিশ্চয়ই একটি মুসলিম দার্শনিক গ্রন্থ।

ইব্‌ন্‌ রুশ্‌দ্‌ যে এরিষ্টটলীয় দর্শনে সম্যক্‌ পারদর্শী ছিলেন তিনি ইহা দেখাইয়াছেন এবং প্রশংসনীয় কৌশল এবং সুনিপুণ বুদ্ধিমত্তার সহিত তিনি তাঁহার যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি মুস্‌লিম ঈশ্বরতত্ত্বের সকল প্রধান সমস্যাই আলোচনা করিয়াছেন এবং একমাত্র দর্শনই যে সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। এই বৃহৎ এবং সুবিস্তৃত গ্রন্থে জগতের নিত্যতা, সৃষ্টিকর্তা এবং আদি কারণ, ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বরের জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে অল্‌ গজালীর যুক্তিসমূহ পুরাপুরি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং আলোচিত হইয়াছে এবং এমন ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং সূক্ষ্মবিচারের সহিত খণ্ডিত হইয়াছে যে ইহা আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। যে সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য অল্‌ কিন্দি প্রথম মুস্‌লিম দার্শনিক বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যযুগের ইস্‌লামে গ্রীক্‌ দর্শনের শেষ মহান্‌ প্রতিনিধির মধ্যে তীব্রভাবে জাগরূক ছিল। "প্লেটোকে ভালবাসার অর্থই হইল সত্যকে ভালবাসা" এই বিখ্যাত উক্তি অদ্ভুত ঘটনাচক্রের ফলে যে কেবলমাত্র আরবীয় ঐতিহ্যে সংরক্ষিত আছে ইহা আমরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি।

অল্‌-গজালী ইব্‌ন্‌রুশ্‌দের সমান স্তরে বিচরণ করিতেন। তিনি একজন মহান্‌ ঈশ্বরতত্ত্ববিৎ ছিলেন তিনি তাঁহার বিপক্ষভুক্ত দার্শনিকগণকে বুঝিতে পারিতেন এবং অল্‌-ফারাবী এবং ইব্‌ন্‌ সীনা ঈশ্বর এবং মানব সম্বন্ধে বিচার করিতে উৎসুক মুস্‌লিমদিগকে যে সকল চিন্তা পদ্ধতির সন্ধান দিয়াছিলেন সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিতেন। আমার বিশ্বাস যে, যে সকল পণ্ডিতের বিচার করিবার যোগ্যতা আছে তাঁহারা যথার্থই বলেন যে তাঁহার যুক্তিসমূহ ইব্‌ন্‌ রুশ্‌দের খণ্ডনসমূহ অপেক্ষা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ। ইস্‌লামের এবং ধর্মমাত্রেরই সারমর্ম সম্বন্ধে অল্‌-গজালীর অধিকতর গভীর অনুভূতি ছিল এবং সেইজন্য ইস্‌লামের ভবিষ্যতের উপর তাঁহার প্রভাব বিচার বুদ্ধির প্রাধান্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হইয়াছিল।

মধ্যযুগীয় ইস্‌লাম সম্পর্কে বলিতে হয় যে এ্যাভেররূজ যে যুদ্ধ করিতেছিলেন তাহা পরাজয়ের। তাঁহার এক বয়ঃ কনিষ্ঠ সমসাময়িক পারসিক সুরাবর্দী অল্‌ মক্‌তুলের গ্রন্থে আমরা এক স্বপ্নের বর্ণনা পাঠ করি যাহাতে এরিষ্টটল তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বপ্নের এরিষ্টটল প্লেটোর প্রশংসা করিলেন। সুরাবর্দী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্লেটোর কাছাকাছি গিয়াছেন এবং প্লেটোর সহিত যাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে এমন কোন মুস্‌লিম দার্শনিক আছেন কিনা। তিনি (সুরাবর্দী) অল্‌-ফারাবী আর ইবন্‌ সীনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছিলেন, কিন্তু ইহা

এরিষ্টটলের মনে কোন রেখাপাত করে নাই। কিন্তু যখন সুরাবর্দী "উন্মত্ত" সুফিগণের প্রথম, প্রাচীন পারসিক রহস্যপন্থী, বিস্তামের আবু ইয়াজিদ্ (মৃত্যু ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) এবং মিশরীয় 'নষ্টিক' (Gnostic) ধুল নূনের (মৃত্যু ৮৬১ খৃষ্টাব্দ) এক অনুবর্তীর উল্লেখ করিলেন তখন অবশেষে এরিষ্টটল এক সদর্থক উত্তর দিলেন: ইঁহারাই যথার্থ দার্শনিক এবং যথার্থ বিজ্ঞ ব্যক্তি। রহস্যপন্থী প্লেটো তখনও আদৃত হইতেন, কিন্তু দার্শনিক এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কারক প্লেটো বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে সকল মুস্লিম সাধারণ মানুষের ধর্ম প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবনযাপন করিতেন এবং প্রাচীন ষ্টোয়িকবাদ ও সন্দেহবাদের যুক্তিসমূহ ব্যবহারকারী নৈষ্ঠিক ঈশ্বরতত্ত্ব ও সুফি-রহস্যবাদে যাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি মনোভাব প্রকাশ পাইত তাঁহাদের জন্য এই প্লেটোর কোন বাণী ছিল না। বিচার বুদ্ধির অতি সঙ্কীর্ণ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ইস্লামীয় দর্শন যে ক্ষেত্রে ইহার পূর্বে গ্রীক্ দর্শন অকৃতকার্য হইয়াছিল সেইক্ষেত্রে অকৃতকার্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অকৃতকার্যতা বর্তমানকালের মানুষকে তাহার নিজের পথ খুঁজিয়া লইতে এবং শেষপর্যন্ত বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতে পারে—যেমন এথেন্সের একাডেমীতে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ প্লেটো খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে করিয়াছিলেন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১।

Menasce, P. J. De, O. P. : *Arabische Philosophie* (bibliographische Einfuhrungen in das Studium der Philosophie, 6), Bern, 1948, pp. 49 (German).

Encyclopedia of Islam, 5 vols , Leiden, 1913-19 (English)

Brockelmann, C. : *Geschichte der arabischen Literatur,* Vol. I. Leiden, 1943 ; Vol. II, Leiden, 1949 (German)

Sarton, G. : *Introduction to the History of the Science*, 4 vols., Baltimore, 1927-1948 (English).

Boer, T. J. De : *The History of Philosophy in Islam,* trans. by E. R. Jones, London, 1903, pp. 229 (English)

Guillaume, A. : "Philosophy and Theology" in *The Legacy of Islam*, Oxford, 1931, pp. 239-83 (English).

Gardet, L. and ANAWATI, M. M. : Introduction a la theologie musulmane, Paris, 1948, pp. 543 (French).

Gilson, E. : *La Philosophie au moyen age*, Paris,' 1944, cap 6 (French).

Gilson, E. : *Reason and Revelation in the Middle Ages*, New York, London, 1939, pp 114 (English).

২।

STEINSCHNEIDER, M.: "Die arabischen Ubersetzungen aus dem Griechischen", *Centralblatt fur Bibliothekswesen*, 6, 1889. "Beiheft" 5; 10, "Beiheft" 12; *Virchows* Archiv. 124, 1891, pp. 115-136; 268-96; 455-87; Z eitschrift der deutschen *Morgenlandischen Gesellschaft* 50,1897, pp. 161-219; 337-417 (German).

STEINSCHNEIDER, M.: "*Die hebraischen Ubersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher*, Berlin, 1893 (German).

STEINSCHNEIDER, M.: "Die europaischen Ubersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17 Jahrhunderts," Sitzungsberichte der Akademie der Vissenschaften zu Wien, 149, 1905, 4; 151, 1906, 1, pp. 84+108 (German).

MULLER, A.: *Die griechischen Philosophen in der arabischen Uberlieferung* (Festschrift Bernhardy), Halle, 1873, (German).

BERGSTRASSER G.: *Hunain ibn Ishaq. Uber die syrischen und arabischen Galenubersetzungen*, Lelpzig, 1925, pp. 48 (German).

MAYERHOF, M.: New Light on Hunain ibn Ishaq., Isis 8 1926, pp. 685 ff. (English)

MAYERHOF, M.: "Von Alexandrien nach Bagdad: Ein Beitrag Zur Geschichte des philosophischen und medizinischen Unterrichtes beiden Arabern," Sitzungsberichte der Beliner Akademie 1930, pp. 43 (German)

ROSENTHAL, F.. "Arabische Nachrichten Uber Zenon den Eleaton, *Orientalia*, 6, 193 pp 21 ff. (German)

ROSENTHAL, F,: "On the knowledge of Plato's Philosophy in tho Islamic World," *Islamic Culture*, 1941, pp. 287 ff (English)

KRAUS, P: "Plotin chez les Arabes," Bulletin de l' Institut d'Egypt, 23 1941, pp. 263-95 (French).

WALZER, R.: "New Light on Galen's Moral Philosophy" (from a recently discovered Arabic source), *Classical Quarterly*, 1949, pp. 82-96 (English).

KRAUS, P. and WALZER, R: *Galeni Compendium Timaei Platonis*, Platus Arabus, i, London, 1951, pp. 101 (Latin).

৩।

(আধুনিক অনুবাদসমূহে প্রাপ্য গ্রন্থাবলীই মাত্র উল্লিখিত হয়েছে)

১। অল্-কিন্দি।

LOTH, A.: *Al-Kindi als Astrolog, in Morgenlandische Forschungen*, Festschrift H. L. Fleischer, Leipzig, 1875, pp, 261-300 (German).

FURLANI, G.: "Una risala di Al-Kindi sull'anima," *Rivista trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi* 3, 1922 pp. 50-63 (Italian).

GUIDI, M., and WALZER, R.: "Studi su Al-Kindi 1. Uno scritto introduttivo allo studio di Aristotele," *Memorie R Accademia dei Lincei*, Ser 2. Vol. 4 fasc 5. Roma, 1940, pp. 45 (Italian)

RITTER, H., and WALZER, R.: "Studi see Al-Kindi, 2. Uno scritto morale inedito di Al-kindi," *Momorie R. Accademia dei Lincei*, ser 6, Vol. 8. fasc. 1 Roma, 1938, pp, 63 (Italian).

GAUTHIER, L.: *Antecedents Greco-Arabes de la Psychophysique (Al-kindi De rerum gradibus)*, Beyrenth, 1939, pp, 101 (French).

২। অর্-রাজী

PINES, S: *Beitrage Zur islamischen Atomlehre*, cap. 2, pp. 34-93, Berlin, 1936 (German).

KRAUS, P., and PINES, S: Article "Al-Razi" in *Encyclopedia of Islam.*

KRAUS, P.: "Razina 1, La, conduite du philosophe, traite d'ethique" etc., *Orientalia*, 4, 1935, pp, 300-334. English translation of the same treatise by A. J. Arberry, *Asiatic Review*, 1949, pp. 703-13,

ARBERRY, A. J.: *The Spiritual Physick of Rhazes*, translated from the Arobic, London 1950. pp. 110 (English)

MEYERHOF, M.: "The Philosophy of the Physician Al-Razi, *Islamic Culture*, 15, 1941, pp. 45-58 (English); cf. also MEYERHOF, M., *The Legacy of Islam* Oxford, 1931, pp. 322 ff., and BROWNE, E.G.: Arabian *Medicine passim.*

৩। অল্-ফারাবী।

STEINSCHNEIDER, M.: "Al-Farabi", *Memoires de l' Academic imperiale des sciences*, St. Petersburg, 1869 pp. 268 (Graman).

MADKOUR, T.: La Place d'Al-Farabi dans l'ecole *philosophique musulmane*, Paris, 1934, pp. 254 (French).

DIETERICI, F.: *Al-Farabi, z Der Musterstaat*, Leiden 1900, pp. 136 (German).

JANSSEN, R. P.: YOUSSEF KARAM, J. CHLALA, AL-FARABI: *Idees des habitants de la cite vertueues* Cario, 1949, pp. 128 (French).

DIETERICI, F.: *Al-Frabi's philosophische Abhandlungen, aus dem* Arabis-*chen ubersetezt*, Leiden, 1892, pp. 223 (German).

DIETERICI, F., and BRONNLE, P.: *Die Staatsleitung von Farabi*, Leiden 1904, pp. 91 (German).

GILSON, E.: "Les sources Greco-Arabes de l' Augustinisme Avicennisanty." Appendix 1, "le texte Latin medieval du De intellectu d' Al-Farabi" *Archives d' histoire doctrinale at litteraire due moyen-age*, 4, 1929-30, pp. 108-41 (with French translation).

GOHZALES, A., and PALENCIAS, "Al-Farabi"; *Catalogo de las cincias*, Madrid 1932, pp. 3-79 (Spanish).

ROSENTHAL, F., and WALZER, R.: *Al-Farabius De Platonis Philosophia*, Plato Arabus 2, London, 1942, pp. 30 (Latin).

GABRIELI, F.; *Al-Farabius De Platvnis Legibus*, Plato Arabus, 3. London, 1952 (Latin).

LUGAL, N., and SAYILI, A.; *Farabi's article on Vacuum*, Ankara, 1951, pp. 17-36 (English).

৪। ইবন্-সীনা

ANAWATI, G. C.: *Essay de bibliographie Avicennienne,* Cario, 1950 pp. 435 (Arabic)

NALLINO, C.A.: *Raccolta di scritti,* Vol. 6, Roma, 1948, pp. 218-73 (Italian).

CARAME, N.: *Metaphysicae Compendium,* Latin translation of the Arabic text, Rome, 1926, pp. 324 (cf. C A. Nallino, *Raccolta di scritti,* Vol. 6, pp. 364 ff).

FACKENHIM, E.L.: A treatise on love by Ibn Sina. Translated. *Medieval Studies 7,* 1945, pp. 208-228 (English).

GILSON, E.: "Les sources Greco-Arabes de l' Augustinisme Avicennaisant," *Archieves d' histoire doctrinale et litteraire du moyen-age,* 4, 1930, pp. 5-107 (French)

GOICHON, A. N.: *Livre des Directions at Remarques (Kitab at isharat va-t-tanbihat)* Traduction avec Introduction et notes. Beyrouth-Paris 1951 pp. 552 (French)

RAHMAN, F.: Avicenna's *Psychology*, Oxford, 1951, pp. 127 (English)

GARDET, L.: *La pensee religieuse d' Avicenne, Paris,* 1951 (French).

BROWNE, E. G.: *A Literary History of Persia,* Vol. 2, London, 1906 pp. 110 ff. (English)

BROWNE, E. G.: *Arabian Medicine,* Cambridge 1921, 1921 *passim* (English)

৫। ইব্‌ন্ টুফইল্।

OCKLEY, S.: *The Improvement of Human Reason Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan,* London, 1708 New edition by A. S. Fulton, London, 1929, pp. 179 (English translation).

GAUTHIER, L.: *Hayy ben Yaqdhan, Roman philosophique d' Ibn Thofail,* texte et traduction, seconde edition, Beyrouth, 1936 (French)

৬। ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্।

NALLINO, C. A.: Raccolta di scritti, Vol. 6, Roma, 1948. pp. 274-81 (Italian).

GAUTHIER, L.: *Ibn Roshd (Averrioes),* Paris, 1948, pp. 281 (French).

BERGH, S. VAN DEN: *Die Epitome der Metaphysik des Averroes,* Translation, Introduction and Notes, Leiden, 1924. pp. 331 (German).

GAUTHIER, L.. *Traite decisif (Fasl al-maqal) sur l'accord de la religion et de la Philosophie,* suivi de l' appenbice (Dhanuma) texte arabe, trad. franc. remainee, 3rd edition, Algier, 1948, pp. 54 (French),

BERGG, S. VAN DEN: *Averroes Tahafut at-Tahufut (The Incohenrence of the Incoherence),* translation, introduction and notes, Oxford, 1952 (Gibb Memorial Trust), about pp. 650 (English).

RENAN, E: *Averroes at l' Averroisme,* 2nd edition, Paris, 1861, pp. 468 (French).

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সেণ্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস্ এবং মধ্যযুগীয় দার্শনিক সম্প্রদায়

১। উপক্রমণিকা

সেণ্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস্ (১২২৬-৭৪) যে দর্শনের প্রচারক ছিলেন সেটা যেমন একান্তভাবে তাঁহারও নহে, সেইরূপ উহা সাধারণভাবে আমাদেরও নহে। যখন কোন দর্শনের সূত্র বাস্তবিকই বিশ্বজনীন হয়, তখন আর উহা আমাদের নিকট রুদ্ধদ্বার থাকে না। এইরূপ দর্শনের মূলসূত্রগুলি যত বেশী হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তত বেশী ইহা সুসমঞ্জস আকার ধারণ করে, এবং সঙ্কীর্ণ মতবাদরূপে ইহা আর থাকে না। সেণ্ট টমাস্ ও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত মূলসূত্রগুলি এইরূপ যে ইহাদের আলোকে সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের নিজস্ব প্রয়োগ ও সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োজনমত সংশোধন ও বিস্তার করা যাইতে পারে।

মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ এমন এক জগতে বাস করিতেন যেখানে এই সব সূত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করার কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইউরোপীয় মধ্যযুগের দ্রষ্টা দান্তে এরিষ্টটলকে 'জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ইন্‌ফার্নো, ৪র্থ, ১৩১), এরিষ্টটলের মুসলমান ভাষ্যকার আভে রোয়েসের নাম 'বিরাট্-ভাষ্য-রচয়িতা'রূপে সাধুগণের নামের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে (ইন্‌ফার্নো, ৪র্থ, ১৪৪), সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস 'স্বর্গীয় জ্ঞানের শিখা' নামে অভিহিত হ'ন (প্যারাডাইসো, ১২শ, ২), এবং 'এরিষ্টটল অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী' ও 'বিশ্ব-নিয়ন্তার মহিমা কীর্তনের জন্য নির্বাচিত' বলিয়া পরিগণিত হ'ন। দান্তে স্বর্গ হইতে 'অখৃষ্টানদের' বিদায় দেন নাই। তাহার মতে শেষ বিচারের দিন যাহারা 'প্রভু। প্রভু!' বলিয়া চীৎকার করে এবং নামমাত্র খৃষ্টের সেবা করে, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা (অখৃষ্টানরা) খৃষ্টের সন্নিধি লাভ করে। (প্যারাডাইসো, ১৯তম, ১০৬)।

দান্তে আলেঘিরি (খৃঃ অঃ ১২৬৫-১৩২১) রচিত ডিভাইনা কমেডিয়ার দার্শনিক মতবাদ সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের 'সাম্মা জিওলজিকা'তে পাওয়া যায়। ক্যাথলিক মতের একটি মূলসূত্র প্রচার প্রসঙ্গে সেণ্ট টমাস বলেন, "সত্য যে রূপই ধারণ করুক

বা যে ভাবেই কথিত হউক্ তাহা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা উক্ত।"[১] খৃষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী খৃষ্টান হইবার জন্য কোন মানবীয় তত্ত্ব বা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ গ্রহণ আবশ্যক, এ কথা মনে করেন না।[২] তাহা হইলেও খৃষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী সেণ্ট টমাস-প্রচারিত তত্ত্বগুলি বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেন, কারণ সত্যের প্রতি তাঁহার অপেক্ষা অন্য কাহারও এত প্রশংসনীয় অনুরাগ ছিল না।[৩]

ধর্মীয় উদ্দেশ্য :—মধ্যযুগে তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিকদের ন্যায় সেণ্ট টমাস প্রধানতঃ ধর্মশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। আবার তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি সুবিদিত। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যত্র 'দৈব প্রত্যাদেশ'-সম্বন্ধীয় কঠিন সমস্যাবলীর উন্নতিবিধান করিয়া উহাকে একাধারে শাস্ত্রসম্মত এবং উদার কিভাবে করা যায় তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ত্রয়োদশ শতকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন :

"অসভ্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন কেহ যদি সাধ্যমত কার্য করে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে প্রেরণা দান করিয়া অথবা তাহার নিকট গুরু পাঠাইয়া মুক্তির জন্য যাহা জ্ঞাতব্য তাহা ঈশ্বর প্রকাশ করেন।"[৪]

'প্রেরণা' পদটী অর্থপূর্ণ, কারণ ইহা শাস্ত্রনিষ্ঠ খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের বাহিরেও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা এবং খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রসম্মত উপায়ে মুক্তির জন্য তাহার পর্যাপ্ততা সমর্থন করে। যে সব ধর্মগুরু বা শিক্ষককে সাধারণতঃ সম্প্রদায়গত মনে করা হইত না, তাঁহাদেরই ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করা হইল।

টমাস-কৃত সমন্বয় প্রধানতঃ সেণ্ট অগাষ্টিনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং এরিষ্টটলের দার্শনিকতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরিষ্টটলের দর্শনকে খৃষ্টীয় প্রত্যাদেশবাদের আলোকে এমনভাবে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করা হইয়াছিল যাহাতে উহা নিরপেক্ষদৃষ্টিসম্মত হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে সেণ্ট টমাস এরিষ্টটলের দোষত্রুটি সমর্থন করিবার জন্য এত বেশী আগ্রহান্বিত হইয়াছেন যে ইহার ফলে তাঁহার সমন্বয় ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এরিষ্টটলের ভিতর যখন আত্মবিরোধ দেখা দেয়, তখন তাঁহার মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।[৫] সাধারণতঃ এরিষ্টটল প্রদত্ত প্রমাণ ও মতবাদ সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে সেণ্ট টমাস কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই, কারণ তদপেক্ষা শ্রেয় তিনি আর কিছু পান নাই। তাঁহার পূর্বগামী ধর্মশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এরিষ্টটলের ন্যায় অখৃষ্টানের প্রমাণ এবং ধর্মগ্রন্থের বাণী ও ধর্মযাজকদের সমর্থন একই সঙ্গে সত্য মনে হইলে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক সমস্যা :—ত্রয়োদশ শতাব্দীর মতবিরোধ এবং এরিষ্টটলের বিকৃত ব্যাখ্যার জন্য আদিসত্তার বিষয়ে সেণ্ট টমাসের মতবাদ নবরূপ ধারণ করে। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এরিষ্টটল এবং যুক্তিশক্তির নামে অনেক অদ্ভুত মতবাদ প্রচারিত হইত। সিগের (Siger of Brabant) ও কলাবিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণ আরবী হইতে লাটিন ভাষায় অনুবাদ এবং সর্বশেষ টীকার সাহায্যে এরিষ্টটলের মনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতেছেন বলিয়া দাবী করিতেন। এরিষ্টটলের মতে পুরাকালের প্রমাণসিদ্ধ মতবাদ হইল যে বিশ্বজগৎ শাশ্বত— ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ 'অসৎ হইতে সৎ-এর সৃষ্টি' এইরূপ অভাবনীয় মতবাদের আবশ্যকতা নাই। বিশ্বজগতের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ঈশ্বরকে পরিকল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে যিনি 'সর্বশ্রেষ্ঠ' দার্শনিক তাঁহার মতে বিশ্বসংসার যে কেবলমাত্র শাশ্বতকাল অস্তিত্বশীল তাহা নহে, ইহা চিরন্তন গতিশীল। ইহারই সমতুল্য কলাবিজ্ঞানে প্রচলিত আর একটা মতবাদ ছিল যে সকল মানুষেরই একটী সাধারণ ধীশক্তি আছে, সুতরাং মৃত্যুর পর ব্যক্তিগতভাবে অমৃতত্বলাভের সম্ভাবনা নাই!

এই সব বিভিন্ন মতবাদ যে কিরূপ বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আধুনিক পাঠকগণের পক্ষে অচিন্তনীয়। বিগত পাঁচশত বৎসরে বিভিন্ন পদের অর্থ সম্বন্ধে এরূপ পরিবর্তন ও মতবিরোধ দেখা দিয়াছে যে বর্তমানকালে আমরা পদের যে কোন্ অর্থ লইয়া সন্তুষ্ট থাকি এবং আধুনিক দার্শনিকের নিকট এইটুকু দাবী করি যে তাঁহার মতবাদ যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইহার ফলে আধুনিক পাঠকের নিকট জগতের বাস্তবতা আদিসত্তা হইতে পৃথক নহে, সময়ের অবিরত গতির অর্থ হইল নিত্যতা, অনাদির অর্থ হইল অপরিমেয় বা অনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক গতি এবং অতি-প্রাকৃত গতি তুল্যার্থবোধক, সাধারণ ধারণা এবং সামান্য বা লোকোত্তর ধারণা এবং বুদ্ধিশক্তি ও যুক্তিশক্তি সমার্থক, ব্যক্তিত্ব হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অপৃথক নহে। পদের অর্থের এইরূপ বিশৃঙ্খলভাব থাকার জন্য সনাতন খৃষ্টীয় মতবাদ বা সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের এবং মধ্যযুগের বা তৎপূর্ব যুগের আদর্শ অনুযায়ী তৎকালীন দার্শনিকদের সমগ্র বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধীয় চিন্তার অবদান যাহা এখানে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন, তাহা বর্তমানে হৃদয়ঙ্গম করিবার আশা নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গ্রীক পদ ও মতের আরবী ও হিব্রু পরিভাষা লাতিন ভাষায় ভুল বুঝার জন্য সাধারণ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর

একটী অসঙ্গত মতবাদের উদ্ভব হয় যে দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বের দুরধিগম্য বিবাদের সমাধান হইতে পারে যদি দুই একটীর পরিবর্তে দুইটী সত্য স্বীকার করা যায়। ইহা দাবী করা হইত যে, দর্শনের সত্য যুক্তির মাধ্যমে জ্ঞাত হয় এবং উহা ধর্মতত্ত্বের সত্যের বিরুদ্ধ, কারণ ধর্মতত্ত্বীয় সত্য বিশ্বাসলব্ধ। স্বতঃই ইউরোপীয় অধিবাসীদের মন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। লাতিন অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। প্লেটো ও সেণ্ট অগাষ্টিনের দার্শনিক মতবাদে শিক্ষিত প্রাচীনপন্থীরা কলা-বিভাগের প্রখর ধী-সম্পন্নদের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই—ইঁহারা এরিষ্টটলের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের প্রহেলিকা হইতে মুক্তিদাতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের এই বিরোধ দুইটী সত্যের, অর্থাৎ যুক্তি ও বিশ্বাসের, মধ্যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিল। এই সঙ্কটের মধ্যে সেণ্ট টমাস্ সম্পূর্ণভাবে এরিষ্টটলীয়দের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট বোনাভেঞ্চার অন্ধভাবে অগাষ্টিন ও প্লেটোর মতবাদ সমর্থন করিতেন ইহা মনে করা ভুল হইবে। সেণ্ট অগাষ্টিন্ ছিলেন ক্যাথলিক যাজকদের জ্ঞানী ব্যক্তি ও খৃষ্টীয় রহস্যবাদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর সন্ধিস্থল।

গ্রীক গূঢ়তত্ত্বের অধিকারী আরবীয় ও হিব্রু টীকাকারদের ব্যাখ্যার গ্রন্থরাশি ভেদ করিয়া প্রকৃত এরিষ্টটলের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। লাতিন ও গ্রীকদের মধ্যে যেরূপ মতভেদ ছিল, সেইরূপ আবার লাতিন টীকাকারদের ও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল এবং তাঁহাদের নিজেদের মনেরও ব্যাখ্যার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আরবী হইতে লাতিন ভাষায় বিচার-বিহীনভাবে অনুবাদের ফলে আরবীয় দার্শনিকদের যে কেবলমাত্র অপব্যাখ্যাই হইত তাহা নহে, উহা এরিষ্টটলের মতকে "আভেরয়বাদ" নামে এক অদ্ভুত বিকৃতরূপ দান করিয়াছিল। "ইব্‌ন্ রুশ্‌দের" লাতিন অপভ্রংশের নাম 'আভেরয়েস্'। ইহার দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত মুসলমান দার্শনিক, কর্ডোভার আবুল-ওয়ালীদ্ ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্ কর্তৃক প্রচারিত মূল মতবাদের মধ্যযুগীয় অপব্যাখ্যাও সূচিত হইত।

সেণ্ট টমাস্-এর নিকট ইহা অপরিজ্ঞাত ছিল: কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে 'আভেরয়েস্' নামে পরিচিত এরিষ্টটলের মতবাদ নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। লাতিন আভেরয়বাদের দোষগুলি সেণ্ট বোনাভেঞ্চারের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। সেণ্ট টমাস্ সঙ্কল্প করিলেন মূল এরিষ্টটলীয়বাদকে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধার করিতে হইবে। তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচারক ভ্রাতা উইলিয়াম্ অব্ মোর্-বেকে-কে মূল গ্রীক হইতে নূতন অনুবাদ করিবার কার্যে উদ্বুদ্ধ করেন। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দের ভিতর এরিষ্টটলের

মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপাত্ত হস্তগত হয় এবং তাহার ফলে তিনি যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সমাধান করিতে এবং কলাবিভাগের লাতিন আভেরয়বাদীদের প্রত্যুত্তর দান করিতে সক্ষম হন।

ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ—সেণ্ট টমাস ভাবানুবেগ দ্বারা তাঁহার কার্যের প্রতি অগ্রসর হ'ন নাই। তাঁহার যুক্তির স্বচ্ছতা ও মনোবলের দৃঢ়তা থাকার জন্য তিনি ব্রাবাণ্টের সিগের-এর ন্যায় আভেরয়বাদ সমর্থন করিতে অস্বীকৃত হ'ন আবার সেণ্ট বোনাভেঞ্চারের ন্যায় ইহাকে পূর্ণভাবে নিন্দাও করেন নাই। তিনি উদারপন্থী সঙ্কলনকারীর ন্যায় তাঁহার সমন্বয়বাদের উপাদান সংগ্রহ করেন নাই। ধর্মদর্শন বা ধর্মসম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের ব্যাপারে বিচারবিহীন উদারনীতি অনেক সময় বিকৃত মতবাদে বা কৃত্রিম মিশ্রণে পর্যবসিত হয় এবং উহা কাহারও যুক্তিবোধকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না।[৭] সেণ্ট টমাস্ প্রতি ব্যক্তিরই নিকট কিছু না কিছু শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিতেন। প্রত্যেকেরই স্পষ্ট সংজ্ঞা বা আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্ট বিবৃতির প্রয়োজন, এরিষ্টটলের এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার আলোচনা কৌশলের উন্নতি বিধান করেন। কাব্য ও আবেগময়ী ভাষার তত্ত্ব দর্শনে কোন স্থান নাই। অমানুষিক শক্তিসহকারে তিনি যেন তত্ত্বদর্শনের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হ'ন। তাঁহার মতে তত্ত্ব-দর্শনের মূলসূত্র হইল অবাধিতত্ব। বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারে না, কারণ এই বিরোধ ঈশ্বরের অন্তর্বিরোধের ইঙ্গিত করিবে—তিনিই সব কিছুরই আদি উৎস এবং তাঁহা হইতেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মতবাদ এবং যুক্তির মূল সূত্রগুলি উদ্ভূত। সেণ্ট টমাসের মতে জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্র মূলতঃ ক্রমানুসারে শ্রেণীবদ্ধ।

"দার্শনিক শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিম্নপর্যায়ের বিজ্ঞান তাহাদের মূল সূত্রগুলি প্রমাণ করে না বা ঐগুলিকে অস্বীকার করিলে বিবাদ করে না। এই কার্য উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের উপর ন্যস্ত থাকে; কিন্তু ইহাদের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান, অর্থাৎ তত্ত্ববিজ্ঞান, কোন মূল সূত্র অস্বীকৃত হইবে তাহা লইয়া বিতর্ক করিতে প্রস্তুত, যদি অবশ্য বিরোধীদল কিছু স্বীকার করিতে সম্মত থাকেন; কিন্তু বিরোধীদল যদি কিছুই মানিয়া লইতে না চাহেন, তাহা হইলে বিরোধ নিষ্প্রয়োজন, যদিও উঁহাদের বিতর্কের উত্তর দান করা যাইতে পারে। যদি আমাদের বিপক্ষদল ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া কোন কিছু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু তাঁহাদের নিকট যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে না, যদিও অবশ্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেহেতু

বিশ্বাস (যথার্থ অর্থে গৃহীত হইলে) অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেহেতু সত্যের বিরোধী বচনকে কখনও প্রমাণ করা যায় না, সেই হেতু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনীত 'প্রমাণগুলি' প্রতিপাদনের বিষয়বস্তু নহে, বরং উহারা খণ্ডনের যোগ্য সাধারণ যুক্তিমাত্র।"[৮]

সেণ্ট-টমাসের সমসাময়িক ধর্মতত্ত্ব-বিশারদ্গণ কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব সম্মত বিচারাদর্শ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন, ইঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁহাদের গুরু মহান্ সেণ্ট আলবার্টের আদর্শে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনার বিষয়বস্তু একত্রীকরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সেণ্ট-টমাস যুক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, (অবশ্য ইহার সীমিত ক্ষমতা মানিয়া লইতে হইবে) এবং ধর্মশাস্ত্র সম্পর্ক-বিরহিত বিজ্ঞানের মধ্যে দর্শনকে ন্যায্য স্থান দিয়াছিলেন। আবার সেই সঙ্গে দার্শনিক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিজ্ঞানের স্থানের তুল্য স্থান তিনি পবিত্র শাস্ত্রগুলির মধ্যে ধর্মতত্ত্বকে দিয়াছিলেন। ধর্মতত্ত্বের বন্ধন হইতে দর্শনকে মুক্তি দান এবং তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রতি দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উভয়েরই শ্রদ্ধার্পণ মানবীয় চিন্তার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। অতএব সেণ্ট টমাসকে দর্শনের আধুনিক সংজ্ঞার অন্যতম উদ্ভাবক বলা যাইতে পারে।

বিশেষজ্ঞগণ :—দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশের পর সেণ্ট টমাস নূতন সম্প্রদায়-স্থাপয়িতার দৃষ্টি লইয়া ভিন্নজাতীয় উপাদানগুলি নির্বাচন করিতে পারিতেন। তাঁহার গুরু সেণ্ট আলবার্টের হিব্রু ও আরবী গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান ছিল। সেই কৃতবিদ্য শিক্ষক রাবি (পুরোহিত) মোজেজ বেন্ মৈমনের গ্রন্থের প্রতি তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; ইনি মধ্যযুগীয় লাতিনগণের নিকট মৈমনিডেস্ নামে পরিচিত ছিলেন। রাবি মোজেস্ হিব্রু ভাষায় 'মোরে নেবুহিন্' নামক এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন; ইহা ইংরাজী ভাষায় 'গাইড্ ফর্ দি পারপ্লেক্সড্'[৯] নামে বিশেষ সুনামের সহিত অনূদিত হইয়াছে। ঐশ্লামিক জগতে সুপরিচিত প্রাচ্য দার্শনিক ফারাবি এবং ইবন্ সীনার পথ অনুসরণ করিয়া মোজেস্ বেন্ মৈমন বিশেষ সাফল্যের সহিত বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয়ের সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেন। রাবি মোজেস্ প্লেটোর দর্শনের ন্যায় এরিষ্টটলের দর্শনে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হিব্রু ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পথনির্দেশের মূল্য অসামান্য। বস্তুতঃ প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে মৈমনিডেসকেই সেণ্ট এল্বার্ট এবং সেণ্ট টমাস একমাত্র উপযুক্ত পথনির্দেশক বলিয়া মনে করিতেন। ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান এবং তাঁহার সৃষ্ট জীব সম্বন্ধে জ্ঞান—এই বিষয়ে

সেণ্ট টমাসের মতের মূল অংশ 'গাইড্ ফর্ দি পারপ্লেক্সড্' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। রাবি মোজেস্ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞানকে নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে শিল্পীর জ্ঞানের সহিত তুলনা করেন। কলাবিদের চিন্তার মধ্যেই তাঁহার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলি সুপ্ত থাকে এবং তাঁহার চিন্তার মধ্যে উহাদের কোন পৃথক সত্তা থাকে না। শিল্পীর সহিত ঈশ্বরের উপমা সেণ্ট টমাসের রচনার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। (বিশ্বকর্মা-রূপ তুলনীয়)। 'নবজাগরণের যুগের' লোকের অন্তরে ইহা বিশেষ প্রেরণা জাগায়।

ঈশ্বরে ন্যস্ত গুণ সম্বন্ধে রাবি মোজেস্ বলিয়াছিলেন যে এই গুণাবলী ঈশ্বরের সার ধর্মের সহিত এক হইতেও পারে না আবার উহার সংজ্ঞা দানও করিতে পারে না। এই জন্য ঈশ্বরের একমাত্র উপযুক্ত নাম হইল অনির্বাচনীয় নির্গুণ টেট্রাগ্রামা-টোন (জাহোবা); ইহা ভারতীয় চিন্তাধারার ওম্-এর সহিত তুলনীয়। ঈশ্বরের উপর সচরাচর যে সমস্ত গুণ আরোপিত হয়, সেগুলিকে ঈশ্বরের ক্রিয়ার নির্দেশক অথবা উহার বিপরীত অবস্থার অস্বীকারসূচক উক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে। ঈশ্বরের উপর মানবীয় বাসনা কামনা বা ক্ষুন্নতা আরোপ করাকে ইহুদী দার্শনিকেরা যে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, সেণ্ট টমাস বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ঐশ্বরিক গুণকে ঈশ্বরের সারধর্মের সহিত তুল্যমান বলিয়া মৈমনিডেসের যুক্তিকে নবরূপ দান করেন। এই বিষয়ে সেণ্ট টমাসের ধর্মতত্ত্ব শঙ্করের মতের অনুরূপ, যদিও অবশ্য তাঁহার মতবাদ সাধারণতঃ রামানুজের ন্যায়।[১০] তবে রাবি মোজেসের মূল মতবাদ কখনও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই। তাঁহার রচনার মধ্যে পুনঃ পুনঃ এই মত-বাদের পুনরভ্যুদয় হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত এই যাজক-দার্শনিক কপট এরিয়োপা-গাইটের ধর্মতত্ত্বের রহস্যবাদের নীরবতার আশ্রয় লইয়াছিলেন।[১১] তাঁহার মত-বাদের এই অংশ শঙ্করের মতের সহিত তুলনীয়।[১২]

শাশ্বত দর্শনের ক্ষেত্রে রাবি মোজেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হইল তাঁহার যুক্তিদারা তত্ত্ববিদ্যাকে শক্তিশালী করিয়া তুলা। তাঁহার যুক্তি হইল যে, যে সমস্ত অযৌক্তিকতার মধ্যে পূর্ণ বিরোধিতা আছে, সেইগুলি স্বভাবতঃই অসার এবং সেই-গুলিকে সম্ভাবনার ক্ষেত্র হইতে বহির্ভূত করা হইলেও ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হয় না, যদিও সম্ভাবনার ক্ষেত্রও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার অন্তর্গত। তৎক্ষণাৎ সেণ্ট টমাস সর্বশক্তিমত্তার প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য উহা গ্রহণ করেন এবং স্থাপত্য কৌশল সুলভ সমন্বয়বাদের উহাকেই ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে রাবি মোজেসের অবদান অপরিহার্য ছিল।

২। দার্শনিক অবদান।

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব বা সর্বশক্তিমত্তা—যদিও এরিষ্টটল বিশ্বের অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন যুক্তির অবতারণা করেন নাই। প্রমাণের অভাবে হিব্রু দার্শনিক স্পষ্ট করিয়া ইহাই বলেন যে সম্ভাবনার ক্ষেত্র ঈশ্বরের সর্বশক্তিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ইহা মানিয়া লইতে হইবে, এবং এই ঈশ্বরই হইতেছেন অনন্ত ব্রহ্ম। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অনন্ত বিশ্ব রচনা করিতে পারেন এবং অনন্তকাল যে ইহা এইরূপ থাকিবে তাহা ইচ্ছা করিতে পারেন ; এই ধারণার মধ্যে ব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন বিরোধের অবকাশ নাই। অপর পক্ষে ইহা স্বীকারের মধ্যেও বিরোধ নাই যে ব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কালের সহিত বিশ্ব সমান্তরাল (অবশ্য ইহা কালের মধ্যে অবস্থান করে না, কারণ উহা জগতেরই সহিত সৃষ্ট হইয়াছে)। এই দুইটিই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের দিক হইতে সম্ভাব্য ; সেইজন্য ঈশ্বর যদি করুণাবশে উদ্ঘাটন না করেন, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না এই দুইটী বিকল্পের মধ্যে কোনটী ঘটিয়াছিল। কালের ন্যায় স্থানের প্রশ্নটীও তত্ত্ববিজ্ঞানের শুদ্ধ সূক্ষ্ম আলোচনাকে ব্যাহত করে না। কালের ন্যায় স্থানও জগতের সহিত রচিত হইয়াছিল।

এরিষ্টটল প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই ; ইহা আমরা পরে সবিস্তারে আলোচনা করিব। তিনি তৎকালীন আর একটা বিবাদে অংশ গ্রহণ করেন ; ইহা তখন স্বতঃসিদ্ধভাবে গৃহীত হইত যে এক অনাদি বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে সুশৃঙ্খল বিশ্বের অভ্যুদয় হইয়াছে। এরিষ্টটল বলিতেন যে, যদি এই সর্ত স্বীকার করিয়া না লই যে আদি বিশৃঙ্খলাবস্থা অনন্তকাল গতিশীল, তাহা হইলে বলা যায় না যে বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে সুশৃঙ্খল অবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছে। 'অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি'—এই মতবাদের সহিত এরিষ্টটল কোন অংশে জড়িত ছিলেন না। লাতিন আভেরয়বাদীরা এরিষ্টটলের সমস্যা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই এবং সৃষ্টিতত্ত্বের বিপক্ষে এরিষ্টটলের বিকল্পযুক্তি এবং জগতের স্থিতির জন্য ঈশ্বরের ন্যায় চরমতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার সহিত বিশ্বের স্বাধীনসত্তার বিরুদ্ধ যুক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন।

জ্ঞানালোক প্রাপ্ত বিদ্রোহী : ধর্মমণ্ডলীর মধ্যে সহস্র বৎসর প্রচলিত সেণ্ট অগাষ্টিন এবং বোয়েটুহিউসের প্রাচীন 'প্লেটোনীয় মতবাদ'কে প্যারি, অক্সফোর্ড ও পাদুয়ার নূতন শিক্ষাপীঠে যুক্তি ও দর্শনের নামে ব্যঙ্গ করা হইত। এই দিক হইতে সেণ্ট টমাসের অপরিবর্তনীয় অনমনীয় এরিষ্টটলীয়বাদই ছিল

যুগধর্মের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। সেণ্ট টমাস এরিষ্টটলের বিশ্বতত্ত্ব গ্রহণ করেন—বিশ্ব বাস্তব এবং প্রত্যক্ষগোচর। ইহার দ্বারা তিনি একটি বাস্তব ভিত্তিভূমি পাইলেন যাহার দ্বারা তিনি উচ্চতর বাস্তব সত্তার বা ঈশ্বরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলেন। প্রচলিত চিন্তাধারায় বিপ্লব আনিবার আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি দার্শনিকদের হস্ত হইতে দর্শনকে মুক্ত করিতে এবং যে এরিষ্টটলের ধর্ম দর্শনকে ধর্মের বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হইত, সেই এরিষ্টটলকেই ধর্মের উপযুক্ত পরিপোষক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সেণ্ট টমাস দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

ধর্মের এই প্রকৃত ধারণার মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে: অনন্ত সম্বন্ধে এরিষ্টটলের যে ধারণা ছিল তাহার মধ্যে উহা সুপ্ত ছিল—এরিষ্টটলের ঐ ধারণা পর্যাপ্ত ছিল না। সান্ত ও অনন্তের সম্বন্ধ সুপরিস্ফুট করার প্রয়োজন ছিল এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য তত্ত্বতঃ নিরূপণ করা আবশ্যক ছিল। এরিষ্টটলকে জ্ঞানের সমর্থক এবং খৃষ্টীয় দৈব প্রত্যাদেশের অনুমোদক করা আবশ্যক। তিনি নিজে সহ-যাজকদের নিন্দার পাত্র হইতে প্রস্তুত ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্লেটোনীয় সম্প্রদায়ের অভিযোগের ফলে প্যারির বিশপ্ (উচ্চপদস্থ যাজক) কর্তৃক তাঁহার মত নিন্দিত হয়। যেখানে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি তাহাই স্বীকার করিতেন বলিয়া ইংলণ্ডে তাঁহার মত 'অপরিসীম নিন্দার' বিষয়বস্তু হয় এবং তিনি ক্যাণ্টারবেরীর ধর্মযাজক ও ইংলণ্ডের ধর্মাধ্যক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে নিন্দিত হ'ন।[১৩] অগাষ্টিনের ভণ্ড অনুগামিগণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় নিন্দাবাদের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। পরবর্তীকালে রোমের ক্যাথলিক চার্চ যাঁহাকে "সেণ্ট" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'বিশ্বজনীন ধর্মমণ্ডলীর সর্বদলীয় জ্ঞানী ব্যক্তি' বলিয়া স্বীকার করেন, মধ্যযুগের পতনের সময় সকলেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করে।[১৪]

দার্শনিক উদারতা :—যিনি প্রকৃত 'ক্যাথলিক' বা উদারমতাবলম্বী তিনি প্রত্যেকেরই নিকট—এমন কি যাঁহাদের সহিত মিলন সম্ভব নহে এরূপ বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতেও—কিছু না কিছু শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক। সেণ্ট টমাস বিশ্বাস করিতেন যে প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই সত্যের সারাংশ আছে।[১৫] যেমন তিনি রাবি মোজেস রচিত 'গাইড্'-এর অন্তর্নিহিত সত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই, সেইরূপ তৎকালীন স্পেনে সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমাম কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত অনেক মতবাদও তিনি গ্রহণ করেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইহুদী ও মুসলমানগণই জ্ঞানবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। সাম্প্রতিককালে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে

দান্তের 'ডিভাইনা কমিডিয়া' স্পেনের অন্তর্গত মূরসিয়ার মুসলমান রহস্যবাদী মুহ্‌য়িদ্দিন ইব্‌নুল অরাবীর (খৃঃ অঃ ১১৬৫—১২৪০) আদর্শে রচিত।[১৬]

তাঁহার পরিচিত এমন কোন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন না যাঁহার রচনা তিনি তাঁহার সত্য সমন্বয়ের উদার মতবাদের জন্য অনুধাবন করেন নাই। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে বুখারার আভিসেন্না (আবূ 'আলী অল্ হুসায়ন্ ইব ন্ 'অব্‌দ্ অল্লাহ্ ইব্‌ন্ সীনা খৃঃ অঃ ৯৮০—১০৩৭) আভেরয়বাদীদের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে লাতিনগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইব্‌ন্ সীনার আরবী হইতে অনুবাদ অত্যধিক অমার্জিত ছিল। যথা, মধ্যযুগীয় 'ইন্‌টেন্‌সিয়ো' পদটী আরবী ম'কূলাৎ—অর্থাৎ যাহা বুদ্ধির (অক্‌ল্) গোচর হইতে পারে—এরূপ অর্থ বিশেষ প্রকাশ করে না। সামান্য পদ, যেমন, মনুষ্য তর্কশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু ; এবং ইহা গঠিত হইবার পূর্বে মনের মধ্যে বস্তুবিশেষের ধারণা, যেমন, একটি মনুষ্য, স্থান পায়। পণ্ডিত প্রবর সেণ্ট আলবার্ট ইব্‌ন্ সীনার যুক্তির সত্যতা বুঝিতে পারেন এবং উহা স্বীয় মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পর এই মত সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস্ ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসার লাভ করে।[১৭]

সেণ্ট টমাসের নিকট অল্ গাজেল নামে পরিচিত লেখক মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম প্রতিভূ : তাঁহার নিকট হইতে তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় সত্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় এবং সমর্থন করিতে হয় তাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আবূ হামিদ্ ইব্‌ন্ মহম্মদ অল্-টূসি অল্-গজালী (খৃঃ অঃ ১০৫৮—১১০৯) তাঁহার সময়ে ঐশ্লামিক ঐতিহ্যে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন ; পরবর্তীকালে সেণ্ট টমাসও খৃষ্টীয় ঐতিহ্যে অনুরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তর্কশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা ও তত্ত্ববিজ্ঞানের উপর অল্-ঘজালীর গ্রন্থরাশি লাতিনদের হস্তগত হইয়াছিল।[১৮] ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যযুগে টোলেডোতে প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন স্থাপনের পর যথোপযুক্ত অনুবাদ পাওয়া যায়। এরিস্টটলের নামে যে সব সমকালীন ঐশ্লামিক দার্শনিকেরা যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের খণ্ডনের জন্য অল্-ঘজালী তাঁহার নিজের পদ্ধতি অনুসারে দর্শন রচনা করেন। যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে অল্-ঘজালীর অভিমত 'তহাফুৎ অল্-ফলাসিফা' এই আখ্যা লইয়া প্রকাশিত হয়—ইহার অর্থ 'দার্শনিকদের অসামঞ্জস্য' এবং ইহা লাতিন ভাষায় 'ডেসট্রাকৃসি ও ফিলসফোরাম' এই আখ্যা লইয়া অনূদিত হয়। সেণ্ট টমাসের সমসাময়িক লেখক রেমণ্ড মার্টিন-এর আরবীয় গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে জ্ঞান আজ পর্যন্ত বোধ হয় অদ্বিতীয়। তিনি অল্-ঘজালী হইতে উদ্ধৃতি এবং ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের

সহিত আচরণের পদ্ধতি বুঝিতে পারেন। ইহুদী ও মুসলমানদের ভিতর মিথ্যা দার্শনিক এবং কুতার্কিদের এবং লাতিন আভেরয়বদীদের বিরুদ্ধে সেণ্ট টমাস-রচিত 'সামা কন্ট্রা জেন্টিলস্' এর ন্যায় তাঁহার 'পুগিও ফিডি এ্যান্ভার্সাস্ মাউরোস এট্ যুডিওস্' ও একটী অসামান্য গ্রন্থ ছিল।

কর্দোভার আবুল-ওয়ালীদ ইব্ন্ রুশদ্ (খৃঃ অঃ ১১২৬-১১৯৮) অল্-ঘজালীর বিরুদ্ধে যথেচ্ছ আক্রমণের উত্তরে 'তহাফুটু-ল্ তহাফুৎ' অর্থাৎ 'অসাঞ্জস্যের অসামঞ্জস্য' এই আখ্যা দিয়া কঠোরভাষায় এক সমালোচনা লেখেন। লাতিন ভাষায় ইহা 'ডেস্ট্রাক্সিও ডেসট্রাক্সানিস্' এই নামলিপি লইয়া প্রকাশিত হয় এবং ইব্ন্ রুশদ্ও 'আভেরয়' ভাবে রূপান্তরিত হন। মূল আরবী গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে যে ইব্ন্ রুশদ্ আভেরয়বাদী ত নহেনই, বরং আভেরয়বাদ নামে যে যুক্তিবাদকে ব্যঙ্গ করা হইত, তিনি তাহারই কঠোর বিরোধী ছিলেন। এই বিকৃতিকরণের কার্য সম্পূর্ণ হয় এবং মধ্যযুগীয় লাতিন দার্শনিকদের মধ্যে অন্তহীন বিরোধ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে খৃষ্টান ও অখৃষ্টানদের মধ্যে 'প্লেটোনিক' সম্প্রদায় এরিষ্টটলকে বিকৃত করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। ইব্ন্ রুশ্দের প্রামাণিক রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং এই খ্যাতনামা মুসলমান টীকাকারের স্বীয় বক্তব্য শুনা যাইতে পারে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি এবং সেণ্ট্ টমাস একই দলভুক্ত; এবং তাঁহারা উভয়েই ধর্ম ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য অসাধারণ চেষ্টা করেন। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি অক্সফোর্ড ও পাডুয়াতে ইব্ন্ রুশ্দের (আভেরয়) মতবাদ বলিয়া দ্বৈত সত্যের যে মতবাদ শিখান হইত, তাহার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমান হইল ইব্ন্ রুশ্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার নাম, উহা হইল 'ফসলু ল্ মকালি ফী মুওয়াফকৃতি-ল্ হিক্মতি ওয়ল-শরী' অ এবং ইহার অর্থ 'দর্শন ও প্রত্যাদেশ-প্রসূত ধর্মের ঐক্য সম্বন্ধীয় প্রকৃত ও সমালোচনা মূলক আলোচনা'।[১২] ইব্ন্ রুশ্দ্ এবং সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের যুক্তি ও আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই অপূর্ব দক্ষতা সহকারে (যুক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে) অবিশ্বাসী রহস্যবাদ এবং অসংযত যুক্তিবাদ এই দুই-এর মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। দুইজনেই বলেন যে যুক্তি কখনও বিশ্বাসের রহস্যজাল ভেদ করিতে পারে না—এই রহস্য যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে না, বরং ইহা যুক্তির ঊর্ধ্বে। 'নেতি নেতির' মাধ্যমে যে চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা ধর্মের অনুরোধে উপমানের সাহায্যে কতকটা প্রশমিত হয়। (তুঃ উপমান) গতি ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে

এরিষ্টটলের পদার্থবিদ্যায় প্রদত্ত বিচারসমূহ উভয়েই ঈশ্বরের সনাতন সত্তা ও বিধাতৃশক্তির সোপমেয় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। কোন কোন গবেষক মনে করেন যে ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্ এবং সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত হেরেমীয় রহস্যবাদের সহিত পরিচিতি থাকার ফলে তাঁহারা নিঃসংশয়ে এত অধিক উপমেয়ের আশ্রয় লইয়াছিলেন। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেণ্ট টমাসের সকল প্রমাণের পূর্ণার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যদি উহাদের উপমেয়-ভাবে দেখা হয়।

এরিষ্টটলের ফিজিক্সে যে অর্থে জড়পদার্থের গতি বুঝান হইয়াছে সে অর্থে না লইয়া তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রদত্ত নিগূঢ় তত্ত্ব-বিজ্ঞান-সম্মত অর্থে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সেণ্ট টমাস দেখাইয়াছেন যে এরিষ্টটলের 'অনন্ত' নিরপেক্ষ অনন্ত নহে, উহা সাপেক্ষ অনন্ত। ইহা গণিত শাস্ত্রের অনন্ত—হয় ইহা অসংখ্য, না হয় ইহা অপরিমিত।[২০] ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্ এবং সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের ব্রহ্ম অনন্ত এবং যাহা সম্পূর্ণ সত্তাবিহীন একমাত্র তাহাই ব্রহ্মের বহির্ভূত (অত্যন্তভাব)। ঈশ্বর সম্বন্ধে সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের বক্তব্য আলোচনার সময় সর্বদা এই তুলনামূলক সূত্র স্মরণ রাখিতে হইবেঃ "যাহা নিম্নস্থ, তাহা উপরিস্থের সমতুল্য এবং যাহা উপরিস্থ, তাহা নিম্নস্থের সমতুল্য।" তাহা না করিলে, তাঁহার প্রতিপাদন এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্তোষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব, শেষ পর্যন্ত কেবল যে ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্য লওয়া হইল তাহা নহে, কল্পনাপূর্ণ ধীশক্তিরও সাহায্য লওয়া হয়—উহা বিচার ও বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ঈশ্বরের চরমসত্তাঃ—ঈশ্বরের সত্তা যে জগৎ ও চিত্তের সত্তা অপেক্ষা বৃহত্তর সত্য ইহা প্রমাণার্থে এরিস্টটলীয় পাঠকবর্গের সন্তুষ্টির জন্য সেণ্ট টমাস পাঁচটি প্রমাণ দিয়াছেন। মধ্যযুগীয় দার্শনিক পদ্ধতির হিসাবে আমরা প্রথম প্রমাণের সারমর্ম নিম্নে প্রদান করিলামঃ

"আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট ইহা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিন্তভাবে প্রতিভাত হয় যে কতকগুলি বস্তু গতিশীল (কারণ উহারা স্থানান্তরিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে)। যাহা কিছু স্থানান্তরিত হয়, তাহা অপর কিছু দ্বারা চালিত হয়, কারণ কোন কিছুকেই স্থানান্তরিত করা যায় না, যদি না যেদিকে গতিশীল, তদভিমুখে সুপ্ত গতিশক্তি যা থাকে। ইহার কারণ হইতেছে যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় রূপান্তর ব্যতীত গতি অন্য কিছু নহে। যাহা নিজে ব্যক্ত তাহা ব্যতীত

অন্য কিছু দ্বারাই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে রূপান্তর সম্ভব নহে। যাহা প্রকৃতপক্ষে উত্তপ্ত, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে প্রকৃতপক্ষে উত্তপ্ত করিতে পারে এবং তাহার ভিতর 'পরিবর্তন' আনিতে পারে, কারণ প্রচ্ছন্নভাবে উহা উত্তপ্ত ছিল। ইহা সম্ভব নহে যে একই বস্তু একই অবস্থায় না হইয়া বরং বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত থাকিতে পারে। যাহা বস্তুতঃ উত্তপ্ত হইয়াছে তাহা একই সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে উত্তপ্ত থাকিতে পারে না, ইহা তখন প্রচ্ছন্নভাবে শীতল। অতএব একই অবস্থায় একই উপায়ে একটা দ্রব্য চালক ও চালিত হইবে (অর্থাৎ নিজেকে নিজে চালিত করিতে পারিবে), ইহা অসম্ভব।

অতএব যাহা স্বয়ং চালিত হইতেছে, তাহা অপর কিছু দ্বারা চালিত হইবে। যাহা দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা যদি আবার নিজে চালিত হয়, তাহা হইলে উহা আবার অন্য কিছু দ্বারা চালিত হইবে, এবং তাহা আবার অপর কিছু দ্বারা চালিত হইবে। ইহা কিন্তু অনন্ত কাল চলিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে কোন আদি চালক থাকিবে না এবং যেহেতু পরবর্তী চালকের আদি চালক থাকিলে চলিতে পারে, সেই হেতু আর কোন চালক থাকিতে পারে না ; যেমন, হস্ত দ্বারা চালিত হইতেছে বলিয়াই ছড়ি নড়িতে পারে।

অতএব, অপর কিছু দ্বারা চালিত নহে এইরূপ আদি পরিচালকের প্রয়োজন, এবং সকলেই ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে।”[২১]

আরও চারিটা সমভাবে কঠিন ও তুলনামূলক প্রতিপাদন ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যুক্তিশক্তি দ্বারা উপমেয়ের মাধ্যমে যে ধীশক্তি অনন্ত ব্রহ্মের কল্পনা করিতে পারে এবং যেহেতু এরিষ্টটল উপমেয়ের সাহায্য ল'ন নাই, সেই হেতু তিনি কেবলমাত্র “অনির্দিষ্টে”র ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। এরিষ্টটলের “সাপেক্ষ অনন্ত” এর ধারণা অতিক্রম করিয়া মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা উপমেয়ের মূল্য বুঝিয়াছিলেন; তাঁহারা প্লেটোর দর্শন হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় প্রত্যাদেশ দ্বারা উহা সমর্থিত হয়।

ঈশ্বরের অনন্তত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাসের দর্শনে অগাষ্টিনীয়, বেনেডেকৃটীয়, সিষ্টেরসীয় অথবা ফ্রান্সিসকান্ সম্প্রদায়ের প্রাচীন পদ্ধতির কোন স্থান ছিল না, ইহা মনে করা ভুল হইবে। সেন্ট টমাস বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন যে পূর্ব হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা উপাত্ত প্রদত্ত না হইলে ধীশক্তি কার্য করিতে সক্ষম হয় না। **Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu** ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে গ্রীকগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত মনোবিদ্যা পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় স্বীকার করে এবং ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বীকৃত অন্তরিন্দ্রিয় এবং বাহ্যতঃ অপ্রকাশিত মনঃ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। মনস্ (তুঃ লাতিন মেন্স্) একটি অন্তরিন্দ্রিয় এবং মানসিক বৃত্তি। ইউরোপের মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণকে ইহার অপরিহার্য ক্রিয়ার জন্য একটা স্থান নির্দেশ করিতে হইল এবং তাঁহারা একটি সাধারণ সংবেদন-বিনিময়কেন্দ্র (sensorium commune) স্বীকার করেন ; ইহার মাধ্যমে মন ইন্দ্রিয়লব্ধ ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ বিচার করে এবং ধীশক্তির যাহায্যে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে সেগুলিকে সাধারণ বা অতীন্দ্রিয় ধারণায় রূপান্তরিত করে।

সেণ্ট টমাসের বক্তব্য ছিল যে ধীশক্তি ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাত্তগুলির সাহায্যে জাগতিক বাস্তবতা উপলব্ধি এবং উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। সেণ্ট টমাস যখন ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাত্তের কথা বলেন, তখন তিনি সমর্থনযোগ্য। আমরা কিন্তু যদি এরিষ্টটলীয়দের নিকট ঈশ্বরের চরমসত্তা প্রমাণের তাঁহার পাঁচটি যুক্তি লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। সেণ্ট অগাষ্টিনের সময় হইতে বিভিন্ন ধর্মক্ষেত্রে চিন্তা ও ধীশক্তির যেরূপ চর্চা হইয়া আসিতেছিল, তাহার প্রতি তাঁহার মনোভাবের বিচার করিতে হইবে। ঈশ্বরের চরমসত্তা প্রমাণের জন্য কল্পনাশ্রয়ী যুক্তিগুলি সেণ্ট এ্যান্সেলম্ (খৃঃ অঃ ১০০০-১১০৯) কর্তৃক সর্বপ্রথম সুসঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ হয়। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের কথা বলেন এবং ইহার ফলে অসৎ-কে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জন করিতেছে, মনঃকল্পিত এইরূপ অনন্তসত্তা সম্বন্ধে অবিশ্বাসবাদীদের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার দান করেন। অস্তিত্ব পদটীর মধ্যে দ্বৈত অর্থ লুক্কায়িত থাকার জন্য দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার উদ্ভব হয় এবং উহার মূলে ছিল 'সৎ-পদার্থ-তত্ত্বসম্বন্ধীয় যুক্তি।' ভ্রান্তধারণার আর একটী কারণ এই যে চতুর্দশ শতকের পর 'সত্তা' পদটী ক্রমশঃ কেবলমাত্র বাস্তবজগতে প্রযোজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

সত্তা এবং অস্তিত্ব—মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের আলোচনার ফলে আমরা বুঝিতে পারি যে 'সত্তা' পদটি—'অস্তিত্ব' পদ হইতে পৃথক করা প্রয়োজন। সত্তাকে অস্তিত্বের মূল উপাদান বলিয়া গণ্য করা যথাযথ হইবে এবং অস্তিত্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে যাহা প্রকাশমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ-ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এইজন্য মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর সতর্ক ছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর অস্তিত্ববান্ ইহা না বলিয়া ঈশ্বর আছেন এইরূপ বলিতেন।

বাস্তবিকই পূর্বতন চিন্তাধারা ও প্রকাশ ভঙ্গিমা অনুবর্তন করিলে বলিতে হয় যে, ঈশ্বর ও সত্তা যদি তুল্যার্থক হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহারই জন্য জগৎ অস্তিত্ববান্। উপনিষদের তুল্য বাক্‌ভঙ্গিমায় আমরা বলিতে পারি যে, ঈশ্বর যদি নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে সৎ হ'ন, তাহা হইলে জগতের নিজস্ব কোন সত্তা নাই এবং উহা সেই অনুপাতে অসৎ। অপর পক্ষে যদি আমরা জগৎকে মূলতঃ সৎ বলি, তাহা হইলে ঈশ্বরকে জাগতিক সত্তার চরম উৎস (সত্যস্য সত্যম্)[২২] বলিতে হইবে।

পূর্বতন সম্প্রদায়ের মতে জগৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের নিরপেক্ষ সত্তার উপর নির্ভরশীল, এই তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা' এইরূপ বচনদ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সর্বসাধারণের অনুমোদনের জন্য সেন্ট টমাস সমগ্র ব্যাপারটীকে এইভাবে সরল করিবার প্রয়াস করেন ; অস্তিত্ববান্ দ্রব্যসমূহের 'যথার্থ' অস্তিত্ব আছে, সম্ভাব্য দ্রব্যগুলির 'অব্যক্ত' অস্তিত্ব আছে ; কিন্তু ঈশ্বরের এই প্রকারের অস্তিত্ব নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহার সত্তা (স্বয়ম্ভূ)।[২৩] ঈশ্বরকে যথার্থ ও সম্ভাব্য দ্রব্যের সমষ্টি কল্পনা করা ভুল হইবে। তিনি যে কেবল যথার্থ ও সম্ভাব্য সত্তারই আমাদের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত কারণ তাহাই নহেন, তিনি বর্তমান সৃষ্টির বাহিরে অপ্রকাশিতব্য ও অপ্রকাশিত সত্তাসমূহেরও কারণ। সেন্ট টমাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইত ; যাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না, তাহাকেই তাঁহারা ব্যঙ্গ করিতেন। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা অবাধিত, অতএব ইহাই ঈশ্বরের অনন্ত সত্তার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ —সেন্ট এ্যান্‌সেল্‌মের ন্যায় অগাষ্টিনীয়দের এই যুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। তাঁহারা বলিতেন যে 'ঈশ্বর আছেন' এই বচনের ন্যায় 'ঈশ্বর নাই' এই বচন ও মন সমভাবে গ্রহণ করিতে পারে। সেন্ট টমাস ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই যুক্তি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে 'ঈশ্বর আছেন' ইহার বিরুদ্ধ-বচন মনে মনে গ্রহণ করা যায়, কারণ বাইবেলে বলাই আছে যে মূর্খেরা তাহাদের অন্তরে বলে যে ঈশ্বর, নাই। (সাম্, ৫২, ১)।

"বোয়েটহিয়াস্ বলিয়াছেন যে মনের মধ্যে এমন কতকগুলি ধারণা থাকিতে পারে যেগুলি একমাত্র জ্ঞানীদেরই নিকট সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বতঃসিদ্ধ, যেমন, অনস্তিকায় দ্রব্য কোন স্থানে অধিষ্ঠিত নহে। অতএব আমি বলিতে পারি যে 'ঈশ্বর আছেন' এই বচন স্বীয় মর্যাদা বলেই স্বতঃসিদ্ধ, কারণ স্বয়ম্ভূ বলিয়া এখানে বিধেয় ও উদ্দেশ্য একই।...কিন্তু যেহেতু **আমরা** ঈশ্বরের স্বরূপলক্ষণ জানি না, সেই হেতু **আমাদের**

নিকট ঐ বচন স্বতঃসিদ্ধ নহে এবং **আমাদের** নিকট অধিকতর পরিচিত দ্রব্য দ্বারা উহার প্রমাণ প্রয়োজন, যদিও উহারা স্বধর্মানুসারে অর্থাৎ তাঁহার কার্য হিসাবে স্বল্পপরিচিত।"[২৪]

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে তাঁহার মতে তাঁহার যুক্তিসমূহ বিজ্ঞজনের নিমিত্ত নহে, পুরাকালের রহস্যবাদী ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যাঁহারা 'ঈশ্বর আছেন' এই বচনকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন তাঁহাদের ন্যায় ইঁহারাও বস্তুর সারধর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন। তিনি তাঁহাদের জন্য লিখিতেছেন যাঁহারা (তাঁহার এবং এরিষ্টটলীয়দের ন্যায়) ঈশ্বরের সারধর্ম জানেন না, অথবা যাঁহাদের নিকট তাঁহার কার্য অপেক্ষা তাঁহার স্বরূপ স্বল্প পরিজ্ঞাত।

সৃষ্টিঃ—ঈশ্বরের ক্রিয়ার মধ্যে সৃষ্টিই সর্বাধিক প্রকাশমান। পূর্ব হইতে বিদ্যমান কোন কিছু হইতে জগৎ রচিত হয় নাই—ইহাই সৃষ্টির জন্য আবশ্যক। মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে "পূর্ব হইতে কিছুই বিদ্যমান নাই" এই পদের নিজস্ব গূঢ় অর্থ আছে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, যাহা কিছু বাধিত তাহারই মূলে আছে "পূর্ণ অলীকত্ব"। সম্ভাব্য দ্রব্যের মধ্যে আত্মবিরোধ নাই এবং এইজন্য ইহাকে পূর্ণ অলীকত্বের সহিত একার্থবোধক করা যায় না। পদের ব্যবহার সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা সবিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়া "পূর্ব হইতে কিছু বিদ্যমান নহে" ইহার যথার্থ অর্থ হইল "বস্তুতঃ অবিদ্যমান" এবং ইহা ঠিক যে যাহা 'বস্তুতঃ অবিদ্যমান' তাহা 'সম্ভাব্য দ্রব্যও' হইতে পারে, যদি অবশ্য আত্ম-বিরোধ না থাকে। অর্থাৎ যাহা "পূর্ব হইতে বিদ্যমান নহে" তাহা এমন সম্ভাব্য দ্রব্য হইতে পারে যাহা এখন বস্তুতঃ নাই। সৃষ্টির তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় যদি তাহার সর্তগুলি যথার্থ বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্বে স্বরূপতঃ বিশ্ব সম্ভাব্য পদার্থ ভাবে থাকে এবং উহাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেবলমাত্র অধিকতর সত্তাবান করা প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বজগৎ কেবলমাত্র বস্তুতঃ অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক হইতে অসৎ -মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বোধগম্য।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা অনন্ত শক্তি ধারণা করিবার সময় আমাদের যাহা অন্তর্বিরোধী তাহাকে বাদ দিতে হইবে। সম্ভাব্যতার অনন্ত ক্ষেত্র ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা নামে অভিহিত হয় এবং ইহা যেন সচরাচর অস্বচ্ছ দর্পণের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়; অবশ্য (ইহা অভিজ্ঞতা করিতে) যে উচ্ছ্বাসের ভাব জাগরিত হয় তাহার মাধ্যমে ইহাকে অনির্বচনীয় ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী

বোধ হয়। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, যে সম্ভাব্যতাকে অধিকতর সত্তা দান করিলে তাহা বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহাকে কি সার্বভৌম অনন্তত্ব স্বাধিকারে ধারণ করিতে পারে? আমাদের বুদ্ধির বলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে পূর্ণ অর্থ দান করিতে পারিব, তাহার দ্বারাই উত্তর নির্ধারিত হইবে। যেখানে অনন্তত্বের মর্মার্থ সঠিকভাবে অবধারিত হইয়াছে, সেখানে এই উত্তর সদর্থক হইবে: যেমন, মানবীয় সকল ধর্মের ভিতরই বস্তুতঃ ইহা ঘটিয়াছে। আবার যদি আমরা কেবলমাত্র মিথ্যা অনন্তের চিন্তা করি, তাহা হইলে অবশ্য উত্তর 'না' হইবে, যেমন, কতকগুলি আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারায় ইহা দেখা যায়।

আমরা আরও বলিতে পারি যে জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বলিয়া স্বভাবতঃই ইহা স্রষ্টার সৃষ্টি শক্তি দ্বারা সদাসর্বদা চালিত হইবে। সেণ্ট টমাসের মতে কোন মধ্যবর্তী প্রতিনিধি নিয়োজিত হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টি সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা সম্ভব এবং সর্বশক্তিমত্তা (অনন্ত বলিয়া) স্বভাবতঃই অদ্বিতীয়।

কয়েকটী তুলনা:—মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের যে সমস্ত পরিভাষা আমরা সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে সেইগুলির যাথার্থ নষ্ট হইয়া যায়। আধুনিকীকরণ অপেক্ষা সেইগুলির সমতুল্য পরিভাষা প্রতীচ্য দর্শন হইতে গ্রহণ করা অধিকতর নিরাপদ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রচলিত পরিভাষা অপেক্ষাকৃত সুনির্ধারিত। যেমন, সৃষ্টিতত্ত্বে কথিত হয় যে সৃজন কার্য বস্তুর প্রচ্ছন্নশক্তির সহিত সংযুক্ত এবং ইহা সম্ভাব্য অবস্থা হইতে বাস্তব অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। মধ্যযুগীয় দর্শনে ব্যবহৃত 'ক্রিয়া' (actus) এবং 'প্রচ্ছন্ন শক্তি' (potentia) আধুনিক অর্থ-অপেক্ষা ভারতীয় চিন্তাধারার 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতির' অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে। আবার, যেমন প্রতি ব্যক্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধযুক্ত এবং উহার অস্তিত্ব উত্তমপুরুষ বা ঈশ্বর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত, সেইরূপ প্রতি ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া (actus) এবং প্রচ্ছন্ন শক্তি (potntia) সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত এবং সেণ্ট টমাস কর্তৃক ইনিই শুদ্ধ ক্রিয়া (*Actus Purus*) রূপে কথিত হ'ন। ইহা অবশ্য লক্ষ্য করা উচিত যে ভারতীয় চিন্তাধারার ন্যায় মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তাধারায় ও বর্তমান ইউরোপীয় দর্শনের চেতনা ও জড়ের দ্বৈতবাদের সহিত কোন সংস্রব নাই। সনাতন চিন্তার প্রকৃতি বা অব্যক্ত শক্তির পুরুষ বা ক্রিয়া ব্যতীত কোন অস্তিত্ব সম্ভব নহে। কিন্তু দেকার্ৎ ও আধুনিক দার্শনিকগণ কর্তৃক কল্পিত 'জড়ের' চেতনা ব্যতীতও অস্তিত্ব

সম্ভব। এই ক্ষেত্রে অবশ্য বিভ্রান্তি ও ব্যঙ্গের ক্ষতিকারক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। কোন না কোন বিষয় সীমিত থাকার জন্য সসীম জীবেরা পরস্পর হইতে এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক্কীকৃত হয়। মধ্যযুগীয় দর্শনে তাহারা 'জড়দেহধারী' রূপে কল্পিত হয় না, বরং তাহারা তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক হইতে 'আদর্শরূপ' (*forma*, গ্রীক *idea*-র সহিত তুল্যার্থবোধক) ও 'উপাদান' (*materia*, গ্রীক্ *hyle*-র তুল্যবোধক), এই দুইয়ের সমন্বয় ভাবে পরিগণিত হয় এবং এই দুইটীর আধুনিক ভাষার 'দৈহিক আকৃতি' ও 'রাসায়নিক উপাদানের' সহিত যথাক্রমে কোন সংযোগ নাই। মধ্যযুগীয় ইউরোপের দর্শনে 'ফর্মা' (forma) পদটীর সহিত ভারতীয় তত্ত্ববিজ্ঞানের 'নামন্'-এর সহিত গভীর মিল আছে, ইহাই হইতেছে সসীম অবস্থার মধ্যে জীবের অবস্থিতির বোধগম্য তাত্ত্বিক কারণ। এই সব সীমিত অবস্থাগুলির উৎপত্তি সেন্ট টমাসের মতে প্রকৃতি বা অব্যক্তশক্তি (potency) হইতে এবং ইহা হইল পুরুষ বা আদর্শরূপক (forma) ধারণ করিবার ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং এই প্রসঙ্গে ইহা উপাদান (materia) অথবা গৌণ উপদান (matia secunda) হইতে পৃথক করিবার জন্য মুখ্য উপাদান (mateia prima) রূপে কথিত হয় এবং গৌণ উপাদান পূর্ব হইতেই অস্তিত্ববান ক্ষমতা সমন্বিত ও গুণ-বিশিষ্ট (signata quantitate) হইয়া থাকে।

অনন্ত :—অসীম সত্তাই হইতেছেন সৃষ্টি রহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব : ইনিই উপনিষদে বর্ণিত 'অনন্তম্' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২য়, ১)। অনন্ত-এর ধারণার সহিত কেবলমাত্র অপরিমিত বা অসংখ্য-এর ধারণার বিভ্রান্তি সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। অনন্তর সহিত সান্ত-এর তুলনার কোন সাধারণ মান (বা প্রমাণ) নাই এবং ইহার বিপরীতও সত্য : কিন্তু সেন্ট টমাস্ স্বীকার করেন যে দর্শনের ক্ষেত্রে সান্ত ও অনন্তের মধ্যে তুলনামূলক বর্ণনা চলিতে পারে। ইহাও বলিতে হইবে যে এই তুলনা উভয়দিকের সমান বৈশিষ্ট্যের নহে, তবে ইহা সমানুপাতিকতার সম্বন্ধ (উপমান)। ইহা না জানিলে, আমাদের নীরব থাকিতে হয়। প্রকৃত অনন্ত সান্তের ঠিক বিপরীতমুখী নহে—ইহা অত্যন্তাভাবের পূর্ণবিরোধী। সুতরাং সৃষ্টি অত্যন্তাভাবের বিরোধী নহে—ইহা 'পূর্বে অবিদ্যমান অবস্থা'র (অর্থাৎ প্রাগভাবের) নিরাকরণ। যথাযথ এই অর্থে দেখিলে, সৃষ্টি 'পূর্ব হইতে অবিদ্যমান কোন কিছু'র বিপরীত অবস্থা নহে, মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের এই মতবাদের ঠিক অনুরূপ মতবাদ দেখা যায় অন্নম্ ভট্টের তর্কসংগ্রহে : কার্য্যং প্রাগভাব-প্রতিযোগী।[২৫]

রহস্যবাদ:—আমরা মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের তত্ত্ববিদ্যা এবং রহস্যবাদের আভাষ-মাত্র দান করিব। তত্ত্ববিদ্যায় বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য বেশী। সেণ্ট টমাস বুদ্ধিশক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া এই বিরোধের সমাধান করেন। "যেহেতু জীবের বুদ্ধিশক্তি (বা ধনশক্তি) ঈশ্বরের সারধর্ম নহে, সেই হেতু ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ইহা আদি ধীশক্তির সদৃশ জীবদেহে অংশ গ্রহণকারী শক্তি। এই জন্য জীবের ধীশক্তিকে বোধির দীপ্তিও বলা যাইতে পারে—ইহা স্বাভাবিকী শক্তি অথবা ঈশ্বরের করুণা বা মহিমার সংযোগ বলা যাইতে পারে। অতএব ঈশ্বরকে অবলোকন করিবার জন্য দৃষ্টিশক্তির পক্ষে ঈশ্বরের সদৃশ কোন কিছুর দৃষ্টিশক্তির সহিত সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন ইহারই ফলে ধীশক্তি ঈশ্বরকে 'অবলোকন করিতে পারে" ।[২৬]

যেমন, অর্জুনকে 'দিব্যদৃষ্টি' প্রদান করা হইয়াছিল (গীতা, ১১শ, ৮), সেইরূপ মানুষের সহজাত শক্তিসমূহকে দৈব অনুগ্রহে অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে উন্নত করিতে হইবে। ধীশক্তির এই পরিবর্ধনকে সেণ্ট টমাস 'ধীশক্তির আলোকিতকরণ' আখ্যা দিয়াছিলেন। ধীশক্তির এই প্রদীপ্তি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে।

"এই আলোকের ফলে ঈশ্বরানুগৃহীতেরা ঈশ্বরাকার বিশিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বর-সদৃশ হন, বাইবেলে কথিত আছে: যখন তিনি 'আবির্ভূত হইবেন, আমরা তাঁহার তুল্য হইব এবং তিনি স্বরূপতঃ যাহা সেইরূপ অবলোকন করিব।' (জন লিখিত সুসমাচার, ৩য়, ২)।"[২৭]

ভারতীয় চিন্তাধারার সারমর্মতত্ত্ব (ভগবদ্গীতা, চতুর্দশ অধ্যায় ২য় শ্লোকে বর্ণিত) সুস্পষ্টভাষায় ইহাই ব্যক্ত করিয়াছে যে ভগবদাশীর্বাদ প্রাপ্ত লোকেরা অতি মানব অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন: এই অবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের অমরত্বের একটা ঐশ্বরিক তাৎপর্য আছে। সকলেরই ভিতর একই ধীশক্তি বিরাজমান এবং সেই কারণ মৃত্যুর পর ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে—যে সব লাতিন আভেরয়বাদীরা এই অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা এরিষ্টটলের 'নৌউস্' সম্বন্ধীয় মতবাদের ভ্রান্ত অর্থ করিয়াছিলেন। এরিষ্টটলের 'নৌউস' একটী অতি-ব্যক্তিক শক্তি—ইহা ভারতীয় দর্শনের 'বুদ্ধি' বা ঐস্লামিক দর্শনের 'আকুল'-এর সহিত তুলনীয়। প্রাচ্য দর্শনে এই শক্তি অতি-ব্যক্তিক, কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা ব্যক্তিগত: অবশ্য অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ বস্তু হিসাবে নহে বরং অতীন্দ্রিয় সত্ত্ব হিসাবে। নিম্নে ইহাই ব্যাখ্যা করা হইতেছে। গ্রীক্ তত্ত্ববিদ্যার অসম্পূর্ণতার জন্য প্রতীচ্যের সমগ্র চিন্তাধারার গতি ব্যাহত হইয়াছে। ইহা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত "অহং"-এর আলোচনার মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখিয়াছিল এবং গভীরতর "আত্মন্"-এ উপনীত হয় নাই। বোদ্ধ

চিন্তাধারার 'আত্মন' যেমন হিন্দু দর্শনের 'আত্মনে'র স্থান লইতে পারে না, সেইরূপ 'সাইকি' (psyche) 'নিউমা'র (preuma)-এর বিকল্প হইতে পারে না।

এখানে একটী গভীর এবং অনির্বচনীয় অবস্থার আলোচনা করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মধ্যে সচরাচর প্রচলিত একটী মতবাদ ছিল যে আত্মার যে বিষয় প্রকৃত জ্ঞান আছে, সেই অবস্থা কোন আশ্চর্য উপায়ে প্রাপ্ত হয় (*Cognosceus fit Cognitum*)। "আত্মা কোন না কোন কোন প্রকারে সকল বিষয় অবগত হয়" (দ্য আনিমা, ৩য়, ৮)—এরিষ্টটলের এই সূত্র সেন্ট টমাস কর্তৃক অনুমোদনের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে।[২৮] মধ্যযুগীয় মতবাদের প্রকৃত অর্থানুযায়ী সমতুল্য মতবাদ পাওয়া যাইবে উপনিষদের এই বাণীর মধ্যে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।[২৯] নব্য-প্লেটোবাদীদের বিশেষতঃ ডাইওনিসিয়াস দি এরিওপেগাইটের মাধ্যমে প্রাচ্য রহস্যবাদ ইউরোপে প্রসার লাভ করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়েরা এই সব রচনায় পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন। অগাষ্টিনীয় এবং ফ্রান্সিস্ কান্‌দের মধ্যে আভিস ব্রোনের (সলোমন্ চেম্ গাবিরন্, আনুমানিক খৃঃ অঃ ১০২১-১০৫৮) প্লেটোনিক রচনা সমাদৃত হয়। "ফাউন্টেন অব্ লাইফ্" নামক আভিস্ ব্রোনের যে পুস্তকে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানকে সহজাত ধারণা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সেন্ট টমাস তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। অপর পক্ষে সেন্ট টমাস ডাইওনিসিয়াস দি এরিওপাগাইটের রচনা বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। ডিউরন্টেল টমাসের রচনার মধ্যে ১৭০২ উদ্ধৃতি পাইয়াছেন যাহা ডাইওনিসিয়াসের প্রকৃত রচনা নহে, অথচ তাঁহার নামে প্রচলিত। মধ্যযুগে ডাইওনিসিয়াসের প্রতি কি প্রকার শ্রদ্ধা দেখান হইত তাহা আমরা দান্তের রচনা হইতে বুঝিতে পারি—তিনি তাঁহার কল্পিত স্বর্গরাজ্যে বোয়েটহিয়ম, সেন্ট আলবার্ট এবং সেন্ট টমাসের পরেই তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন।

সেন্ট টমাসের রহস্যানুভূতির এক বর্ণনায় দেখি যে তিনি তখন যখন 'সামা থিওলজিকা'র (Summa Theologica) সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড (যেখানে খৃষ্টের অবতার তত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বর ও মানবের প্রকৃত সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে) রচনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার আনন্দঘন অবস্থায় এমন এক দৈবজ্ঞান হয় যে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা অনাবশ্যক বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তিনি তাঁহার রচনাবলীকে অসার বলিয়া অভিহিত করেন।[৩০] এইখানে তিনি 'সামা' রচনার কার্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নীরবতা অতিপ্রাকৃতরূপ ধারণ করে। একাত্মবোধের

রহস্যানুভূতি সেণ্ট বোনাভেঞ্চার বা মাইণ্টার একৃহার্টের ন্যায় তিনি কখনও ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাই যোগ বা তৌ-হীদের নিরুদ্ধাবস্থা কি না তাহা আমরা সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের নিকট হইতে কখনও জানিতে পারিব না। তাঁহার এবং ঈশ্বরের মধ্যেই এই গোপনতত্ত্ব সীমাবদ্ধ থাকিয়া গেল।

নীতি বিদ্যা :—কোন কার্য যতই বুদ্ধি সঞ্জাত হউক, তাহার মহত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার বিচার করিতে হইবে। খৃষ্টীয় চিন্তাধারায় ব্যবহারিক বুদ্ধিকে কখনই মননশীলতা হইতে পৃথক করা হয় নাই। খৃষ্টীয় মতবাদে ব্যবহার ও পরমার্থের মধ্যে পূর্ণ বিভেদ নাই। এই বিষয়ে খৃষ্টীয় আদর্শকে ভগবদ্গীতার মূলচিন্তার সহিত এক বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় মতবাদানুসারে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ যথেচ্ছ রীতিনীতির উপর নির্ভরশীল নহে—ইহা সনাতনী নীতি (লেক্স ঈটার্না lex aeterna) অনুসারে পালিত ; ইহা ঈশ্বরের সারধর্মের সহিত একার্থক। এই সনাতনী নীতিকে বেদের সনাতন ঋতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—প্রাচীন হিন্দুচিন্তাধারায় ইহা ঐশী সত্যের সমার্থক।[৩১] যখন এই সনাতনী নীতি সৃষ্টি কার্যে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহাকে প্রকৃতির মধ্যে নিহিত দেখি। এই অবস্থায় ইহাকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' (লেক্স নাটুরালিস, lex naturalis) বলে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় চিন্তাধারার 'লেক্স নাটুরালিসের' অনুরূপ মতবাদ হইল ভারতীয় চিন্তাধারার 'ধর্ম'। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে উপরে বর্ণিত 'প্রাকৃতিক নীতি'র বিরুদ্ধে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সনাতনী নীতির বিরোধী—যেমন অধর্ম মাত্রই অঋতম্।

রহস্যের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তি :—সেণ্ট টমাসের দর্শনে নৈতিক মতবাদের মূলে আছে এরিষ্টটলের উদ্দেশ্যসাধনবাদ। খৃষ্টীয় মতবাদানুসারে মানুষের চরম লক্ষ্য কেবলমাত্র এরিষ্টটলীয় আদর্শের আলোকে ব্যক্তিগত উন্নতি নহে, পরন্তু উহা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করিয়া একটী গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্তি এবং গুণাতীতানন্দলাভ। এই গুণাতীত অবস্থা ভারতীয় দর্শনের পুরুষার্থসাধনার সমতুল্য। খৃষ্টীয় আদর্শানুযায়ী "নিকোমেকিয়ান্ এথিকস্"কে পরিবর্তিত করিতে সেণ্ট টমাসের কোন অসুবিধা হয় নাই। এরিষ্টটল পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ঐতিহ্যকে প্রাচীনকালে অংশতঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, (খৃষ্টীয় মতবাদের মাধ্যমে) প্রাচ্য জগৎ তাহাকেই পূর্ণতা দান করে।[৩২] মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাঁহারই জন্য সৃষ্ট, আবার তাঁহারই সহিত রহস্যময় মিলনের মাধ্যমে জীবনের চরম উৎকর্ষতালাভ—খৃষ্টীয় ধর্মে ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ইহা প্রাচীন গ্রীক মতবাদের এক-

নায়কত্ব হইতে ইউরোপের মানুষকে মুক্তিদান করে। মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে স্বাধীন, এই খৃষ্টীয় মতবাদ সর্বপ্রথম আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় প্রকাশিত হইতে দেখি। মানুষের সহিত ঈশ্বরের পারমার্থিক সম্বন্ধের রহস্যপূর্ণ মনোজ্ঞ তাৎপর্য সেন্ট বোনাভেঞ্চারের ধর্মতত্ত্বে পাওয়া যাইবে এবং সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস ও বোনাভেঞ্চারের সমসাময়িক মাইষ্টার একহার্ট ভাষায় অতীত এই নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে এই সূত্রেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে।[৩৪] যদি আমরা সেন্ট টমাসকে প্রশ্ন করি যে ঈশ্বরের সহিত সংযোগানন্দ কিসে হয়, তাহা হইলে তিনি উপদেশ দিবেন যে ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধিসম্ভূত ক্রিয়া। ঈশ্বরের ধ্যানকালে তাঁহার স্বরূপধর্ম যেন বুদ্ধির দর্শনে প্রতিফলিত হয়। ইহা সুবিদিত যে খৃষ্টীয় চিন্তাধারায় ঈশ্বরের স্বরূপধর্ম ত্রয়াত্মক এবং ইহাকেই দান্তে "একটা নক্ষত্রের মধ্যে দেদীপ্যমান ত্রিধারাময় আলোক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ("প্যারাডাইসো" ৩১শ, ২৮)।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে হইলে পরস্পরাভিমুখী ঐতিহ্য আলোচনা করা প্রয়োজন। হিন্দু চিন্তাধারায় 'ব্রহ্ম ত্রিবিধ' অর্থাৎ 'তিনি ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা', এই মতবাদ প্রচলিত আছে, তত্ত্ববিজ্ঞানের ভাষায় তিনি অখণ্ড, সৎ-চিৎ-আনন্দ। প্রাচীন পারসীক ঐতিহ্যে '**জর্বন্** অকরণ' বা পরমব্রহ্মের সহিত নিম্নলিখিত প্রত্যয় বা ধারণাগুলির সমীকরণ করা যাইতে পারে: 'অহুর' সৎ, 'মজ্দা' চিৎ বা জ্ঞান এবং 'অহুরমজ্দা' 'স্পেণ্ট-মৈন্যু' বা আনন্দের সহিত একার্থবোধক। আবার ঐস্লামিক চিন্তাধারায় আল্লার অনন্তত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অল্-আকুইল (সৎ), অল্-অকূলু (চিৎ) এবং অল্-মকুল (আনন্দ) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই সবই সেই একই একমেবাদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মের বিভিন্ন পরিচায়ক। ধর্মের বিভিন্নতার কথা বলিলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়: সঠিক পরিভাষায় বলিতে গেলে (ঈশ্বরের মনে) একটামাত্র সাবজনীন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ঐতিহ্য পারস্পরিক ভুল নিরাকরণ করে এবং পরস্পরকে পুষ্ট করে। আবার, বর্তমানের প্রচলিত ভাষায় অনন্তব্রহ্মকে নৈর্ব্যক্তিক বলা হয়। উপযুক্ত পদ হইতেছে 'অতি-ব্যক্তি' বা 'পরাব্যক্তি'। 'ব্যক্তি' পদটার প্রকৃত অর্থ লইয়া যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, খৃষ্টীয় লেখকদের রচনায় ইহা এক নির্দিষ্ট অর্থ ধারণা করিয়াছে। সেন্ট টমাস এই পদকে এইরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন:

"সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা সম্পূর্ণ তাহাই ব্যক্তি—'ব্যক্তি' (বা 'পুরুষবিশেষ') পদটী যথাযথভাবে একমাত্র ঈশ্বরেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ তিনি স্বরূপতঃ

পূর্ণাঙ্গ বলিয়া যাহা কিছু সম্পূর্ণ তাহা একমাত্র তাঁহাতেই আরোপিত হইতে পারে : অবশ্য ব্যক্তিত্ব পদটী সাধারণ জীবের উপর যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সে অর্থে নহে, পরন্তু অধিকতর উৎকর্ষের নির্দেশক হিসাবে (ঈশ্বরের ক্ষেত্রে) প্রযুক্ত হয়। অন্য সব নামই যাহা ঈশ্বরে প্রযুক্ত হয় তাহাদের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য, যদিও জীবের উপর ইহারা আরোপিত হয়।'[৩৫]

(ইংরাজী) 'পার্সন্' (Person) পদটীর মূল অর্থের জন্য (লাতিন 'পার্সোনা' per-sona—শব্দের অর্থ হইল 'মুখোস', যাহার ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা কথা বলে) যে আপত্তি করা হয়, তাহার উত্তরে সেণ্ট টমাস বলিয়াছেন :

"যদিও শব্দের ব্যুৎপত্তির দিক হইতে 'পারসন্ (person) নামটী ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা হইলেও বাস্তব অর্থের দিক হইতে ইহা যথাযথভাবে ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইতে পারে : কারণ বিভিন্ন বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক নাটকে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের প্রতিরূপ দেখান হইত বলিয়া, 'পার্সন্' পদটী যাঁহারা খুব সম্মানী তাঁহাদেরই বুঝাইত।.........অতএব কেহ কেহ 'পার্সন্'-এর সংজ্ঞা দিতেন এমন একজন সত্তাবান্ ব্যক্তি যিনি বিশেষভাবে সম্মানিত। যেহেতু কোন যুক্তিক্ষম ব্যক্তির মধ্যে সত্তাই বিশেষ সম্মানের বিষয়বস্তু, প্রত্যেক যুক্তিধর্মী ব্যক্তিই 'পার্সন্' পদবাচ্য। ঈশ্বরের স্বরূপাবস্থার মর্যাদা সব কিছুর ঊর্ধ্বে এই দিক হইতে বিচার করিলে 'পার্সন্' পদটী প্রধানতঃ ঈশ্বরেই প্রযোজ্য।[৩৬]

মুস্কিল হইতেছে যে ইউরোপীয় ভাষায় এইরূপ উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করিবার আর কোন উপযুক্ত পদ নাই। যখন প্রাচ্য ভাষায় তত্ত্ববিজ্ঞানের উপযুক্ত পদ ইহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে 'পারসন'-পদটীর প্রয়োগের আপত্তি তিরোহিত হইয়া যায়। মধ্যযুগের দর্শনে ব্যবহৃত 'পারসন্'-পদটীর উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইল ভারতীয় পরিভাষার 'পুরুষ', যাহার অর্থ হইল বুদ্ধিসংযুক্ত ব্যক্তি-বিশেষ। 'পারসন্' অর্থেই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে পুরুষ পদটী প্রযোজ্য হয় ; অবশ্য 'পুরুষোত্তম' পদটী অধিকতর সুষ্ঠু হইবে। আধুনিক দার্শনিকেরা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের জন্য 'পার্সন্' পদটী ব্যক্তির বাহ্য প্রকাশের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করেন : সেইজন্য যদি টার্টুলিয়ান—যিনি তত্ত্ববিজ্ঞানে উচ্চপদ মর্যাদা বুঝাইবার জন্য এই পদটী সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন—'পার্সন্'-পদের পরিবর্তে পার্সোনাণ্ট (personant) পদটী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে আধুনিকেরা অধিকতর সন্তুষ্ট হইতেন। তাহা হইলে বাহ্য আবরণের (persona বা মুখোস) পশ্চাতে সত্তাকে স্পষ্টতরভাবে উহা নির্দেশ করিত।

মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা যেমন মননশীলতার ক্ষেত্রে সেইরূপ ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সম্যক্ দৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে 'সামা থিওলজিকার' 'প্রাইমা সেকুণ্ডি' (Prima Seundae)-তে। নীতির (Law) সারধর্ম যুক্তি এবং ইহা যুক্তির অবদান, এইভাবেই সেণ্ট টমাস নীতির সংজ্ঞা দিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত না হইলে নীতিকে বৈধ বা অকৃত্রিম বলিয়া প্রবর্তিত করা যায় না। সেণ্ট টমাসের মতে "নীতি হইল সাধারণের মঙ্গলের জন্য যুক্তির আদেশ ইহা সমাজের অধিশাস্তা কর্তৃক প্রচারিত।"[৩৭] তাঁহার এই সংজ্ঞা জগৎকর্তার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। যত কিছু সম্ভাব্য নৈতিক আদেশ আছে তাহাই সনাতনী নীতি হইতে উদ্ভূত এবং এই নীতি ঈশ্বরের মন হইতে পৃথক নহে। প্রখর-ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা হীনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সনাতনী নীতিগুলিকে শাসন কার্যে কিভাবে প্রয়োগে করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতে পারে; এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষকে নিছক পার্থিব শক্তির উপরে স্থান দেওয়া হইত। ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর প্রতিপক্ষ হিসাবে নূতন ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া রাষ্ট্র যখন এক নায়কত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে, তখন মধ্যযুগের এই শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা তিরোহিত হয়। মধ্যযুগের শেষভাগে রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী, এই ধারণই বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

সনাতনী নীতি ভঙ্গ করিয়া রচিত বস্তুনিষ্ঠ নীতিকে অন্যায় বিধান বলিয়া সেণ্ট টমাস নিন্দা করিতেন, কারণ ইহা সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। রাষ্ট্রশাসক তাঁহার সকল ক্ষমতা শাসিত জনসাধারণের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রের বিধান কর্তা যতদিন সমগ্র সমাজের কল্যাণে রত থাকেন, ততদিন তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের অধিকর্তা থাকিবেন। যদিও নানাপ্রকার বৈধ শাসনকার্য সম্ভব, তাহা হইলেও যেটি সকল ব্যবস্থার সুবিধাগুলির সমন্বয় করে সেইটিই সেণ্ট টমাস অনু-মোদন করেন।

এই প্রকার সংবিধান নিম্নলিখিত আদর্শের সমন্বয় হইবে: রাজতন্ত্র, কারণ ইহা এক সর্বাধিনায়ক স্বীকার করে: অভিজাততন্ত্র, কারণ ইহার মতে গুণানুসারে কতকগুলি লোকের উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকে: এবং গণতন্ত্র বা জনতারাজ, কারণ ইহার মতে শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের মধ্য হইতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।[৩৮]

সেণ্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস যে বিরাট্ জ্ঞান স্তম্ভ রচনা করিয়াছিলেন তাহা শাশ্বত

দর্শন (Philosophia Perennis) নামে সুপরিচিত এবং অদ্যাবধি উহার গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। অগাস্টিনীয় ধর্মতত্ত্বের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা সেণ্ট টমাস করিয়াছিলেন তাহার ফলে পরবর্তী শতাব্দীতে সূক্ষ্মতত্ত্ববিশারদ্ ডান্স্কোটাসের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীর আবির্ভাব হয়।[৩৯] টমাসের দার্শনিক সৌধ কম্পিত হয় ; কিন্তু দেখা গেল যে শাশ্বত দর্শনের এই সৌধ যাহা সেণ্ট টমাস প্রাণপাত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন তাহা সেণ্ট টমাস অপেক্ষাও শক্তিশালী। আজ ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ে টমাসের মতবাদের পুনর্জাগরণ হইয়াছে। যখন ভারত ও চীনের ঐতিহ্য আরও ভাল করিয়া জানা যাইবে, মধ্যযুগের উপাদান লইয়া এই মহাজ্ঞানী যাহা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুষ্ঠু এবং ব্যাপক উদার মতাবলম্বী সমন্বয় তাঁহার প্রদর্শিত পথে রচিত হইবে।

পাদটীকা

১। 'সামা থিওলজিকা', I a, II ae, q. 109, a, I *ad lum*. সেণ্ট আম্ব্রোস, ১ম কোবিন্থিয়ান্স্-এব টীকা, ১২শ, ৩ ; মিগ্নে 'পেট্রোলগিয়া লাতিনা' ১৭শ, স্তম্ভ ২৪৫

২। এ, ডি, সার্টিলাঙ্গেস্, 'বিন্দু ভ্য জন', ২৫শে অগাষ্ট, ১৯২১। জাক্ মারিতেঁ সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস্ এঞ্জেল অব্ দি স্কুলস্', লণ্ডন, ১৯৩৩, পৃঃ ১৬৮

৩। ত্রয়োদশ লিও : 'ইটার্নি পাত্রিস্', 'এন্সাইক্লিকাল অন স্কলাষ্টিক ফিলজফি', ১৮৭৯।

দশম পাইয়াস্ 'ডক্টরিস্ এঞ্জেলিসি', মোটু প্রোপ্রিও, ১৯১০।

পঞ্চদশ বেনিডিক্ট : 'নিউ কোড্ অব্ ক্যানন্ ল' ১৯১৭। ১৩৬৬ সংখ্যক আদেশ, ২য় অনুচ্ছেদ।

একাদশ পায়াস্ স্টুডিওবাম্ ডিউসেম্, ১৯২৩।

৪। 'ইল্ সেণ্ট' dist. ২৮, q. ১, a. ৪ ad ৪

৫। 'সামা থিওলজিকা, ২য় a, ২য় ae, q. ১ম, a. ৪, সি।

৬। ৩য় 'মেটাফিজিকা' ৮ ; 'কণ্ট্রা জেণ্টিল্স্' ২য়, ৭৩।

৭। আনন্দ কুমার স্বামী : অন্ দি পার্টিনেন্স অব্ ফিলজফি'—এস্ রাধাকৃষ্ণণ ও জে, এইচ্ মুরহেড্ সম্পাদিত 'কণ্টেম্পরারি ইণ্ডিয়ান্ ফিলজফি,' লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৬, পৃঃ ১২৬।

রেণে গুয়েগেঁ, 'ইস্টয়ার্ দ্যুন সিউডো-রেলিজেঁা,' প্যারি, ১৯৩০।

৮। 'সামা থিওলজিকা,' ১ম খণ্ড, q 1, a. ৮, মি।

৯। মোজেস্ মৈমনিডেস্ : 'দি গাইড্ ফর্ দি পার্প্লেক্সড্'—মূল আরবী গ্রন্থ হইতে এম্ ফ্রীড্‌লেণ্ডেরের কর্তৃক অনূদিত লণ্ডন ১৯৩৬।

আই, আব্রাহাম্স্, এড্উইন্ আর্ বেভান্ এবং চার্লস্ সিঙ্গার : 'দি লেগাসি অব্ ইজ্রেল্', অক্সফোর্ড, ১৯৪৪, পৃঃ ১৯২।

১০। পি, জোহাঁ 'ভার ল্য ক্রিষ্ট পার ল্য বেদান্ত' লুভেঁ, ১৯৩২, 'শঙ্কর এ রামানুজ', ১ম খণ্ড।

১১। 'সামা কণ্ট্রা জেন্টিলস্', ১ম, ১২ : যে সত্তার ফলে ঈশ্বর স্বয়ম্ভু সে সত্তা সম্বন্ধে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে ইহার কি প্রকারের এবং ইহা স্বরূপতঃ কি, তাহা অজ্ঞাত।

বোয়েটিআম্, 'ডা ট্রিনিটেট্‌ q. ১ a. ২, ad ৪: "আমরা যে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত তিনি অজ্ঞাত।"

'সামা থিওলজিকা', ১ম, q ২, a. ২, ad ৩: "যে কার্য কারণের সহিত সমানানুপাতিক নহে, তাহা হইতে কারণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান পাওয়া যায় না। তথাপি প্রতি কার্য হইতেই কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় বলিয়া, ঈশ্বরের কার্যাবলী হইতেই তাঁহার অস্তিত্ব আমরা দেখাইতে পারি, অবশ্য ঐ সমস্ত কার্য হইতে ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি তাহা আমরা জানিতে পারি না।

১২। টমাসের রহস্যময় নীরবতা সম্বন্ধে এ, ডি, সেটিলাঙ্গেস্ 'রিভু ড ফিলজফি-তে—অগাষ্ট, ১৯০৬ পৃঃ ১২৭—নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাদান করিয়াছেনঃ 'সত্তা' পদটার ন্যায় যখন 'কারণ' পদটী ঈশ্বরে আরোপিত হয়, তখন তাঁহার সম্বন্ধে সুষ্ঠু সংজ্ঞা দান করিতে পারে না, বরং তাঁহার সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতার আভাষ দান করে..... কারণ আমরা নিজেদের এবং আমাদের বিশ্বকে অধীন মনে করি। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের উক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের উপরই আসিয়া পড়ে। উহারা তাঁহার গুণ প্রকাশ করে না—কেবলমাত্র আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধকে প্রকাশ করে।..... সেইজন্য ঈশ্বরের সংজ্ঞা দান কালে আমাদের পূর্ণ নেতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়।... .....স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন অনুমান, সংজ্ঞা বা ধারণা হইতে পারে না।"

১৩। জাক্ মারিতেঁ, ঐ, পৃঃ ৫০।

১৪। 'টেস্টিমোনিয়া ইক্লিসি,' রোমা, ১৯১৪, ১ম খণ্ড : জে, জে, বের্টাইর, 'স্যাংটাস্ টমাস ডক্টর কমুনিস্ ইক্লিজি।'

১৫। 'ডা মালো', ২য়, ২।

১৬। মিগুয়েল অসিন ওয়াই পালাসিওসঃ 'ল্য এস্কাটালোগিয়া মুসলমানা আঁনা ডিভাইনা কমেডিয়া', মাদ্রিদ, ১৯১৯। ইংরাজী অনুবাদের নামঃ 'ইসলাম এণ্ড দি ডিভাইন কমেডি,' লণ্ডন, ১৯২৬।

১৭। টমাস আরনল্ড ও আলফ্রেড্ গুইলাওমেঃ দি লেগাসি অব্ ইসলাম', লণ্ডন, ১৯৩১ পৃঃ ২৫৭।

১৮। মিগুয়েল আসিন পালাসিওঃ 'আলগাজেল,' জারাগোজা ১৯০১।

১৯। 'দি লেগাসি অব্ ইসলাম,' পৃঃ ২৭৬-৭।

২০। 'সামা থিওলজিকা', ১ম, q. ৭ a ৩ সি।

২১। ঐ, ১ম, q. ২, a. ৩, সি।

২২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২য় ১ম ২০।

২৩। 'সামা থিওলজিকা', ১ম, q. ১০৪, a. ১, সি।

২৪। ঐ, ১ম, q. ২, a. ১, সি।

২৫। তর্ক-সংগ্রহ, ২৯শ, ৩।

২৬। সামা থিওলজিকা ১ম, q. ১২, a. ২, সি।

২৭। ঐ, ১ম, q. ১২, a. ৫, সি।

২৮। ঐ, ১ম, q. ১৪, a. ১, সি।

২৯। মুণ্ডক-উপনিষদ্ ৩য়, ২, ৯।

৩০। জ্যাক্ মারিতঁ ঐ ; পৃঃ ৫১।

৩১। ঋগ্-বেদ, ১০ম, ১৯০, ১ ; ঋতম্ চ সত্যম্ চাভীদ্ধাৎ তপসোধ্যজায়ত ; ঋগ্-বেদ, ১০ম, ৮৫, ১ সত্যেনোত্তভিতা ভূমি।

৩২। জি. টি. গ্যারাট্ : 'দি লেগাসি অব্ ইণ্ডিয়া,' অক্সফোর্ড, ১৯৩২। এইচ্ জি. রলিন্সনের রচনা —সক্রেটিসের যুগে ভারত ও গ্রীসের সংযোগ দেখাইয়াছে। সক্রেটিস প্লেটোর গুরু ছিলেন, অতএব তিনি এরিষ্টটলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

৩৩। এটিনে গিলসন : 'দি ফিলজফি অব্ সেণ্ট বোনাভেঞ্চার', লণ্ডন, ১৯৩৮। উচ্ছ্বাস এবং আবেগ (ecstasy ও rapture)-এর পারিভাষিক প্রভেদের জন্য বোনাভেঞ্চার, 'ইন্ হেক্সিমেরোন', ২য়, ২৯, ৫ম, পৃঃ ৩৪১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ দ্রষ্টব্য। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, যিনি উচ্ছ্বাসের অবস্থায় উপনীত হন, তিনি বলিতে পারেন কিরূপে তিনি ঐ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন সর্তগুলির নির্দেশ করিতে পারেন ; কিন্তু যদি তিনি অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি কিছুই বলিতে বুঝাইতে পারেন না। 'ইন্ সেনটেন্সিয়ারাস',—এ ২৩, ২, ৩, সিদ্ধান্ত, ২য়, পৃঃ ৫৪০, সেণ্ট বোনাভেঞ্চার বলিয়াছেন যে আবেশের অবস্থা অনন্যসাধারণ এবং ইহা "তাঁহাদেরই ভিতর দেখা যাইতে পারে যাহারা অনুকম্পার সুযোগে পৃথিবীতে বিচরণশীল মানবের অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। (status viatorum, তুঃ যতি)। এটিতে গিলসন্ ইহার উপর টীকা করিয়াছেন : "যাহাকে ঈশ্বর আবেশের অবস্থায় উপনীত করেন তিনি আর সাধারণ মানুষ থাকেন না ; তিনি বিশেষ আশীর্বাদের অধিকারী ; এবং এই কারণেই মানুষ কর্তৃক ঈশ্বরাবলোকনের ধারণাটী স্ব-বিরোধী।"

৩৪। 'মাইষ্টার একহার্ট', পফাইফারের সংস্করণ, ইভানস্ কর্তৃক অনূদিত, লণ্ডন, ১৯২৪।

রুডল্ফ্ অটো : 'মিষ্টিসিজম, ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট', লণ্ডন, ১৯৩২। এই গ্রন্থে শঙ্কর এবং মাইষ্টার একহার্টের তুলনামূলক বিচার আছে।

৩৫। 'সামা থিওলজিকা', ১ম, ১, ২৯, a. ৩ সি।

৩৬। ঐ ১ম, q. ২৯, a. ৩ ad ২।

৩৭। ঐ ১ম এ, ২য় এ, ই, q. ৯০, a. ৪, সি।

৩৮। ঐ ১ম এ, ২য় এ, ই, q ১০৩, a. ১, সি।

৩৯। 'লেগাসি অব্ দি মিড্ল্ এজেস্, সি. জি. ক্রাম্প এবং ই. এফ্ জেকব্ কর্তৃক সম্পাদিত ; অক্সফোর্ড, ১৯২৬, পৃঃ ২৪৬ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

গ্রন্থ-বিবরণী

ডি. জে. বি. হকিংস্ 'এ স্কেচ্ অব্ মিডিভাল ফিলজফি, লণ্ডন, ১৯৪৬।

আনটন্ সি পেগিস্, 'বেসিক্ রাইটিংস্ অব্ সেণ্ট টমাস্ এ্যাকুইনাস্', নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫

হান্স্ মেয়ার 'দি ফিলজফি অব্ সেণ্ট টমাস এ্যাকুইনাস্,' সেণ্ট লুই, ১৯৪৬।

ইটিনি গিল্‌সন্ ; 'দি ফিলজফি অব্ সেণ্ট বোনাভেঞ্চার' নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৮।

চার্লস্ হাস্‌কিন্‌স্ ; 'দি রেনেশাঁ'স অব দি টুয়েল্‌ভ্‌থ্ সেঞ্চুরি', কেম্ব্রিজ, ১৯২৭।

এইচ্, বেট্ ; 'জোহানেস্ স্কোটাস্ এরিজিনা', এ স্টাডি ইন্ মিডিভাল ফিলজফি', কেম্ব্রিজ, ১৯২৫।

জে, টি, মাক্‌ল্ ; আল্ গাজেল্‌স্ মেটাফিজিক্স ; এ মিডিফাল্ ট্র্যানস্লেশন্', টোরোণ্টো, ১৯৩৩।

ডি, ই, শার্প : 'ফ্রানসিস্‌কান্ ফিলজফি এ্যাট্ অক্সফোর্ড ইন্ দি থার্টিংথ্ সেঞ্চুরি'; অক্সফোর্ড, ১৯৩০।

সি, আর, এস্, হ্যারিস্ : 'ডান্ স্কোটাস্', অক্সফোর্ড, ১৯২৭।

এম্, বের্গসোঁ : 'ল্ স্ট্রুক্‌টুর্ দু কঁসেপ্ লাতাঁ দ্য প্যারসন্ অটাওয়া, ১৯৩৮।

এল্, গাউট্‌হিয়ার্ : 'স্কলাস্তিক্ মুসলমানে এ স্কলাস্তিক্ ক্রেটিন্'—রিভ্যু দ্য ইস্তয়ার্ দ্য লা ফিলজফি, ১৯২৮, পৃঃ ২২১—৫৩, ৩৩৩—৬৫।

জি, গেস্‌নের্ : ডি আবস্ট্রাকশিওনস্‌লেহ্‌রে ইন্ ডে আব্ স্কলাষ্টিক সিস্‌টম'স্ ফন্ আকুইন্ মিট্ বেসণ্ডেরের বেরুক্ জিশ্‌টিগুঙ্গ ডেস্ লিষ্ট্‌বেগ্রিফেস্', ফুল্‌ডা, ১৯৩০।

জে, উইন্‌ড্রো সুইম্যান : 'ইস্‌লাম্ এ্যাণ্ড্ ক্রিশ্চিয়ান্ থিওলজি—এ ষ্টাডি অব্ দি ইন্‌টারপ্রেটেশন্ অব দি থিওলজিক্যাল্ আইডিয়াস্ ইন্ দি টু বিলিজান্‌স্'। লুটেরওয়ার্থ লাইব্রেরী (মিশনারী রিসার্চ সিরিজ্), লণ্ডন, ১৯৪৮—৪৯—৫০।

এ লালান্‌দে : 'ভোকাবুলেয়ার্ টেক্‌নিকে এ ক্রিটিকে দ্য লা ফিলজফি' ২য় খণ্ড ও প্যারিস, ১৯২৮—৩২।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সুফি-মতবাদ

'সুফি'-পদটীর ব্যুৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতগণ বিতর্ক করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদের অবকাশ নাই বলিয়া আমার মনে হয়। শব্দ কোষ-সঙ্কলকদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সংক্ষেপে লক্ষ্য করা যাউক।

(১) কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের চিত্তের পবিত্রতা (সাফা) এবং কার্যের শুচিতার (অথর) জন্য তাঁহাদের সুফি বলা হইত। বিশ্‌র্ ইব্‌ন্ আল্‌হারিথ্ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার চিত্ত অকপট বা সরলভাবে (সাফা) আসক্ত। তিনিই সুফি"

'সুফি'-শব্দটি যদি 'সাফা'-পদ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শুদ্ধ পদ সুফি না হইয়া 'সাফায়ী' হওয়া উচিত ছিল।

(২) আবার কেহ কেহ বলেন যে "তাঁহাদের সকল বাসনা ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া তোলার জন্য, তাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বরাসক্ত করার জন্য এবং সকল গোপনতত্ত্ব ঈশ্বরের নিকট উন্মোচিত করার জন্য সুফিরা ঈশ্বর সান্নিধ্যে প্রথম স্থান (সাফ্) অধিকার করিতেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছিল সুফি।"

'সুফি' শব্দটী যদি 'সাফ্' শব্দটীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহা সুফি না হইয়া 'সাফী' হইত।

(৩) একদল বলেন, "তাঁহাদের সুফি বলা হইত, কারণ ভগবৎ-আদিষ্ট মহম্মদের সমকালীন লোকের গুণাবলীর সহিত সুফিদের গুণের সাদৃশ্য ছিল। তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং স্বজনবর্গ পরিহার করিয়াছিলেন। জাগতিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে যাহা নগ্নতানিবারণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের একজনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "সুফি কে?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যিনি নিজে কিছুরই অধিকারী ন'ন এবং কাহারও দ্বারা অধিকৃত ন'ন।" ইহার দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে সুফি বাসনার দাস ন'ন।

কিন্তু যদি সুফি শব্দটী সুফ্‌ফা হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইহার শুদ্ধরূপ' 'সুফি না হইয়া 'সুফ্‌ফি' হইত।

(৪) আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে তাঁহারা সুফ্ বা পশম পরিতেন বলিয়া তাঁহাদের সুফি বলা হইত।

যদি সুফ্ শব্দ হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শব্দটী নির্ভুল বা যথার্থ বলা যাইতে পারে। আবু বকর্ অল্ কলবধি মনে করে যে ইহার মধ্যে "সকল প্রয়োজনীয় অর্থই আছে, যথা, জগৎ হইতে নিজেকে প্রত্যাহার, জগতের প্রতি নিরাসক্তি, অভ্যস্ত আবাস পরিত্যাগ, সর্বদা ভ্রমণ, ভোগবিরাগ, আত্মশুদ্ধিকরণ, বিবেক মার্জন, বক্ষঃপ্রসারণ এবং জননায়কত্ব।"[২]

ইব্‌ন্ খল্‌দুনেরও অভিমত ছিল যে সুফ্ শব্দ হইতে 'সুফি' শব্দের ব্যুৎপত্তি। ইহাও কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কেবলমাত্র রুক্ষ পশম পরিধান করিয়াই কেহ সুফি হ'ন না। হুজ্উইরি বলিয়াছেন, "পবিত্রতা (সাফ্) হইল ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং পশম (সুফ্) হইল মেষাদি জীবের পরিধান।"

ইমাম্ কুইশারীর গবেষণানুসারে হিজরী দ্বিতীয় শতকের (খৃষ্টাব্দ ৮২২) কিছু পূর্বে সুফী শব্দের প্রবর্তন হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর সে যুগের জনগণ 'মিত্র বা দোস্ত' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা শ্রেয় উপাধির প্রয়োজন ছিল না, কারণ 'মিত্রতা' সর্ববাদিসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ উপাধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এই 'দোস্তগণের' সহিত সহযোগিতা করিতেন, তাঁহাদের সেই সময় 'তাবেয়ূন' (অনুবর্তী) বলা হইত। আবার যাঁহারা এই 'অনুবর্তিগণের' পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহাদের 'অনুবর্তীর অনুবর্তী' (বা প্রশিষ্য) আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ের পর ধর্মভাবের শিথিলতা দেখা দিল। জনচিত্ত ঈশ্বর অপেক্ষা জাগতিক সুখের প্রতি অকৃষ্ট হইতেছিল। কতকগুলি মতবাদ ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। প্রতি সম্প্রদায় আবার কয়েকটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রেমে মগ্ন ছিলেন তাঁহারা জগৎ হইতে নিজেদের পৃথক রাখিয়া তাঁহাদের একমাত্র প্রেমনিধান ঈশ্বরের চিন্তায় ও ধ্যানে নিযুক্ত রাখিতেন।

পরবর্তীকালে ইঁহাদেরই সুফি বলা হইত। ঈশ্বরের সেবার জন্য ইঁহারা পার্থিব ব্যাপার হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিতেন—ইঁহারা সর্বদা ধ্যাননিমগ্ন, সকল মলিনতা হইতে মুক্ত থাকিতেন—ইঁহাদের দৃষ্টিতে স্বর্ণ ও কর্দম (টাকা ও মাটি) সমমূল্যজ্ঞাপক ; এবং এইজন্য আবু আলি অল্-রুধ্‌বারী সুফির সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন :

"যিনি তাঁহার পবিত্রতার উপর পশম পরিধান করেন, যিনি তাঁহার কামকে অত্যাচারের রূপ দিয়াছেন এবং যিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-আদিষ্ট-মহাপুরুষের পথে যাত্রা করেন।"৩

এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে এখন 'সুফি'-মতবাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা যাইতে পারে। যদি সুফিগণ নিজেরাই সুফি-মতবাদের যে সমস্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন সেগুলি পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে সুফিগণের অনেকগুলি গুণের কথা জানিতে পারি। সবগুলি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। তাহাদের সারাংশ শেখ-উল-ইসলাম জাকারিয়া আনসারি প্রদত্ত সংজ্ঞায় সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ; ইহা এইরূপ—

"সুফি-মতবাদ শিক্ষা দেয় কি ভাবে আত্ম-শুদ্ধি করা যায়, নৈতিক উন্নতি সাধন করা যায় এবং শাশ্বত শান্তিলাভের জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তর জীবন গঠন করা যায়। ইহার বিষয়-বস্তু হইল আত্ম-তৃপ্তি এবং উদ্দেশ্য হইল শাশ্বত সুখ এবং আনন্দলাভ।" অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা কয়েকজন সুফির নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি উপর্যুক্ত সংজ্ঞার অর্থ সম্প্রসারণ এবং সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছে।

রসাইন নামক সুফিদের বৃহৎ সঙ্কলনের গ্রন্থকর্তা ইমাম্ কুইশয়্রী সুফি-মতবাদ বলিতে পবিত্রতা অর্থাৎ অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ বুঝিয়াছেন : এবং তিনি বলেন "যে ভাষাতেই ব্যবহৃত হউক 'পবিত্রতা' খ্যাতির যোগ্য এবং ইহার বিপরীত, অর্থাৎ অপবিত্রতা বর্জনীয়।" আবুল-হুশায়ন অল-নূরীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'সুফি-মতবাদ কাহাকে বলে ?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "অন্তরের ইন্দ্রিয়পরায়ণ অংশের পরিবর্জন।" আবু আলী কোআজউনীর মতে সুফির অর্থ হইল 'ভদ্র আচরণ'। আবু সাল শলুকী ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন, "আপত্তি উত্থাপন হইতে বিরত থাকা।" আবু মহম্মদ অল্-জরীরী মনে করেন যে সদ্-আচরণের অভ্যাস গঠন এবং মন্দ বাসনা ও কামনা হইতে অন্তঃকরণকে বিমুক্ত রাখার নাম সুফিধর্ম।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে এই সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুফিগনের মতে ইন্দ্রিয় ও বাসনার পরিমার্জনই হইতেছে সুফিধর্ম ; ইহা হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট ব্যক্তিগত বাসনার বলিদান। ইহা যেন শুদ্ধ আত্মা এবং বাসনা ও প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করা। মোট কথা, ইহা হইল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ—যাহা নিষিদ্ধ তাহার পরিহার এবং যাহা আদিষ্ট তাহার সাধন।

এই অর্থে সুফিধর্ম হইল খাঁটি ঐশ্লামিক অনুশাসন। ইহা অলঙ্ঘনীয় অনুশাসন,

কর্তব্য, নিয়ম ও আদেশের প্রবর্তন করিয়া মুসলমানগণের চরিত্র গঠন করিয়া থাকে। বিশ্বমানবকে শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের পাপমুক্ত করিবার জন্য মহামানব মহম্মদ প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৪] সুফিরা সর্বদাই এই সব অনুশাসন স্মরণ রাখিতেন, এই আদেশগুলি পালন করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন এবং ইহার পরেও যাহা করিতে আদিষ্ট হইতেন, তাহা করিতেন। ভগবান বলিয়াছেন: "যাহারা আমাদের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে, আমরা সর্বদাই তাহাদের রক্ষা করিব।"[৫] আবার বলিয়াছেন "হে বিশ্বস্ত অনুগামিগণ! ভগবানের প্রতি তোমাদের কর্তব্য কর, তাঁহাকে পাইবার পথ অনুসন্ধান কর, শক্তি সহকারে তাঁহার জন্য সংগ্রাম কর; তাহা হইলে তুমি শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।"[৬]

ইস্‌লামে সুফি-ধর্মের ইহাই পূর্ণ অর্থ নহে। ইহার একটা গূঢ় অর্থ আছে। এই গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে হইলে কুর্-আণ অনুসারে (সুরা ৫৬) মানবের ত্রিধা শ্রেণীকরণের অর্থ বুঝিতে হইবে। মানুষকে তিনভাবে ভাগ করা হয়: (১) দক্ষিণ হস্তের অনুচর (আশাব্-উল্-মৈমেনা) (২) বাম হস্তের অনুচর (আশাব্-উল্-মশ্-অমা) (৩) ঈশ্বরের সমীপবর্তী (মুকুরামুন)।

দক্ষিণ হস্তের অনুচরগণ "অদৃশ্য শক্তিতে আস্থাবান্", "প্রার্থনায় একাগ্র" এবং তাঁহাদের অন্তরে আছে "পরলোক সম্বন্ধে সুনিশ্চয়তা।" তাঁহারা "ঈশ্বরের নির্দেশে সৎপথে থাকেন।" বামপন্থীরা "ভগবৎ বিশ্বাস পরিহার করিয়াছেন" এবং অলীক দেবতার অনুশাসন করেন। কুর্-আণে বলে তাঁহারা "ভগবানের নির্দেশের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ গ্রহণ করিয়াছেন" এবং "তাঁহার প্রকৃত নির্দেশ পরিহার করিয়াছেন।" যে জ্ঞান হইতে বিভিন্ন কার্যের উদ্ভব হয়, সৎপথ সম্বন্ধে ধারণা এবং অসৎপথ হইতে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেই জ্ঞান অনুসারেই এই শ্রেণীকরণ হইয়াছে। কিন্তু "মুকারমুন" কাহারা? তাঁহারা কেবল "দক্ষিণ হস্তের অনুচর" নহেন। তাহা হইলে তাহাদের পৃথক শ্রেণীতে রাখা হইত না। সুফিরা মনে করেন যে ইহা কেবল ঈশ্বর-পরিচালিত সৎপথের অনুবর্তিগণের বিকল্প নাম নহে—তাঁহারা 'হক্' এবং 'খাল্ক্' এর, অর্থাৎ স্রষ্টা, ভগবান্ এবং মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধ জানেন; অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাদের স্রষ্টাকে 'নাহ্' বা দেবতা বলিয়া গণ্য করেন এবং কেবলমাত্র তাঁহাকেই পূজা করেন ও তাঁহারই সাহায্যে প্রার্থনা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তিনি ছাড়া আর কেহই আমাদের ভক্তির যোগ্য নহেন বা আমাদের সাহায্য করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদেরই কুর-আণে দক্ষিণ পন্থী বলা হয়। আর যাঁহারা কতকগুলি সৃষ্ট জীবকে দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করেন এবং

ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র ধারক ও বাহক এই বিশ্বাস পরিহার করিয়া ঐ সব দেবতাদের পূজা করেন, তাঁহাদের বামপন্থী বলা হয়। যাঁহারা 'মুকরাবূন্' তাঁহারা যে কেবলমাত্র তাঁহাদের স্রষ্টাকে একমাত্র দেবতাজ্ঞান করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা নহে—তাঁহারা জগৎস্রষ্টা এবং জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ জানেন। মহাত্ সুফী সাধক শায়্খ্ শাহাবুদ্দিন সুরাবর্দী তাঁহার বিখ্যাত সুফী সঙ্কলন 'আরিফল্ স'রিফ'-এ (প্রথম অধ্যায়) বলিয়াছেন যে পবিত্র কুর্-আণে সুফী শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও সুফী শব্দের যে অর্থ তাহা 'মুকরিব' শব্দে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইবার কুর্-আণে 'হক্‌ক্' এবং 'খান্‌ক্' এই দুইটির মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ সবিস্তারে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমে স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে কুর্-আণে 'বহুত্ববাদ' শিক্ষা দেয়। 'ঐক্য-বাদের' বিরুদ্ধে খান্‌ক্ বা সৃষ্ট জীবের অপরত্ব, পৃথকত্ব এবং নানাত্বের কথা বলে। এই পার্থক্য 'বাস্তব' এবং কেবলমাত্র 'কাল্পনিক' নহে। হক্‌ক্ বা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর সত্তাবান্ এবং অসংখ্য গুণের অধিকারী। বহু, অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের সত্তাবান্ এবং গুণের অধিকারী। বাহ্যতঃ বস্তুনিচয় ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তিনি ইহাদের স্রষ্টা। কুর্-আণে বলে ঈশ্বর সব কিছুরই স্রষ্টা। মনের দিক হইতে বলিতে হইলে এই সব বস্তু ঈশ্বরের 'ভাবনিচয়' (অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞাত বস্তু)। ঈশ্বর সকল বস্তু জানেন—অর্থাৎ তাহাদের সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তিনি তাহাদের জানিতেন। তাহাদের সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার অন্তরে উহারা 'ভাব' হিসাবে ছিল :

'এবং তিনি সব কিছু-ই জানেন।'

স্রষ্টা এবং সৃষ্ট, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই দুইয়ের সম্বন্ধ 'অভিন্নতার' নহে, বরং স্পষ্টতঃই 'ভেদ' বা 'ভিন্নতার' সম্বন্ধ। যেমন, শিল্পী হয়ত কুকুরের ধারণা কল্পনা করিলেন এবং তাহার পর পটে উহা অঙ্কন করিলেন। এই ধারণা তাঁহার মনে আছে এবং মানসিক অস্তিত্বের জন্য উহা তাঁহার মনের উপর নির্ভরশীল। শিল্পীর মন হইল এই ধারণার বাহক; কিন্তু জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, মন এবং ধারণা, কোন অর্থে-ই অভিন্ন নহে। শিল্পী কুকুর নহেন এবং কুকুরও শিল্পী নহেন। উহাদের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ-ই 'পৃথকত্বের' সম্বন্ধ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জাগতিক বস্তু ঈশ্বরের ধারণা মাত্র। শাশ্বতকাল হইতে ঈশ্বর জ্ঞাতা এবং তাঁহার জ্ঞানের বস্তু অর্থাৎ তাঁহার ভাবধারা তিনি জানেন। সুফিগণ বলেন যে বস্তুর সারধর্ম হইল ঈশ্বরের ভাব এবং উহা যখন প্রকাশিত বা

সৃষ্ট হয়, তখন উহাদের বাহ্য বস্তু বা সৃষ্ট বস্তু বা কেবলমাত্র জাগতিক বস্তু বলা হয়।

বস্তুর আভ্যন্তরীন দিক হইতে অর্থাৎ ঈশ্বরের মানসিক ধারণা বা সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাউক। ধারণা বা ভাব হিসাবে বস্তু সমূহ ঈশ্বরের সারধর্ম বা **খাত্‌** হইতে অভিন্ন হয়। জ্ঞাতা বা ঈশ্বর এবং তাঁহাদের ভাব বা জ্ঞেয়, এই দুইয়ের পার্থক্য কি? সংক্ষেপে ইহা এইভাবে বলা যাইতে পারে:

জ্ঞেয়	জ্ঞাতা
১) ইহার একটী সসীম আকার, বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব থাকে।	(১) ইহার কোন সীমা বা বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা আকারহীন।
২) ইহা জ্ঞাতার মানসিক বৃত্তি এবং ইহার কোন স্বাধীন সত্তা নাই। স্থফীরা ইহাকে "আপেক্ষিক অসৎ" বলেন।	(২) ইহা ঈশ্বরেই অধিষ্ঠিত এবং অপর কিছুর উপর নির্ভরশীল নহে।
(৩) জীবনীশক্তি, জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি কোন গুণ নাই: তবে এই সব অর্জনের ক্ষমতা আছে।	(৩) ইহা প্রাণ, জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি, শ্রুতি, দৃষ্টি এবং বাক্‌শক্তি এই সব গুণের অধিকারী (ইহারা ঈশ্বরের মুখ্য গুণ)।
(৪) ইহা ক্রিয়া হীন। ইহার কোন অস্তিত্ব বা সৎগুণ না থাকার জন্য ইহার কোন নিজস্ব কার্য শক্তি নাই।	(৪) ইহা সক্রিয়।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়-এর সম্বন্ধ পৃথক্‌ত্বের সম্বন্ধ, ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ নহে। বস্তুর—সারধর্ম হইল ঈশ্বরের ভাব এবং ইহা তাঁহারই ন্যায় শাশ্বত। ঈশ্বর এক, তাঁহার ভাব বহু। ঈশ্বর স্বাধীন এবং তাঁহার ভাব তাঁহারই মনের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের সারধর্মের কোন সীমা বা নিয়ন্ত্রণ নাই, যদিও তাঁহার ভাব অসংখ্য, তাহা হইলেও তাহারা সসীম আকার ধারণ করে এবং তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকে কুর্‌-আণে ইহাদের শাকিলাৎ বলে।

যদি ভাব বা সারধর্ম ঈশ্বরেতর হয়, তাহা হইলে ভাবের বাহ্য প্রকাশকেও ঈশ্বরেতর বলিতে হয়। তাঁহার স্বরূপে বা বস্তু স্বরূপে যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাকে ঈশ্বর বাহ্যরূপ দান করেন। ঈশ্বর বস্তুর সীমা ও গুণকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান থাকেন। কোরাণে বলে:

"তিনি কোন বস্তুর সদৃশ নহেন :
তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা।"

আবার :

"ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা বর্ধিত হউক : যে সব গুণ তাঁহাতে ন্যস্ত হয়, তিনি তাহাদের ঊর্ধ্বে।" ঈশ্বরের সারধর্ম বা ধাত্ স্বাধীন বলিয়া ইহা সকল নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। যেহেতু সকল জাগতিক বস্তুই স্বরূপতঃ নিয়ন্ত্রিত, সেই হেতু "ঈশ্বর কোন কিছুর প্রতিকৃতি হইতে পারেন না।" এবং "তাঁহাতে যাহা আরোপিত হয়, তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।" ঈশ্বরের সহিত বস্তুর একত্ব কি করিয়া সাধিত হয়? স্রষ্টা এবং সৃষ্ট কি করিয়া এক হইতে পারে? স্বরূপতঃ ঈশ্বর বস্তু হইতে ভিন্ন এবং এই পার্থক্য কাল্পনিক নহে, ইহা বাস্তব। এই পার্থক্য মূলগত, কারণ ঈশ্বরের সারধর্ম বস্তুর সারধর্ম হইতে পৃথক। ঈশ্বর কোন সৃষ্ট জীবের সহিত তুলনীয় নহেন। তিনি বিশ্বাতীত, কারণ জগৎ প্রপঞ্চের সাপেক্ষ, সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন বস্তুর তুলনায় তিনি আত্ম-জাত, স্বয়ম্ভূ, সৎ, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তিনি অজ্ঞাত, অকথনীয় এবং প্রমাণসাপেক্ষ নহেন—এই অর্থেও তিনি বিশ্বাতীত। কুর্-আনে বলে :

"ঈশ্বর তাঁহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন।"

এক, বিশ্বাতীত অতুলনীয় ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের বহুত্বের সম্বন্ধ ধর্মবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ভাবে ব্যক্ত করা যায় :

এক	বহু
খালিক্ (স্রষ্টা)	মখলুক্ (সৃষ্ট)
রব্ব্ (প্রভু)	মরবুব্ (দাস)
ইলাহ্ (পূজ্য)	মালুহ্ (পূজারী)
মালিক (প্রভু)	মুমলূক (ভৃত্য)

এই মতবাদ যত দূর ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই অনুসারে মানুষ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। যাঁহারা ঐস্লামিক রহস্যবাদকে সর্বেশ্বরবাদের রূপান্তর ভাবেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ঐরূপ মনে করিয়া থাকেন।

বহুত্ববাদ অনুসারে ঈশ্বরের সারধর্ম সৃষ্টজীবের সারধর্ম হইতে পৃথক এবং ঐ দুইয়ের মধ্যে 'অপরত্বের' সম্বন্ধ বিদ্যমান। আবার কুর্-আনের মত বহুত্ববাদ ঐক্যবাদের বিরোধিতা করে না, সুফিদের এই মতও সত্য। আপাতদৃষ্টিতে দুইটি বিরুদ্ধ মতের সম্বন্ধ হিসাবে ইহা এক অদ্ভুত মতবাদ বলিয়া মনে হয়।

এইবার আমি কুর্-আণে যেমন বর্ণিত আছে, সেইভাবে ঐক্যবাদের বর্ণনা করিব।

কুর্-আণে বলে ঈশ্বর সর্ববস্তুতে বিরাজমান। এই ব্যাপকতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নানাভাবে করা হইয়াছে। ঈশ্বর ও মানুষের সামীপ্য নিম্নলিখিত সূত্রে দেখান হইয়াছে:

"আমরা মানুষের শিরা অপেক্ষাও তাহার নিকটতর।"

"তুমি যাহা এবং যাহা দেখ না তাহা অপেক্ষাও আমরা তাহার নিকটতর।" (৫৬ তম, ৮৫)

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখান হইয়াছে:—

"পূর্ব এবং পশ্চিম সবই ঈশ্বরাধিকারভুক্ত, তুমি যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে; কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ।" (২য়, ১১১৫)

"ঈশ্বর সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন।" (৪র্থ, ১২৬)

"তুমি যেখানেই থাক, ঈশ্বর তোমার সহিত আছেন।" (৫৭তম, ৪)

"তিনি আদি এবং অন্ত, বাহ্য এবং আন্তর এবং তিনি সবই জানেন।" (৫৭তম, ২)।

ঈশ্বরের নৈকট্য, সামীপ্য, সর্বব্যাপিত্ব, বাহ্যপ্রকাশ অন্তরবস্থা এবং ব্যাপকতাকে কি ভাবে বুঝিতে হইবে? তাঁহার এই বিশ্বাতীত অবস্থার সহিত বিশ্বব্যাপ্ত অবস্থার কিরূপে সমন্বয় করা যাইবে? ঈশ্বর যদি বস্তু হইতে পৃথক হ'ন, তাহা হইলে তিনি কি করিয়া সকল বস্তুর আদি ও অন্ত, আন্তর ও বাহ্যাবস্থা হইতে পারেন? ইহার জন্য সমস্যাটির তাত্ত্বিক পট-ভূমির জ্ঞান প্রয়োজন। পুনরুক্তির দোষ হইলেও সমগ্র বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিব।

সুফিরা বিশ্বাস করেন যে কুর্-আণের মতে ঈশ্বর সৎ এবং সর্বজ্ঞ। জ্ঞাতা বলিতে 'জ্ঞান' এবং 'জ্ঞেয় পদার্থ' বুঝায়। ঈশ্বর তাঁহার নিজের ভাব জানেন; এইগুলিই তাঁহার জ্ঞানের বিষয়বস্তু। যদি ঈশ্বরের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় (এবং ইহা সম্পূর্ণ বলিয়াই ধরা হয়), তাঁহার ভাব (জ্ঞানের বিষয়বস্তু) সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ। ঈশ্বর জ্ঞানের অধিকারী, শাশ্বতকাল হইতে তিনি জ্ঞাতা। অতএব তাঁহার ভাব শাশ্বত এবং অজ। জ্ঞান ঈশ্বরের গুণ এবং তাঁহার হইতে পৃথক করা যায় না। ইহা ঈশ্বরের সারধর্ম। যেহেতু ঈশ্বর অজ, তাঁহার জ্ঞানও অজ। এই পার্থক্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের ঐক্য নষ্ট করে না; কিন্তু ইহা বস্তুর অর্থাৎ পরমসত্তা

আমাদের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হ'ন তাহার সার ধর্ম। ইবন্-অল্ অরবী বলেন, "বিবর্তনের মূলে আছে ত্রিবৃত্তি।"

ঈশ্বরের ভাব দর্শনের পরিভাষায় বলা হয় 'সারধর্ম'। সারধর্মগুলি প্রথমতঃ অজ এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়। ইহারা বস্তুর উপাদান। প্রতি সারধর্মেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ আছে। কুর্-আণে এইগুলিকে 'শাকিলাৎ' বলা হয়।

যেহেতু এই সারধর্ম অজ এবং অপরিবর্তনীয়, ইহাদের বৈশিষ্ট্যও অজ এবং অপরিবর্তনীয়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সৃষ্টি ঈশ্বরের ভাবনার বাহ্যপ্রকাশ বা বাস্তবে পরিণত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব হইল যে ঈশ্বর নিজের ভাবের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করেন। এইভাবে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া ঈশ্বর যেমন ছিলেন, আছেন বা থাকিবেন, সেই ভাবেই থাকেন। ঈশ্বর প্রকাশ করিতেছেন, অথচ নিজেকে সংরক্ষণ করিতেছেন; তিনি নিজেকে বহুধা বিভক্ত করিতেছেন, অথচ এক থাকিতেছেন। যে দ্রব্যের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন, সেই দ্রব্যের 'প্রবণতা' অনুসারে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার গুণগুলি ভাবরাশি বা আকার বা উপাদানগুলির উপর অর্পণ করেন এবং সেইগুলি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। দ্রব্যের সারধর্ম অস্তিত্ববিহীন, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরের জ্ঞান বা ভাবের বৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তিনি আদি এবং অন্ত, বাহ্য এবং আন্তর। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই সময়ও যাহা অব্যক্ত রহিল, সবকিছুরই তিনি অন্তর্নিহিত সত্তা। "তিনি আদি এবং অন্ত, বাহ্য এবং আন্তর, এবং তিনি সর্বজ্ঞ"—কুর্-আণের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া মহম্মদ বলিয়াছেন, "(হে ঈশ্বর), তুমিই বাহ্য প্রকাশ এবং তোমার উপরে কিছু নাই; তুমিই অন্তঃস্থ এবং তোমার নিম্নে কিছু নাই; তুমিই আদি এবং তোমার পূর্বে কিছু ছিল না; তুমিই অন্ত এবং তোমার পরে কিছু নাই।"

বিভিন্ন বস্তুর রূপের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি সকল বস্তুর আদি এবং বাহ্য ও আন্তর অবস্থা হইয়াছেন। এইরূপেই তাঁহার নৈকট্য, সামীপ্য, সর্বব্যাপিত্ব অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্যাপকতা বুঝা যায়। একজন বিখ্যাত ভারতীয় সুফি নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিদ্বয়ে সমগ্র বিষয়টা সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"সেই একই অতুলনীয় আদি সত্তার কাহারও সহিত তুলনার অবকাশ না

থাকিলেও সকল বস্তুর মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছেন।" ইবূন্‌-অল্‌ অরবী বলিয়াছেন, "ঈশ্বর জয় হউক! তিনি সকল জাগতিক বস্তুর সারধর্ম হইয়া সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সকল বস্তুরই উৎপত্তি যখন সর্বদ্রব্যের আদিসত্তা বা ঈশ্বর হইতে, তখন স্বভাবতঃই ইহা বুঝা যায় যে সকল গুণই, অর্থাৎ, জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন এবং বাক্‌শক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরেই আছে। 'আবদল্‌ করীম জীলী বলিয়াছেন, "যখন স্ুফি ঈশ্বরের তাৎপর্য বুঝেন, তখন তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাহা বুঝিতে পারেন"[৭], তখন তাঁহার উপলব্ধি হয় যে তিনি শ্রবণ করিতেছেন মানে ঈশ্বর শ্রবণ করিতেছেন, তিনি দর্শন করিতেছেন, ইহার অর্থ ঈশ্বর দর্শন করিতেছেন, তাঁহার বাক্‌শক্তি ঈশ্বরের বাক্‌ শক্তি, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের জীবন, তাঁহার জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা, ও তাঁহার শক্তি ঈশ্বরের শক্তি; এবং তিনি স্বভাবতঃই এই সকল মনের অধিকারী। তিনি ইহা জানেন যে উপর্যুক্ত এই সব গুণের প্রকৃত অধিকারী ঈশ্বর, এবং এইগুলি ঋণ লইয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে।"[৮] (এই মতবাদকে বলা হয় তৌহীদ-ই-ষিফাতী এবং ইহা তৌহীদ্‌-ই-ধাতী এই মতবাদের অপরিহার্য ফল)।

গুণগুলি কার্যে রত হয়। গুণগুলি যদি বাস্তবিকই ঈশ্বরে থাকে, তাহা হইলে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হয়, যে একমাত্র ঈশ্বরই কর্তা।

কুর্‌-আণের মতে বস্তুর সারধর্ম সমুদয় হইতে সত্তা ও গুণগুলিকে যেমন পৃথক করি, সেইরূপ ক্রিয়াগুলিকেও উহাদের হইতে পৃথক করি। (তৌহীদ্‌-ই-ফে'লী)। একমাত্র ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব আছে, তিনিই গুণের অধিকারী এবং তিনিই প্রকৃত কর্তা। "স্বর্গ-মর্ত্যের সকল বস্তুরই"[৯] অধিকারী ঈশ্বর। তিনিই একমাত্র প্রভু ও জগতাধিপতি। (তৌহিদ্‌-ফি-অল্‌-অথার)।

'হক্‌' ও 'খল্‌ক্‌' এর মধ্যে ইহাই হইল পার্থক্য। জ্ঞাতা (হক্‌ বা সত্তা) জ্ঞেয় (বা খল্‌ক্‌) এর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং জ্ঞেয় পদার্থের সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। জ্ঞাতারই অস্তিত্ব আছে এবং ইহাই হইল প্রকৃত সত্তা। সত্তা ও অস্তিত্ব-এর মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নাই। তত্ত্বতঃ একটিমাত্র সত্তা আছে।

সত্তা এক, কিন্তু সারধর্ম বহু। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সারধর্মগুলি বিশ্বজ্ঞাতার ভাবধর্ম। জ্ঞাতার ন্যায় ইহারাও চিরনিত্য। ইহারা অজ। যদি ভাবসমূহ জ্ঞাতার দ্বারা সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর তাহাদের অধিকারী হইতেন না। তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় যে ঈশ্বর উহাদের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। ঈশ্বরকে

কেহই কোন সময় অজ্ঞ মনে করে না। ভাবসমূহ লইয়াই ঈশ্বরের জ্ঞানরাজ্য এবং তাঁহা হইতে উহাদের পৃথক করা যায় না। আবার ভাবরাশি ঈশ্বরের সহিত সমতুল্য নহে। পূর্বোক্ত কারণবশতঃ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়-এর মধ্যে 'পরত্বের' (তাদাত্ম্যের নহে) সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইহার জন্য অপর কোন বাহ্য সত্তায় বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই, কারণ ভাবের কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিত্তে তাহাদের অধিষ্ঠান আছে।

যদি ভাবনিচয় বা সারধর্ম ঈশ্বর হইতে 'পৃথক' এবং সসীম হয়, তাহা হইলে বস্তুসমূহ ঈশ্বরের ভাবনার বাহ্যপ্রকাশ হিসাবে ঈশ্বর হইতে পৃথক। সেইজন্য কুর্-আণে তাহাদের 'ঈশ্বরেতর' বলা হয়। (বহুত্ববাদ—সারধর্মের বহুত্ব)।

সত্তার মধ্যে ঐক্য আছে : কিন্তু সারধর্মের মধ্যে বহুত্ব আছে। যিনি তাঁহার ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিয়াছেন, তিনি গূঢ় অর্থে সুফি। সুফি জানেন যে স্বরূপতঃ তিনি ঈশ্বরের অন্তরের ভাবমাত্র। ভাব হিসাবে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমভাবে নিত্য; বাহ্যতঃ তিনি সৃষ্ট জীব এবং তাঁহার বাহ্যরূপে ঈশ্বর সুফির প্রবৃত্তি (সংস্কার) বা শাকিলাৎ অনুসারে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন স্বাধীন সত্তা বা প্রকৃত গুণ (জীবন, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি) নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সহিত তাঁহার অস্তিত্ব বিজড়িত এবং তাঁহারই মাধ্যমে তিনি দর্শন করেন, শ্রবণ করেন ইত্যাদি। একজন সুফি বলিয়াছেন :

"যখন শাশ্বত সত্যের আলোক প্রকাশিত হয়, তখন আমি শ্রদ্ধাভরে নিজেকে হারাইয়া ফেলি। আমি কখনও সেখান হইতে নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি প্রধাবিত হই নাই। যখন আমি অহং জ্ঞান হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে পাই, আমার আত্মা মিথ্যা হইয়া যায় এবং তাহার মৃত্যু ঘটে। ঈশ্বরের সহিত মিলনে কেবল আমি তাঁহাকেই দর্শন করি। আমি যখন একাকী থাকি, তখন এই তৃপ্তি থাকে না। এই রহস্যময় মিলন আমার আত্মা হইতে অহংকে বিদূরিত করিয়াছে। দুই এক হইয়া যায়—মনঃ সংযোগের এই রহস্য লক্ষ্য কর।"[১০]

সুফি মতবাদের গূঢ় ও সহজবোধ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা দান করা হইল। এখন আমরা সুফিদের গূঢ়তত্ত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন সংক্ষেপে নির্ধারণ করিব। এ পর্যন্ত কেহই ঐস্লামিক রহস্যবাদের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা করেন নাই।

সুফি মতবাদের উপর অন্যতম পারসীক পণ্ডিত জামী বলিয়াছেন[১১] যে সুফি মতবাদের গূঢ়তত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যাকারক একজন মিশরীয় বা নুবি. ধূ'ল—নূন (হিঃ ২৪৫-২৪৬)—ইনি বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ মালিক বেন্ অনসের শিষ্য।

থূল—নূনের উপদেশাবলী বাগদাদের জুনায়দ্ (হিঃ ২৯৭) কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ হইয়াছিল। জুনায়দের মতবাদ তাঁহার শিষ্য খুরাসানের আবূ বকর্ শিব্‌লী (সন ৩৩৫) কর্তৃক সদর্পে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনিই তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সুফি মতবাদের গূঢ়তত্ত্ব 'জন-সাধারণের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রচার করিয়াছিলেন এবং সক্রেটিসের ন্যায় দর্শনকে স্বর্গ হইতে মর্তে আনয়ন করিয়াছিলেন।[১৩] এই উপদেশাবলী আবূ নসর সর্‌রাজ (সন ৩৭৮) কর্তৃক তাঁহার পুস্তক 'লুমা'-তে (আর এ নিকলসন্ কর্তৃক সম্পাদিত) এবং পরে অবু-অল্-কাসিম অল্ কোশয়রী (হিঃ ৪৩৭) কর্তৃক তাঁহার রসাইল্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম যিনি ঐশ্লামিক রহস্যবাদকে রীতিসম্মত উপায়ে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন, মহান্ রহস্যবাদী শায়খ্ মুহ্‌য়িদ্দিন ইব্‌ন্-অল্ অরবী। (জন্ম, খ্রীঃ ১১৬৪ হিঃ ৫৬০, মুর্‌সিয়া, দক্ষিণ পূর্ব স্পেন)।

ধর্মপথের যাত্রীর পক্ষে কোন গুরুর নির্দেশে চলাই সাধারণ প্রথা এবং এখনও ঐ রীতিই চলিয়া আসিতেছে। তিনিই তাঁহার শিক্ষক এবং শায়খ্, মুরশীদ্ বা পির বলিয়া কথিত হ'ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিষ্যত্বের অর্থ হইল গুরুর প্রতি একান্ত অনুবর্তিতা, কারণ তিনি পথের সন্ধান রাখেন এবং যিনি ঈশ্বর ও তাঁহার সামীপ্য (কুর্‌ব্) আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পক্ষে ব্যক্তিগত বাসনা, কামনা এবং যাহাকে স্বেচ্ছাচার (নফ্) বলা হয়, তাহাদের পরিহার (হওয়া) অন্যতম কৃচ্ছ্রসাধনরূপে প্রয়োজন। এক একজন গুরুকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়, তাহা হইতেই দরবেশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইঁহারা কখন কখন 'সাধারণ লোকের সম্প্রদায়' ভাবে থাকিয়া নিজেদের সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেন ; আবার কখন কখন একজন শয়খ্-এর অনুবর্তী হইয়া স্থায়ী সম্প্রদায়রূপে বসবাস করিতেন। ইসলামে সুফি মতবাদের বিবর্তন অনুশীলন করিতে হইলে গত কয়েক শতাব্দীতে সুফিদের যে সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সুফি মতবাদের ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে চৌদ্দটী সম্প্রদায় (খান্‌ওয়াদাহ্)।[১৪]

(১) জ্যাদিয়াহ্—আব্‌দুল ওয়াহিদ্ বেন্ জয়দ্ (জন্ম, হিঃ ১৭৭) কর্তৃক স্থাপিত। তিনি ছিলেন হাসান্ বস্‌রির (হিঃ ১১০) প্রধান শিষ্য। এই সম্প্রদায়ের মত ছিল বৈরাগ্য ও পৃথকীরণ (সংসার বর্জন)। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ হইল যে বাহ্যতঃ সকল প্রকার দৈব দুর্বিপাক হইতে নিরাসক্ত থাকিতে হইবে এবং অন্তরে কোন ক্ষতি-

পূরণের বাসনা থাকিবে না ; অর্থাৎ জাগতিক কোন ঘটনার সুযোগ লওয়া উচিত নহে, অথবা শপথ করিয়া যাহা অস্বীকার করা হইয়াছে (স্থায়ী হউক, অস্থায়ী হউক) তাহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা উচিত নহে। ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য হিসাবেই ইহা করা উচিত, অন্য কোন কারণে বা ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া ইহা করা উচিত নহে।[১৫] " 'পৃথকীকরণ' পদের অর্থ হইল সকল নামরূপ হইতে এবং সকল অবস্থায় নিজেকে পৃথক রাখিতে হইবে এবং সকল কার্যে একাত্মভাব থাকিবে—অর্থাৎ সকল কার্য ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হইবে ; ইহাতে আত্মচিন্তা থাকিবে না, কাহারও প্রতি শ্রদ্ধাবশে কিছু করা উচিত নহে বা ক্ষতিপূরণের বাসনা থাকা উচিত নহে।"[১৫]

"নির্বিকার ঈশ্বরের সহিত তিনি বিরলে বাস করেন। তাঁহার বাসনা এক হওয়ায় তিনি একাত্মভাব হইয়া থাকেন।"[১৬]

'অবুদ্-অল্ ওয়াহিদ্ বেন্ জয়দ্' ছিলেন একজন বিখ্যাত রহস্যবাদী। তিনি "অহং জ্ঞানের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়াছিলেন" এবং 'বৈরাগ্য' বা 'পৃথকীকরণ' অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-অভিমুখে রহস্যবাদের পথে যাত্রার ইহাই সর্বোচ্চ অবস্থা।

(২) ইয়াদিয়াহ—কুফার ফুদয়ান বেন্ ইয়াদ্ (হিঃ ১৮৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন অবদ্-অল্ ওয়াহিদ্ বেন জয়দ্-এর প্রধান শিষ্য। তাঁহার প্রধান মতবাদ হইল প্রেমধর্ম। তিনি বলিতেন যে প্রেমের জন্যই তিনি ঈশ্বরকে পূজা করেন ; কোনরূপ ভয় বা বাসনা লইয়া নহে। যিনি ভয় বা বাসনা লইয়া পূজা করেন, তিনি নিজেরই পূজা করেন, কারণ তাঁহার পূজার উদ্দেশ্য হইল নিজের মুক্তি বা স্বর্গ-সুখের আকাঙ্ক্ষা।[১৭] কথিত আছে যে "প্রেম যখন কোন জীবের জন্য হইয়া থাকে, তখন উহা এক প্রকার সুখ বিশেষ, আর উহা যখন জগৎ কর্তার জন্য তখন উহা আত্মবিসর্জন।" 'আত্মবিসর্জন' দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না, ইহা অহৈতুকী ভক্তি।[১৮]

(৩) অধমীয়াহ—ইব্রাহিম (জন্ম, আতহাম, হিঃ ১৬১) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ফুদ্অয়ন্ বেন্ ইয়াদ্ এর প্রধান শিষ্য। তিনি অনেকদিন ইমাম্ আবু হানিফার (হিঃ ১৫০) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যুনায়দ তাঁহাকে "জ্ঞানের চাবিকাঠি" বলিতেন। কথিত আছে ইব্রাহীম বেন অধম্ (যিনি ছিলেন বল্খের রাজার পুত্র) একবার মৃগয়ার জন্য গিয়াছিলেন। একটী কণ্ঠস্বর তাঁহাকে আদেশ করিল, "তুমি এইজন্য সৃষ্ট হও নাই এবং এই কার্যের জন্য নিয়োজিত হও নাই।" দুইবার এই কণ্ঠস্বর তাঁহাকে ডাকিল এবং তৃতীয়বারে এই আদেশ আসিল তাঁহার জিনের সম্মুখের উন্নতাংশ হইতে। তখন তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের নামে বলিতেছি যে

এবার হইতে আমি আর ঈশ্বরকে অমান্য করিব না। ঈশ্বর আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।"[১৯] তিনি এইরূপে অবস্থার প্রভাবে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, তিনি যেন ছিলেন "অন্বেষণের বস্তু" এবং ঈশ্বর হইলেন "অন্বেষণকারী।" এইভাবে যাঁহারা অবস্থার প্রভাবে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন, তাঁহারা দৈব প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন এবং এইভাবে পাশব প্রবৃত্তিগুলিও তাহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হ'ন। আবূ বক্‌র্ অল্-কলাবধী অল্ বর্‌কি-কর্তৃক-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন, এইগুলি সুন্দররূপে ইব্‌ন্ অদ্‌হম্-এর প্রধান উপদেশবাণী—"অন্বেষণকারী ও অন্বেষণের বস্তু" সম্বন্ধে মতবাদ—পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে :

"অন্বেষণকারীর চিত্ত পবিত্র। বাসনা (সংসাররূপ) গিরিসঙ্কটের পথে তাহাকে (মানুষকে) পরিচালিত করে। যে পথেই সে যাউক্, তাহার শেষ আশ্রয়স্থল হইলেন পরমেশ্বর।

"পবিত্রতা সহকারে তিনি (সাধু) কার্য করেন এবং ঐ ভাবেই তিনি পুরস্কৃত হ'ন। পবিত্রতাই তাঁহার চিত্তে আলোক প্রদান করে। অন্বেষণকারীর প্রতি তাঁহার চিত্ত নিবদ্ধ। অন্বেষণকারী স্বয়ং যাঁহাকে অন্বেষণ করেন, বাস্তবিকই তিনি অতীব ভাগ্যবান।"[২০]

(৪) অজমিয়াহ্—ইহা হবিব অজমী (হিঃ ১৫৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন হসন বসরীর প্রধান শিষ্য। "অনাসক্তি" ও "ধৈর্য"—এই দুইটীই তাঁহার মতবাদের প্রধান অঙ্গ। "যিনি কোন কিছুরই অধিকারী ন'ন এবং যাঁহার অন্তরে অধিকারের বাসনা নাই", তিনিই নিরাসক্ত। মহম্মদ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পক্ষে এই জগতের ভার মশকের পাখার ভারের ন্যায়ও নহে।"[২১] অতএব যাহা কিছু পরিত্যজ্য, সুফি তাহাই ত্যাগ করেন। ঈশ্বরই প্রেমের একমাত্র পাত্র।

(৫) তর্‌ফূরিয়াহ্—আবূ ইয়াজিদ তরফূর ইব্‌ন্ ইসা অল্-বিসটামী (হিঃ ১৬০—২৬০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইমাম্-উল্-উলমা নামেই সুপরিচিত। তিনি ইমাম জাফর সাদিকের প্রধান শিষ্য। ঈশ্বর-প্রেম মাদকতা এবং মিতাচারিতা ছিল এই সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা।

আবূ ইয়াজিদের পিতামহ ছিলেন পারসীধর্মাবলম্বী এবং পরে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। জুনয়দের মতে আবূ ইয়াজিদ্ ছিলেন আজন্ম সাধু (ওয়ালি)। আবূ ইয়াজীদ্ বলিয়াছেন, "সুফিরা হইতেছেন ঈশ্বরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট সন্তানসন্ততি স্বরূপ।"[২২]

(৬) কর্‌খিয়াহ্—ম'রূফ করখী (হিঃ ২০০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ম'রূফের

পিতা ছিলেন পারসী ধর্মাবলম্বী। ম'রূফ তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং আলি বেন্ মুসা রিজার নিকট চলিয়া আসেন এবং ইসলামধর্ম অবলম্বন করেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুফি ছিলেন। তিনি ইমাম্ মুসা রিজার প্রধান শিষ্য ছিলেন; তিনি তাঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং বিশেষ আয়াস সহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একমাত্র ম'রূফের নিকট হইতে সুফিদের ছয়টি সম্প্রদায় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। ম'রূফ্ করখী বলেন, "ধর্মের ভিত্তি হইল নিষিদ্ধ কার্য পরিহার এবং আত্মা হইতে দেহকে বিচ্ছিন্ন করা; আত্মার সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যতই তাঁহারা কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন, ততই তাঁহারা নিশ্চিত পুণ্য অর্জন করিয়াছেন।"[২৩]

(৭) সকৃঅতীয়াহ্—সরী বেন মুগাল্লিস সকৃতি (হিঃ ২৫৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন মরূফ করখীর প্রধান শিষ্য এবং বাগদাদের বিখ্যাত রহস্যবাদী জুনায়দের শয়খ্।

এই সম্প্রদায়ের প্রধান মত হইল "স্মরণ"। প্রকৃত স্মরণ হইল সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত সব কিছু ভুলিয়া যাওয়া। কুর-আণে বলে, "যখন সব কিছু ভুলিয়া যাও, তখন প্রভুকে স্মরণ রাখিও।"[২৪] অর্থাৎ যখন ঈশ্বরকে তুমি ভুলিয়া যাও নাই, তখন তুমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছ। মহম্মদ বলিয়াছেন, "নীরবধর্মী অগ্রগণ্যতা লাভ করে।" যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "নীরবধর্মী কে?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যে সব নরনারী সর্বাধিক স্মরণ করে।"[২৫] নীরবধর্মী তিনিই যাঁহার সহায়ক কেহ নাই।

(৮) জুনয়্দিয়াহ্—বাগদাদের অল্-জুনায়দ্ (হিঃ ২৯৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে তায়ুস্-উল্-উলামা (বিদ্বৎ-সমাজের ময়ূর) উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তিনিই প্রথম বিখ্যাত সুফি যিনি সুফি মতবাদের গূঢ়তত্ত্বগুলিকে সুসংবদ্ধরূপ দান করিয়াছিলেন। তিনি সরী-অল্-সকোয়তার প্রধান শিষ্য ছিলেন।

জুনায়দ্ সুফি মতবাদের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: "সৃষ্ট বস্তুর সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করা, স্বাভাবিক জীবধর্ম হইতে নিজেকে পৃথকীকরণ, মানবীয় (দুর্বল) গুণকে দমন, পাশব প্রবৃত্তির প্রলোভন পরিহার, আধ্যাত্মিক গুণের বিকাশ, তত্ত্ববিদ্যার প্রতি অনুরাগ, অমৃতত্ত্বের পক্ষে যাহা অধিকতর বিধিসঙ্গত তাহা গ্রহণ, সমগ্র সমাজকে উপদেশ দান, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মহম্মদের আদর্শ অনুসরণ।"[২৬]

জ্ঞানবাদী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে জুনায়দ বলেন, "পাত্রের বর্ণ অনুযায়ীই

জনের বর্ণ।" ইহার অর্থ হইল যে প্রকৃত জ্ঞানী প্রতি অবস্থাতেই যাহা অধিকতর সঙ্গত তাহাই করেন ; তিনি বিভিন্ন অবস্থা ধারণ করেন এবং এই কারণেই তাঁহাকে "যুগের সন্তান"[২৭] বলা হয়।

জুনায়দের গূঢ়তত্ত্ব "সহ্‌্য়" (মিতাচারিতা) এবং প্রেমধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যোগাভ্যাস অনুসরণ করিতেন। তিনি "মাদকতাবাদ" (সুক্‌র্) পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা অপ্রকৃতিস্থ, তাহাদের সঙ্গলাভের প্রয়োজন নাই।" তিনি বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসের অবস্থাতেই উচ্ছ্বাস-বাদীরা ঈশ্বরের সংস্পর্শে থাকেন। "ভাবোচ্ছ্বাস সাময়িক (জওয়াল), কিন্তু জ্ঞান স্থায়ী এবং উহা চলিয়া যায় না।"[২৮]

উপর্যুক্ত চৌদ্দটী বিখ্যাত সুফিসম্প্রদায়গুলির বাকী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমরা স্থানাভাবে দিতে পারিলাম না। আমবা কেবলমাত্র তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম।

(৯) হুবৈরিয়াহ্ : হুবৈয়ৎ-উল্-বস্‌রি (সন ২৮৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১০) চিশ্‌টিয়াহ্ : খাজা 'উলু দিন্‌ওয়ারি (সন ২৯৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১১) গরূজ রোনিয়াহ্ : আবু ইশক্ গরূজরোনি (সন ৪২৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১২) তুসিয়াহ্ : আলাউদ্দীন্ তুসি (সন ৫৬০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১৩) সুহ্‌রওয়র্দিয়াহ্—ধিয়াউদ্‌দিন্ আবু নজিব সুহ্‌রবর্দি (সন ৫৬৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১৪) ফির্দৌসিয়াহ্—নজমুদ্‌দিন্ কুবরা (সন ৬১৮) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য মহান সাধু এবং সুফি শয়খ্ আবদুল কোয়াদির জিলানির (হিঃ ৫৬১) নামোল্লেখ প্রয়োজন। তিনি কোয়াদিরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম অবস্থায় সালিক (যিনি সুলুকে প্রবেশ করিয়াছেন) নীরবে বা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ (ধিক্‌র্) করেন। ইহা দ্বারা "প্রকৃত বিশ্বাসী অন্ধকার হইতে আলোকে নীত হ'ন।"[২৯] সালিক মনে করেন যে সব কিছুই ঈশ্বরের প্রকাশ। যাহার মধ্যে ঈশ্বর নাই এমন কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেন না। দ্বিতীয় পর্যায়ে মালিক জাগতিক বস্তুর প্রতি কোন আসক্তি বোধ করেন না। তাঁহার পক্ষে ইহাদের কোন সত্তা থাকে না। "তিনি নিজের গুণাবলী পরিহার করিয়া ভগবদ্‌গুণরাজিতে বিরাজমান থাকেন।"

"দেবশক্তির প্রকাশের প্রথম আলোকেই প্রকৃতির বাহ্যরূপ লুপ্ত হইয়া যায়।" তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে চিন্তা তিরোহিত হয়। মনের

মধ্যে এক নির্বিকার ভাব দেখা যায়; সর্বভূতে সমদৃষ্টি হয় এবং ঈশ্বরকে চিন্তার অতীত মনে হয়। "যাহা হউক কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই নিমিত্ত ছিল, সে সম্বন্ধে দৃষ্টি জাগরিত হয়; এক সনাতন সত্তা বিরাজমান থাকেন।"

গজ্জালির প্রভাবে সুফি মতবাদ ইসলামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৪৫০ অব্দে তুসে গজ্জালি জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন এবং এক বিশ্বস্ত সুফী শুভানুধ্যায়ী কর্তৃক শিক্ষিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে নয়শাপুরে ইমাম্ অল্-হরময়নের শিষ্য ভাবে কাটিয়াছিল। ৪৮৪ সালে বিখ্যাত উজীর নিজাম-উল্-মুল্ক কর্তৃক বাগদাদের নিজামীয়া শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে অধ্যাপক এবং ব্যবহার শাস্ত্রের উপদেষ্টা হিসাবে গজ্জালি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়া ছিলেন। "তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুফিগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার প্রকৃত পথের যাত্রী—ঈশ্বর ব্যতীত অপর সব কিছুর সংস্পর্শ হইতে চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা এবং ঈশ্বর প্রণিধানে চিত্তকে নিমগ্ন রাখাই হইল এই পথের সুরু এবং ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করাই হইল ইহার চরম পরিণতি। গজ্জালি বলেন যে সুফিগণ দেবদূত এবং ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ অবলোকন করার অবস্থা হইতে এমন অবস্থায় উপনীত হ'ন যেখানে ভাষা নীরব হইয়া গিয়াছে এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রচেষ্টা মাত্রই ভ্রমাত্মক হইবে। তাঁহারা ঈশ্বরের এমন এক নৈকট্য লাভ করেন যে এই অবস্থাকে কেহ বলিয়াছেন হুলূল (সত্তার একীভূত হওয়া), কেহ বলিয়াছেন ইত্তিহদ্ (তাদাত্ম্য), আবার কেহ বলিয়াছেন ওয়ুসুল (মিলন), কিন্তু এ সবই হইল অনির্বচনীয় অবস্থাকে ভ্রান্ত উপায়ে বর্ণনা করা।"[৩০]

গজ্জালি সুফিমতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত রূপদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অসামান্য প্রভাবে সনাতন সুফিমতবাদ সুন্নিধর্মশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই উহা নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুফি মতবাদ পরিবর্তিত আকারে সনাতন ইসলাম ধর্মে স্থান পাইল।

সপ্ত শতাব্দীতে সুফি মতবাদ স্পেনে দেখা দেয়। প্রথম স্পেনীয় সুফি হইলেন শয়খ্ মুহ্য়িদ্-দিন মহম্মদ ইব্ন্ 'অলি (খৃঃ ১১৬৫-১২৪০; সাধারণতঃ ইব্ন্-অল্ 'অরবী অথবা প্রাচ্য ভূখণ্ডে কেবলমাত্র ইব্ন্ 'অরবী নামে পরিচিত) এবং অশ-শয়খ-উল্ আকবর (ডঃ ম্যাক্সিমাস্)-ইনি এসিয়ার বহুস্থানে পর্যটন করেন এবং দামাস্কাসে দেহ রক্ষা করেন।[৩১] অধ্যাপক ই, জি ব্রাউন বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ জলালুদ্দিন রুমী ব্যতীত কোন ঐস্লামিক রহস্যবাদী-ই প্রভাব, উদ্ভাবনীশক্তি বা

তাত্ত্বিক জটিলতার ব্যাপারে শয়খ্ মুহ্‌দ্দীনকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।"[৩২] আরব ভাষাভাষী অঞ্চলে বা পারস্যে তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক সর্বেশ্বরবাদী স্থফিই তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন্ অল্ অরবীর ফুস্থস্ অল্ হিকমের উপর কুনিয়র সদ্‌রুদ্দিন কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রুমী পর্যন্ত কতকাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। স্থফিদের মধ্যে ইরাকী (সন ৬৮৬), জামী (সন ৮৯৮), জীলী (৮১১), শবীস্তরী (সন ৭২০), কাশানী (সন ৭৩০) ইত্যাদি এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের মতবাদ, পরিভাষা এবং চিন্তাধারার মধ্যে ইব্‌ন্ অর্‌বীর নিজের বা তাঁহার শিষ্যের গ্রন্থের স্থস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। ঐশ্লামিক জগতের বাহিরে মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মাবলম্বী দার্শনিক বা রহস্যবাদীদের উপর তাঁহার প্রভাব দেখা গিয়াছিল। মঃ পনসিও মনে করেন লুল্লি এবং দান্তের মধ্যেও তাঁহার প্রভাবের চিহ্ন আছে।

ইব্‌ন্-অল্ আরবী ওয়াযুদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের মতে সমগ্র বিশ্ব ঐশীশক্তি হইতে নিঃসৃত! তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন যে আদি সত্তার নিম্নস্তরে প্রকাশের ফলে উচ্চস্তরে কোন হ্রাস ঘটে না। বাহ্য এবং আন্তর সকল প্রকাশই হইল সত্তা স্বরূপ এবং সত্তাই হইল অস্তিত্ববান্। জ্ঞানের নিম্নপর্যায়ে অস্‌মা (ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম) এবং ষিফাৎই (গুণ) হইল সত্তা।

ইব্‌ন্-অল্-অরবীর মতবাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত রহিল না। শায়খ্ রুকুনুদ্-দিন্ অলাউদ্-দয়লহ্ তাঁহার মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন সম্‌নানের অধিবাসী এবং ৬৮৭ অব্দে বগ্‌দাদে বসবাস সুরু করেন। তিনি শায়খ নূরুদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইব্‌ন্-অল্ অরবীর গ্রন্থরাশি পাঠ করেন এবং তাঁহার ফুটুহাতের উপর টীকা রচনা করেন। তিনি ছিলেন শুহুদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে জগৎ ঈশ্বরের চিন্তাস্বরূপ—উহা তাঁহা হইতে নিঃসৃত নহে। সারধর্ম হইতে সত্তা পৃথক এবং উহার বাহ্য অবস্থিতি আছে। ওয়জুদিয়াহ সম্প্রদায়ের মতে বাহ্য অস্তিত্বের অর্থ হইল ঈশ্বরেরই অবস্থিতি। শুহুদিয়া সম্প্রদায়ের মতে অদম্ (অসৎ)-এর সহিত ঈশ্বরের অস্‌মা (নাম) এবং যিফাৎ (গুণ)-এর জ্যোতির সংযোগ ঘটে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টজীবের মধ্যে বাস্তবিকই বিরাজমান, পরবর্তী সম্প্রদায়ের মতে তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে উহাদের ভিতর আছেন।

সপ্ত শতাব্দীর বিখ্যাত সুফি হইলেন স্থফি জলাল্-উদ্-দিন রুমী (৬৭২ অব্দ)। তিনি বল্‌খের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বহাউয়্যুদ্দিন ঐ সহর পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিম অভিমুখে গমণ করেন ও শেষ পর্যন্ত কুওন্যাতে স্থায়ী হ'ন; সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (৬২৮ অব্দ)। জলালুদ্দিন তাঁহার পিতার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন—ইনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আলেপ্পো ও দামাস্কাসে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার পিতার অন্যতম খ্যাতনামা শিষ্য বুর্হানুদ্দিনের প্রভাবে আসেন এবং সুফি-মতবাদের আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার গুরুর মৃত্যুর পর তিনি বিখ্যাত সাধু শাম্‌স্‌-ই-তব্‌রীজের সংস্পর্শে আসেন। তিনি তাঁহার অন্তরে ভাবের প্রেরণা জাগান এবং অহংজ্ঞানের বন্ধন হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। শাম্‌স্‌-ই-তবরীজের মৃত্যুর পর রুমি রহস্যবাদপূর্ণ কবিতা মথ্‌নাম্নি রচনা করেন। সমগ্র ঐশ্লামিক জগতে ইহা অসাধারণ খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।[৩৪]

জলালুদ্দিন রুমী এক দরবেশ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন; ইহার নাম মওয়্‌লয়ি—ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ইহাদের বলিতেন 'নৃত্যশীল দরবেশ।' রুমীর বিশেষ মতবাদ হইল 'ঈশ্বরের সামীপ্য।' তিনি বলেন যে শূন্যে উত্থানদ্বারা ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করা যায় না—আত্ম-অবলুপ্তি দ্বারা ইহা পাওয়া যায়। অবলুপ্তির মধ্যে সত্যরত্নের আগার নিহিত আছে। "অহংজ্ঞানে গর্বিত মানুষ, তুমি জান না আত্ম-অবলুপ্তির প্রকৃত অর্থ কি।"[৩৫]

তিনি আবার বলিয়াছেন: "সূর্য যখন পূর্বে উদিত হয়, তখন রাত্রির বা তারকারাজির কোন চিহ্ন থাকে না। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্নিধি কামনা করেন, তাঁহাদের অবস্থাও অনুরূপ। যখন ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়, প্রার্থীর অস্তিত্ব তখন অবলুপ্ত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলে ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয়—অর্থাৎ তিনি আছেন আবার নেই। অনস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্ব সত্যই এক আশ্চর্য ঘটনা।"[৩৬]

এই অবস্থা অদ্ভুত মনে হইলেও কতকাংশে ইহা বোধ্যগম্য হয়, যদি আমরা মনে রাখি যে ঈশ্বরের সন্নিধিতে অর্থাৎ সুফি পরিভাষায় যাহাকে ফণা বলে, সেই অবস্থায় প্রার্থীর নিজস্ব সত্তা অক্ষুন্ন থাকে। আমরা জানি যে স্বরূপত: তিনি ঈশ্বরের অন্তরের ভাব বিশেষ এবং মন বা জ্ঞাতা হইতে ভাব বিভিন্ন; অর্থাৎ প্রার্থী (ভাব) ঈশ্বর (জ্ঞাতা) হইতে পারেন না এবং ঈশ্বর (জ্ঞাতা) প্রার্থী (ভাব) হইতে পারেন না। সারধর্মের কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা হইতেছে স্বরূপ পরিণাম। সৃষ্টির পূর্বে প্রার্থী ছিলেন ঈশ্বরের অন্তরের ভাব এবং ফণার অবস্থায় তিনি পূর্বে যে অবস্থায় ঈশ্বরের অন্তরে ছিলেন,

অর্থাৎ ভাবের অবস্থা, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। একমাত্র ঈশ্বরই তখন বিরাজমান থাকেন।[৩৭]

বর্তমান ভারতে আমরা চারিটী স্থফি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখিতে পাই। এই সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিতে পারি। প্রথমটী হইতেছে চিস্টিয়া সম্প্রদায়—হিজরী সপ্ত শতাব্দীতে ইহার অভ্যুত্থান হয়। সিজিস্তানের অধিবাসী খাজা মুইনুদ্দিন চিস্টি সিজিসি (৬৩৩ অব্দ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা চিল্লী অভ্যাস করেন, অর্থাৎ একটী ঘরে নিজেদের চল্লিশ দিন আবদ্ধ রাখেন স্বল্পাহার করিবেন এবং নিদ্রা পরিহার করেন। তাঁহারা শ্রবণ প্রিয় (সমা')। তাঁহাদের মতে সমা' দ্বারা চিত্ত (কুলব্) ঈশ্বরের প্রতি উন্নত হয়। ইহা নবীনদের পক্ষে শিক্ষাভূমি স্বরূপ, কারণ ইহা চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা অনন্ত সঙ্গীতের প্রভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হন—এই সঙ্গীত হইল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীত। সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত ও দাঁড়কাকের গান উভয়েই তাঁহার উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। বিখ্যাত স্থফি কবি সদি বলিয়াছেন:

> "যাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনায় রত থাকেন,
> তাঁহারা জল চালিত চাকার শব্দেও উচ্ছ্বাসে নিমগ্ন হ'ন।"

কিন্তু সমার জন্য তিনটি আবশ্যকীয় উপাদান প্রয়োজন: কাল (জমান), স্থান (মকান) এবং ভ্রাতৃত্ব (ইখ্ওয়ান) কাল অর্থে বুঝায় ঈশ্বর চিন্তায় শ্রোতা যে সময় নিমগ্ন থাকেন এবং অন্য সকল চিন্তা পরিত্যাগ করেন, সেই সময়। স্থান অর্থে বুঝায় গুপ্ত স্থান যেখান হইতে সকল অপরিচিত ব্যক্তিকেই বাহিরে রাখা হয়। ভ্রাতৃত্ব বলিতে বুঝায় একই পীরের অনুগামিত্ব।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম নক্শ্বন্দিয়া। ইহা অষ্টম শতকে খাজা বহাউদ্দীন (হিঃ ৭২৮-৭৯১) কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে ভক্তিমার্গ আটটী অথবা কেহ কেহ বলেন একাদশটী। প্রথম আটটী খাজা অব্দল্ খালিক্ খজদওয়ানি (খাজা বাহাউদ্দীনের পীর) এবং অবশিষ্ট তিনটী খাজা নক্শবন্দ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন খাজা বাকি-বিল্লাহ্ (সন ১০১২) এবং শয়খ অহ্মদ সর্হিন্দী (সন ১০৩৫)।

কোয়াদিরিয়াহ্ সম্প্রদায়েরও ভারতে অনেক অনুগামী আছেন।

সুহ্রওয়র্দিয়াহ্ সম্প্রদায় দিয়াউদ্দিন অবু নাজীব সুহ্রওয়র্দি (৫৬৩) কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রধান শিষ্য, বিখ্যাত সুফি সঙ্কলন 'অওয়ারিফ্-উল্-ম' আরিফে'র প্রণেতা শাহাবুদ্দিন সুরাবর্দি কর্তৃক এই সম্প্রদায় পুষ্ট হইয়াছিল। ইঁহাদেরও ভারতে বহু অনুগামী আছেন।

শুহুদিয়াহ্ সম্প্রদায়ভুক্ত এক সাধু আহ্মদ্ সরহিন্দীর নেতৃত্বে বর্তমান কালে ভারতে সুফি মতবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। তিনি মুজ্দ্দিদ্-ই-অল্ফ্-ই-থানি (ইসলামের নবজাগরয়িতা অথবা ঐস্লামিক যুগের দ্বিতীয় সহস্রের প্রধান) নামে পরিচিত। তিনি ভারতে নক্শ্বন্দিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। তিনি খাজা বাকি বিল্লাহের (হিঃ ১০১২) প্রধান শিষ্য। আমরা পূর্বে ওয়্জুদিয়াহ্ এবং শুহুদিয়াহ্ সম্প্রদায়ের মত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ববর্তীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল এমন অনেক উচ্চতর মার্গ ও অবস্থার বর্ণনা দ্বারা মুজদ্দিদ্ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ব্যাপকতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল মক্তু বাৎ।[৩৮]

পাদটীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

(অন্য কোন নির্দেশ না থাকিলে বর্তমান অধ্যায়ের সকল 'সন'কে হিজরী অব্দ বুঝিতে হইবে)।

১। দি ডক্ট্রিন্ অব্ দি সুফীস্ বা কিতাব অল্ ট' অরুফ লিমাদ্ধব্ অহ্ল্ অল্—তাষঅয়ুফ; আবু বক্র্ অল্ কলাবধির মূল আরবী হইতে আর্থার জন্ আরবেরি কর্তৃক অনূদিত, কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্, ১৯৩০, পৃঃ ৫। পরে ডঃসুঃ রূপে উল্লিখিত।

২। ঐ, পৃঃ ৯

৩। ঐ, পৃঃ ১০

৪। কুর্-আণ্ সুরা ২য়, ১২৯

৫। কুর্-আণ, সুঃ ২৯ তম, ৬৯

৬। কুর্-আণ্ সুঃ ৫ম, ৩৮

৭। তুঃ 'হদিথ্-অ-কুর্বে নয়ফিল' নামক লোকোক্তি: "আমি তাহারই হইয়া শুনিতেছি, দেখিতেছি এবং কার্য করিতেছি যাহার ফলে আমারই মাধ্যমে সে শুনিতে পায় এবং আমারই মাধ্যমে সে দেখিতে পায়" ইত্যাদি।

৮। জিলি-রচিত ইন্সান্-ই—কামিল (কায়রো সংস্করণ)। ডঃ নিক্ল্সন্ কর্তৃক তাঁহার "ষ্টাডিজ্ ইন্ ইস্লামিক মিষ্টিসিজ্ম্" গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৩।

৯। স্থ: ২য়, ২৫৫

১০। ড:স্থ:, পৃ: ১১৮

১১। নফহাত্ অল্ উন্‌স্, নওল কিশোর প্রেস্ লক্ষ্ণৌ, পৃ: ২৩।

১২। ঐ

১৩। কথিত আছে জুনয়দ্ শিব্‌লিকে বলিয়াছিলেন: "আমরা সযত্নে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম এবং তাহার পর ইহা একান্ত সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আসিয়া লোকসমক্ষে ইহা প্রচার করিয়াছ।" (ড:স্থ:, পৃ: ১৪৭)।

১৪। এই সব সম্প্রদায়ের বিশদ্ বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য মুজাফ্‌ফর্ অলি শাহ্ রচিত জওহর ঘয়বী, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ১৮৮৭। শাহ্ ওয়ালি-উল্লা-রচিত হু'মাৎ ও ইন্তিবাহ্ ফী সলাসিলি আউলিয়া তুলনীয়।

১৫। ড: স্থ:, পৃ: ১০৪

১৬। ঐ, পৃ: ১০৫

১৭। নফাহৎ অল্ উন্‌স্, পৃ: ২৬।

১৮। ড: স্থ: ১০২

১৯। নফাহাৎ অল্ উন্‌স্, পৃ: ২৮। এই গল্প কুশ্-অয়রী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রিসালাহ্ (কায়্‌রো, ১২৮৪), পৃ: ১০। ইব্রাহিম্ বেন্ অধাম্ এবং পূর্ণজীবনী ইব্‌ন্ অসাকির্ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে; তারিখ্ দিমশ্‌ক্ (দামাস্কাস, ১৩৩০), পৃ: ১৬৭ এইচ।

২০। ড:সু:, পৃ: ১৪৩

২১। ওয়েন্ সিল্‌ক্, 'কন্‌কর্ডান্‌স্, পৃ: ২০০।

২২। ড:সু:, পৃ: ৮১

২৩। ঐ, পৃ: ৯০

২৪। স্থ:, ২৮ তম, ২৪

২৫। ড :স্থ:, পৃ: ৯৫

২৬। ঐ, পৃ: ৯৫

২৭। ঐ, পৃ: ১৩৯

২৮। ঐ, পৃ: ১০৬

২৯। স্থ: ২য়, ২৫৭

৩০। তু: গজ্জালির বিখ্যাত গ্রন্থ অল্-মুন-জিধ্ মির্-অল্-দলাল (ভ্রান্তি

হইতে মুক্তিদাতা)। ম্যাক্ডোনাল্ড ইহাকে "ঐশ্লামিক বিশ্বাসের সমর্থনকারী এক অপূর্ব গ্রন্থ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (ডি, বি, ম্যাক্ডোনাল্ড রচিত "ডেভালপ্-মেণ্ট অব্ মুস্লিম্ থিওলজি, জুরিস্প্রুডেন্স এণ্ড্ কন্স্টিটিউশানাল থিওরি, পৃঃ ২১৬ দ্রষ্টব্য)।

৩১। স্পেনে ইনি ইব্ন্ সুরাকুআহ্ নামে পরিচিত।

৩২। লিটারারি হিষ্ট্রি অব্ পার্শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০০।

৩৩। পালাসিও রচিত 'ইস্লাম্ এণ্ড ডিভাইন কমিডি এণ্ড আবেনমাসারা দ্রষ্টব্য।

৩৪। তুঃ ও' লে আরি রচিত 'এ্যারাবিক্ থট্ এণ্ড ইট্স্ প্লেস্ ইন্ হিষ্ট্রি।'

৩৫। কুর্ব্ লে বলা জে পস্তি রফতন্ অস্ত্,
কুরব্-এ হক্ অজ্ জিস্সে হস্তি রসতন্ অস্ত্,
কর্গহ্-গজে হক্ দর্ নিস্তি খস্ত্,
গর্'রে হস্তি চে দম্ নিস্ত চিস্ত। (রুমি)

৩৬। তুঃ মথ্নবি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩

৩৭। তুঃ 'দি কন্সেপ্সন্ অব্ পাসিং এ্যাওয়ে ইন্ ইস্লামিক্ মিষ্টিসিজ্ম্' শীর্ষক প্রবন্ধ, হায়দ্রাবাদ এ্যাকাডেমি ষ্টাডিজ্ ৮ম সংখ্যা, ১৯৪৬, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য।

৩৮। মক্তুবত্-ই-ইমাম্-ই-রব্বনি (পার্শী ভাষায় রচিত) এই আখ্যা দিয়া মহম্মদ নুর আহ্মেদ কর্তৃক সম্পাদিত। (লাহোরে মুদ্রিত, ১৩৩৪)। মুজাহিদের তওহিদ্-তত্ত্বের উপর ডক্টর বি, এ, ফরিকুর নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। (এম্ আশ্রফ, লাহোর, ভারতবর্ষ)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের রহস্যবাদ

রহস্যবাদের কোন ইতিবৃত্ত নাই; কারণ, ইহা দেশকাল পরিসীমার ঊর্ধে মানবের কোন অনুভূতির সহিত সংযুক্ত। খৃষ্টের জীবনে 'রূপান্তর' বলিয়া বর্ণিত ঘটনাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি যখন জেরুজালেমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যাইতে কৃতসংকল্প হন, তখন তাঁহার তিনজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে এক পর্বতের উপর লইয়া যান এবং তাঁহাদের সম্মুখে "রূপান্তরিত" হন। তাঁহারা (শিষ্যগণ) নিজেদের অনুভূতি এক উজ্জ্বল আলোকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার (খৃষ্টের) সহিত তাঁহারা নিজেদের হিব্রুবংশের ইতিহাসে উল্লিখিত দুইজন পুরুষকে দর্শন করেন। পরস্পরের সহিত কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান থাকিলেও, আর দ্বিতীয়জন খৃষ্টের অষ্ট শতাব্দী পূর্বের হইলেও, এই দুইপুরুষের একইরূপ অনুভূতি হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই পবিত্র সিনাই পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তথায় ঈশ্বরের সহিত রহস্যঘন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। মোজেসের ক্ষেত্রে ইহা চাক্ষুস প্রত্যক্ষের অভাবাত্মক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ ঈশ্বরের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইবে না। তিনি ঈশ্বরের পৃষ্ঠভাগ দেখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যে কোন আলোক হইতেও অধিক বাঙ্ময় এক অন্ধকার তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। এলিজার ক্ষেত্রে প্রকাশটি শব্দের মাধ্যমে হইয়াছিল। তিনি এমন এক ধ্বনি শুনিয়াছিলেন যে তাহা যেন "শান্ত নীরবতার" ধ্বনি। অন্য-কথায় তিনি এমন এক নিস্তব্ধতা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন যে তাহা যে কোন ধ্বনি অপেক্ষাও অধিক গভীরভাবে সম্ভাবনাময়। খৃষ্ট ছিলেন মনুষ্যরূপে "অক্ষর" বা "জ্ঞানের" মূর্তরূপ। খৃষ্টের পূর্বে আগত এই দুইজন পুরুষ, পবিত্র পর্বতের উপরে, তৎকালেও অমূর্ত ঈশ্বরের "অক্ষরের" সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী রহস্যবাদীগণের মুখে নেতিমূলক কথাই বারে বারে আসিয়াছে। সেইন্ট্ পল বলেন যে, উচ্চারিত হইতে পারে না এমন কথা তিনি শুনিয়াছেন, আর বর্ণিত হইতে পারে না এমন দৃশ্য দেখিয়াছেন। "নব বিধানের" (New Testament) এক শতাব্দী পরে, আলেকজান্‌ড্রিয়ার ক্লিমেণ্টকে আমরা সরাসরি মোজেস্‌কে নির্দেশ করিতে দেখি, যখন তিনি অন্ধকারে ঈশ্বরানুসন্ধানের

প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন, আর বলেন যে তাঁহাকে "চিনিতে হইবে, তিনি কি, এরূপে নহে, তিনি কি নহেন, এইরূপে।" একই সংঘের লোক ওরিগেন, এই নেতিভাবের আবশ্যকতার যুক্তিপ্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনশ্চক্ষে উপরে তাকাইলেন, আর দেহবিরাগী হইয়া আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিলেই শুধু, তুমি ঈশ্বর দর্শন লাভ করিতে পার।" তিনি রহস্ত-বাদের পথে একটি বিশেষ বৃত্তি অনুধাবন করিয়াছেন আর খৃষ্টজীবনের অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঘটনাটি অধ্যাত্মজীবনের দুইটি বৃত্তির সহিত পুনঃ পুনঃ উপমিত হইয়াছে। এই ঘটনা ঘটে খৃষ্ট কর্তৃক দুই ভগ্নীর গৃহে পদার্পণ উপলক্ষে। মার্থা অতিথির সেবায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু মেরী শুধু তাঁহার পদতলে উপসন্ন হয়। তিনি (খৃষ্ট) মেরীকে "অপেক্ষাকৃত ভাল অংশ" বাছিয়া লওয়ার জন্য প্রশংসা করেন।

রোমক সভ্যতা ক্রমবর্ধমান অরাজকতায় নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এই "অপেক্ষাকৃত শ্রেয় অংশ" বাছিয়া লন এবং মরুভূমিতে আশ্রয় সন্ধান করেন। জীবনধারণের বিক্ষিপ্ততা হইতে মানুষ নির্জনে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছে; কোন কোন স্থলে কেবল সাধারণ সাপ্তাহিক উপাসনা দিয়া তাহাদের নির্জনতা দূর করিয়াছে; পরবর্তীকালে, অপর কেহ বা সর্বসাধারণের জীবন আরও বেশী মাত্রায় ভোগ করিয়াছে, কিন্তু তবুও সাধারণ একাকীত্ব বিসর্জন দেয় নাই। চতুর্থ শতাব্দীর এইরূপ প্রধান ও প্রাচীনতম সাধুদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এণ্টনী। মুরমী প্রার্থনাবাক্য বুদ্ধির বোধাকারগুলির বাহিরে বলিয়া তিনি মনে করিতেন: "যে প্রার্থনায় সাধু নিজেকে বা নিজের প্রার্থনাবাক্যকে বুঝিতে পারেন তাহা সম্পূর্ণ নহে।" ম্যাকেরিয়াস্ ইহাকে অতীব কষ্টসাধ্য দ্বাদশটি সোপান আরোহণ করার মত মনে করেন। রহস্তবাদী বর্ণনাতেও এই সোপানের প্রতীকটি পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিয়াছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত "কৃপাদ্বারা বিত্তশালী হইয়া কেহ শিখরদেশে দিবারাত্র নির্বিশেষে অবস্থান করেন, আর ঊর্ধদেশে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া বিশুদ্ধ ও মুক্ত হন" ততক্ষণ পর্যন্ত এই আরোহণ চলিতে থাকে। পরন্তু, আত্মা ও খৃষ্টের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে ম্যাকেরিয়াস্ বরবধূর উপমাও ব্যবহার করেন। ঐ উপমাটি 'পুরাতন' ও 'নূতন' এই উভয় 'বিধান' হইতেই আগত; আর বহু রহস্তবাদী লেখকই, বিশেষতঃ ক্লেয়ারভৌর বার্ণার্ড, ইহা ব্যবহার করিয়াছেন।

মরুভূমির এই ধর্মগুরুগণের অনুসৃত পদ্ধতিগুলি অনুধাবন করা শিক্ষাপ্রদ। সাধারণের নিবেদিত রবিবার-সম্বন্ধীয় অর্চনা ব্যতীত, নির্জন গুহাগৃহে তাঁহাদের

দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যে ছিল ধর্মগ্রন্থ, বিশেষতঃ স্তোত্রগ্রন্থ, হইতে আবৃত্তি করা। তাঁহাদের শরীর কঠোর সংযমে নিপীড়িত হইত; আর তালপাত্র হইতে চাটাই তৈয়ারীর কায়িক শ্রম তাঁহাদের নিত্যকর্মের অংশ ছিল। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মহান প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁহাদের জীবনযাপনের উপাদানগুলিকে অধিকতর নিয়মিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। সেইন্ট্ বেসিল্ প্রাচ্যদেশীয়দিগের জন্য একটি নক্সা প্রবর্তন করেন, যাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন বহুযুগেও হয় নাই; কিন্তু সেইন্ট্ বেনেডিক্টের উত্তরপুরুষরূপে প্রতীচ্যদেশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা-গণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং যদিও তাঁহার (বেনেডিক্টের) সম্প্রদায়টি সতেজে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, তবুও তাঁহার প্রাথমিক বিধানটি বহুভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সেইন্ট্ অগাষ্টিনের "কনফেশান্স্" পড়িয়া তাঁহাকে রহস্যবাদী বলিয়াই মনে হয়। ওরিগেন দ্বারা পূর্বে উল্লিখিত, 'কৃতিমূলক' ও 'ধ্যানমূলক' বৃত্তি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছেন। মরমীসাধকগণের অনুভূত বিভিন্ন ধরণের দর্শন ও শ্রবণের সংজ্ঞাকরণ তাঁহার অপর উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি (এই দর্শন শ্রবণের) তিন রকমের বিভাগ করেন। দেহজটিই সর্বাপেক্ষা বেশী সমালোচনার বস্তু; কারণ, ইহা অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরবশ, আর তন্নিমিত্ত ইহার ফল অনৈশ্বরিক কারণোদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এই সকল ক্ষেত্রে চাক্ষুষ বিষয় বাস্তবিকই বহির্ভাগে প্রতীয়মান হয় ও দ্রষ্টার বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কাল্পনিক দর্শনও দেহজের মতই বাস্তব; কিন্তু এখানে কল্পনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় এবং ইহা অধিকতর আন্তর অনুভব। বোধির দৃষ্টিই সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের দর্শন। ইহাতে কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু দৃশ্য বিষয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে তীব্র অনুভূতি থাকে। এই শ্রেণী স্বীকারে মনে হয় যে, যাহা সাধারণ পরিমাপের উপায় হইতে দূরতম প্রদেশে অবস্থিত, তাহাই রহস্যবাদীর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য। কোন ধর্মগুরুই যে বিভূতিসুলভ অবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা তাহার উপর নির্ভরতাকে উৎসাহ দেন নাই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐগুলিকে অগ্রগমনের প্রতীক বলিয়া মনে করা ঠিক নহে।

সেইন্ট গ্রাগরী বৃত্তির প্রশ্ন তুলিয়াছেন আর তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, ধ্যানমূলক বৃত্তিই কৃতিমূলক বৃত্তি অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট। তবুও তিনি বলেন যে, দায়িত্ব-পালনে আহুত যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ধ্যানমূলক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃতিজীবনে ফিরিয়া আসা কর্তব্য। তিনি "মিশ্র" বৃত্তি বলিয়া এক তৃতীয় প্রকার

বৃত্তি স্বীকার করেন; ইহা অপর দুইটির উপরে যাইয়া উহাদের সমন্বয় ঘটাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, খৃষ্ট নিজেই তাহার দৃষ্টান্ত; কারণ, তিনিও দীর্ঘকালের নির্জনতা হইতে বহুবিধ কর্মমুখর দিনগুলিতে ফিরিয়া আসিতেন। এই স্বীকৃতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য; ইহা মরমী-সাধকের পক্ষে, বহুবিস্তৃত নেতিমূলক ভাবের বিকল্পে, ভাবমূলক ভাবে ঈশ্বরসমীপে গমন সম্ভব করিয়াছে।

প্রাচীনকালের রহস্যবাদ আলোচনা ত্যাগ করিবার পূর্বে একজনের উল্লেখ না করিলে চলে না; মনে হয় ইঁহারই প্রভাব পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী পড়িয়াছে। সম্ভবত পঞ্চশতকের শেষভাগে আবির্ভূত এই লেখকের সহিত, সেইণ্ট পলের শিষ্য ও এ্যরিওপেগাইট্, দিয়নিসাসের, ভ্রমাত্মক একীকরণই, তাঁহার উপদেশাবলীর বিশেষ গুরুত্বের কারণ। অবশ্য ইহা স্বতঃই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, রহস্যবাদীগণ যে "স্বর্গীয় তমসের" মধ্যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতে চাহেন বলিয়া দেখিয়াছি, তাহার সংজ্ঞা এখানে পাওয়া যায়। সর্ববস্তুর অজ্ঞাত কারণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধির অগোচর। সেই কারণ, সত্তার গণ্ডীর বাহিরে, দিব্যালোকে বাস করেন, আর তিনি আমাদিগের জ্ঞানযোগ্য সকল আলোকের দ্বারা রহস্যাবৃত থাকেন। জ্ঞাত সমস্ত প্রমাণের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিলেই তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি। "ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকৃত জ্ঞান।"

খৃষ্ট পরবর্তী যুগের প্রথম কয়েক শতকে মরমীয়াসাধনার প্রধান ধারাটি অনুসরণ করিবার পর, এখন ইউরোপের বিভিন্ন অংশে বা প্রদেশে ঐ ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে হয়; পরন্তু, অবশিষ্ট প্রাচ্যদেশের রহস্যবাদী ঐতিহ্যের সহিত অধিকতর নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, প্রাচ্য খৃষ্ট ধর্মের ধারাটি সুবিবেচনার সহিত অনুধাবন করা কর্তব্য।

ইটালীর কথায় সর্বাগ্রে মনে পড়ে আজিজির সেইণ্ট্ ফ্রান্সিসের কথা। তাঁহার রচনা অত্যন্ত কম, কিন্তু দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে তিনি এক উচ্চমার্গের রহস্য-বাদী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে কৃতি ও ধ্যানমূলক বৃত্তি দুইটি অবিশ্রাম, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া, সেইণ্ট্ গ্রীগরীর বর্গোল্লিখিত তৃতীয় "মিশ্র" বৃত্তিতে সমন্বিত হইয়াছিল। তিনি প্রকৃতির মধ্যে ভগবৎপ্রকাশ দর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ; আর অসুস্থতানিবন্ধন দীর্ঘ একাকীত্বের পরে, গ্রাম্যপ্রকৃতির প্রথম অনুধ্যানের সহিত তাঁহার (আধ্যাত্মিক) নবজন্মের যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার "ক্যান্টিকুল্ অব্ ব্রাদার্ সান্" পুস্তকে উৎসারিত প্রকৃতিলভ্য আনন্দের সহিত সাংসারিক দুঃখ সম্বন্ধে তীব্র সহানুভূতি যুক্ত হইয়াছে; আর "খৃষ্টের আগের" ছিল তাঁহার ধ্যানের বিষয়বস্তু।

এ্যাল্ভার্না পর্বতে তাঁহার এক চরম রহস্যঘন অনুভূতির মধ্যে, মিলিত জীবনের দিকে এই দুইধারার প্রয়াস পূর্ণ সফলতা লাভ করে। তাঁহার ক্রুশবিদ্ধের চিহ্ন গ্রহণ করার সহিত সংযুক্ত দিব্যদর্শনের প্রতীকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতীকটি ছিল এক ক্রুশবিদ্ধ দেবদূতের। স্বর্গীয় দূতগণের শ্রেণীক্রমের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন এই দেবদূত। ইহা ভগবৎ প্রেমের বিশুদ্ধ শিখা সংকেতিত করে। এই প্রতীক, "খৃষ্টের আবেগ" প্রতীকের সহিত যুক্ত হইয়া এমন এক অনুভূতির ব্যঞ্জনা করে, যাহাতে আনন্দ ও বেদনা, অনির্বচনীর তৃতীয় কিছুর মধ্যে সমাহিত হয়, আর যাহা এতদুভয়কে কুক্ষিগত করিয়াও উর্ধ্বে চলিয়া যায়।

এই ভাবাত্মক পথ ফ্রান্সিসীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। সেইন্ট ফ্রান্সিসের অনুভূতি সম্বলিত ঐ একই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বোনাভেনতুরা মনে করেন যে, দিয়নিসান্ বর্ণিত "ধীপূর্ণ তমসের" অনুসন্ধান প্রত্যেকেই করিতে পারে ; তবে ইহারও বাহিরে কিছু আছে যাহাতে শুধু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অধিকার। ফ্রান্সিসীয় টার্সিয়ারী, দান্তের মধ্যে আমরা ভাবাত্মক উপাসনার পরিষ্কার নিদর্শন পাই। "ভিতা নুয়োভা"তে তাঁহার প্রাথমিক অনুভূতি, বিয়েত্রিচের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সহিত যুক্ত হইয়াছে ; "ডিভাইন কমেডী" বর্ণিত নিরয়ের অন্ধকার পার হইবার পর, বিশেষতঃ প্যারডিসো বা স্বর্গে উচ্চতম প্রয়াণের কালে, তিনিই (বিয়েত্রিচে) তাঁহার (দান্তের) পথপ্রদর্শিকা।

দিয়নিসাসের প্রভাব সত্ত্বেও, জেনোয়ার ক্যাথারিণ, "বিশুদ্ধ প্রেমের" এক বিশেষ ভাবাত্মক মতবাদ উদ্ভাবন করেন। এই প্রেমের একবিন্দুও নিরয়ে পতিত হইলে, নিরয় স্বর্গে রূপান্তরিত হইতে পারে। উন্মুখ আত্মা এই প্রেমের অগ্নিস্রোতে অবগাহন করিতে প্রস্তুত, শুদ্ধির বেদনা ইহাতে যতই না হউক কেন। তিনি (ক্যাথারিণ) এই নীতির মধ্যে, রহস্যবাদীর পথে বেদনা ও আনন্দের ভিত্তিস্বরূপ একটি উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ প্রেম তাঁহার মনযোগ এতই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে ইহা হইতে চিত্তবিক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না ; এমনকি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য ও আত্মীয়গণের সমর্থনেও না। ইহাতে (ঐ প্রেমে) প্রত্যেকটি জ্ঞান ও কর্ম ঈশ্বরের দিকে আত্মার একাভিমুখীনতার মধ্যে বিবৃত হয়।

জেনোয়ার ক্যাথারিণ নিজ চিকিৎসালয়ের সীমিত পরিধির মধ্যে অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। সিয়েনার ক্যাথারিণ নামে অপর একজন ইতালীয়, ইউরোপীয় ঘটনাবলীতে, বিশেষতঃ বিবদমান ধর্মগুরুদের (পোপ) বিষয়ে, অত্যধিক ব্যস্ত থাকিতেন। তবু তাঁহার মধ্যে এমন এক মরমিয়ার সাক্ষাৎ মিলে যিনি সাধনমার্গের

বাধাবিঘ্নের ঊর্ধ্বে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে দ্বন্দ্ব আসে নাই এমন নহে; কিন্তু মনে হয় যে তিনি এমন এক অকলঙ্ক আত্মিক বিশুদ্ধতার অধিকারিণী ছিলেন যে, তাঁহার মধ্যে এক কুকল্পনার পালা ঘটিয়া যাইবার পর, খৃষ্ট নিজে সেই বিশুদ্ধতার সাক্ষী হইয়াছিলেন, এক দিব্যদর্শনের মধ্যে। এই কুকল্পনার দ্বারা তিনি (ক্যাথারিণ) অভিভাবিত হইলেও উহার প্রতি বাস্তবিকই তাঁহার অনুমোদন ছিল না। তাঁহার মধ্যে আমরা "আধ্যাত্মিক বিবাহের" এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই; ইহা এমন এক অনুভূতি যাহা কখন কখন মরমিয়া অনুভূতির চারিটি স্তরের শেষ স্তরে প্রবেশ নির্দেশ করে; অর্থাৎ "রূপান্তকারী মিলন" সঙ্কেতিত করে।

ইবেরিয়ান উপদ্বীপেও ফ্রান্সিসীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য পাওয়া দুর্লভ নহে। "পাদুয়া" নামে খ্যাত, পর্তুগালের সেইন্ট এ্যান্টনী গল্পকথায় এতই রহস্যাবৃত যে তাঁহার অবদানের পরিমাপ করা কঠিন। কিন্তু রামন্ লুলের রচনা পাওয়া যায়, আর ঐ রচনার নায়ক ব্লান্‌কের্ণার আত্মিক শক্তির উপরে আলোচনা, রহস্যবাদ সত্ত্বেও, স্পেন—দেশীয়গণের দার্শনিকতা ও বৈশ্লেষিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে। অবশ্য পরবর্তীকালের ফ্রান্সিসীয় সেইন্ট্ পিটার অল্‌কান্তারাকে ভাবিলে উক্ত বাক্যে সন্দেহ হইতে পারে; যদি না, মধ্যযুগ যখন নবঅভ্যুদয়ের দিকে মোড় ফিরিতেছে তখন যত রকম প্রার্থনা পদ্ধতি দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে তাঁহারটাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইত। তিনি নিজে, রহস্যবাদী প্রার্থনার তৃতীয় স্তর "দিব্যোল্লাস" সংক্রান্ত, কতকগুলি মরমিয়া ঘটনার দৃষ্টান্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, "লিগেচার" (বন্ধনী) বলিয়া বর্ণিত একপ্রকার প্রার্থনা আবৃত্তি করিবার উৎকণ্ঠা তাঁহার ক্ষেত্রে এতই প্রকট হইত যে, "মাস্"*—প্রার্থনা বাক্য বলিতে তাঁহার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিত; সাধারণতঃ উহাতে আধঘণ্টা লাগে। তাঁহার বায়ুস্তরে ঊর্ধ্বগতির প্রতি প্রবণতা তাঁহার সাহায্যকারীদিগের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিত। ইহা সত্ত্বেও তিনি ফ্রান্সিসীয় সারল্যের ধারাটি বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেন।

টমাস এ্যাকুইনাস স্পেনদেশীয় ছিলেন আর স্পেনেরই সেইন্ট্ ডমিনিক—সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পূর্বশতাব্দীতে, ক্লেয়ারভৌর বার্নার্ড-কৃত এক ভেদ তিনি তাঁহার রহস্যবাদী মতবাদে গ্রহণ করেন; আর "বিশুদ্ধ চিন্তা" ও "দিব্য-প্রকাশের" মধ্যে এই ভেদের একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য চিত্র দিয়া তিনি উহার নাম দিয়াছেন "অপচ্ছায়া" ("ফ্যান্টাস্‌মাটা")। সেইন্ট টমাস তিনটি ভিন্ন দিক স্বীকার করেন।

* "মাস্" সাধারণতঃ রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একপ্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

প্রথমটিতে "অপচ্ছায়াগুলি" মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। দ্বিতীয়টিতে উহাদের (অপচ্ছায়াগুলির) কোন মূল্য নাই, যেমন, দেহহীন আত্মার নিকট থাকে না। তৃতীয়টি এক "আনন্দঘন—দর্শন" "ঈশ্বরের অকুণ্ঠ, দর্শন"; শিক্ষার্থী আত্মার এই দর্শন হইতে পারে না। মানুষের মন তাহার সাধারণ শক্তি দিয়া শুধু পরোক্ষভাবেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি জানিতে পারে। মরমিয়ার দিব্যজ্ঞানই আধ্যাত্মিক বস্তুগুলি সাক্ষাৎভাবে গ্রহণে সক্ষম। এই সাক্ষাৎজ্ঞান শেষ পর্যন্ত, তাঁহার মত প্রতিভাবান পণ্ডিতের সতেজ অন্তঃকরণের স্বাভাবিক শক্তিগুলি ব্যবহার করিবার বাসনা দূরীভূত করিয়াছিল; তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি তাঁহার লেখনী নামাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর ইহা এতই বিখ্যাত যে বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

রহস্যবাদীদের আলোচনায় ইগ্‌না-সিয়াস্ লোয়োলার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। মানরেসাতে তাঁহার অনুভূতিই শুধু তাঁহাকে উক্ত আখ্যায় ভূষিত করিতে সমর্থ। তাঁহার "স্পিরিচুয়াল এক্‌স্‌সারসাইজেস্" নামক গ্রন্থ রহস্যবাদী ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বৈরাগ্যবাদী ধর্মতত্ত্বের উপরেই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, অপরিহার্য সঙ্কল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যে বৈরাগ্য, তাহার উৎপাদন উদ্দেশ্যে পূর্বগামী অভ্যাসগুলিই, এই পুস্তক, অনুগামীগুলির অপেক্ষা বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

ষষ্ঠশতাব্দীর ডিস্‌কালসেড্ কারমেলাইটগণের দিনই স্পেনদেশীয় অবদানের গুরুত্বপূর্ণ কাল। খুব অল্প কয়েকজন ধর্মগুরুই, এ্যাভিলার টেরেসার মত, তাঁহাদের অনুভূতির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার (টেরেসার) ও জন্ অব্ দি ক্রশ এর রচনার মধ্যে আমরা রহস্যবাদীগণের উচ্চমার্গের দিকে একটি সুসংবদ্ধ সামীপ্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সেইন্ট্ জন "তামসী রাত্রিসমূহের" মতবাদ দিয়াছেন; ইহাদের প্রথমটি ইন্দ্রিয়গ্রামকে ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া আধ্যাত্মিক মধুরতায় পর্যবসিত করে, আর জীবকে সুকঠিন কিন্তু গভীর কৃতিসাধ্য প্রেমের জন্য প্রস্তুত করে; এই প্রেম আত্মার দ্বিতীয় রাত্রির মধ্য দিয়া, জীবকে প্রেমাস্পদের সহিত গোপন মিলনের দিকে লইয়া যায়। সেইন্ট্ টেরেসার রচনায়, পিয়র পউলেন বর্ণিত, নিম্নোক্ত স্তরগুলির মধ্য দিয়া মরমী আত্মার অভিসার প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) শান্ত প্রার্থনা; (২) পূর্ণমিলন প্রার্থতা; (৩) দিব্যোল্লাস; (৪) রূপান্তরকারী মিলন। সেইন্ট্ টেরেসার সতেজ আত্মচরিতে, তাঁহার "ইন্‌টিরিয়র ক্যাসেল্" ইত্যাদি গ্রন্থের প্রমাণ, তাঁহার নিজের জীবনেই আছে বলিয়া বোধ হয়। "ফ্যান্‌টাসমাটার" বা অপচ্ছায়ার পূর্ণ অংশ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, যদিও উহাদের উপর তিনি

বেশী আস্থা স্থাপন করেন নাই। আত্মিক উত্থানে পুণ্যের ফলোৎপাদনই উন্নতির একটি প্রমাণ স্বরূপ ছিল।

টিউটন্ ধর্মগুরু, মেইষ্টার একহার্ট একজন ডমিনিক্যান ছিলেন, আর ফ্রান্সেসীয় বোনাভেনটুরা ও টমাস্ এ্যাকুইনাসের কালের কয়েক দশক পরে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন। কখন কখন তিনি মধ্যযুগীয় পণ্ডিত রহস্যবাদী বলিয়া পরিচিত, আর এ্যারিওপেগাইট্ দিয়নিসাসের নবপ্লেটোনীয় ভাবধারার দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। তিনি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম ও অনন্তসত্তা মনে করেন। "শূন্য"ই ঈশ্বরের প্রকৃষ্টতম বর্ণনা। ঈশ্বরকে অস্তিত্ববান মনে করা অপেক্ষা, ঈশ্বরই "অস্তিত্ব" মনে করা ভাল। এই মতে "সর্বেশ্বরবাদে"র দিকে একটা প্রবণতা দেখা যায়। তবুও তিনি মনে করেন যে ঐশ্বরিক সত্তা মানবের মধ্যেই বিশেষভাবে বিদ্যমান আর জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত মিলন সম্ভব; এই জ্ঞান জীবের অকিঞ্চিৎকরতার সম্বন্ধে জ্ঞান আর ইহাতে ঈশ্বরের সহিত অনবচ্ছেদের বোধ হয়। হেনরী সুসো আর টয়লার নামে একহার্টের শিষ্যদ্বয় "ঈশ্বরের মিত্র" বলিয়া পরিচিত এক সংঘ স্থাপন করেন। টয়লার বিশেষ করিয়া ফ্লেমিশ রহস্যবাদী রুইসব্রোককে প্রভাবান্বিত করেন ; ইনি (রুইস্ব্রোক) প্রেমের স্তরভেদের উপর রচনার জন্য পরিচিত। রুইসব্রোক সোপান প্রতীকের মধ্যে আত্মোন্নতির পথ পান : ইহার দ্বারা জীব কর্মমুখর জীবন হইতে, আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের মধ্য দিয়া, ধ্যানলোকের জীবনে উত্তীর্ণ হয়। তবু উচ্চতম প্রদেশেও জীব তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। "সাধারণ ভাগ্যের ভ্রাতৃসঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠাতা গ্রোট্কে রুইস্ব্রোক্ প্রভাবিত করেন। এই সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে "ইমিটেশন অব্ ক্রাইষ্ট"এর লেখকও একজন। এই পুস্তককে সরাসরি রহস্যবাদী বলা না গেলেও, ইহা অনেককে এমন মনোভাব বা আত্মিক অবস্থা লাভে সাহায্য করিয়াছে যাহা রহস্যবাদী প্রেরণার উপযোগী।

প্রথম গণ্যমান্য ইংরাজ মরমিয়াগণ তাঁহাদের অনুভূতি সঙ্গীতের ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহেন। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গদ্যে লিখিবার সময়ও ইংরাজ মরমিয়াগণ কবি হইবার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। "ক্লাউড্ অব্ আননোইঙ্"এর লেখক আবাহনী শব্দের মাধ্যমে, দিয়নিসাস্ বর্ণিত স্বর্গীয় অন্ধকার প্রয়োগ করিতেন, আর এক-স্বরযুক্ত শব্দগুলিই তাঁহার রুচি অনুযায়ী ছিল, যেমন, "গড্" (ঈশ্বর), "সিন্" (পাপ), "লাম্প্" (পিণ্ড) ইত্যাদি। ইহার দ্বারা তিনি অধিকারীদিগের মধ্যে একরূপ তদ্বর্ণিত অবস্থা উৎপন্ন করিতে চাহিতেন।

নরউইচের জুলিয়ান ঐ একই শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক বাক্যাংশগুলি কবিগণ অনুসরণ করিয়াছেন আর তাঁহার "সমস্তই ভাল হইবে" এরূপ বিশ্বাসও কম গ্রহণ করেন নাই। এই প্রাথমিক কালে, মার্জরি কেম্প নামক দুর্বোধ্য মহিলাই কবিতার দ্বারা প্রভাবিতা হন নাই বলিয়া মনে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যাম্‌ব্রিজের প্লেটোপন্থীগণ রহস্যবাদকে প্রভাবিত করিয়াছেন, আর ইহার ফল প্রধানতঃ আধিবিদ্যক কবিদের মধ্যে প্রকাশিত। ইঁহাদের মধ্যে হেনরী ভগান্ ও টমাস্ ট্রাহের্ন নিঃসন্দিগ্ধরূপে রহস্যবাদী। শেষোল্লিখিত ব্যক্তি প্রাকৃত জগতেই ঈশ্বরের সহিত রহস্যঘন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; ইহা তাঁহার সেইন্ট্ ফ্রান্সিস্-সুলভ ভাবমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি কমনীয়তা ও সজীবতা দান করিয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীতে উইলিয়ম ব্লেক মরমিয়া কাব্য-ধারাটি অব্যাহত রাখিয়াছেন, যদিও তিনি "ফ্যান্টাস্‌মাটার" (রূপচ্ছায়া) প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ; আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রিষ্টিনা রসেটিও এইরূপ ছিলেন।

সন্ন্যাসী লেখকদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে অগাষ্টিন বেকারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার "হোলী উইজডম্" পুস্তকে, ভাবময় প্রার্থনার স্তর ও সেইন্ট্ জন্ অব্ দি ক্রশ বর্ণিত প্রথম তামস রাত্রিকালের উপর টীকার জন্যই এই প্রভাব। পরবর্তী শতাব্দীতে উইলিয়ম ল, ফ্রান্সে একইরূপ কার্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া, সাধারণ জীবনের সহিত রহস্যবাদের সম্বন্ধ স্থাপনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্তমানকালে টি. এস. এলিয়ট্ ইউরোপ ও এশিয়া, এতদুভয়েরই রহস্যবাদ একত্র করিয়া এক নূতন অর্থ দিয়াছেন। তাঁহার শেষের দিকের কবিতাতেই এই ধারাটি বিশেষ প্রকট।

সেইন্ট ফ্রান্সিস্ দ্য সেলিসের পরিচালনায় বৈষয়িক ফরাসীগণ মঠের বাহিরের মানুষের জন্য মরমিয়া সাধনার পথ উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যারিসে এমন এক সময় ছিল যখন মরমিয়াসাধনা প্রায় সমাজের কেন্দ্রে ছিল; মাদাম্ আকেরী ছিলেন ইঁহাদের (সাধকদের) মুকুটহীনা সম্রাজ্ঞী। এই মহিলা বিমূর্ত জগতে বাহিত না হইয়া কোন আধ্যাত্মিক রচনা পাঠ করিতে পারিতেন না। "কমিউনিটি" নামক সমিতিভুক্ত লেখকগণও এই জগতে আত্মার দিগ দর্শনের দ্বারা সব সময়ই প্রভাবান্বিত ছিলেন। লরেন্স্ ভাই (ব্রাদার লরেন্স), "ইমিটেশনের" লেখকের মত, ততটা মরমিয়া ছিলেন না, যতটা মরমিয়া অনুভূতির জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করিতেন। তিনি ঈশ্বরের সামীপ্য-সাধনার প্রয়োজন শিক্ষা

দিয়াছেন। জেস্যুইট্ ধর্মগুরু ডি কসাডির উপদেশে এই ভাবটি আরও গভীর হইয়াছে। প্রতি মুহূর্তের সুযোগেই তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করিয়াছেন। বর্তমান কালে ডম্ জন্ চ্যাপ্‌মান্ নামক বেনেডিকটাইন্ এই মতটির প্রাধান্য দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের রহস্যবাদী ঐতিহ্যের পশ্চাতে চাহিয়া আমরা রহস্যবাদের প্রতি একটা প্রবণতা দেখিতে পাই, আর সন্ন্যাসী ও মরমী লেখকদের মধ্যে একটি মরমিয়া সাধনার পথ আবিষ্কার করি। যাঁহারা এই ঐতিহ্যের প্রধান ধারাটির বাহিরে বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদিগকে আমরা, স্পষ্টতার জন্য ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছি; কিন্তু তবুও তাঁহারা নিজেদের দিক দিয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হইতেছে, জ্যাকব্ ভোমি, মলিনস্, মাদাম গুইয়ন, এমন কি সর্বপ্রথম "কোয়েকার" বা বন্ধু, জর্জ ফক্স্।

মরুভূমিতে আর অদ্যাবধি বর্তমান প্রাথমিক সংঘপ্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রথম দশায়, মরমিয়া বোধি সৃষ্টির সাহায্যকারী মনোভাব তৈয়ার করিতে, ধর্মগ্রন্থে আবৃত্তি ও প্রচলিত প্রার্থনা, বিশেষতঃ, গির্জার বিশেষ ধরণের অর্চনাগুলি কত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিত তাহা আমরা দেখিয়াছি। সন্ন্যাসীজীবনের বিশেষ অভ্যাস অথবা জীবিকার জন্য কাজগুলির নিয়মিত অনুশীলনরূপ সাধনাও ইহার সহিত যুক্ত হইত। তথাকথিত বিশ্বাসের যুগে, ধ্যানে নিযুক্ত হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য ইহার বেশী অতি অল্পই জীবের পক্ষে প্রয়োজন হইত বলিয়া মনে হয়।

ধ্যানের বিস্তৃত পদ্ধতিগুলি আর, বিশেষ ধরণের অর্চনায় ব্যবহৃত বাচনিক প্রার্থনা হইতে ভিন্ন, মানসিক প্রার্থনা বলিয়া কথিত অন্যান্য পদ্ধতিগুলি, নব-অভ্যুদয়ের ফল বলিয়া মনে হয়। নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান পূর্বের বিশ্বাসের সারল্যকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। ধ্যানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তখন খুব বেশী মাত্রায় কৃত্রিম অনুশীলন প্রয়োজন হইতে লাগিল। প্রার্থনার পক্ষে উপযোগী বিষয়ের ধ্যানে মনোনিবেশের দ্বারা স্তববিরোধী মনোভাবগুলি অপসারিত করিয়া মনের কৃত্রিম অনুশীলন হইত। এই মনোনিবেশ উদ্ভূত স্তবক্রিয়াগুলি দিয়া আবেগ সমূহের কৃত্রিম শাসন হইত। "ইন্দ্রিয়ের রাত্রি" অনুভবের মধ্য দিয়া আবেগের শৃঙ্খলা আনিতে হইত; ইহাতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাগুলি উদ্দীপ্ত হইতে পারিত না আর যথোপযুক্ত বলিয়া গৃহীত মনোভাব প্রকাশক "কৃত্রিম কর্মের" প্রতি আত্মার চালনা হইত। এই মনোভাবগুলির মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণই সর্বাপেক্ষা

ফলবতী বিবেচিত হইত। কামনার কৃত্রিম শাসন হইত, প্রথমত ধ্যানের ও ভাবময় প্রার্থনার ফলস্বরূপ সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া, আর পরে, "সারল্যের স্তরের" মধ্যে ভগবানের প্রতি সহজ ও অচঞ্চল অভিনিবেশের মধ্য দিয়া।

মনের শাসনের স্তরকে কখন কখন "শুদ্ধিমার্গ" বলা হয়। আবেগের শাসনের স্তরকে বলা হয় "উদ্দীপন মার্গ"। কামনার শাসিত আভিমুখ্যের স্তরকে কখন কখন "অদ্বৈত মার্গ" বলা হয়। জীবগণ ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া কমবেশী ক্ষিপ্র ও নিয়মানুবর্তিভাবে এই স্তরগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হয়। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, অন্ততঃ কোন কোন ধর্মগুরু, মানসিক প্রার্থনার এই তৃতীয় স্তরকে প্রত্যেক অকপট ও ভক্তিমান জীবের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে করেন।

ইহাদের উপরে আছে মরমিয়া প্রার্থনার জগত; ইহার প্রথম স্তর "শান্ত প্রার্থনা" ক্রমিকভাবে "সারল্যের প্রার্থনা" হইতে নিঃসৃত হইতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আত্মার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভক্তের অভিনিবেশ এখানে, ঈশ্বর নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন। ইহারও উপরে আছে "পূর্ণ মিলন" যেখানে আত্মা দুর্নিবার ভাবে আকৃষ্ট হয়। ইহারাও উপরে "দিব্যোল্লাস", যাহার বিমূর্তনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে নানা রকমের অবস্থা। এই অবস্থাগুলি ইতিমধ্যে কোন কোন ধর্মগুরুর মধ্যে দেখান হইয়াছে। শেষ স্তরটি হইতেছে "রূপান্তরকারী মিলন" যাহা কখন কখন "আধ্যাত্মিক বিবাহ" রূপে দেখা দেয়। ইহাতে আত্মা "অপচ্ছায়া" হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দ্বারা অভিভূত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রায়ই কঠিন কর্মের সহিত যুক্ত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত জীবগণের ইচ্ছার মিলনই হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু আত্মার স্বাতন্ত্র্য-বিলোপকারী সম্পূর্ণ গ্রাস নহে। দিব্যদর্শনের প্রতি কামনার যে বিভিন্ন স্তরগুলি "আত্মার তামসী রাত্রি" আবরণ করিয়া রাখে, সেগুলি বহু ধর্মগুরুর মতে দৈহিক জীবনের পরপারে অবস্থিত।

খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের রহস্যবাদের প্রাচ্যে ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করি! ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে সেই প্রাথমিক শতাব্দীগুলির একই সাধারণ ধারা, যাহা, ইহা পাশ্চাত্যের সহিত ভাগ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু যেমন পাশ্চাত্যের সন্ন্যাস-যোগে বহু বিভিন্ন ধারার উদ্ভব হইয়াছিল অথচ প্রাচী একই ধারা রক্ষা করিয়াছে, তেমনই পাশ্চাত্যের মত একই ধারার বিশ্লেষণ আত্মোন্নতির বিভিন্ন স্তরভেদ, প্রাচীতে পাওয়া যায় না। ইহার একটি কারণ এই যে, পাশ্চাত্য রহস্যবাদ যেমন

খৃষ্টকেন্দ্রিক আর খৃষ্টের অনুভূতিতে আত্মার মধ্যে পুনর্জাগরিত করিতে চাহিয়াছে, তেমনই প্রাচ্য রহস্যবাদের মূল হইতেছে, দেবত্ব প্রাপ্তির কামনায় সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ভিতর হইতে বিকশিত করার জন্য "ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার" গ্রহণ।

প্রাচ্যদেশে বৈরাগ্যের একটি ঐতিহ্য বর্তমান; আর একাদশ শতাব্দী ধরিয়া ধর্মগুরুদের রচনার অংশগুলি "আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের প্রেম" নামক "ফাইলো-কালিয়া" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ বৈরাগ্যের আদর্শ বিনয় ও মানুষের অসংস্কৃত স্বভাবের আবেগ-দমন; আর ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দ্বারা সংস্কৃত হইবার জন্য উহাকে (ঐ স্বভাবকে) মুক্ত করিয়া রাখা। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা এই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আর তাঁহার অনুগ্রহে মনুষ্য মধ্যে রোপিত নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের মধ্যে দ্বৈত সন্ধানের প্রবণতা পাশ্চাত্যে যেমন পাওয়া যায়, এখানে তেমন পাওয়া যায় না। সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তরই রহস্যবাদের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য-দেশীয়গণের পথটি যে মাত্রায় ভাবাত্মক ততটা পশ্চিমে পাওয়া যায় না; যদিও উহার কিছুটা আসিসির ফ্রান্সিসের মত সাধুর মধ্যে পাওয়া যায়।

এই ঐশ্বরিক ভাবানুষঙ্গে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয় কিন্তু নষ্ট হয় না। নবধর্ম শাস্ত্রপ্রণেতা, সাইমন তাঁহার অনুভূতি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "সহসা তিনি আবির্ভূত হইলেন আর আমার সহিত অব্যক্তভাবে মিলিত হইলেন, "ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা" না করিয়া তিনি আমার অস্তিত্বের সর্বাংশে প্রবেশ করিলেন—অগ্নি যেমন লৌহকে ভেদ করে, অথবা, স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়া যেমন আলোক-স্রোত বহিয়া যায়।" মরমিয়া অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে "আলোক" কথাটি বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধারাটিতে সেইন্ট্ জন অব্ দি ক্রশের "তামসী রাত্রিগুলির" স্থান খুবই কম মনে হয়। সারোভের সেইন্ট্ সেরাফিমের একজন দর্শনপ্রার্থী সেই মহাপুরুষের স্পর্শমাত্রে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সেই মহাপুরুষের সমস্ত দেহ আলোকিত দেখিয়াছিলেন, আর ঐ আলোককে তাঁহার চতুর্দিকে জ্যোতি বিকিরণ করিতে দেখিয়াছিলেন।

গত শতাব্দীতে আবির্ভূত সারোভের এই মহাপুরুষের কথা, এই (প্রাচ্য-দেশীয়) ঐতিহ্যে মরমিয়া সাধনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এক বহু-বৎসরব্যাপী মৌনি ও কঠোর বৈরাগ্যসাধনায় লিপ্ত ছিলেন, যখন অরণ্যের প্রাণীকুলের সহিত তাহার এক মহতী ঐক্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ বৈরাগ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমরা তাঁহাকে, নিজ মঠে, আত্মার এক অদ্ভুত সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখি। এই মঠে সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

আমরা এইখানে এক ও বহুর মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান পাই, প্রেমের এক উৎসারণের মধ্যে ; আর এই প্রেম বহুর প্রয়োজন সাধনে একের সহিত যুক্ত হয়।

মরমিয়া সাধনা একটা দান বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ, কিন্তু উহা লাভ করিবার প্রস্তুতির জন্ত বৈরাগ্যসাধন রূপ উপায় রহিয়াছে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়া মরুভূমিতে প্রাথমিক ধর্মগুরুগণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ক্রমটি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্টানগণের একটি সৎসঙ্গ বা ধর্মীয় সংহতির গভীর বোধ আছে বলিয়া গীর্জার বিশেষ সমবেত অর্চনা এখানে অনেকটা কাজ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত এখানে ধর্মগ্রন্থে একেবারে ডুবিয়া থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে "নববিধানের" সমস্তটা পাঠ করা এখানকার একটি রীতি। চারিদিনের প্রত্যেকদিন এক একটি "সুসমাচার" ও সপ্তাহের বাকী কয়দিনে অন্যান্য অংশের পাঠ হয়। পবিত্র-ভাবটি মূর্ত ভাবে প্রকাশের জন্য মূর্তি, পবিত্র চিত্র প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। আর প্রয়োজন হয় "যীশুর প্রার্থনা।"

নিকোলাস বার্দায়েভ লিখিয়াছেন, " 'যীশুর প্রার্থনা' আবৃত্তি রীতিটি গোঁড়া রহস্যবাদের মর্মস্থল। এই প্রার্থনার ফলে আমাদের প্রভু যীশুখৃষ্ট আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেন আর আমাদের সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত করেন। যীশুর প্রার্থনাই ("হে প্রভু যীশুখৃষ্ট, ঈশ্বরের সন্তান, আমার মত পাপীর উপর সদয় হও।") রহস্যঘন তন্ময়তার প্রারম্ভস্থল।" ইহাকে ব্যবহার করিবার পদ্ধতিগুলি, রুশভাষা হইতে অনূদিত "দি ওয়ে অফ্ পিল্গ্রিম্" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। কোন বয়োবৃদ্ধ বা "স্টারেট্স্" এর পরিচালনায় ভক্ত প্রথমে প্রতিদিন ঐ প্রার্থনা উচ্চৈ বহুবার আবৃত্তি করিতে শিখে , অতঃপর সে মনে মনে ইহা এতবার আবৃত্তি করিতে শিখে যে ক্রমশঃ ইহা প্রত্যুষে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি আরম্ভ হইতে থাকে। অতঃপর, হৃদস্পন্দনের তালে তালে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সে ইহা আবৃত্তি করিতে শিখে। এইরূপ অভ্যাসের ফলে, ভক্তের দৈনন্দিন জীবনের সকল বাহিরের কর্মের মূলে পবিত্র নামটির প্রবাহ বহিতে থাকে। এই স্তর ব্যবহারজনিত অভ্যাসগুলি মঠের মধ্যে অনুশীলন করা যায়, আর ভক্ত তাঁহার সাধারণ ব্যবহারজীবনেও ইহার অনুশীলন করিতে পারেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে আত্মার একজন "পথপ্রদর্শকের" স্থানটি সহজেই বুঝা যায়। প্রাচ্য ঐতিহ্যে জ্ঞানবৃদ্ধের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি আরও নিকট—তুলনায় অনেকটা "গুরুর" মত। পাশ্চাত্য আশ্রমের শিক্ষার্থীগণকে সাধারণতঃ একজন" শিক্ষক-গুরুর" অধীনে রাখা হয়। প্রাচ্যদেশে এক বা দুইজন শিক্ষার্থীকে একজন অভিজ্ঞ সাধুর

সহিত যুক্ত করা হয়, যিনি কার্যতঃ তাঁহাদের আধ্যাত্মজীবনে পিতারূপে বৃত হন। সাধারণ জীবের সহিত জ্ঞানবৃক্ষের সম্বন্ধের উদাহরণ হইতেছেন সেইণ্ট, সেরাফিম্।

একজন ভারতীয় মরমীসাধক রহস্যবাদের পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সুন্দর সিং শিখ ছিলেন; খৃষ্টের গভীর রহস্যময় অনুভূতির পর তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হিমালয় পর্বতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যান। তাঁহার ভ্রমণকালে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা ও দিব্যদর্শন ছাড়া, মনে হয় তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের সান্নিধ্যবোধ হইত। তাঁহার অনুভূতিতে "তামসী রাত্রির" আপাতঃ অভাব দেখিয়া খ্যাতনামা রহস্যবাদের লেখক ফন্ হুগল্ হতবুদ্ধি হইয়াছেন। খৃষ্টীয় রহস্যবাদের প্রাচ্য ভাবধারার সহিত সামান্য পরিচয় থাকিলে, তাঁহার (হুগলের) নিজের ভাবধারার সহিত ইহার সঙ্গতি হইত বলিয়া মনে হয়। সুন্দর সিং তাঁহার ভ্রমণকালে এক গুপ্ত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের সভ্যদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইতে প্ররোচিত করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে এখনও ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের রহস্যবাদের একটি ঐতিহ্য বর্তমান; তবে এখনও উহার স্বরূপ পরীক্ষার সময় হয় নাই। পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যের ভাবধারার সহিতই ইহার অধিকতর সঙ্গতি আছে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে রহস্যবাদের বেশ খানিকটা বিস্তারের মুখে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এখন অনেকটা আশা হয়। গত দুই শতাব্দীর যুক্তিবাদ, যাহা প্রাচ্যদেশীয়গণকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই, এখন মানুষকে একটা ব্যর্থতার মধ্যে ফেলিয়া যাইতেছে। মাপ ও পরিমাণের ঊর্ধে অনেককিছুই মনুষ্যজীবনে বর্তমান। অপরদিকে, মানুষ, ধর্ম, ও জীবনের সেই সম্বন্ধের দিকে আর সহজে ফিরিতে পারিবে না, যাহা প্রায়শঃই প্রতীকধর্মী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মরমীজীবন মানুষের সত্যকারের অন্তরঙ্গ জীবন। যে এই জীবন যাপন করে তাহার নিকট দৈনন্দিন জীবনের কর্মগুলিই অসীম ও নিত্যজগতের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। ভারত, চীন ও জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্য এখন পাশ্চাত্যজগতে নূতনভাবে আলোচিত হইতেছে। নব্যপ্লেটোবাদ—যেমন প্রাথমিক খৃষ্টীয় রহস্যবাদকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, তেমনই যেন উহারা (ভারত, চীন ইত্যাদি) আগামী রহস্যবাদকে পরিপুষ্ট করে।

গ্রন্থপঞ্জী

এ মঙ্ক্ অব্ দি ইষ্টার্ণ চার্চ : অর্থডক্স স্পিরিচুয়ালিটি।
বেকার, অগষ্টাইন : হোলী উইজডম্।
বার্দায়েভ, নিকোলাস্ : ফ্রিডম্ এ্যাণ্ড্ দি স্পিরিট্।
বার্দায়েভ, নিকোলাস্ : স্পিরিট্ এ্যাণ্ড্ রিয়ালিটি।
বেট্, হেন্‌রী : নিকোলাস্ অব্ কজা।
ব্রেমণ্ড হেন্‌রী : হিষ্টরী লিটারিয়ার ডু সেন্টিমেন্ট রিলিজিয় এন ফ্রান্স।
বাট্‌লার, ডম কুথবার্ট : ওয়েষ্টার্ন মিষ্টিসিজম।
গিল্‌সান্ : ফিলসফি অব্ সেইন্ট বোনাভেনটুরো।
ইঞ্জ, ডব্লিউ. আর : ক্রিশ্চিয়ান্ মিষ্টিসিজম্।
জন্ অব্ দি ক্রশ : দি ডার্ক নাইট অব্ দি সোল্।
ইয়ুং, সি জি : মডার্ন ম্যান্ ইন্ সার্চ অব্ এ সোল।
পিয়ার্স, এ্যালিসন্ : স্প্যানিশ মিষ্টিক্‌স্।
পলাইন্, এ : দি গ্রেসেস্ অব্ ইন্টিরিয়র্ প্রেয়ার।
বোল্ট, সি. ই : দিয়নিসাস্ দি এ্যারিওপেগাইট্।
ট্রাহের্ন, টমাস্ : সেঞ্চুরিস্ অব্ মেডিটেশান।
আণ্ডারহিল্, এল্‌ভিন্ : মিষ্টিসিজম।
ফন্ হুগল, এফ. : দি মিষ্টিক্যাল্ এলিমেন্ট ইন্ রিলিজিয়ন্।
ওয়াডেল্, হেলেন : ডেজার্ট ফাদারস্।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

১। উপক্রমণিকা

পণ্ডিতীয় (Scholastic) বিচার ধারা নিঃশেষিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য দর্শন ক্রমে উহার "আধুনিক" আকার ধারণ করিয়াছিল। এই আধুনিক দৃষ্টি নবজাগরণের (Renaissance) ফল। উহার অভাবাত্মক রূপটি হইতেছে ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা; এবং উহার ভাবাত্মক রূপটি হইতেছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করা। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সপ্তদশ শতাব্দীর বৌদ্ধিক আবহাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদ ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism) এই দুইটি বিচার-ধারা একই সঙ্গে আরম্ভ হয়। উহাদের মধ্যে, দেকার্ৎ-প্রবর্তিত বুদ্ধিবাদে, পণ্ডিতীয় মতের কিয়দংশ অর্থাৎ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। কিন্তু যদিও দেকার্ৎ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত একজন খাঁটি খৃষ্টান ছিলেন, তথাপি তাহার এই শ্রদ্ধা বা আনুগত্য ধর্মযাজকদের প্রতি ছিলনা, কিন্তু তাহার আনুগত্য ছিল প্লেটোর প্রতি। মধ্যযুগে দর্শন চিন্তার জগতে, এরিষ্টটলের যে স্থান ছিল, নবজাগরণের যুগে প্লেটো সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দেকার্ৎ হইতে আরম্ভ করিয়া লাইব্‌নিজ পর্যন্ত, সর্ববুদ্ধিবাদী দার্শনিক তাহাদের দর্শন চিন্তার ভিত্তিস্থানীয় ধারণাগুলির জন্য প্লেটোর নিকটেই ঋণী। বুদ্ধিবাদীদের প্রমাণ-শাস্ত্রীয় একটি বিশিষ্ট মত এই যে, জ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থে, উহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিচার বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। এই মতটিও প্লেটোর নিকট হইতেই গৃহীত। বুদ্ধিবাদীরা এই মতের সাহায্যে, ঈশ্বর, আত্মা এবং অমরত্ব সম্বন্ধে দর্শনের যে সকল চিরন্তন সমস্যাকে প্রত্যক্ষবাদীরা শেষ পর্যন্ত অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভাবে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিচারের সহিত বুদ্ধিবাদের একটি সংযোগ সূত্র রহিয়া গেল; আর প্রত্যক্ষবাদ শেষ পর্যন্ত উভয় বিচারধারা হইতেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

তবু প্রশ্ন থাকিল : যে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গ্রীকযুগীয় চিন্তাধারার সহিত ও বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ঈশ্বরবাদের সহিত বিসঙ্গত; তাহার সম্বন্ধে কি বলা যায়?

দেকার্তের পক্ষে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করা সম্ভবপর ছিলনা। কারণ, তিনি নিজেই সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানস্রষ্টাদের অন্যতম। আবার, তিনি দার্শনিক ছিলেন বলিয়া দর্শনকে-ও পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। এই ভাবে, একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ায়, দেকাৎ´ এক উভয় সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। দেকাৎ´ অপেক্ষা অল্প প্রতিভার দার্শনিক এই সংকটে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এই সংকটে, দেকাৎ´ দর্শন ও বিজ্ঞানের দাবীগুলির সমন্বয়সাধনের সমস্যাটিকেই স্পষ্টভাবে বিচার করার সুযোগ পাইলেন। তাহার মতে দর্শনের বিষয়বস্তু হইতেছে ধর্ম ও নীতির ভিত্তিস্থানীয় ঈশ্বর, আত্মা ও অমরত্ব। সুতরাং তাহার মূল সমস্যা ছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও নীতিরও কি করিয়া সমর্থন করিতে পারা যায়। ইহা স্পষ্ট যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে এমন একটি ব্যাপক ধারণা গঠন করা আবশ্যক, যাহা বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির সহিত সুসঙ্গত হইয়া আবার একইসঙ্গে ধর্ম ও নীতিকেও যথাযোগ্য স্থান দেয়। এইরূপ প্রচেষ্টার প্রথম উদ্যোক্তারূপে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেকাৎ´ এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। আর তিনি এই মূল সমস্যাটিকে যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হইযাছে, তাহার দ্বারা আধুনিক দর্শনের এবং বিশেষভাবে বুদ্ধিবাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

(২) রেনি দেকাৎ´ (১৫৯৬-১৬৫০)

দেকার্তের নিকট ধর্ম ও নীতির- ক্ষেত্রে কোন নূতন সমস্যা দেখা দেয় নাই; কিন্তু উহাদেব তুলনায় বিজ্ঞান একটি নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, কারণ, উহা দেকাৎ´ প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদেরই সৃষ্টি। এইরূপ অবস্থায় যদি বলা হইত যে, ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের জন্য পরম্পরাগত ধারণানুযায়ী ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব এবং তৎকালীন বিজ্ঞানের ধারণানুযায়ী জড়জগতের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, তাহা হইলেই দেকার্তের মূল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি "পদ্ধতিবিষয়ক প্রবন্ধ" (A Discourse on Mathod), এবং "চিন্তা সমূহ" (Meditionas), তাহার এই দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে যে পথে এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এত সহজ ও সরল নহে। উহার কারণ এই তিনি লোকের মনে এইরূপ ধারণা উৎপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর, আত্মা ও জড়জগতের অস্তিত্ব শুধু কথায় প্রচার না করিয়া, যুক্তিদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতেছেন,

ও এইভাবে ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞানের প্রামাণ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, শুধু বিনা বিচারে মানিয়া লইতেছেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রমা সম্বন্ধে একটি নূতন প্রমাশাস্ত্রীয় মতবাদ (theory of knowledge) প্রণয়ন করেন। ইহা দর্শনের ক্ষেত্রে তাহার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। সত্তা বিষয়ক সমস্যায় তিনি যে সমাধান দিয়াছেন, তাহা এই মতবাদ হইতে যৌক্তিক নিয়মে নিগমিত হয়, অন্ততঃ এইরূপ আভাস জন্মে,—বিশেষ ভাবে এই জন্যই এই মতবাদের গুরুত্ব।

দেকার্ৎ ও অন্যান্য বিচারবাদীদের মতে, প্রমাণ করার অর্থ হইতেছে অবরোহ পদ্ধতিতে নিগমন করা। ইহা বিচারবাদী প্রমাশাস্ত্রের একটি অবশ্যম্ভাব অনুসিদ্ধান্ত। কারণ, এই প্রমাশাস্ত্রে গণিতকে সর্বপ্রকার জ্ঞানের আদর্শ অথবা উৎকৃষ্ট নমুনা বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এই মতের সমর্থনকারী দার্শনিকরা লক্ষ করেন নাই যে, বস্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিগমনকে একমাত্র পদ্ধতিরূপে ব্যবহার করা অযৌক্তিক ও অসমর্থনীয়। নিগমন প্রণালীর জন্য এমন কোন এক বা তদধিক স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক সত্য অত্যাবশ্যক, যাহা হইতে সার্বিক ও অখণ্ডনীয় সত্য সমূহ বাহির করা সম্ভবপর। সুতরাং ঈশ্বর, আত্মা ও জড়জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য দেকার্তের এমন একটি স্বপ্রমাণ ভিত্তির প্রয়োজন ছিল, যাহা হইতে তিনি এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব জ্যামিতিকাবের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নিগমন করিতে পারেন।

যে তত্ত্ব বা সত্যকে সন্দেহ করিলে স্ববিরোধ দেখা দেয় তাহা স্বপ্রমাণ। এই-রূপ স্ব-প্রমাণ সত্যের অন্বেষণে দেকার্ৎ প্রথম সোপান রূপে একপ্রকার অপসারণ পদ্ধতির (elimination) আশ্রয় লইলেন। পদ্ধতিটি এই যে- সকল প্রতিজ্ঞা স্বপ্রামাণ্যের পরীক্ষায় তিষ্ঠাইতে পারেনা, সেইগুলিকে পরিহার করিতে হইবে। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ "দেকার্তীয় সন্দেহ" পদ্ধতি। এই সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্য প্রাপ্তি। উহা সন্দেহবাদ নামক দার্শনিক মত নহে। কারণ, সন্দেহবাদে সন্দেহের মনোভাব হইতেছে তত্ত্ববিচারের শেষ ফল। অবশ্য দেকার্তীয় সন্দেহের গণ্ডী বেশ কিছু বিস্তৃত। তাহার মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সমগ্র ক্ষেত্রটিই সন্দেহের যোগ্য। কারণ হয়ত, ইন্দ্রিয় লব্ধ পদার্থসকল স্বপ্ন, ভ্রমপ্রত্যক্ষ ও চিত্ত-বিভ্রমের ন্যায় অবাস্তব। দেকার্ৎ আরও বলিলেন যে, এই সকল অবাস্তব প্রত্যক্ষের কারণ হয়ত কোন দুরাত্মা দানব, মঙ্গলময় ঈশ্বর নহেন। সুতরাং আমাদের ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসও ক্রমে সন্দেহাস্পদ হইবে। কিন্তু দেকার্তের মনে আশঙ্কা হইল যে, সন্দেহ একবার এই স্থলে উপনীত হইলে, গাণিতিক প্রতিজ্ঞা সমূহের সত্যতাও সমর্থন করা অসম্ভব। কারণ, সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে যে, তথাকথিত গাণিতিক সত্যগুলি প্রকৃত

পক্ষে ভ্রান্তি, মাত্র—ঐ দুষ্টমতি দৈত্য আমাদের মনে সেগুলিকে চাপাইয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রতারণায় আমাদের সত্যাসত্য নির্ধারণের শক্তি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা উহাদের ভ্রান্ততা বুঝিতে অক্ষম।

এই ভাবে, আমি আমার সন্দেহ অধিকারিক ক্ষেত্রে বাড়াইয়া যাইতে পারি। দেকার্ৎ বলেন যে, তথাপি "আমি সন্দেহ করি" এই কথা আমি সন্দেহ করিতে পারিনা। অর্থাৎ সন্দেহের দ্বারা সন্দেহকে দূর করা যায়না। কিন্তু সন্দেহ হইতেছে এক প্রকার চিন্তা। সুতরাং "আমি চিন্তা করি", এই কথা নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু আমি যদি অস্তিত্ববান না হই, তাহা হইলে আমার পক্ষে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্য, দেকার্তের সিদ্ধান্ত এই—"আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"। (Cogito, ergo, sum)। এখানে "অতএব" শব্দদ্বারা মনে হইতে পারে যে, আমার অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। কিন্তু দেকার্তের বক্তব্য এই যে, এখানে বাস্তবিক পক্ষে কোন রকম অনুমান করা হয় নাই। চিন্তারূপ ক্রিয়ার দ্বারা চিন্তাকারী আমার অস্তিত্বের যে নিশ্চিত নির্ধারণ, তাহা একপ্রকার প্রত্যক্ষাত্মক নিশ্চয়। কিন্তু দেকার্তের এই মন্তব্য সমর্থনীয় নহে। কারণ, তিনি যে অন্তিম নিঃসন্দিগ্ধ তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার যথাযোগ্য বর্ণনা এই : "চিন্তা নামক পদার্থ অস্তিত্ববান"। তবু হয়ত এখানে "আমি" শব্দের ব্যবহার সমর্থন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা শুধু ব্যাকরণের খাতিরে, কোন বস্তুর অস্তিত্ববাচক রূপে নহে। প্রকৃতপক্ষে দেকার্তের অন্তিম তথ্যটি "আমি চিন্তা করি"—এইরূপ নহে; কিন্তু "আমি একটা কিছু চিন্তা করি"—এইরূপ চিন্তার সহিত যেমন চিন্তক অনিবার্যভাবে জড়িত, তেমনই চিন্তিত বিষয়টিও একইরকম অনিবার্যভাবে জড়িত। তাহা ছাড়া, চিন্তকের অর্থ এমন কোন পদার্থ নহে, যাহা চিন্তা করে। চিন্তক শব্দের অর্থ বিষয়প্রত্যয়ের সহিত সম্বদ্ধ অহং-প্রত্যয় মাত্র। কিন্তু দেকার্তের মত ইহা হইতে ভিন্ন। তিনি প্রথমতঃ চিন্তাকে উহার বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ (abstract) করিয়া এই প্রত্যাহৃত পদার্থটিকে নিজ খেয়াল মত একটি গোটা তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর উহাকে পণ্ডিতীয় চিন্তাধারা অনুসারে দ্রব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দেকার্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, কোন রকমে পরম্পরাগত ধারণা অনুযায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা। তাহা ছাড়া, তিনি যে চিন্তাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া মানিলেন, ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, তাহার মনে তৎপূর্বে এই ধারণাও ছিল যে, আত্মা জড় জগৎ হইতে পৃথক। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি", তাহার এই কথাটি কোন অভিনব

তত্ত্বের বাচক নহে, কিন্তু উহাকে জড়-চেতনাত্মক দ্বৈতবাদের সত্যতা মানিয়া লইয়া, উহা হইতে নিগমন করা হইয়াছে মাত্র।

অগাষ্টিনের মতে, "আমি চিন্তা করি," ইহা হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত জ্ঞান; দেকার্তের মতে, তদুপরি উহা দর্শনের আদি তত্ত্ব-ও বটে। সুতরাং দেকার্তের মতে, আমার মন ব্যতীত অন্য সর্ব পদার্থ (যথা অন্যের মন এবং বাহ্য বস্তু) যদি আদৌ জানার যোগ্য হয়, তাহা হইলে উহারা আমার আত্মজ্ঞান হইতে পরোক্ষ ভাবেই জানা যাইবে। এইভাবে তিনি বাহ্যেন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের পূর্ববর্তিতা সিদ্ধ করিয়া, আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে আত্মকেন্দ্রীয়তা প্রবর্তন করিলেন। ইহার ফলে কিন্তু তাহার সম্মুখে একটি সমস্যা দেখা দিল, আমরা যে সাধারণতঃ মনোবাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তাহার ব্যাখ্যা কি?

দেকার্ৎ শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন যে, "আমি চিন্তা করি,"—এই কথা যে শুধু দর্শনের মূল তত্ত্ব, তাহা নহে, উপরন্তু উহা সত্য-নির্ধারণের মাপকাঠি-ও বটে। যেহেতু এই কথাটি স্পষ্ট ও বিবিক্ত, (clear and distinct) অতএব উহা স্ব-প্রমাণ। মন বস্তুতঃ এমন একটি দ্রব্য, যাহা চিন্তা করে। কারণ, উহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এইরূপে স্পষ্ট ও বিবিক্ত। কিন্তু বাহ্যপ্রত্যক্ষ অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত; সুতরাং উহার বিষয় যে অস্তিবান, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ নহে। অতএব মন ব্যতীত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে "যে পদার্থ স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে ধারণা করা যায় তাহা সত্য," সত্য-নির্ধারণের দেকার্ৎসম্মত এই সাধারণ মাপকাঠি অপ্রযোজ্য। ইহাই হইল সমস্যা। মনকে দ্রব্য অথবা স্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া, দেকার্তের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কিন্তু তাহার পক্ষে এইরূপ মানাও অসম্ভব ছিল যে, মন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, মনের অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, উহাদের নিকট হইতে এমন কোন বস্তুর সূচনা পাওয়া যায় কিনা, যাহার উপর মনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু মনের অভ্যন্তরস্থ বস্তু হইতেছে কতকগুলি "ধারণা"। এই সব ধারণা দেকার্ৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) যে সকল ধারণা আমাদের দ্বারা সৃষ্ট; (২) যে সকল ধারণা বাহ্যবস্তু দ্বারা জনিত; এবং (৩) যে সকল ধারণা মূলতই অন্তর্জাত বা প্রকৃতি সিদ্ধ। শেষোক্ত শ্রেণীতে তিনি এমন একটি ধারণা খুঁজিয়া পাইলেন, যাহা তাহার নিকট বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ববান বলিয়া মনে হইল। ইহা হইতেছে ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণা। কিন্তু ধারণার সম্বন্ধে দেকার্তের সাধারণ মত এই যে, উহারা হইতেছে মন বা

অন্তঃকরণেরই অবস্থা অথবা বৃত্তি মাত্র, বাহ্য পদার্থ নহে। এইভাবে তিনি চিন্তা ও বস্তু এই দুইয়ের মধ্যে একটি ভেদ স্বীকার করিলেন। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য তিনি যৌক্তিক প্রমাণের আবশ্যকতা বোধ করিলেন। এই সব প্রমাণ তিনি প্রধানতঃ পণ্ডিতীয় দর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমার সম্বন্ধে আমি জানি যে, আমি সান্ত, সুতরাং অপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে যদি পূর্ণতম সত্তার ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার অপূর্ণতার কথা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার মনে এই যে পূর্ণতম সত্তার ধারণা আছে, তাহার নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে। কিন্তু এই কারণটি কোন অপূর্ণ সত্তা নহে; সুতরাং আমার মনে পূর্ণতার ধারণা উৎপন্ন করার জন্য পূর্ণতম সত্তা থাকিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া, আমি নিজেকে যখন সান্ত বলিয়া জানি, তখন ইহাও জানি যে, আমার যাহা কিছু আছে, তাহার জন্য আমি পূর্ণতম সত্তার উপর নির্ভর করি। সুতরাং যে পূর্ণতম সত্তার উপর আমি এতটা নির্ভরশীল, তাহা অস্তিত্ববান না হইয়া পারে না। সর্বশেষে ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য আন্‌সেলম্‌ সত্তা-বিষয়ক যে যুক্তি দিয়াছিলেন, তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেকার্ৎ বলিলেন, ইহা সম্ভবপর যে অন্যান্য বস্তু-বিষয়ক আমাদের ধারণাগুলি এমন সকল ধর্মের (essence) ধারণাও হইতে পারে, যে সকল ধর্মের ধর্মী বস্তুতঃ নাই; তথাপি আমাদের ঈশ্বর বিষয়ক ধারণার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে শুধু ধর্মের ধারণা হইতেই ধর্মীর অস্তিত্ব ততটুকু অনিবার্যভাবে নিগমিত হয়, যতটুকু অনিবার্যভাবে কোন ত্রিভুজের সংজ্ঞা হইতে উহার ধর্মগুলির অস্তিত্ব নিগমিত হয়। কারণ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণাটি অন্তর্জাত অথবা প্রকৃতিসিদ্ধ (innate) এবং তজ্জন্যই স্পষ্ট ও বিবিক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, এইসকল যুক্তি কয়েকটি বিনা-বিচারে-গৃহীত ধারণা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পরিসরে এই সকল ধারণার পরীক্ষা অসম্ভব। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহাদের মূলে একটি অবিবেক (confusion) আছে—জ্ঞানীয় স্বয়ং-পর্যাপ্ততার (self sufficiency) সহিত নৈতিক পূর্ণতার অবিবেক। এই অবিবেকবশতঃ ইহা দেখান সম্ভবপর হইল যে, ব্যষ্টি-মনের আশ্রয়ীভূত অনাত্ম বস্তুটি পরমপরাগত ধর্মের ধারণানুযায়ী ঈশ্বরই। কিন্তু পরবর্তীকালে, কাণ্ট বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, কোন প্রকার বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করা যায় না; যে যুক্তি নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার দ্বারা কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে। কিছু ভিন্ন-দৃষ্টিতে হেগেলও

আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, তথাকথিত সত্তা-সম্বন্ধীয় যুক্তির দোষ এই যে, উহার গোড়াতেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, চিন্তা সত্তা হইতে ভিন্ন। সে যাহা হউক, দেকার্ৎ এই সকল যুক্তির দ্বারা সান্ত মনের বহির্ভূত এবং উহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও সত্তা ব্যতীত অন্যকিছু প্রমাণ করিতে পারিযাছেন, এইরূপ বলা যায় না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ। তখন আর বলা যায় না যে, বাহ্য সত্তায় বিশ্বাস করিয়া আমি প্রতারিত হইয়াছি। কারণ, ঈশ্বর আমাকে এইভাবে প্রতারণা করিতে পারেন, এইরূপ ভাবিলে তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের সহিত বিসঙ্গতি ঘটে। সুতরাং বাহ্য জগৎ অস্তিত্ববান। এই সকল যুক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দেকার্তের মতে, বাহ্যবস্তুর শুধু স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণাই উহার অস্তিত্বের নিশ্চায়ক নহে। কিন্তু যে পদার্থের ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত, তাহা যদি সত্য না হয, তাহা হইলে আমাদের ঈশ্বর বিষয়ক অন্তর্জাত (সুতরাং স্পষ্ট ও বিবিক্ত) ধারণার দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করা দেকার্তের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরাস্তিত্ব দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দেকার্ৎ যে-যুক্তি দিযাছেন, তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আছে। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরের সত্য-নিষ্ঠাকে সত্য-নির্ণয়েব একটি নূতন মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করায়, দুর্ভাগ্যক্রমে দেকার্ৎকে, অন্তিম সত্যমাত্রই স্পষ্ট ও বিবিক্ত অথবা স্ব-প্রমাণ, এই বিশুদ্ধ ন্যায়ানুগ মত ত্যাগ করিতে হইল।

ভগবানের সত্যনিষ্ঠা-সত্ত্বেও, দেকার্তের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অস্পষ্ট ও অবিবিক্তই থাকিয়া যায়: ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না। উহারা শুধু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটায়। সুতরাং ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠাদ্বারা স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণার সত্যতায় আমাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহা সমর্থিত হয় মাত্র। কিন্তু এইরূপ স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণা কেবল গাণিতিক প্রতিজ্ঞাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এইসকল প্রজ্ঞাসম্পর্কে বাস্তব সত্যতার প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং দেকার্ৎ যখন বলিলেন, আমরা যে সকল স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে বুঝিতে পারি, তাহাদের সত্তা আছে, তখন তিনি গাণিতিক প্রতিজ্ঞার কথা ভাবেন নাই; কিন্তু গণিতীয় বস্তুর (অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে গণিতীয় ধর্ম বিদ্যমান, উহাদের) কথাই ভাবিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে তিনি এই প্রকার বস্তুরই অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেকার্তের বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে তথা-কথিত প্রমাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সমকালীন বিজ্ঞান বিশ্ব সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিত, সেই ধারণা অনুযায়ী বিশ্বের অস্তিত্ব কোনও প্রকারে প্রতিপাদন করা।

বাহ্যজগৎসম্বন্ধে দেকার্ৎ যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শেষ বিচারে বাহ্যসত্তার স্বরূপ গাণিতিক পদার্থের ন্যায়। এইজন্যই তিনি বাহ্যবস্তুর গুণগুলির মধ্যে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক (frimary and secondary) এই দুইটি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাথমিক গুণগুলি হইতেছে বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি। তাঁহার মতে, এইগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর দ্বারা জনিত মনের বিকার মাত্র; এবং যেহেতু উহারা অস্পষ্ট ও অবিবিক্ত, অতএব উহারা বাহ্যবস্তুর ধর্ম হইতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বস্তুসমূহের যে গুণগত ভেদ প্রতিভাত হয়, তাহা সত্য নহে। বাহ্য জগতে যাহা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান, তাহা হইতেছে প্রাথমিক গুণ অর্থাৎ বিস্তার। কিন্তু দেকার্তের মতে, বিস্তার বলিতে মূর্ত বস্তুর (গোল প্রভৃতি) আকৃতি, (ছোট বড়) আকার এবং চেহারা (বা গঠন) প্রভৃতি পরিমাণ গত ধর্ম বুঝায় না। বিস্তার হইতেছে বিশুদ্ধ ত্রিমাত্রিক দেশ; সুতরাং দেশস্থ পদার্থ ও দেশের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বস্তুগত পার্থক্য নহে, কিন্তু উহা হইতেছে আমাদের তৎসম্বন্ধীয় ধারণার প্রকারগত পার্থক্য। এইভাবে, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাহ্যবস্তুর কোন রকম পরিমাণগত পার্থক্য নাই। এই মত পোষণ করিতে গিয়া দেকার্ৎ অংশী (অর্থাৎ সমগ্ররূপে জড় পদার্থ) এবং অংশ (ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ জড় বস্তু), এই দুইয়ের মধ্যেও একটি ভেদ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় পূর্ববর্তী এবং অধিক সত্তাবান। কিন্তু মনকে বুঝিবার জন্য তিনি এইরূপ কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, ব্যষ্টিমনগুলিও পরমার্থতঃ সত্য। দেকার্ৎ যে ভেদের ধারণার সাহায্যে শুধু জড় জগৎকে বুঝিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে স্পিনোজা তাহার সাহায্যেই জড় ও মন উভয় জগৎকেই বুঝিয়াছিলেন।

কিন্তু দেকার্ৎ ব্যষ্টি জড় বস্তুর পরিমাণগত ভেদকে অবাস্তব বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার মতে, এইগুলি জড়পদার্থের বিশিষ্ট প্রকাররূপে জড়বস্তুতে গতির ক্রিয়ার দ্বারা জনিত এবং সেইজন্য অন্যসাপেক্ষ। এইভাবে তিনি গতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, জড় জগৎ যে অন্তিম বিশ্লেষণে শুধু জড় তত্ত্ব ও গতি মাত্র, এই বৈজ্ঞানিক মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বেই বাহ্য জগতেও বিস্তারের অভেদ স্বীকার করায়, তাঁহার নিকট গতির অস্তিত্ব এমন একটি রহস্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, যাহার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, আদিতে ঈশ্বরই জড় দ্রব্যে এই গতি সংক্রামিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গতি স্বীকার করিলে, কাল ও পরিবর্তনও স্বীকার করিতে হয়, অথচ বাহ্য জগৎ ও বিস্তারের অভেদবাদের সহিত উক্ত কাল

ও পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান করাও দেকার্তের পক্ষে সমভাবে অসম্ভব ছিল। বস্তুতঃ, মন ও জড় পদার্থকে দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করার ফলে, সমগ্র সত্তার যে কোন কালিক ধর্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধারণা তিনি পূর্বেই প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে একদিকে আত্মার অবিনাশিত্ববাদের বিরুদ্ধে উহার অনন্ততা মানিতে হইয়াছিল; অথচ নীতি ও ধর্মের জন্য তাহার পক্ষে উহার অবিনাশিত্বও স্বীকার করা প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে, জড় জগতের অপ্রত্যাখ্যেয় পরিবর্তনকে গ্রহণ করার পথও তাহার জন্য রুদ্ধ ছিল। এই দুই সংকট দূর করিবার জন্য, তিনি কালকে পরমাণুতুল্য নিরংশ ক্ষণ সমূহের একটি অনন্ত ধারা বলিয়া মানিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে দেকার্ৎ যে ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাতে গতির ন্যায় কালেরও কোন স্থান ছিল না। তাই উহাও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-সূচক একটি রহস্যময় বিরামহীন ধারা, এইরূপ না মানিযা, তাহার গত্যন্তর ছিল না। এইভাবে, বিশ্বের নানাদিকের ব্যাখ্যার জন্য, ঈশ্বরের গুরুত্ব যে সর্বাপেক্ষা বেশী, এই কথা সূচিত করিয়া, দেকার্ৎ তাহার বিশ্বসম্বন্ধীয় ধারণাটিকে স্পিনোজা পরবর্তীকালে যেভাবে পরিবর্তিত করেন তাহারই আয়োজন করিয়াছিলেন। দেকার্তের ধারণা অনুসারে বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত:—একদিকে রহিয়াছে শুদ্ধ চৈতন্যাত্মক মন সমূহ—এইগুলি বিস্তার-শূন্য এবং দেহ ও দৈহিক ধর্ম হইতে পৃথক, অপরদিকে, আছে বিস্তারাত্মক জড় পদার্থ—ইহা বিস্তারীয ধর্ম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম হইতে বিচ্যুত। এই মত দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। কিন্তু দেকার্ৎ বলিয়াছেন, আমরা ইহাও জানি যে, মন ও জড় উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি; কিন্তু সৃষ্টি শব্দের অর্থে এই অর্থও নিহিত আছে যে, সৃষ্ট জগৎ উহার স্রষ্টা হইতে পৃথক। দেকার্ৎ তাই বিচার করিলেন: ধরিয়া লইতে কোন বাধা নাই যে, জড় জগতের ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, কিন্তু মানুষের মন স্বাধীন ভাবেই কাজ করে। এই ভাবে, বিজ্ঞান ও নৈতিক চেতনা, উভয়ের ধারণাই সমর্থিত হয। স্বাধীনতার সম্বন্ধে দেকার্ৎ আরও বলেন, মানবীয় স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা জনিত; তাই উহা পূর্ণ স্বাধীনতা নহে; অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম-নির্বাচনের ক্ষমতা নহে। পূর্ণ স্বাধীনতা শুধু ঈশ্বরেই বর্তমান। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা সীমিত, অর্থাৎ হাঁ কি না বলার ক্ষমতা মাত্র। জড় জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, এই মত দ্বারা দেকার্ৎ জড় জগৎ সম্বন্ধীয় অনিবার্য নিয়ন্ত্রণের ধারণাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ধারণানুসারে, জড়ের প্রতিটি ক্রিয়া অমোঘ নৈসর্গিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এমনকি, মানুষ্য ও ইতর প্রাণীর জীবন্ত শরীরগুলিকেও তিনি যন্ত্র বলিয়া ভাবিতেন। অবশ্য তাহার মতে, যদিও ইতর প্রাণীসমূহ স্বতঃক্রিয় যন্ত্র মাত্র, এবং

উহারা জড় পদার্থের নিয়ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত ও চৈতন্যবিবর্জিত, তথাপি মনুষ্যের কথা পৃথক, কারণ, তাহার আত্মা রহিয়াছে।

দেকার্তীয় দ্বৈতবাদে, যে সকল সমস্যা দেখা দিল, তাহাদের মধ্যে, ইচ্ছাবৃত্তির পরিচালনায় এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে জড় জগতের জ্ঞান সম্পাদন শরীরের উপর মনের যে ক্রিয়া (অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মন ও শরীরের যে সম্বন্ধ), তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশেষ ভাবে কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। বিশেষভাবে এই দুইটি সমস্যার সম্পর্কেই দেকার্তের অনুসরণকারীরা ভাল করিয়া তাহার দর্শনের ত্রুটি উপলব্ধি করেন। এই সকল সমস্যার সমাধানে তাহারা যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন, ত'দ্বারা দেকার্তীয় দর্শনের কোন না কোন দিকে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া, দেকার্ৎ স্বয়ং এইরূপ একটী স্থূল মতের সাহায্য লইলেন যে, মন মস্তিষ্কের পিনিয়েল (pineal) নামক গ্রন্থিতে থাকিয়া শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়। তিনি আরও বলেন যে, সমগ্র বিশ্বে মোট গতির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে, আত্মা তাহা বদলাইতে পারে না ; তথাপি আত্মা সাক্ষাৎভাবে সজীব শরীরের গতির দিক এবং গৌণভাবে জড় জগতের গতির দিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ কিন্তু দেকার্তের এই ব্যাখ্যা তাহার দ্বৈতবাদের সহিত খাপ খায়না ; কারণ, এই মতবাদানুসারে, কোন অর্থেই শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ কিংবা শরীরের উপর মনের প্রভাব ঘটা অসম্ভব। এই জন্য, শিষ্য গুয়েলি এবং মালেব্রাঁশ এই ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমরা কি করি জ্ঞান লাভ করিযা দেকার্ৎ তাহা যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিযাছিলেন, তাহা প্রতিনিধিবাদ অথবা প্রতিমূর্তিবাদ (representationism) নামে খ্যাত। এই মতানুসারে, বাহ্যবস্তু মনের উপর ক্রিয়া কবিযা, সেখানে কতকগুলি ধাবণা জন্মায, এবং আমাদের মন এই সকল ধারণা হইতে পরোক্ষভাবে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান আহরণ করে। কিন্তু এই মতটি স্পষ্টতঃই দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের সহিত অসমঞ্জস। তাহাছাড়া, বাহ্যবস্তুর দ্বারা মনে মনে কোন রকমে ধারণা উৎপন্ন হয় এই কথা মানিয়া লইলেও, যেহেতু এই ধারণাগুলি মনেরই অবস্থা বা ধর্ম মাত্র, এবং ঐ জন্যই বিস্তারহীন, সুতরাং ইহাদিগকে কিছুতেই বিস্তাবযুক্ত বাহ্যবস্তুর প্রতিমূর্তি বা প্রতিনিধি বলা যাযনা। সুতরাং দেকার্তের দ্বৈতবাদ মানিয়া লইলে, বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের ব্যাপারে, মূলতঃ যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা তৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু কিছু দূরে সরাইয়া দেওয়া হয় মাত্র।

আর্ণল্ড নামক অপর একজন দেকার্তের অনুযায়ী ধারণা নামক পদার্থটিকে মানিতে রাজী হন নাই। তিনি বলিলেন, মন সাক্ষাৎ ভাবেই (ধারণার সাহায্য

ছাড়াই) জড় বস্তুকে জানে। কিন্তু তিনি আবার দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন ; অথচ উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জড় বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, এই মত পোষণ করা অসম্ভব। গুয়েলি স্বেচ্ছাকৃত কর্ম এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এই উভয় বিষয়ক সমস্যাগুলিকে একই সঙ্গে গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রসঙ্গবাদ (occasionalism) নামক মতদ্বারা উহাদের সমধান করার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মত অনুসারে, আমাতে যখন কোন ইচ্ছার উদয় হয়, তখন ঐ ইচ্ছার প্রসঙ্গে, অর্থাৎ ঐ ইচ্ছাকে নিমিত্ত করিয়া, আমার শরীরে যে ক্রিয়া দেখা দেয়, তাহা আমার ইচ্ছা দ্বারা জনিত নহে, কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক জনিত। একই ভাবে (বাহ্যবস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের সঞ্চালন বশতঃ), আমার মস্তিষ্কে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে, তৎপ্রসঙ্গে আমার মনে যে-সকল ধারণা জন্মে, সেগুলি ও মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কার্য নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা নিতান্তই কল্পনামূলক ও অবৈজ্ঞানিক ; তদুপরি, উহাতে মন ও শরীরের ক্রিয়ায় ঈশ্বরের নিত্য হস্তক্ষেপ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, দেকার্তীয় দর্শনের গোড়াতেই কুঠারঘাত করা হয়। কারণ, দেকার্তীয় দর্শনে মন ও জড় পদার্থ শুধু পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন।

মালেব্রাঁশের হস্তে দেকার্তীয় দর্শনের অধিকতর দুরবস্থা হইল। কারণ, তিনি গুয়েলির মতকেও অতিক্রম করিয়া পরবর্তীকালের দার্শনিক বার্ক্‌লির ন্যায় বলিলেন, মন হইতে পৃথক বাহ্য জগৎ বলিয়া এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের মানসিক ধারণার উৎপাদক হইতে পারে। তাহার মতে, আমাদের ধারণাগুলি আসলে ঈশ্বরের মনেরই ধারণা—তথাকথিত বাহ্য জগৎ এই সকল ঐশ্বরিক মনের ধারণার দ্বারা গঠিত। মালেব্রাঁশ এইভাবে বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র সত্তা ত অগ্রাহ্য করিলেনই, তদুপরি, আরও অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন, জ্ঞাতারূপে আমাদের মন ঐশ্বরিক ধারণাগুলিকেই অংশতঃ উপলব্ধি করে, এবং এই জন্য আমাদের মন ভাগবত সত্তারই অংশ মাত্র—উহার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বস্তুতঃ, মালেব্রাঁশ মনে করিতেন যে, ব্যক্তি বা জীবের শুধু একটি বিশিষ্টরূপেই স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এবং উহার অন্য কোনরূপেই উহাকে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব—উহার ঐ বিশিষ্ট রূপটি হইতেছে উহার স্বাধীন ইচ্ছা অর্থাৎ নৈতিক কর্মের কর্তৃত্ব। এইভাবে দেকার্তের এক অনুযায়ীর হাত হইতে অন্য অনুযায়ীর হাতে পড়িয়া তাহার দর্শনের ধ্বংস ক্রিয়া ক্রমশঃ অধিকাধিক বেগ সঞ্চয় করতঃ, সর্বশেষে স্পিনোজার দর্শনে চরমে উঠিল। স্পিনোজার দর্শনে দেকার্তের মূলগত সমস্যাটির একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সমাধান দেওয়া হইল।

৩। বেনেডিক্ট স্পিনোজা (খৃঃ ১৬৩২-১৬৭৭)

স্পিনোজার দার্শনিক মতের পূর্বাভাস তাহার "বুদ্ধির সংশোধন বিষয়ক প্রবন্ধ" (Tractatus de Intellectus Emendatione) প্রভৃতি তাহার জীবনের প্রথমদিকে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গেলেও, উহা তাহার প্রধান গ্রন্থ "নীতিবিজ্ঞানে" (Ethica) পূর্ণ আকার ধারণ করে। স্পিনোজার উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিশাস্ত্রের কঠোর নিয়মানুসারে এমন একটি মতবাদ গঠন করা, যাহাতে ধর্ম নীতি এবং বিজ্ঞান, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভবপর হইবে। কেহ কেহ স্পিনোজার জীবন ও উপদেশের নৈতিক উৎকর্ষের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ তাহার ধর্মবিষয়ক আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। অবশ্য, রক্ষণশীলদের চক্ষে স্পিনোজা অবিশ্বাসী এবং জড়বাদী ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। আর এই কথাও সত্য যে স্পিনোজা দেকার্তের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তথাপি তিনি নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। এই জন্য, তিনি ধর্ম ও নীতিকে গতানুগতিক দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। দেকার্তের মতে, একদিকে, তোমাদের ধারণা সমূহের উচ্চ-নীচ ক্রমে (in the order of ideas) মনের স্থান সকলের উপরে এবং উহার অস্তিত্ব দর্শনের আদি তত্ত্ব, অন্যদিকে অস্তিত্বের উচ্চ-নীচ ক্রমে ঈশ্বর সকলের আদিতে, অর্থাৎ তিনি প্রকৃত অর্থে অন্তিম সত্তা অথবা দ্রব্য। এই দুই অনুক্রমের মধ্যে এই যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহা অপনয়নের জন্য স্পিনোজা দেকার্তীয় বিচার-প্রণালীটিকে এমন একটি জ্যামিতীয় প্রমাণ-পদ্ধতিতে পরিণত করিতে চাহিলেন, যাহার সাহায্যে প্রত্যেকটি পদার্থের ধারণাই একটি সর্বগ্রাহী (all-inclusive) ধারণা হইতে নিগমন করা সম্ভবপর। ইহাতে তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রমাশাস্ত্রীয় একটি নিজস্ব মতবাদের ভিত্তির উপর দার্শনিক সৌধের প্রতিষ্ঠা করা, শুধু দেকার্তীয় বিচার-প্রণালী ও মূল তত্ত্বের যুক্তি-সিদ্ধ সমালোচনারূপ সহজলভ্য সাদাসিধা ভিত্তির উপরে নহে।

সাক্ষাৎ অনুভবে যাহা জানা যায়, তাহার কালিক ধর্ম কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারেনা, স্পিনোজার দৃষ্টি-ও এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু যেহেতু সাক্ষাৎ অনুভব আমাদের জ্ঞানের প্রথম অথবা অসংস্কৃত অবস্থা, এবং যেহেতু উহা বুদ্ধির আলোকে অনালোকিত, সুতরাং স্পিনোজার ভাষায় উহা পদার্থের কাল্পনিক দৃষ্টি মাত্র। এই জন্য, স্পিনোজা ভাবিলেন যে, যদি যৌক্তিক জ্ঞানের স্তরে, কালের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে কালকে প্রকৃতপক্ষে সত্তার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়না। ইন্দ্রিয়

প্রত্যক্ষে জ্ঞাত বস্তু সকল নিশ্চয়ই স্থায়ী পদার্থ, অর্থাৎ উহারা অনির্দিষ্ট কাল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্পিনোজার মতে, এই স্থায়িত্ব কোন বাস্তব পদার্থ নহে, উহা বস্তু হইতে অপসারিত এমন একটি পরিণাম (abstract quantity) যাহা বিভাজ্য এবং যাহার পরিমাপ শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাপকাঠির দ্বারাই করার যোগ্য। তাহাছাড়া, পরিবর্তন বিনা স্থায়িত্ব থাকিতে পারেনা, আবার এমন স্থায়িত্বও নাই, যাহা অপেক্ষা কম বা বেশী স্থায়িত্ব কল্পনা করা যায়না। এই জন্য, স্পিনোজা বলিলেন, স্থায়িত্বের সহিত সম্বন্ধ ধর্মগুলি বস্তুধর্মেব সহিত সম্পূর্ণ অসমঞ্জস। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সদ্বস্তু কালপরিচ্ছেদের উর্দ্ধে, উহা এমন পদার্থ নহে, যাহা এক, বহু অথবা অনন্তক্ষণ ধরিয়া বিদ্যমান থাকে, অথবা যাহা অনাদ্যন্তকাল স্থায়ী। আবার তিনি ইহাও মনে করিতেন না যে, সদ্বস্তুর স্বরূপ হইতেছে স্থায়িত্বের অথবা কালিক ধর্মের অভাব। তাহার মতে, সদ্বস্তু পূর্ণ ভাবে ভাবাত্মক; এবং যদি ইহার স্বরূপ ও সত্তা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন না হয়, অথবা যদি উহা স্বরূপমূলক সত্তার অধিকারী অর্থাৎ শাশ্বত (aeternitas) না হয়, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ ভাবাত্মক হইতে পারেনা। এই ভাবে স্পিনোজা এই পণ্ডিতীয় (scholastic) সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যে বস্তু সর্বাপেক্ষা সৎ, তাহার অস্তিত্ব উহার স্বরূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সুতরাং দেকার্ৎ তদীয় সত্তা-মূলক যুক্তিদ্বারা যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, স্পিনোজা উহাই নিজ দর্শনের আদ্য তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

স্পিনোজার উপরিবর্ণিত বিচারপ্রণালীর ভিত্তি ছিল তাহার প্রমাশাস্ত্রীয় মত। এই মত অনুসারে, প্রজ্ঞারূপ সাক্ষাৎ অনুভূতিকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও বিচারবুদ্ধির উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বিচার বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতেছে বিশৃঙ্খল (Confused) ও অপূর্ণ (inadquate) ধারণা মাত্র; তাই উহাতে বস্তুর খণ্ডিত অংশ ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু বিচার বুদ্ধি বস্তুসমূহকে উহাদের অন্যোন্য-সম্বন্ধ ও যোগসূত্রসহ গ্রহণ করে বলিয়া, উহা তাহাদিগকে এক অর্থে তাহাদের শাশ্বতরূপে (*Sub specie aeternitatis*) জানে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি স্বভাবতঃই বিশ্লেষণকারী বলিয়া, উহা সত্তার সমগ্র রূপটিকে দেখিতে পায়না, এবং বস্তু সমূহের নিষ্কৃষ্ট (abstract) সম্বন্ধগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিচার-বুদ্ধি বিষয়ক এই মত দ্বারা স্পিনোজা শুধু ইহাই ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, বিচার বুদ্ধির ত্রুটি জ্ঞানের তৃতীয় বা সর্বোচ্চস্তরে অর্থাৎ প্রজ্ঞাপ্রত্যক্ষে দূরীভূত হয়। এই প্রজ্ঞা

দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, সর্ব পদার্থ শাশ্বত সত্তার অন্তর্গত এবং উহা হইতেই নিগমিত। এই প্রকার বোধই উহাদের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। বস্তুতঃ, স্পিনোজার মতে, জ্ঞানের এই সর্বোচ্চস্তর হইতে দেখা যাইবে যে, শুধু জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কিন্তু জ্ঞাতা মন ও স্বরূপাত্মক শাশ্বত সত্তারই অংশভাক্। সুতরাং যে বিচারাতীত দৃষ্টিকে স্পিনোজা প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিতেন, সেই দৃষ্টিতে, তাহার নিকট, মানব মনের নিত্যম ততখানি নিশ্চয়তাব সহিত প্রতিভাত হইল, যতখানি নিশ্চয়তার সহিত দেকার্তের নিকট জীবাত্মাব অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহার ফলে, আধুনিক দর্শনে দেকার্ৎ যে জ্ঞাতৃকেন্দ্রিক এবং মানবকেন্দ্রিক বিচারধারা প্রবর্তন করিযাছিলেন, তাহা হইতে স্পিনোজা আধুনিক দর্শনকে বিমুক্ত কবিলেন।

স্পিনোজার মতে, স্বরূপাত্মক সত্তা হইতেছে অদ্বিতীয ও একমাত্র দ্রব্য এবং উহা অবশ্যই অনন্ত। তাহার হেগেল মতাবলম্বী, ব্যাখ্যাতাগণ বলেন যে, তাহার মতে, দ্রব্যের কোন নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি দ্রব্যকে নিশ্চয়ই সেইরূপ মনে করিতেন না। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন, "সর্ব-নির্দেশনা হইতেছে নিষেধনা" (*omns determinatio est negutio*)। কিন্তু এই কথাটি দ্রব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ইহার দ্বারা তিনি শুধু বলিতে চাহেন যে, সমগ্র অবয়বীর অন্তর্ভূক্ত অংশ মাত্রই সসীম অথবা পরিচ্ছিন্ন। স্পিনোজার ধারণানুসারে, দ্রব্য হইতেছে সর্বসমাবেশক একমাত্র সত্তা ; সুতরাং উহা বাস্তবগুণসমূহের ধর্মী ও ভাবগর্ভ বস্তু না হইয়া পারেনা। কিন্তু স্পিনোজা তৎসঙ্গে এই সাবধান বাণীও শুনাইয়াছেন যে, দ্রব্যের এমন কোন গুণ থাকিতে পারে না, যাহা স্বরূপাত্মক সত্তার অনন্ততা ও অবিভক্ততা এবং অপরিবর্তনীয়তা প্রকাশ করে না। অবশ্য, উপরিব্যাখ্যাত কারণবশতঃ, তিনি এই দৃষ্টিতে দ্রব্যের কালিক ধর্ম নিষেধ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এই কথাও বলিয়াছেন যে, অপরিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য বিস্তারের ধারণা অসম্ভবনীয়ত নহেই, উপরন্তু উহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং বিচার-সহ। অবশ্য, পরবর্তী কালে, লাইবনিজ বিস্তারের বিভাজ্যতার দরুনই দ্রব্যে উহার অস্তিত্ব অস্বীকাব করেন। আমরা পরে লাইবনিজ-দর্শনের আলোচনায দেখিতে পাইব যে, এই কারণেই তিনি অনন্ত সংখ্যক দ্রব্য স্বীকার করিয়াছিলেন। স্পিনোজা পারমার্থিক সত্তার সমগ্র রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি বিস্তারের একটি শাশ্বতরূপ মানিয়া, এই শাশ্বতরূপান্বিত বিস্তারকে দ্রব্যের গুণ বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু দ্রব্যে চিন্তার আরোপ বিনা, বিস্তারের আরোপ সমীচীন হইতে পারেনা। কারণ, দ্রব্যে উভয় ধর্মেরই আরোপ না করিলে, বিষয়ী এবং বিষয়, চিন্তা এবং সত্তা, এই দুইয়ের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ পরস্পরের পৃথকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও উহারা যে একে অন্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে, এই কথার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ, স্পিনোজা মনে করিতেন যে, চিন্তা হইতেছে বিস্তারের "বিষয়গত স্বরূপ" (essentia objictiva), এবং বিস্তার হইতেছে চিন্তার "বিষয়" (objectum or Ideatum)। অবশ্য, ইহার অর্থ এই যে, বিস্তার ও চিন্তাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়না, এবং ইহা মনে করাই সঙ্গত যে, উভয়ে একই দ্রব্যের গুণ। কিন্তু দ্রব্যের যে শুধু বিস্তার ও চিন্তা এই দুইটি গুণ আছে, তাহা নহে। বরং স্পিনোজা বলিয়াছেন: "সম্পূর্ণ অনন্ত সত্তার নিশ্চিত লক্ষণ এই যে, উহা অনন্ত সংখ্যক এমন সকল গুণের দ্বারা গঠিত যে, উহাদের প্রত্যেকেই কোন একটি নিত্য ও অনন্ত স্বরূপের প্রকাশক"। স্পিনোজার এই উক্তিতে তাহার গুণ বিষয়ক মতের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ দ্রব্যের প্রত্যেকটি গুণ নিজে অনন্ত; আবার দ্রব্যে অনন্ত সংখ্যক গুণ আছে। দ্বিতীয়তঃ গুণগুলি আমাদের দ্রব্যজ্ঞানের প্রকার নহে, কিন্তু উহারা দ্রব্যেরই নির্বর্তক অথবা সংগঠক। স্পিনোজা গুণদ্বয়ের নাম নির্দেশ করিলেও, অনন্ত সংখ্যক গুণের কথাও বলিয়াছেন; ইহাতে সূচিত হয় যে, তাহার মতে, যে গুণগুলির তিনি নাম নির্দেশ করিতে পারেন নাই, অথবা যে গুণগুলি আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে, সেইগুলি যেমন আমাদের দ্রব্য জ্ঞানের প্রকার হইতে পারেনা, তেমনই যে দুইটির তিনি নাম নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দুইটিও জ্ঞানের প্রকার নহে। কিন্তু স্পিনোজার গুণবিষয়ক মত সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে: দ্রব্যের অনন্তগুণরাজীর মধ্যে তিনি যে শুধু বিস্তার ও চিন্তা এই দুইটিরই নাম নির্দেশ করিতে পারিলেন, অথবা আমরা যে শুধু এই দুইটি গুণই জানিতে পারি, তাহার কারণ কি? স্পিনোজা যদি মানিয়া লইতেন, আমরা শরীরী আত্মা বলিয়া কেবল বিস্তার ও চিন্তার বিকারেই গঠিত, এবং আমরা যাহার দ্বারা গঠিত, শুধু তাহাই জানিতে পারি, তাহা হইলে, তিনি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু স্পিনোজার এই সকল বিকল্পনা (assumption) যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় যে, পরমতত্ত্ব অথবা দ্রব্যের ধর্ম নির্ধারণ করিতে গিয়া, তিনি মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাহার কোন কোন সমালোচক এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

তথাপি সন্দেহ নাই যে, স্পিনোজার মতে, যে সকল ধর্ম সসীমতার দ্যোতক,

তাহাদিগকে তিনি দ্রব্যের ধারণা হইতে দূরে রাখিতে ব্যগ্র ছিলেন ; এইজন্য তিনি দ্রব্যকে "ভেদের মধ্যে ঐক্য" এই অর্থে এক না বলিয়া, বরং উহাকে অনন্ত সাধারণ বলিতেন ; কারণ, তাহার মতে, পরিসংখ্যেয়ত্ব এক প্রকার সসীমতা এবং উহা দ্রব্যের অনন্ততার সহিত অসমঞ্জস।

স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই দুইটি শব্দ একই দ্রব্যের বাচক অর্থাৎ উভয় শব্দ দ্বারাই এমন এক স্বরূপ বুঝায়, যাহার সহিত উহার অস্তিত্বও জড়িত। সুতরাং তাহার পক্ষে, দেকার্তের ন্যায়, উহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক ছিলনা। এইজন্য তাহার মনে হইয়াছিল যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সমঞ্জস ; পরস্পরের বিরোধী নহে। ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরে মনুষ্য-ধর্মের আরোপ করায়, যে সকল ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তিনি এই দৃষ্টিতে সেইগুলি দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্পিনোজার মতে, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মতদ্বৈধের হেতু হইতেছে কারণতা-সম্পর্কে তাহাদের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান বিশ্বজগৎকে অবশ্যম্ভব নিয়মে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বলিয়া বুঝিতে চায় ; কিন্তু ধর্মতত্ত্ব মনে করে যে, ঐশ্বরিক কারণতা মানুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের ন্যায়। আর স্বাধীন কর্তৃত্বের অর্থ এই যে, উহা "অন্তিম উদ্দেশ্য দ্বারা" চালিত এবং সম্পূর্ণ অনিশ্চিত স্বভাব ইচ্ছা শক্তি হইতে সম্ভূত। এই ভাবে, ঈশ্বরবাদে ভগবানকে বিশ্বের বিশ্বাতীত কারণ রূপে এবং পুরুষ রূপে ভাবা হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরপুরুষ মানবপুরুষ হইতে "সর্বশক্তিমত্তা" ও "সর্বজ্ঞতা" এই দুই বিষয়ে পৃথক। এই মতের বিরুদ্ধে স্পিনোজার বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণায় তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার ক্ষেত্রে, সত্তা যে স্বরূপেই নিহিত, এই কথা ব্যক্ত হয় নাই। স্বরূপে নিহিত সত্তার অধিকারী রূপে ঈশ্বর নিশ্চয়ই একটি কারণ অর্থাৎ নিজের কারণ (*causa sui*)। তাঁহাকে বিশ্বের কারণও বলা যাইতে পারে। এই মতের সমর্থনে স্পিনোজার যুক্তি এই : "সর্ব-অস্তিত্ববান পদার্থ ঈশ্বরের অন্তর্বর্তী এবং ঈশ্বরের মাধ্যমেই উহাদিগকে বুঝিতে হইবে" ; তাহা-ছাড়া "ঈশ্বরের বাহিরে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়না"। তিনি হইতেছেন জগতের অন্তঃস্থ কারণ, বহিঃস্থ কারণ নহে। অন্য ভাষায় বলা যায়, বিশ্বের পদার্থ সকল যে কোন এক অতীত কালে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে ; কিন্তু যেমন ত্রিভুজের স্বরূপ হইতে নিগমিত হয় যে, উহার তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, তেমনই জাগতিক পদার্থ সকল অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্যন্ত ঈশ্বরের স্বভাব হইতে অনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয়।

এই ভাবে, জ্যামিতিক হেতু-ফল সম্বন্ধের সাদৃশ্যে, ঐশ্বরিক কারণতা ব্যাখ্যা

করিয়া স্পিনোজা ধর্মতত্ত্বের এই মতটিকে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, ঈশ্বর হইতেছেন এমন এক পুরুষ, যিনি স্বীয় স্বভাব দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালেরবশে কোন "অন্তিম উদ্দেশ্য" সাধনের নিমিত্ত কার্য করেন। স্পিনোজার মতে ঈশ্বরবাদী এই মতের শেষ অংশটিতে "অজ্ঞানের আশ্রয়" লওয়া হইয়াছে, এবং উভয় অংশেই ঈশ্বরকে অপূর্ণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এবংবিধ বিচার দ্বারা, স্পিনোজা শুধু যে ধর্মকে ঈশ্বরবাদের বিনা বিচারে গৃহীত ভ্রান্ত মত হইতে বিযুক্ত করিলেন, তাহা নহে, উপরন্তু তিনি ধর্মবিষয়ক এমন এক নূতন দৃষ্টি-ও স্বীকার করিলেন, যাহা অনিবার্য নিয়মের রাজ্যে জড়জগৎকে এবং তদুপরি মানুষের মনকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

ইহা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পিনোজার এই নূতন ধারণার সহিত এই কথাও জড়িত যে, স্রষ্টা-রূপে ঈশ্বর (*Natura Naturans*) এবং সৃষ্ট জগৎ-রূপে ঈশ্বর (*Natura Naturata*) পরস্পর হইতে অভিন্ন; সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্যা স্পিনোজাকে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতেছে ব্যষ্টিকরণের সমস্যা; এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহার মতে, ইহার অর্থ হইতেছে ব্যষ্টি জড়বস্তু এবং মানুষের ব্যষ্টিমনগুলিকে বিস্তার ও চিন্তা এই দুইটি অপরিচ্ছিন্ন ধর্ম হইতে যৌক্তিক পদ্ধতিতে নিগমিত করার সমস্যা। তিনি তাহার রূপ-ভেদ-বিষয়ক (modes) মতের সাহায্যে এই সমস্যার যে সমাধান দিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইতে পারে।

ব্যষ্টিজড়বস্তু-সমূহ বিস্তারযুক্ত বলিয়া বিস্তারেরই অন্তর্বর্তী বিভাগ, কিন্তু বিস্তারের বিভাগ নহে (অর্থাৎ পৃথক পৃথক বিস্তার নহে)। সুতরাং দ্রব্য বা সত্তার দৃষ্টিতে উহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে। উহাদের পারস্পরিক ভেদ অথবা বিশেষ ধর্ম, উহাদের বিশিষ্ট দ্রব্যত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ প্রভৃতি উহাদের অবস্থাবৈচিত্র্য হইতে নিঃসৃত হয়, এবং এই অবস্থাবৈচিত্র্য "গতি ও স্থিতি" নামক জগৎ প্রক্রিয়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গতি ও স্থিতিকে স্পিনোজা বিস্তারের "অপরিচ্ছিন্ন ও শাশ্বত সাক্ষাৎ রূপভেদ" নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর জড়বস্তুতে উহার গতি সংক্রামিত করিয়াছেন, দেকার্তের এই স্থূল ধারণাটিকে স্পিনোজা এই ভাবে এড়াইতে পারিলেন। তাহা ছাড়া, জড় জগৎকে বুঝিতে হইলে গতির ধারণা অত্যাবশ্যক, এই কথার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া, তিনি পরম্পরাগত পদার্থ-বিদ্যার পুষ্টিসাধন করিলেন।

কিন্তু তাহার মতে, জড়জগৎ শুধু কতকগুলি মূর্তবস্তুর সমষ্টি মাত্র নহে। উহা হইতেছে এমন একটি সমগ্র অখণ্ড বস্তু, যাহা ঐ সকল মূর্তবস্তুর প্রত্যেকটিতে প্রতিফলিত। সুতরাং তিনি মনে করিতেন, সান্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎভাবে গতি ও

স্থিতি নামক রূপভেদ হইতে নিগমিত নহে; কিন্তু উহারা জড়জগতের সামগ্রিক রূপটির মধ্য দিয়া পরম্পরায় নিঃসৃত। স্পিনোজার পরিভাষায়, জগতের এই সামগ্রিক রূপটি হইতেছে "শরীরী বিশ্বের মুখ মণ্ডল" (the face of the corporeal universe)। ইহাকে তিনি বিস্তার ধর্মের "পরোক্ষ অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্ত রূপ-ভেদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ভাবে, সান্ত বস্তুসমূহের সম্বন্ধে স্পিনোজার ধারণা এই যে, উহারা একটি সমগ্র বস্তুর অন্তর্গত অংশ। অথবা বলা যায় যে, উহারা সান্তবস্তু সমূহের দ্বারা গঠিত এমন একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবয়বীর অংশ, যাহা পরিশেষে "গতি ও স্থিতির" উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাহার পর, স্পিনোজা এই কথাও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, বিস্তারের মধ্যে যেমন একটি তাহারই প্রকারী-ভূত সুশৃঙ্খল সমুদায় (modal system) আছে, তেমনই চিন্তার ভিতরেও একটি সম্পূর্ণ তৎসদৃশ ও চিন্তার প্রকারীভূত সমুদায় বিদ্যমান। বিস্তারগত "গতি ও স্থিতির" ন্যায়, "অপরিচ্ছিন্ন বিচার বুদ্ধি" হইতেছে চিন্তার 'সাক্ষাৎ অপরিচ্ছিন্ন এবং অনন্ত রূপ-ভেদ"। কিন্তু বিস্তারের ক্ষেত্রে, "শরীরী বিশ্বের মুখমণ্ডলের" ন্যায়, চিন্তার রাজ্যে, "অপরোক্ষ অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্ত রূপ ভেদটি" কী, তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই। তথাপি তাহার প্রকৃত বক্তব্য-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, এবং তাহা এই :—এমন একটি অখণ্ড পদার্থ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি-মন সমূহের দ্বারা গঠিত এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবয়বী আছে, যাহার মধ্যে এই সকল ব্যক্তি মন অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত, এবং যাহা পরিশেষে ঈশ্বরের "অপরিচ্ছিন্ন বিচার-বুদ্ধিতে" প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং স্পিনোজার মতে, সসীম মূর্তবস্তু সমূহ এবং ব্যক্তিমনসকল দ্রব্য নহে। উহারা বিস্তাররূপে এবং চিন্তারূপে ঈশ্বরের, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বিস্তার ও চিন্তা এই দুইটি ঈশ্বর ধর্মের, পরিচ্ছিন্ন প্রকার-ভেদমাত্র। এই উক্তির দ্বারা, স্পিনোজা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্যক্তিমনগুলি হইতেছে সান্ত মূর্তবস্তুর আত্মার দিক অথবা "বিষয়গত-স্বরূপ", এবং পরিচ্ছিন্ন মূর্ত বিষয়গুলি হইতেছে ব্যক্তিমনসমূহের শরীরের দিক অথবা "চিন্ত্যবিষয়"। অতএব মন ও শরীর সম্বন্ধে স্পিনোজার ধারণা এই :—উহারা হইতেছে এমন দুইটি সমান্তরাল সুবিন্যস্ত সমুদায়, যাহারা একই দ্রব্যে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বিদ্যমান। বস্তুতঃ, ইহাই দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের সমস্যার স্পিনোজা-প্রদত্ত সুপ্রসিদ্ধ সমাধান।

কিন্তু স্পিনোজার উপর এই মত আরোপ করা অন্যায় হইবে যে, তিনি বিশিষ্ট পদার্থ-সমূহকে অর্থাৎ ব্যক্তি-মন অথবা সান্তমূর্ত বস্তু-সমূহকে সম্পূর্ণ অবাস্তব অথবা

অভাবাত্মক বলিয়া মনে করিতেন। অবশ্য, তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে বিশিষ্ট ব্যক্তিপদার্থ সমূহকে উহাদের অবয়বী হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া (abstracting) স্ব-সত্তান্বিত বস্তু বলিয়া ভাবিলে, ঐরূপে উহারা অবাস্তব নিকৃষ্ট পদার্থমাত্র, এবং তখন উহারা আমাদের নিকট অপূর্ণ ও ক্ষণিক এবং নির্দিষ্ট দেশকালে উৎপত্তি বিনাশশীল বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু স্পিনোজা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন, ব্যক্তি-পদার্থ সম্বন্ধে, এই দৃষ্টি ভ্রমাত্মক না হইলেও, অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা আংশিক ও অপূর্ণ। এই দৃষ্টির এই ত্রুটি এত বদ্ধমূল যে, আমাদের সাধারণ দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া, উহা দূর করা সম্ভবপর বলিয়া স্পিনোজা মনে করিতেন না। এমনকি, আমরা যদি ভাবি যে, বিশিষ্ট জড় বস্তু সকল সসীম কার্য ও কারণ সমূহের অন্তহীন ধারার অন্তঃপাতী একএকটি ঘটনা, এবং দেকার্তের ন্যায় যদি আমরা ইহাও মনে করি যে, বিশিষ্ট মনসকল অবিনশ্বর, অথবা উহারা অসংখ্য ক্ষণ-সমূহের অনন্ত ধারার মধ্যেও স্থায়ী থাকে, তাহা হইলেও, এই ত্রুটি সংশোধন করা তিনি সম্ভবপর বলিযা মনে করিতেন না। স্পিনোজার মতে, যদি আমরা সান্তবস্তু-সমূহকে উহাদের যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করি, অর্থাৎ মনে করি যে, উহারা হইতেছে অনন্ত দ্রব্যের মধ্যে এবং তাহারই মাধ্যমে সর্বদা সত্তান্বিত, তাহা হইলে, এই ত্রুটি সংশোধিত হয়। আরও স্পষ্টভাষায় কথাটি এই যে, সান্ত বস্তুর অস্তিত্বের অর্থ শুধু দেশকালীন প্রবাহের মধ্যে একটি ঘটনা হওয়া নহে, কিন্তু উহা ঈশ্বরেব ধর্মরূপে সদ্বস্তুর যে শাশ্বত অনন্ত সত্তা আছে, সেই সত্তা। এইখানেই স্পিনোজার সর্বেশ্বর-বাদের (pantheism) অর্থাৎ "যাহা কিছু আছে তাহাব সবই ঈশ্বর," এই মতের উদ্ভব।

বিশ্বের সম্বন্ধে স্পিনোজার ধারণানুসারে, প্রত্যেক পদার্থই যৌক্তিক অনিবার্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এখানে কোন প্রকার "সম্ভাবনা" (possibility) অথবা "আকস্মিকতা" (contingency) অথবা "অহেতুকত্ব" (chance) নাই, জীবাত্মাসমূহের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়াও কিছুই নাই। তাহার মতে, পরমতত্ত্ব সদাপরিপূর্ণ ও নির্দোষ ; সুতরাং পাপ ও পুণ্য আমাদের নিকট যেই রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপে এই দুইটি শব্দ বস্তুর নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করেনা। কিন্তু উহারা হইতেছে আমাদের পরিবর্তনশীল অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ সাপেক্ষ এবং তজ্জন্য আংশিক ও অপূর্ণ দৃষ্টিতে, বস্তু যেইরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেই আভাসীয় রূপ। সুতরাং স্পিনোজার মতে, নীতিমত্তার জন্য যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব ধরিয়া লইতে হয়, উহারা জগতের সত্যস্বরূপে অবিদ্যমান। তাহা হইলে, স্পিনোজা কি করিয়া

মানুষের আদর্শ অথবা উন্নততর জীবন-যাপনের চেষ্টার কথা বলিতে পারেন? এই প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাহার সত্তাবিষয়ক দার্শনিক মত হইতে নিগমিত। এই দার্শনিক মত বশতঃই, তিনি নৈতিক চেতনার উপরিউক্ত পূর্বগৃহীত পদার্থগুলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

স্পিনোজা তত্ত্ব-শাস্ত্রীয় (metaphysical) মতানুসারে মানুষের মন ঈশ-স্বভাবের একটি অনিবার্য ফল, অতএব নীতি বিষয়ক বিচারের জন্য, মানুষের হৃদয়াবেগ ও আচরণকে অন্যনিরপেক্ষ বিষয়রূপে গণ্য করা সঙ্গত নহে; কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিতেও এইরূপ মনে করাই সঙ্গত হইবে যে, মানুষ নিজে যে উৎস হইতে নির্গত হইয়াছে, উহারাও সেই উৎস হইতেই নির্গত হইযাছে। অবশ্য মানুষরূপে মানুষের একটি সাপেক্ষ স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ নিজ স্বতন্ত্র সত্তায় বিদ্যমান থাকার দিকে একটি প্রবণতা আছে। এই প্রবণতাকে স্পিনোজা ইচ্ছাশক্তি অথবা "বাসনা" (cupiditas) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বাসনা হইতেছে প্রযত্ন (striving), সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), স্বাভাবিক কর্ম-প্রেরণা (impulse) প্রভৃতি অস্মিতা-প্রকাশক একটি সমগ্র স্বরগ্রাম (gamut) অথবা সংগ্রহ। মানুষ যখন তাহার কোন কর্মকে স্বীয় বাসনার দ্বারাই জনিত বলিয়া ভাবে, তখন সে উহাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায কৃত অথবা নিজের স্বরূপ হইতে সঞ্জাত বলিয়া বোধ করে। কিন্তু স্পিনোজা বলেন যে, মানুষের এই ধারণা তাহার প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞান হইতে উত্থিত হয়; কারণ, তাহার স্বরূপ এবং সেইজন্য তাহার বাসনাও চিন্তা ও বিস্তারাত্মক সমগ্র বিশ্বের উপর নির্ভর করে।

তথাপি মানুষের (জীবন ও) আচরণে এই অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, স্পিনোজার মতে, "স্বাধীনতা" এবং "বন্ধন" বা "দাসত্বের" মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের স্বভাবই তাহার সকল কর্মের একমাত্র (নিকটতম) কারণ বলিয়া স্পষ্ট ধারণা করা যায়, ঐ সকল কর্মের ব্যাপারে, সে স্বাধীন। অপরদিকে, যে সকল কর্মের স্পষ্ট ধারণা করিতে গেলে, তাহার স্বভাব ব্যতীত বাহ্য কারণও স্বীকার কবিতে হয়, উহাদের ব্যাপারে, সে অকর্তা অথবা পরাধীন। এইজন্য স্পিনোজা হৃদয়াবেগ রূপ কর্মের উৎসগুলিকে অকর্তৃক ও সকর্তৃক (*passions* and *actions*) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর হৃদয়াবেগ অস্পষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করে; আর উহাদের সুখ বা দুঃখরূপ ধর্ম মনের স্বভাবাতিরিক্ত ও মনের উপর ক্রিয়াশীল নানারকম বাহ্য প্রভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য, উহারা মানুষের মনে, অনুরাগ ও দ্বেষ, ভয় ও ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা প্রভৃতি বিবিধ ঐন্দ্রিয়িক

প্রতিক্রিয়া জন্মায়। ইহাতে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয়াবেগগুলি পর্যাপ্ত ধারণার উপর নির্ভর করে; কারণ, উহারা একমাত্র মনের স্বভাব হইতেই নির্গত হয় এবং সেইজন্য উহারা মনের চিন্তাশক্তিকেই ব্যক্ত করে; আর এই চিন্তাশক্তি মানব চরিত্রের প্রকৃত বল। স্পিনোজার মতে, চরিত্র বলে শক্তিমান ব্যক্তিই স্বাধীন ভাবে কর্ম করেন; নিজের ব্যাপারে তিনি ইন্দ্রিয়জ প্ররোচনার ঊর্ধে থাকিয়া, "মিতাচার" (Temperence), "স্থৈর্য" (Sobriety) প্রভৃতি সদ্গুণ অনুশীলন করিয়া, নিজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করেন; আর অন্যের ব্যাপারে, তিনি "মহাশয়তা" (magnanimity) এবং "উদারতা" (nobility) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, বুদ্ধি-সহকার তাহাদিগকে সাহায্য করিতে এবং তাহাদের সহিত মিত্রের আচরণ করিতে সচেষ্ট থাকেন।

এইভাবে, স্পিনোজা বিশ্বাস করিতেন, একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিই অন্যের ভাল করিতে পারে, এবং যে-ব্যক্তির কর্ম পর্যাপ্ত ধারণা অথবা বিচার বুদ্ধি হইতে নিঃসৃত হয়, তিনি স্বাধীন। সুতরাং ধর্ম জীবন হইতেছে বিচার বুদ্ধির জীবন, অর্থাৎ যে জীবনে সর্বকামনা বিচার বুদ্ধির অধীনে থাকে। তাই স্পিনোজার দৃঢ় মত এই ছিল যে, মানুষের অন্তিম উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বপদার্থের, এমন কি নিজের সম্বন্ধেও পর্যাপ্ত ধারণা গঠন করা। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বস্তু সম্বন্ধেই পর্যাপ্ত ধারণা হইতে পারেনা, অতএব স্পিনোজা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মানুষের অন্তিম উদ্দেশ্য হইতেছে ঈশ্বরকে জানা। তাহার মতে, ঈশ্বরের জ্ঞানই সকল মানুষকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত করার একমাত্র যোগসূত্র; কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মানব-মনের স্বরূপ ধর্ম হইতেছে ঈশ্বরের শাশ্বত ও অনন্ত স্বরূপসম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা।

স্পিনোজা আরও বলেন, পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির মধ্যে কোন প্রকার উত্তেজনা অথবা বিষাদের ভাব নাই; উত্তেজনা ও বিষাদ শুধু আগমাপায়ী ইচ্ছার পূর্তি ও অপূর্তিরই সহচর। তথাপি স্পিনোজা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছিলেন যে, এই পরমপুরুষার্থের প্রাপ্তিতে পরমানন্দের উদাত্ত বৌদ্ধিকচেতনা থাকে। তাহার মতে, এই বৌদ্ধিকচেতনা হইতেছে প্রেমেব সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার। কারণ, "ঈশ্বর বিষয়ক বৌদ্ধিক প্রেমে" (*amor intellectualis Dei*) জ্ঞান ও হৃদয়াবেগ একই সঙ্গে উহাদের চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু স্পিনোজা মনে করিতেন, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানে আমরা স্বকীয় অনন্ততাও উপলব্ধি করি, এবং অন্তিম বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে, ঈশ্বরের অংশ-রূপে আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান-ও তাহাই। অতএব আমাদের ঈশ্বর-

বিষয়ক বৌদ্ধিক প্রেম হইতেছে ঈশ্বরের অংশরূপে আমাদের প্রতি ঈশ্বরেরই "সতত এবং শাশ্বত" প্রেম। স্পিনোজার মতে, ইহাই আমাদের আদর্শ; কারণ উহাই আমাদের মুক্তি অথবা "বন্ধন হইতে পরিত্রাণ"।

এইভাবে, স্পিনোজা তাহার দার্শনিক মতবাদে, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি বিষয়ক বিচার অন্তর্ভুক্ত করিয়া, উহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিলেন। এই দার্শনিক মতবাদ তাহার অধিবিদ্যা-বিষয়ক মতের (metephysical considerations) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতানুসারে, সর্ববিশেষ পদার্থ, এমনকি মানুষের মন ও, স্বরূপে শুধু কতকগুলি স্বভাব্য পদার্থ মাত্র, এবং উহারা ঈশ্বরের অনন্ততা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপগত সত্তাতেই বাস্তবরূপ প্রাপ্ত হয়।

৪। গট্‌ফ্রিড্ ভিলহেল্‌ম্ লাইবনিৎস্ (খৃঃ ১৬৪৬—১৭১৬)

স্পিনোজার ন্যায়, লাইবনিৎস্-ও দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় যুক্তি-বহির্ভূত কথা দূরে রাখিতে ব্যগ্র ছিলেন, এবং তিনি-ও দর্শনের ভিত্তি-রূপে যুক্তিশাস্ত্রের গুরুত্বে কম বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু লোকমতের বিরুদ্ধে স্বীয় বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার জন্য যে সাহস এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সততার প্রয়োজন, যাহা স্পিনোজার ব্যক্তিগত জীবন ও দার্শনিক চিন্তা উভয়েরই প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য, তাহা তাহার ছিল না। ইহার ফলে, তিনি লোক সাধাবণেব জন্য, এক প্রকাব দর্শন এবং আত্ম-তৃপ্তির জন্য অন্য একপ্রকার দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্পিনোজার বিরোধিতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি স্পিনোজার দর্শনেরই মত।

লাইবনিৎস্ প্রত্যক্ষানুভূত জগতের বিশ্লেষণ করিয়া, দেকার্ৎ ও স্পিনোজার সহিত একমত হইলেন যে, কাল অন্তিম সত্তার ধর্ম নহে। ইহার কারণ এই যে, তিনি এই দার্শনিকদের অপর একটি মত-ও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই মতে, দ্রব্যের ধারণাকে দর্শন-বিচারে মৌলিক গুরুত্ব দেওয়া হয়; আবার ইহা-ও স্পষ্ট যে, এই ধারণা পরিবর্তনের অস্তিত্বের সহিত অসমঞ্জস। দেকার্ৎ ও স্পিনোজা উভয়েই বিস্তার ও চিন্তাকে সত্তার ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু লাইবনিৎসের মতে, বিস্তার বিভাজ্য পদার্থ বলিয়া দ্রব্যের ধর্ম হইতে পারে না। কারণ, দ্রব্য স্বরূপতঃ অবিভাজ্য। এর জন্য, লাইবনিৎস্ জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলেন, দ্রব্যের কোন বিস্তার নাই। কিন্তু অন্ততঃ এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশ বা বিস্তার নামক পদার্থটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়; সুতরাং এই প্রতিভাসের

ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই জন্য লাইবনিৎস্ বলেন যে, বিশ্বে বহু দ্রব্য থাকিতে বাধ্য, এবং উহাদের সুশৃঙ্খল বিন্যাস-ই দেশ বা বিস্তারের প্রতিভাসের হেতু। এইভাবে, যেখানে স্পিনোজা একটি মাত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে তাহার পরিবর্তে লাইবনিৎস্ অনন্ত-সংখ্যক দ্রব্য স্বীকার করিলেন। তিনি ইহাদিগকে "চিদণু" (monad) আখ্যা দিয়াছেন।

লাইবনিৎসের মতে, এই সকল চিদণু জড়-পদার্থের অণু নহে ; কারণ, জড়াণুগুলির পরিমাণ থাকে। চিদণুকে গাণিতিক বিন্দু-ও বলা চলে না। কারণ, এই সকল বিন্দুর (বিস্তার না থাকিলেও, দেশে) অবস্থান (position) আছে। বস্তুতঃ লাইবনিৎস্ চিদণুকে ব্যষ্টি-আত্মা-রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। দ্রব্যে বিস্তার-ধর্ম অস্বীকার করিয়া, তিনি চিন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ; চিদণুর ধারণা এই স্বীকৃতির যৌক্তিক পরিণাম। এইভাবে, স্পিনোজা যে জ্ঞাতৃ-কেন্দ্রিক বিচার-প্রবণতা এড়াইয়া চলিযাছিলেন, আধুনিক দর্শনে তাহা লাইবনিৎসের হস্তে পুনঃ-স্থাপিত হইল।

ইহা স্বাভাবিক যে লাইবনিৎস্ চিদণুকে স্বরূপতঃ ক্রিয়াত্মক বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া, তিনি এই বিস্ময়কর মতও প্রতিপাদন করিলেন যে, চিদণুর ক্রিয়া হইতেছে জগৎকে স্বীয় মনোদর্পণে প্রতিফলিত করা—এই ক্রিয়ার বিকশিত রূপ হইতেছে প্রত্যক্ষ (perception), এবং অবিকশিত রূপ হইতেছে স্পৃহা (appetition)। যেহেতু চিদণু মাত্রই প্রত্যক্ষ ও স্পৃহাযুক্ত ব্যষ্টিআত্মা, অতএব লাইবনিৎসের মতে, বিশ্বের অন্তিম উপাদানে কোনরকম জাতিগত ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং বস্তুর অন্তিম বিশ্লেষণে, প্রতীয়মান হইবে যে, ভেদমাত্রই শুধু মাত্রাগত, এবং এই মাত্রাগত ভেদ অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) ও অনভিব্যক্তির (স্পৃহা) তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

লাইবনিৎস্ আরও বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতি কখনও লাফাইয়া চলে না (*Natura non facit Saltum*), কিন্তু উহা সর্বত্র ধারাবাহিকতা অথবা নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের নিয়মের অধীন। তাই তিনি মনে করিতেন, সম্পূর্ণ অবিকশিত চিদণু হইতে আরম্ভ করিয়া মন পর্যন্ত চিদণুগুলি অসংখ্য উচ্চাবচ স্তরের একটি ক্রমিক নিরবিচ্ছিন্ন ধারা নির্মাণ করে। প্রথম শ্রেণীর চিদণুগুলির ধারাটি নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। সুতরাং সর্বাপেক্ষা অবিকশিত অথবা বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অর্থাৎ, অচেতন মানসিক অবস্থা (*petite* perceptions) হওয়াই উহাদের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ লাইবনিৎসের মতে, এইসকল চিদণুই জড় পদার্থের উপাদান। কিন্তু মন অভ্রান্ত

চিদণু অপেক্ষা বিশ্বকে অধিক স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে প্রতিফলিত করে। এইদিক হইতে, উহা তাহাদের তুলনায় অধিক উন্নত। তাহাছাড়া মনের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, চেতন ও অচেতন অবস্থা ব্যতীত উহার স্বসংবেদন আছে।

চিদণু সমূহের উচ্চাবচস্তরের ধারাটি অন্তহীন এবং অবিচ্ছিন্ন হওয়ায় লাইবনিৎস্ এই মত পোষণ করিতেন যে, বিশ্বে কোথাও শূন্যস্থান থাকিতে পারেনা। ধারার প্রত্যেকটি সম্ভাব্য স্তরেই, কোন না কোন শ্রেণীর একটি চিদণু বিদ্যমান; এবং যেহেতু উচ্চাবচ স্তর সমূহের অবিচ্ছিন্ন ধারায়, প্রত্যেকটি স্তরই অন্যান্য স্তর হইতে বিসদৃশ, অতএব কোন দুইটি চিদণুর মধ্যেই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিতে পারেনা। ইহাকেই লাইবনিৎস্ "দুর্লক্ষ্য ভেদবান্ পদার্থ-সমূহের অভেদ"—তত্ত্ব (Identity of Indiscernibles) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দেকার্ৎ মন ও জড় পদার্থের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন বলিয়া, তাঁহার অনুযায়ীরা এই মত পোষণ করিতেন যে, এই দুই দ্রব্য পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারেনা। অবশ্য, লাইবনিৎস্ উহাদিগকে সবশ্রেণীর পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি তিনিও এই সকল দার্শনিকের ন্যায়, এই মত সমর্থন করিতেন যে, প্রত্যেকটি চিদণু অন্য সকল চিদণু হইতে স্বতন্ত্র, এবং কোন দুইটি চিদণুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারেনা। চিদণু সকল "বাতায়ন-বিহীন", তাহার এই প্রসিদ্ধ উক্তিতে পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এইমত গ্রহণের ফলে, যে সকল সমস্যা উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সংক্রান্ত। লাইবনিৎসের ধারণানুসারে, চিদণুর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলিতে বিশ্বকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করা বুঝায়। অথচ এই প্রতিফলন প্রত্যক্ষকারীর উপর প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, লাইবনিৎস্ বলিলেন, চিদণুতে বিশ্বের প্রতিবিম্ব পড়ার কারণ ইহা নয় যে, বিশ্ব উহার উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু উহার প্রকৃত কারণ হইতেছে, এই যে, ঈশ্বর চিদণুগুলিকে এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, একের অবস্থা পরিবর্তনের সহিত, অন্য সকলেরই অবস্থা পরিবর্তনের সামঞ্জস্য থাকে। এই প্রাঙ-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যই (pre-established harmony) ভ্রান্তি-বশতঃ পরস্পরের উপর ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হয়।

লাইবনিৎসের প্রাঙ্-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য বাদ স্পষ্টতঃই প্রসঙ্গবাদের ন্যায় কাল্পনিক। অবশ্য, দ্বিতীয় মতে, বহু অতিপ্রাকৃত ঘটনা কল্পনা করিতে হয়; কিন্তু প্রথম মতে উহাদের পরিবর্তে শুধু একটি মাত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনা রাখা হইয়াছে। লাইবনিৎসের বিবেচনায়, এই প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট সামাঞ্জস্যবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সূচনা করে বলিয়া

উহার এই কাল্পনিকতাদোষের বহুগুণে ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইহাতে প্রসঙ্গবাদের তুলনায় যে বিশেষ সুবিধা হইল, তাহা নহে। কারণ, প্রসঙ্গবাদে ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই গৃহীত থাকে, এবং প্রাঙ্-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যবাদে যে-ধরনের ঈশ্বর প্রমাণ করা সম্ভবপর, তাহা প্রসঙ্গবাদীয় ঈশ্বরের মতই কৃত্রিম দেবতা মাত্র।

কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য, লাইবনিৎস্ একমাত্র পূর্বনির্দিষ্ট সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করেন নাই। তাহার মতে, চিদণু-সকল কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিবর্জিত হইয়াও, পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্রিয়া করে। দেকার্তীয় চিন্তা-ধারার সহিত অপরিচিত যে-কোন ব্যক্তি এইমত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। তাহা ছাড়া, লাইবনিৎস্ নিজেই বিশ্বাস করিতেন যে, শুধু তাহার এই মত গ্রহণ করিলেই, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের যুক্তটি প্রামাণিক হইতে পারে, অন্যথায় নহে। কিন্তু লাইব-নিৎস্ মনে করিতেন যে, অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিটি (ontological argument) পৃথক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরম্পরাগত আকারে যুক্তিটি যে প্রকল্পনার উপর স্থাপিত, তাহা এই যে, ঈশ্বর হইতেছেন পূর্ণতমসত্তা। এই প্রকল্পনার সত্যতা মানিয়া, পরে বলা হয় যে, যদি ঈশ্বর অস্তিত্ববান না হন, তাহা হইলে, তিনি পূর্ণতম সত্তাই নহেন। কিন্তু এই যুক্তির আলোচনায়, লাইবনিৎস্ অনুভব করিলেন যে, যুক্তিটিকে কার্যক্ষম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করা দরকার যে, ঈশ্বরে সর্বপূর্ণগুণের সমাবেশ করিলে, কোন অসামঞ্জস্য ঘটে না এবং এইজন্য পূর্ণতমসত্তা যাহার লক্ষণ, এইরূপ ঈশ্বর সম্ভবপর। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, তিনি এই যুক্তি দিলেন যে, পূর্ণতা হইতেছে "এমন একটি অমিশ্রধর্ম, যাহা ভাবাত্মক ও অন্যনিরপেক্ষ, এবং উহা যাহা ব্যক্তকরে তাহাই অন্তহীন বলিযা ব্যক্ত করে"; অতএব এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সর্বপূর্ণতা ঈশ্বরে একই সঙ্গে থাকিতে পারে। কিন্তু সত্তা-সম্বন্ধীয় যুক্তির এই নূতন অংশটিতে প্রকৃতপক্ষে লাইবনিৎস্ শুধু তাহার এই সাধারণ বিশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহা যুক্তি-শাস্ত্রানুসারে সম্ভবপর নহে তাহা অস্তিত্ববান্ অথবা বাস্তব হইতে পারেনা। কিন্তু পরবর্তী কালে, সত্তাসম্বন্ধীয় যুক্তির বিরুদ্ধে, কাণ্ট আপত্তি তুলেন যে অস্তিত্ব কখনও বিধেয় বা বিশেষণ হইতে পারেনা। লাইবনিৎসের নূতন যুক্তিতে-ও এই আপত্তি দূর করার কোন ব্যবস্থা নাই।

লাইবনিৎস্ তাহার "চিদণু-বিজ্ঞান", "প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক তত্ত্বসকল" এবং "ঈশ্বর বিষয়ক বিজ্ঞান" ("Monadology", "The Principles of Nature and of Grace" এবং "Theodicee") নামক প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে যে-দর্শন প্রতিপাদন

করিয়াছেন, তাহার মূলে বিরোধ-বিষয়ক নিয়ম (Law of contradiction) ও পর্যাপ্ত কারণের নিয়ম (Law of sufficient reason), এই দুইটি তর্কশাস্ত্রীয় তত্ত্ব রহিয়াছে ; আবার এই নিয়ম দুইটিকে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। যে-সকল উক্তি প্রথম নিয়মটির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাদের সত্যত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লাইবনিৎসের মতে, যে-সকল উক্তিতে কোন কিছু আছে বলা হয়, অর্থাৎ যাহাদের বর্ণিত বস্তুগুলি হইতেছে দেশ ও কালান্তঃপাতী কোন ঘটনা, তাহারা দ্বিতীয় নিয়মটির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহাদের সত্যতা শুধু সম্ভবপর অথবা আকস্মিক (অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা অসিদ্ধ)। তিনি মনে করিতেন যে, যৌক্তিক দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব এবং তদন্তর্বর্তী যেকোন বিশিষ্ট পদার্থের পক্ষে অস্তিত্ববান না হওয়া সম্ভবপর নহে। অবশ্য, বিশ্ব-অনাদিকাল হইতেই অস্তিত্ববান ; কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এমন কোন হেতু বিদ্যমান নাই, যাহা হইতে উহা কেন অস্তিত্ববান, তাহা বলা যাইতে পারে। সুতরাং বিশ্বের বাহিরে উহার অস্তিত্বের একটি পর্যাপ্ত কারণ থাকিতে বাধ্য ; এবং উহার অস্তিত্বের এই কারণ ঈশ্বর-ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারেনা। এই ভাবে, লাইবনিৎস্ বিশ্বকারণ-বিষয়ক যুক্তিটিকে (Cosmological argument) পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু উহাতে যে ঈশ্বরকে আদি (বিশ্বাতীত) কারণ বলা হইযাছে, তাহার পরিবর্তে তিনি এই অধিক সন্তোষজনক ধারণা প্রবর্তন করেন যে, ঈশ্বর হইতেছেন জগতের পর্যাপ্ত কাবণ। এতৎ-সত্ত্বেও, তাহার এই যুক্তি সত্তা-সম্বন্ধীয় যুক্তির উপরই নির্ভর করে। কাণ্ট দেখাইয়াছেন যে, বিশ্ব-কারণ-বিষযক পরম্পবাগত যুক্তিটিও সেইরূপ। কারণ, যদি আমরা ধরিয়া না লই যে, স্বয়ং ঈশ্বর এমন একটি সত্তা, যাহার স্বরূপের সহিত উহাব অস্তিত্বও জড়িত, তাহা হইলে, ঈশ্বরকে জগতের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত কারণ বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

লাইবনিৎস্ অন্য এক আকারেও বিশ্ব-কারণ-বিষয়ক যুক্তির আশ্রয় লইযাছিলেন। এই নূতন আকারে, যুক্তিটি সম্ভাব্য সত্য হইতে সাক্ষাৎ ভাবে নহে, কিন্তু প্রথমতঃ উহা হইতে নিত্য অথবা অবশ্যম্ভব সত্তা প্রমাণ করিয়া, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধ করে। তাহার মতে, সম্ভাবনা জ্ঞাপক বাক্যগুলির মধ্যে উহাদের সত্যতা নির্ধারক হেতু অবিদ্যমান ; আবার সত্যতা নির্ধারক এই হেতু নিজে শুধু সম্ভবপর হইলে চলিবেনা। উহা কোন না কোন চিরন্তন সত্য হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাহাছাড়া, যাহা নিজে অস্তিত্ববান নহে, তাহা কখনও কাহারও অস্তিত্বের হেতু হইতে পারেনা। অতএব লাইবনিৎসের সিদ্ধান্ত এই যে, যাহা চিরন্তন সত্য তাহা নিশ্চয়ই অস্তিত্ববান ; এবং উহার অস্তিত্ব কেবল কোন চিরন্তন

মনে অর্থাৎ ঈশ্বরেই থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই যুক্তিটি বিশ্বকারণবিষয়ক যুক্তিরই প্রকারভেদ, অতএব উপরিবর্ণিত আপত্তিটি উহার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া; যুক্তিটিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সত্যের-অস্তিত্ব আছে, এবং তাহা স্বীয় অস্তিত্বের জন্য নিজের জ্ঞাতার উপর নির্ভর করে, অথচ এই কথা সমর্থনের অযোগ্য।

পর্যাপ্ত হেতুর নিয়ম পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিলে, ইহা-ও মানা দরকার যে, ক্রিয়া মাত্রই যৌক্তিক অনিবার্যতার সহিত সংঘটিত হয়, এবং সেইজন্য কোথাও আকস্মিক ঘটনা অথবা নির্বাচনের স্বাধীনতা (freedom of choice) থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বরের কার্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, লাইবনিৎস্ স্পিনোজার মতের বিরুদ্ধে, স্বীকার করিলেন যে, মানুষ ও ঈশ্বর উভয়েরই স্বাধীন ইচ্ছা আছে—এই মত অন্ততঃ তাহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের কার্যের পশ্চাতে কোন কিছু প্রেরণা থাকে বটে, তথাপি লাইবনিৎসের মতে, উহাতে কোন প্রকার যৌক্তিক অনিবার্যতা নাই। মানুষ সমভাবে সম্ভবপর কয়েকটি বিভিন্ন কর্ম হইতে, যে-কোন একটিকে বাছিয়া লইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন। কারণ, তাহার মতে, ঈশ্বরের পক্ষে-ও বহু বিভিন্ন রকমের জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর। সৃষ্টির পূর্বে, ঈশ্বর যে-সকল অনন্ত সংখ্যক বিভিন্ন সম্ভবপর জগতের কথা ভাবিয়াছিলেন, আমাদের বাস্তব সৃষ্ট জগৎ তাহাদের মধ্যেই একটি। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি কার্য-ও কোনরকম যৌক্তিক অনিবার্যতার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। কিন্তু বিচারান্তে লাইবনিৎসের ইহাও মনে হইল যে, ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ-সৃষ্টি যদৃচ্ছা বা খামখেয়ালের বশে হইতে পারেনা; কারণ, যে জগৎ সম্ভবপর তাহা যুক্তি শাস্ত্রীয় নিয়মের বিরোধী নহে। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট যে-সকল জগৎ সম্ভবপর ছিল, তাহাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে বাছিয়া লওয়ার সুবিশাল স্বাধীনতা-ই এই সৃষ্টির উৎস।

কিন্তু বহু জগতের সম্ভাব্যতা এবং ঈশ্বরের স্বাধীনতা এই দুইটিকে ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট করায়, লাইবনিৎস্‌কে এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইল, যাহা হইতে স্পিনোজা মুক্ত ছিলেন। প্রশ্নটি এই যে, বহু সম্ভবপর জগতের মধ্যে ঈশ্বর যে-জগৎটিকে বস্তুতঃ সৃষ্টি করিলেন, ঠিক ঠিক উহাকেই কেন তিনি বাছিয়া লইলেন? লাইবনিৎস্ উত্তর দিলেন: কারণ, বাস্তবজগতই সম্ভাব্য জগৎগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহার মতে, সর্বোত্তম জগতে যে মন্দ বা কু-এর স্থান নাই, এমন নহে—উহা হইতেছে এমন জগৎ, যাহাতে কু-এর তুলনায় সু অধিকতম

পরিমাণে বেশী। লাইবনিৎস্ যথেষ্ট সমর্থনসহ এই কথাও বলিলেন যে, কতক খারাপ জিনিষ যে-কোন সম্ভাব্য জগতেই থাকিতে বাধ্য, যথা পদার্থ সমূহের অপূর্ণতা এবং পরিচ্ছন্নতা। এইগুলিকে তিনি "পরমতাত্ত্বিক কু" (metaphysical evil) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই এমন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, যেখানে নৈতিক অমঙ্গল অথবা পাপ নাই। কিন্তু তাহা করিলে, তিনি মানুষকে স্বাধীনেচ্ছাসমন্বিত করিতে পারিতেন না। অথচ এই স্বাধীন ইচ্ছা একটি অত্যন্ত মঙ্গলকর জিনিষ; এবং মানুষকে স্বাধীনেচ্ছা সমন্বিত করিতে না পারিলে, তিনি তাহার ধর্মার্জনের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রাখিতে পারিতেন না। লাইবনিৎস্ আরও বলিলেন, এই ভাবে নৈতিক অমঙ্গল থাকিতে দেওয়ার ঐশ্বরিক ইচ্ছা সমর্থনযোগ্য হইলেও, তাহার পক্ষে ঐ সঙ্গে এইরূপ ইচ্ছা করা সম্ভবপর ছিল না যে, জগতে দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি শারীরিক অমঙ্গলও থাকিবে না; কারণ শারীরিক অমঙ্গল না থাকিলে, পাপের শাস্তি সম্ভবপর নহে। অমঙ্গল-বিষয়ক সমস্যার লাইবনিৎস্-প্রদত্ত সমাধানটির গুণ এই যে, উহা জগতে ভাল ও মন্দ দুই-ই আছে—এই স্পষ্ট সত্যের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের বাস্তব জগতে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল অত্যধিক পরিমাণ বেশী, তাহার এই প্রকল্পনা আশাবাদ সমর্থন করিলেও, উহার সত্যতা বিতর্কের বিষয়।

বিস্তার হইতেছে প্রতিভাস মাত্র, উহা নিসর্গের প্রকৃত ধর্ম নহে, স্পিনোজার বিরুদ্ধে এই মত পোষণ করায়, এবং তজ্জন্য অনন্ত-সংখ্যক বাতায়ন-হীন চিদণুর পরমার্থিক সত্তা স্বীকার করায়, লাইবনিৎস্ তাহার দর্শনে বিশ্বের অঙ্গাঙ্গিমূলক ঐক্যটিকে ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু চিন্তা বা জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া, এবং প্রত্যেক চিদণুতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিফলিত হয়, এই মত গ্রহণ করিয়া, তিনি এই ঐক্য পুনঃস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে, স্পিনোজার মতের তুলনায়, লাইবনিৎসের মতের পার্থক্য এইরূপ দাঁড়াইল: প্রথম দার্শনিক বৃহৎ বিশ্ব ও ক্ষুদ্র বিশ্বের সম্বন্ধটিকে বিস্তার-চিন্তা-সমন্বিত ঈশ্বরে, আর অপর দার্শনিক এই সম্বন্ধটিকে প্রত্যেক চিদণুতে অন্তর্ভুক্ত করিলেন। যতক্ষণ লাইবনিৎস্ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিশ্বের সম্বন্ধ-বিষয়ক স্বীয় মতের দোষ লক্ষ করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ অবশ্য তিনি স্পিনোজার সহিত তাহার মতানৈক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একদিকে চিদণুগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আবার অপর দিকে সমগ্র বিশ্বের-ও একটি অঙ্গাঙ্গিমূলক ঐক্য আছে, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? যখন লাইবনিৎস্ এই সমস্যা সমাধানের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, তখন তাহার দার্শনিক চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা

দেখা দিল, এবং এখন পর্যন্ত তাহার যে-মতের বিবৃতি আমি এখানে দিয়াছি, তাহা তিনি অতিক্রম করিতে প্রণোদিত হইলেন।

তিনি পূর্বে জগৎ এবং ঈশ্বরের অর্থাৎ চিদণু-সকলের ও চিদণুর (monad of monads) মধ্যে যে ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, উহার পুনরালোচনা লাইবনিৎসের নূতন মতের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের মনে যে অনন্ত সংখ্যক সম্ভাব্যজগতের কল্পনা আছে, সর্বচিদণুসমেত বাস্তব-জগৎ (উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও) উহাদেরই অন্যতম। তাই লাইবনিৎসের মতে, ঈশ্বর-বাস্তব জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা, যাহা অব্যক্তরূপে জগতের অভিব্যক্ত রূপকে অতিক্রম করেন। কিন্তু লাইবনিৎসের মূল তত্ত্বগুলির প্রামাণ্য মানিয়া লইলেও, এই মতটিকে সমর্থন করা অসম্ভব। কারণ, তাহার দৃষ্টিতে, চিদণুসকলের ন্যায় ঈশ্বরের স্বরূপ-ও চিন্তা; এমত অবস্থায়, অভিব্যক্ত অথবা বাস্তবরূপ ধারণ না করিয়া, ঈশ্বরের পক্ষে চিদণু-গুলির কোন রকম সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই অর্থাৎ কোন রকম সম্ভাব্য জগৎকেই চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং লাইবনিৎস্ বলিতে বাধ্য হইলেন যে, অনন্যসাপেক্ষ পূর্ণ সত্তার অর্থাৎ ঈশ্বরের, ধারণার সহিত তাঁহার বীজাবস্থার, অথবা অব্যক্ততার ধারণা অসমঞ্জস। তাই লাইবনিৎসের দর্শনে, পুনরায় স্পিনোজীয় মত আবির্ভূত হইল।

লাইবনিৎস্ প্রথমে অবশ্যম্ভাবিতাবোধক (necessary) বাক ও সম্ভাব্যতা-বোধক (contingent) বাক্যের মধ্যে যে-ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এখন তিনি, স্পিনোজার সহিত একমত হইয়া, পরিত্যাগ করিলেন, এবং এই নূতন মতগ্রহণ করিলেন যে, উহাদের ভিত্তি-স্থানীয় বিরোধ-বিষয়ক ও পর্যাপ্ত-হেতু—বিষয়ক নিয়ম দুইটির অর্থ মূলতঃ এক, এবং তাহা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক যথার্থ বাক্য বিশ্লেষণজ। সুতরাং তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-বিষয়ক তথাকথিত প্রত্যক্ষজ বাক্যের আকারও উদ্দেশ্যবিধেয় ঘটিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ সেখানে-ও উদ্দেশ্য হইতেই বিধেয়ের নিগমন হইতে পারে। সুতরাং ঈশ্বর, মানুষ বা জড়বস্তু, যে পদার্থই হউক না কেন, তাহাতে যাহা ঘটে, অথবা তাহা যাহা করে, তাহার ধারণা ঐ পদার্থের ধারণার মধ্যেই সর্বদা নিহিত থাকে। এই ভাবে, জগৎ-সম্বন্ধে লাইবনিৎস এমন একটি মত পোষণ করিতে লাগিলেন, যাহা স্পিনোজার মতের ন্যায় সমভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ। অবশ্য, তাহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে তিনি এই মতের কোন উল্লেখ করেন নাই।

লাইব্নিৎস্ আর এক বিষয়েও সর্বযুক্তি বহির্ভূত কথা বর্জন করিয়া, কেবল শুদ্ধ তর্কশাস্ত্রীয় নিয়মের মধ্যে, নিজ বিচার সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিষয়টি এই। পদার্থের অস্তিত্বের নিমিত্ত, তিনি তাহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তে, তিনি এখন এক নূতন পদ্ধতির সূচনা করিলেন। প্রথম পদ্ধতিটি এই যে, জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ কল্যাণকরত্বের সহিত যে সকল পদার্থের সামঞ্জস্য আছে, কেবল তাহাদেরই অস্তিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীটিতে, ঈশ্বরের সম্বন্ধ বর্জন করা হইয়াছে, এবং উহা লাইবনিৎসের নিম্নলিখিত মত হইতে বুঝিতে পারা যায় : দুই বা ততোধিক পদার্থের অস্তিত্ব শুধু তখনই স্বীকার্য, যখন উহারা পরস্পরের সহিত "সহ সম্ভাব্য" (অথবা যখন উহারা একইসঙ্গে সম্ভবপর) হয়, অর্থাৎ যখন তাহাদের সহাস্তিত্বে কোন যৌক্তিক বিরোধ উৎপন্ন হয়না।

লাইবনিৎস্ ভাবিয়াছিলেন, পদার্থ, বিষযক এই যুক্তি-সম্মত দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট করা সম্ভবপর, এবং তখন গাণিতিক পদ্ধতিতে বর্ণিত এমন কতক অকাট্য তত্ত্ব পাওয়া যাইবে, যাহাদের সাহায্যে যুক্তিশাস্ত্রীয় বিচার ও গণিত শাস্ত্রেব ন্যায় একেবারে নির্ভুল হইতে পারিবে। যদিও লাইবনিৎসের এই ধারণার ভিত্তিতে "গাণিতিক তর্কবিদ্যা" (mathematical logic) নামক একটি জ্ঞানের নূতন শাখার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তথাপি তাহার নিজ দর্শনে উহার প্রায় কোন প্রভাবই পড়ে নাই। কারণ, তাহার এই ধারণাটিকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, এরিষ্টটলের যে-মতবাদে বিরোধ বিষযক নিয়মের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়, অর্থাৎ উক্তি-মাত্রই উদ্দেশ্য-বিধেয় ঘটিত এইরূপ মনে করা হয়, সেই মতবাদ হইতে ভিন্ন অপব একটি যুক্তি-শাস্ত্রীয় মত গ্রহণ করা দরকার ; অথচ লাইবনিৎস্ তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি বলিতে হইবে যে, লাইবনিৎস্ তাহার যুক্তিশাস্ত্রীয় মতের এই সঙ্কীর্ণতা কিযদংশে দূর করিযাছিলেন। কারণ, তিনি শেষপর্যন্ত অনন্তসংখ্যক চিদণুব অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ; এবং ইহা স্পষ্টতঃই বাক্য-সম্বন্ধে উদ্দেশ্য বিধেয়কতা-বাদেব সহিত সমঞ্জস নহে। এই ভাবে, স্বীয় মতের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য দ্বারাই লাইবনিৎস্ নিজেকে স্পিনোজার অদ্বয়বাদ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ও স্পিনোজা উভয়ে যে-যৌক্তিক মতবাদ সমর্থন করিতেন, উক্ত অদ্বয়বাদ তাহার অনিবার্য ফল।

৫। উপসংহার

দেকার্ৎ-প্রবর্তিত দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যম্ভব সত্যলাভ করা। সুতরাং তাহার পরিবর্তে যে-দার্শনিকগণ, একের পর এক, এই চিন্তা-ধারায় যোগদান

করেন, তাহারা সকলেই নিজ নিজ দর্শন তর্কশাস্ত্রের বিরোধ বিষয়ক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্পিনোজা এই বিষয়ে অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। তিনি তাহার দার্শনিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে এই নিয়ম অবিচলিতভাবে পালন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবিষয়ক এমন কোন সত্য নাই, যাহা কোন অবশ্যম্ভব সত্য হইতে উপপাদন করা অসম্ভব; এবং এমন কোন বিশিষ্ট পদার্থ-ও বাস্তবে থাকিতে পারে না, যাহা স্বরূপগতসত্তার, বা দ্রব্যের, অথবা একমাত্র বাস্তব সত্তান্বিতের, প্রচ্ছন্ন শক্তি কিংবা প্রকার নহে। লাইবনিৎস্ স্পষ্টভাবে দেখাইযাছিলেন যে, ইন্দ্রিযগ্রাহ্য পদার্থ-বিষয়ক সত্যগুলি অবশ্যম্ভব নহে, কিন্তু সম্ভাব্য মাত্র; সুতরাং উহারা বিরোধ-বিষয়ক নিয়ম হইতে ভিন্ন অন্য কোন তর্কশাস্ত্রীয় তত্ত্বের উপর, অর্থাৎ পর্যাপ্ত হেতুর নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্রব্যের তথাকথিত রূপ-ভেদগুলি উহার অব্যক্তরূপ মাত্র নহে, কিন্তু উহারা নিজেরাই চিদণু নামক বাস্তব পদার্থ অথবা দ্রব্য। কিন্তু ইহার পূর্বে, কোন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকই স্পিনোজীয মতের যৌক্তিক ত্রুটিটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তথাপি স্পিনোজার প্রভাব অতিক্রম করার মত শক্তি লাইবনিৎসের ছিল না, এবং সেইজন্য তিনি তাহার তর্কশাস্ত্রীয নূতন আবিষ্কারের সম্পূর্ণ তৎপর্য স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইযাছি।

লাইবনিৎসের পর, বুদ্ধিবাদী চিন্তা-ধারা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহার শিষ্য ভল্‌ফ্ (Wolf) দর্শন-শাস্ত্রে লাইবনিৎসের প্রধান প্রধান অবদানগুলির মধ্যে অধিকাংশগুলিরই গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি লাইবনিৎসের অবশ্যম্ভব সত্য ও সম্ভাব্য সত্যের ভেদের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহাদিগকে দুই বিভিন্ন প্রকার সত্তার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া ভাবেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে, সত্তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, এমন কতকজ্ঞান আছে, যাহা শুধু ধারণা হইতে উপপাদন করা যায়, আবার এমন কতকজ্ঞান আছে, যাহা শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে পাওয়া সম্ভবপর। ভল্‌ফ্ এইভাবে লাইবনিৎসের সহিত একমত হইয়া, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের যেটুকু গুরুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহা "মানুষের সর্বধারণা ও কল্পনা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়," লকের এই মতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কিন্তু হিউম-কর্তৃক এই লকীয় মতের যৌক্তিক ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের পূর্বে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদীয় দৃষ্টির পূর্ণ গুরুত্ব পাশ্চাত্ত্য দর্শনজগতে অনুভূত হয় নাই। হিউম্ দেখাইলেন যে, স্বরূপগতসত্তা অথবা দ্রব্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারেনা; তাহা ছাড়া, প্রকৃত অর্থে, এমন কোন জ্ঞানও

থাকিতে পারেনা, যাহা নিশ্চিত ভাবে সার্বিক এবং অবশ্যম্ভব। তাহার মতে, অস্তিত্ববান্ পদার্থ মাত্রই কালানুবিদ্ধ, (অর্থাৎ পূর্বাপর ক্রম-যুক্ত); আমাদের পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান সংশ্লেষ দ্বারা উৎপন্ন হয় ; এবং এইজন্য উহার সত্যতা অবশ্যম্ভবই হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এইভাবে, পাশ্চাত্য দর্শনজগতে বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের উদয় হইল। এই সঙ্কট-কালে দর্শনের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা হইতেছে দর্শনের মূল সমস্যাগুলিকে পুনরায় আলোচনা করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণ করা। কাণ্ট তাহার সমালোচনামূলক দর্শনে (critical philosophy) এই কার্য সম্পাদনেই উদ্যোক্ত হইযাছিলেন। ইহার ফলে, তিনি পাশ্চাত্য দর্শনেতিহাসে এক নবযুগ প্রবর্তন করিলেন।

গ্রন্থবিবরণী

বুদ্ধিবাদ

দেকার্ৎ

তাহার দর্শনের প্রথম বিবৃতি তদীয Rules for the Direction of the Mind নামক পুস্তকে পাওযা যায। তাহার প্রধান দার্শনিক গ্রন্থগুলি এই :—*Discourse on Method, Meditations on the First Philosophy, Principles of Philosophy* (a compendium of his Philosophical views).

দেকার্তের গ্রন্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও সমালোচনাত্মক কযেকটি গ্রন্থের নাম এই : —

Kemp Smith, Norman ; *Studies in Cartesian Philosophy*, 1902.
Gilson, E .·. *La Liberte Chez Descartes et la Theologie*, 1913.
Hoffmann, A .·. *Rene Descartes*, 1922.
Roth, L .·. *Spinoza, Descartes and Maimonides*, 1924.
Gibson, A. Boyce ; *Philosophy of Descartes*, 1933.

গুয়েলি ও মালেব্রাঁশ্

প্রথম দার্শনিকের প্রধান গ্রন্থগুলির নাম : *Logic, Ethics, Methodus* ; দ্বিতীয় দার্শনিকের গ্রন্থগুলির নাম : *De la Recherche de la Verite, Entretiens Sur Metaphysique et sur la Religion.*

বুদ্ধিবাদ

ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ মালে ব্রাঁশের ছাত্রগণ নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঠে লাভবান হইবেন :

Church, R. W. : *A Study in the Philosophy of Malebranche*, 1931.

স্পিনোজা

তাহার প্রথমদিকের মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি হইতেছে—*Concerning the Improvement of the Understanding, Treatise Concerning God and Man, Tractatus Theologico-Politicus, Tractatus Politicus.*

শেষের দিকে, তাহার দর্শন যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা তাহার প্রধান গ্রন্থ এথিক্স্-এ (Ethics) লিপিবদ্ধ আছে।

স্পিনোজা সম্বন্ধে যে বহু সংখ্যক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিতগুলি দ্রষ্টব্য :

Joachim, H. H. *A : Study of the Ethics of Spinoza*, 1901.
Fischer, Kuno. : *Spinoza*, 1909.
Pollock, F. : *Spinoza, His Life and Philosophy*, 1911.
Brunschvicg, L. : *Spinoza et Ses Contemporains*, 1923.
Roth, L. : *Spinoza*, 1929.
Hallett, H. F. : *Aeternitas.*

লাইবনিৎস্

সর্বসাধারণের জন্য তিনি যে দর্শন প্রণয়ণ করেন, তাহা তাহার *Monadology* ও *Principles of Nature and of Grace* গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক তাহার প্রধান গ্রন্থ হইতেছে *Theodicee*। দর্শনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মূল্যবান্ : *Nova Methodus pro Maximis et Minimis* এবং *De Scientia Universali seu Calculo Philosophico.*

R. Lata কর্তৃক সম্পাদিত এবং অনূদিত Monadology গ্রন্থে লাইবনিৎসীয় দর্শনের একটি উত্তম ভূমিকা আছে। ঐ একই বিষয়ে, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ মূল্যবান :

Russell, Bertrand. : *A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz*, 1900.
Couturat, L. : *La Logique de Leibniz*, 1901.
Cassirer E. : *Leibniz System in seinem Wissenchaftlichen Grundlagen*, 1902.
Wundt, W. : *Leibniz*, 1917.

ভল্‌ফ্

ইনি সত্তাশাস্ত্র, বিশ্বতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ ল্যাটিন ও জার্মান এই দুই ভাষাতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; এই সকল বিষয়ে জার্মান ভাষায় লিখিত তাহার রচনাগুলিকে *Rational*

Thoughts এই নাম দেওযা হইযাছিল। ল্যাটিন ভাষায, তাহার প্রধান গ্রন্থগুলি এই : *Philosophia Prima sive Ontologia, Cosmologia, Psychologia Empirica, Rationalis, Theologia Naturalis.*

ভল্‌ফেব শিষ্যদেব মধ্যে *Systema Causarum Efficientium* নামক পুস্তকের প্রণেতা Knutzen এবং *Metaphysica* নামক গ্রন্থেব বচযিতা Baumgarten এব মতেব দিকে কাণ্ট বিশেষ লক্ষ্য দিযাছিলেন। Metaphysica বম্‌গার্টেনেব প্রধান গ্রন্থ।

সমগ্রভাবে এই যুগেব দর্শনেব বিবৃতিব জন্য সাধাবণ পাঠক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিব সাহায্য লইতে পাবেন।

Erdmann, G. E. : *History of Philosophy*, Vol. II Fourth Edition reprinted, 1922
Adamson, R. : *Development of Modern Philosophy*. Ed by W. R. Sorley, 1930.
Russell, Bertrand : *History of Western Philosophy* 1946.

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism)

১। উপক্রমণিকা

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকে বিশিষ্ট কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত না বলিয়া বরং মনের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বলাই সঙ্গত। এইজন্য সর্বযুগে এবং সর্বদেশে, দর্শনের ইতিহাসে, উহা পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। যে সকল দেশে দার্শনিক চিন্তার কিছু ঐতিহ্য আছে, তাহাদের মধ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায়, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই-ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ প্রমাবিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট মতরূপে সর্বাপেক্ষা কম প্রচলিত ছিল। স্থূল অর্থে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ বলিতে এই বিশ্বাস বুঝায় যে, যেহেতু দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিশদ ও বোধগম্য করা, অতএব ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ পদার্থের আলোচনা হইতেই দর্শন-বিচার আরম্ভ করিতে হইবে, এবং পরিশেষে স্বীয় মতবাদের চূড়ান্ত সমর্থনের জন্য ঐ অনুভূতির নিকটেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। দার্শনিক আলোচনা মানুষের অনুভূতি হইতেই আরম্ভ হয়, এই কথা সম্ভবতঃ সর্বদর্শন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সত্য; কারণ, যদিও দার্শনিক বিচার আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতক্ষেত্র হইতে বহুদূরে বেদান্তীর ব্রহ্মা প্লেটোর মূল আদর্শ অথবা কাণ্টের স্বরূপস্থ-বস্তু প্রভৃতি পদার্থের ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারে, তথাপি এই কথা সত্য যে, দর্শন আমাদের অনুভূতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ও আলোচনা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে।

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সর্বদর্শনেরই আরম্ভ অনুভূতি হইতে; কিন্তু প্রত্যেক দর্শনই যে শেষে অনুভূতির নিকট ফিরিয়া আসে, এবং যে সকল প্রশ্ন হইতে দর্শনের আরম্ভ বা উৎপত্তি তাহাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দার্শনিকগণ সত্যের অনুসন্ধান করিবার সময় যে মূল প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কারের জন্য তাহারা দর্শনচর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাই অনেকস্থলে ভুলিয়া যান; এবং তাহাদের আবিষ্কৃত নূতন সত্যটি দ্বারা এতই মোহিত হইয়া যান যে, ঐ সত্যটি তাহাদের প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর কিনা; অথবা যে অনুভূতিলব্ধ তথ্য হইতে তাহাদের বিচারের আরম্ভ তাহার সঙ্গে উহা খাপ খায় কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করার আরামটুকুও স্বীকার করেন না। এই কল্পনা প্রবণতার জন্যই দার্শনিকদিগকে স্বপ্ন-

বিলাসী, কর্মে অদক্ষ প্রভৃতি নিন্দা-ব্যঞ্জক নাম দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ এই কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ; এবং উহা প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্যদ্বারা অসমর্থিত কোন দার্শনিক প্রকল্পনা গ্রহণে দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়।

সম্ভবতঃ প্রাচীন কালের সুসভ্যজাতিদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট কার্য ভারতবর্ষ এবং গ্রীস দেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু দার্শনিক সমস্যার দিকে এই দুই পুরাতন সংস্কৃতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিচার প্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনের এই ভেদ নিম্নলিখিত ব্যাপক ও সাধারণ উক্তির দ্বারা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায়। ভারতীয় দর্শন প্রধানতঃ জ্ঞাতার আন্তর অনুভবের জগৎকে জানিতে চাহে ; কিন্তু প্রাচীন গ্রীকরা আন্তর জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং সতত পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তুর জগতকে জানিতে চাহিত। দুঃখানুভূতি সঞ্জাত দ্বন্দ্ববোধে, অথবা বিভিন্ন কর্তব্যের দ্বন্দ্ববোধে বেদান্ত ব্যতীত সর্বভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি। কিন্তু গ্রীক দর্শন (অন্ততঃ উহার প্রাথমিকরূপে) নিসর্গ বিষয়ক কৌতূহল দ্বারা প্রভাবিত ; এবং উহা প্রকৃতি সদাপ্রবিবর্তমান বাহ্যাকারের অন্তরালে নিহিত গুপ্ত রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে উৎসুক। কাহারও কাহারও এইরূপ বলার প্রলোভন হয় যে, স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি মানুষের আক্রোশ হইতে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি, অপর দিকে বস্তু ও ঘটনারাজীর জগৎ মানুষের হৃদয়ে যে বিস্ময় জন্মায়, তাহা হইতে গ্রীক দর্শনের উদ্ভব। এই অর্থে ইহা বলা সঙ্গত হইবে যে, প্রাচীন গ্রীকরা কেবল প্রাকৃত-বিজ্ঞানেরই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এমন নহে, উপরন্তু যে দার্শনিক ঐতিহ্য বৈজ্ঞানিক, চিন্তার নিকটতম এবং প্রত্যক্ষবাদ যাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাহারও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মধ্যযুগীন ইউরোপে, যুক্তিহীন মত ও ধর্মতত্ত্বীয় ধারণার বিশেষ আধিপত্য ছিল, এবং "নবজাগরণের" (Renaissance) যুগপর্যন্ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষমূলক দৃষ্টি আবৃতাবস্থায় ছিল। মানববুদ্ধির স্বাধীন ক্রিয়াকে ধর্মযাজকরা (Church) যে বন্ধন-পাশে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, যদিও নবজাগরণ মূলতঃ উহারই বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ এবং যদিও গ্রীসদেশের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠযুগের (classical age) মূল গ্রন্থগুলির পুনরাবিষ্কারেই নবজাগরণের আরম্ভ, তথাপি অঙ্কুরিত নূতন ভাবরাশি হইতে যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে শুধু যে স্বতন্ত্র প্রাকৃত বিজ্ঞানের ধারণাই জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা নহে, অধিকন্তু যে দর্শনিক চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে আধুনিক বলা হয়, তাহারও জন্ম হইল—এখন হইতে এই চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়া, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকিল।

যাজক সম্প্রদায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এইরূপ ভয়ের বাধা হইতে মুক্ত হইয়া, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক প্রণালীতে স্বতন্ত্রভাবে প্রাকৃতঘটনা সমূহের অনুসন্ধান করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিজ্ঞান যে সংগ্রাম চালাইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে জার্মানীর কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), পিসা সহরে ভূমিষ্ঠ ইটালীর গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) এবং ইংলণ্ডনিবাসী নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহারা যে সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে, দর্শনের পদ্ধতি-বিষয়ক সমস্যার দিকে দার্শনিকদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা আকৃষ্ট হইল, এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ পুনরায় নিজের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইল; কারণ বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতির দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়ার প্রকৃতচেষ্টা একমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদেই করা হয়।

২। বেকন

যে প্রত্যক্ষবাদী আন্দোলন আমাদের আলোচনার বিষয়, দর্শনের ক্ষেত্রে ফ্রেনসিস বেকনকে (১৫৬১-১৬২৬) তাহার আদ্যগুরু বলিতে হইবে। ইনি কেমব্রিজে অধ্যয়ন করেন এবং এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের রাজদরবারে, অল্প কালের জন্য কিন্তু খুব কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। এরিষ্টটলের সময় হইতে, দার্শনিকগণ যে অবরোহ পদ্ধতির ব্যবহারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাহার বিপরীত আরোহ পদ্ধতির সমর্থনেই বেকনের গুরুত্ব। তাহার মতে অবরোহ পদ্ধতিতে হেতু-বাক্যের মধ্যেই সিদ্ধান্ত-বাক্যটি নিহিত থাকে বলিয়া, উহার সাহায্যে কোন নূতন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। শুধু আরোহ-পদ্ধতি দ্বারাই নূতন জ্ঞান আহরণ করা সম্ভবপর। এই আরোহ পদ্ধতি প্রত্যক্ষানুভূত পদার্থের পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষিত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমানের উপর নির্ভর করে—ইহার ফলে, প্রকল্প (hypothesis) রচিত হয়। এই সকল প্রকল্প বারবার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার আলোকে যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। বেকন সত্যানুসন্ধানে এই প্রত্যক্ষমূলক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের পথে যে সকল বিঘ্ন আছে, উহাদিগকে "পুত্তলিকা" অর্থাৎ বুদ্ধি ও সমালোচনা শক্তির স্বাধীন ব্যবহারের পরিপন্থী মিথ্যা-ধারণা এই নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রাণালী সম্বন্ধে বেকনের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল। যে দুই তত্ত্বের উপর সমগ্র আরোহমূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই 'প্রকৃতির

সমরূপতার নিয়ম' (uniformity of nature) ও তন্নিঃসৃত কার্যকারণ নিয়মের (causality) বিশ্লেষণ করিতে, অথবা তাহাদের দার্শনিক সমর্থন দিতে তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তুলনা (comparison), সহ পরিবর্তন (concomitant variation) ও ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তের অভাব (Exclusion of negative instances), এই কয়েকটি প্রণালীর দ্বারাই বিবেচ্য ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত আকার অথবা গঠনটি আবিষ্কার করা সম্ভবপর। তিনি বিশেষভাবে চূড়ান্ত নিশ্চায়ক দৃষ্টান্তের (crucial intsance) গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছিলেন। যে সকল দৃষ্টান্তে, কারণ পদার্থের কোন একটির অংশের (যথা ক—এর) পর কার্য পদার্থের খ অংশটি নিয়মিতভাবে থাকে, এবং কারণস্থ ক-এর অভাবের পরে কার্যস্থ খ-এরও নিয়মিত ভাবে অভাব ঘটে, তাহাদিগকে চূড়ান্ত নিশ্চায়ক দৃষ্টান্ত বলে।

যে সকল মূলতত্ত্বেরও উপর আরোহপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, বেকন্ যে তাহাদের দর্শন-শাস্ত্র-সম্মত ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নাই, শুধু তাহা নহে কিন্তু প্রকল্প রচনায় সৃষ্টিকারী কল্পনা-শক্তির গুরুত্ব-ও তিনি পর্যাপ্ত ভাবে স্বীকার করেন নাই। কেবল ধৈর্য সহকারে তথ্যসংগ্রহ করিলেই যে প্রকল্প-রচনা করা যায়, তাহা নহে। বস্তুতঃ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য, প্রথমে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নির্বাচন করিতে হয়, এবং কোন গৃহীত প্রকল্পের সাহায্য ব্যতীত এই নির্বাচন ক্রিয়া আরম্ভ করাই অসম্ভব। যোগ্য প্রকল্পরচনার জন্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োজন—ধৈর্যসহকারে ধীরে ধীরে তথ্যসংগ্রহ করার জন্য প্রতিভার আবশ্যকতা নাই। তথ্য নির্বাচনের দিগ্‌দর্শক কোন তত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত শুধু কতকগুলি বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তকারী তথ্যই সংগৃহীত হইবে। এই সাহায্য ব্যতীত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে অবরোহ মূলক যুক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব। কারণ, বিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়ম প্রকৃতির সমরূপতা-তত্ত্ব হইতে (আরোহ পদ্ধতিতে) নিগমন মাত্র। এমন কি, যে-কোন প্রকল্পের পরীক্ষাতেই একটি সুদীর্ঘ অবরোহমূলক যুক্তি-শৃঙ্খল আবশ্যক—যে সকল পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যদ্বারা উক্ত প্রকল্পের সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের প্রতি যে প্রকল্পটি বাস্তবিকই প্রযোজ্য, তাহা এইরূপ যুক্তিশৃঙ্খল দ্বারাই প্রদর্শিত হয়।

৩। হব্‌স্‌

অপর একজন ইংরাজ দার্শনিক টমাস হব্‌সের (১৫৮৮-১৬৭৯) দৃষ্টিভঙ্গীও মূলতঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী। এখানে আমরা তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবেই

দুইচার কথা বলিতে পারি। কেবল নিজেকে যতটুকু জড়বাদী বলিয়া স্বীকার করিতেন, হব্‌স্‌ তাহা অপেক্ষা অধিক পুরাপুরি জড়বাদী ছিলেন। হব্‌সের মতে, জড়বস্তু ও তাহার গতিবিষয়ক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উপাদান। কারণ হইতে কার্যের এবং কার্য হইতে কারণের অনুমান করাই দর্শনের একমাত্র কাজ। হব্‌স্‌ দর্শনের চারিটি শাখা স্বীকার করিয়াছেন : (১) জ্যামিতি—ইহার বিষয় হইতেছে দেশে অবস্থিত জড়কণার গতি ; (২) পদার্থ বিদ্যা—ইহা জড়বস্তু সমূহের পরস্পর সংঘাতবশতঃ উহাদের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা আলোচনা করে ; (৩) নীতিবিজ্ঞান—ইহার বিষয় হইতেছে স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) গতি সমূহ ; এবং (৪) রাজনীতি—ইহাব বিষয় হইতেছে এক স্নায়ুতন্ত্র অথবা স্নায়ুতন্ত্রসমষ্টিতে অন্য স্নায়ুতন্ত্রজনিত পরিণাম সকল। প্রত্যেক জড়বস্তুর মধ্যেই আত্মরক্ষার প্রবণতা আছে ; সুতরাং জৈব হউক অথবা অজৈব হউক, সকল জড়-বস্তুকেই পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাত ও বিগ্রহ করিতে হইযাছিল। হব্‌স্‌ রাজনীতির সমস্যার সমাধানের জন্য তাহার এই মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন ; এবং তাহার লেভিযাথান্‌ নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাজনৈতিক দর্শনের একটি সর্বোচ্চশ্রেণীর রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কৌতূহলের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে তিনি অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের সমর্থন করিযাছেন।

৪। লক্‌, বার্কলি ও হিউম্‌

যে-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ এবং লক্‌ (১৬৩২-১৭০৪), বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) ও হিউম্‌ (১৭১১-১৭৭৬) যাহার প্রতিনিধি, আমরা এখন সেই সম্প্রদায়ের মত আলোচনা করিব। লক্‌ ছিলেন ইংরাজ, বার্কলি আয়র্লেণ্ডবাসী, এবং হিউম্‌ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। লক্‌ প্রথমে মানবীয়জ্ঞানের উদ্গম ও বিস্তার সম্বন্ধীয় মূল সমস্যাটি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিযা উহার সমাধানের জন্য প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টির লক্ষণ নির্দেশ করিলেন ; এবং তাহার অনুগামিগন এই চিন্তাধারাকে উহার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিলেন—ইহাই এই সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের বর্তমান আলোচনা অপরিহার্যভাবে সংক্ষিপ্ত হইবে ; তাহাছাড়া, আমাদিগকে এই সকল ব্রিটিশ দার্শনিকের বহু কৌতূহলজনক কথাও বাদ দিয়া যাইতে হইবে। কোন কোন ব্যাপারে, ইহাদের রচনা নির্ভুল ও যথাযথ বিচারের আদর্শ।—প্রায়ই পাণ্ডিত্যের ভার দার্শনিকের রচনা-সৌষ্ঠব নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু লক্‌, বার্কলি ও হিউমের লেখার স্বচ্ছন্দগতি পাণ্ডিত্যভারে বাধা পায় নাই।

লক্

জন্ লকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে "মানববুদ্ধি বিষয়ক প্রবন্ধ" (Essay Concerning Human Understanding)। তিনি রাজনীতি ও শিক্ষা-শাস্ত্র সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন। রাজনীতিতে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাই এই ক্ষেত্রে, তিনি তাহার সমসাময়িক টমাস হব্‌সের মতের বিরোধিতা করেন। তাহার রাজনৈতিক মত তৎকালীন বিভিন্ন রাজকীয় আন্দোলনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু যদিও তাহার শিক্ষাবিষয়ক মতও অতিশয় পুরোগামী ছিল, তথাপি বহুকাল পর্যন্ত উহার গুরুত্ব লোকে ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে নাই।

লকের "মানববুদ্ধি বিষয়ক প্রবন্ধে" প্রধান সমস্যা ছিল মানবজ্ঞানের বিস্তার ও সীমানির্ধারণ। তিনি জ্ঞানের যাথার্থনির্ধারক মাপকাঠির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেকার্তের মাপকাঠি হইতে খুব ভিন্ন নহে। যাহার সম্বন্ধে মানুষের নিশ্চয়বুদ্ধি আছে, তাহাই জ্ঞান। কিন্তু 'নিশ্চয়' বলিতে, তিনি কেবল ব্যষ্টিমনের নিঃসন্দিগ্ধতার ভাবই বুঝিতেন না। ইহার দ্বারা তিনি জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ অথবা যুক্তিসম্মত এমন একপ্রকার অপরিহার্যতা বুঝিতেন, যাহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু লক্—মনে করিতেন যে, কোন্ প্রকার জ্ঞান এইরূপে সিঃসন্দিগ্ধতা দাবী করিতে পারে, তাহা নির্ধারণের পূর্বে, জ্ঞানের উপাদানীভূত ধারণাসকলের উৎস ও মূল কী, তাহা আলোচনা করা কর্তব্য। যদি দেকার্তের এই বিশ্বাস ঠিক হয় যে, আমাদের মনে এমন কতক অন্তর্নিহিত জন্মজাত ধারণা (অর্থাৎ এমন সব ধারণা যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় না এবং আন্তর প্রত্যক্ষে জ্ঞাত হয়) আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, মানবজ্ঞানের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বহু পদার্থও জানিতে সমর্থ। তাই লক্ অন্তর্নিহিত ধারণার প্রতিষেধ করিয়াই স্বীয় প্রত্যক্ষবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। অন্তর্নিহিত ধারণার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার জন্য, তিনি অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। দেকার্তের মতের বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তাহার যুক্তি এই যে, যেহেতু মনের লক্ষণ হইতেছে চেতনা, অতএব মনে এমন কিছু থাকিতে পারেনা, যাহার সম্বন্ধে মন সচেতন নহে। যদি ঈশ্বর, জড়বস্তু, অথবা চেতন দ্রব্য কিংবা কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত ধারণা থাকিত, তাহা হইলে, মানবমনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল ধারণা সম্বন্ধে মন সচেতন হইত ; এবং শুধু বিদ্বান দার্শনিকদেরই নহে, কিন্তু শিশু

এবং অসভ্য অশিক্ষিত লোকেরও উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ও ভেদগ্রাহী জ্ঞান থাকিত। কিন্তু যেহেতু শিশু, অসভ্য ও সাধারণ লোকের এইরূপ কোন ধারণা নাই, এবং যেহেতু দার্শনিকরাও ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই পরস্পরের সহিত বিবাদে রত থাকেন, অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, ইন্দ্রিযানুভূতির পূর্বে ইহারা বিদ্যমান ছিলনা। এবং এইজন্য শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির আলোকেই এই সকল ধারণার সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা সম্ভবপর। তাই লক্ বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের পূর্বে মন হইতেছে যেন শূন্য বা কোরা, (অর্থাৎ যাহাতে এখনও কিছু লেখা হয় নাই এমন) একটি শ্লেট (tabula rasa) এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই আমাদের সর্বপ্রকার ধারণার একমাত্র উৎস এবং মূল।

আমরা পূর্বেই বলিযাছি, দেকার্তীয় ও অন্যান্য বুদ্ধিবাদী প্রমাতত্ত্বের (theory of knowledge) নিরাকরণরূপে লকের এই মত সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই মত ভ্রান্ত। কারণ, অধুনা মনকে শুধু কতকগুলি বহিরাগত সম্মুদ্রণের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা বলিয়া ধরা হয়না। শুধু তাহাই নহে। আধুনিক মতে, ইহাও স্বীকৃত হয় যে, সম্ভবতঃ মানবমনে এমন অনেক কিছু আছে, যাহাদের সম্বন্ধে মন সচেতন নহে।

এখন আমরা আবার লকের যুক্তিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যদি এই কথা সত্য হয় যে, আমাদের সর্বধারণা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতেই আসে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহাদের দুইটি মাত্র উৎস থাকিতে পারে: যথা (১) ইন্দ্রিয়সংবেদন (sensation) এবং (২) অনুচিন্তন (reflection)। আমাদের মন বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানে, তাহা ইন্দ্রিয়সংবেদন দ্বারাই অবগত হয়; আর উহা নিজে যাহা করে, তাহার সব কিছুই অনুচিন্তনে বিদিত হয়। সুতরাং আমাদের দুইপ্রকার ধারণা আছে: যথা (১) ইন্দ্রিয়সংবেদন-জাত ও (২) অনুচিন্তন-জাত। অনুচিন্তনকে আধুনিক পরিভাষায় অন্তর্নিরীক্ষণ (introspection) বলা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, লক্ তাহার দার্শনিক বিচারের এই স্থলে, একটি বড় রকমের ভ্রান্তিতে পতিত হন। তিনি "ধারণা" শব্দটি দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিলেন এবং এই দ্ব্যর্থকতা তাহার নিজ দর্শনের বহু গোলমাল ও অসঙ্গতির মূল হইল। তাহাছাড়া, লকের অনুগামী বার্কলি ও হিউম্ তাহার গৃহীত মত হইতে যে সকল দূরগামী সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেন, এবং যাহা দেখিলে স্বয়ং লক্ স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন, তাহারও কারণ এই দ্ব্যর্থকতা।

এখন পর্যন্ত ধারণা শব্দ দ্বারা লক্ মানবমনের আভ্যন্তর বস্তু সকল, অর্থাৎ

মানুষ যখন কোন কিছু জানে অথবা তৎসম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন তাহার মনের ভিতরে যাহা থাকে, তাহাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখন লক্ ধারণা শব্দের একটি নূতন অর্থ দিলেন এবং বলিলেন, মন যাহা কিছু ইন্দ্রিয়সংবেদনে অথবা অনুচিন্তনে প্রত্যক্ষ করে, তাহাই ধারণা। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় এবং জ্ঞানের আভ্যন্তর বস্তুর মধ্যে (object of knowing and content of knowledge) অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও মনের সচেতন অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, উহাদিগকে এক করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ধারণার এই দুইটি অর্থকে তিনি পৃথক রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগে তিনি এমন এক কুজ্ঝটিকার মধ্যে পতিত হইলেন যে, তর্কবিজ্ঞানকে জলাঞ্জলি না দিয়া, তাহার পক্ষে উহা হইতে বাহিরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

ইন্দ্রিয় সংবেদন হইতে অথবা অনুচিন্তন হইতে বুদ্ধি যে সকল ধারণা পায়, সেইগুলি অমিশ্র ; কিন্তু বুদ্ধির এমন কতক শক্তি আছে, যাহা দ্বারা গতকালীন অমিশ্র ধারণা সমূহের পুনরুপস্থাপন, পারস্পরিক তুলনা ও সম্মিলন সম্ভবপর ; এবং ইহাদের সাহায্যে আমাদের বুদ্ধি মিশ্রধারণা নির্মাণ করিতে পারে। মিশ্রণ করা অথবা সংগ্রহ করার ক্ষমতা মনের আছে বটে, কিন্তু যাহা মনের নিকট কখনও উপস্থিত হয় নাই, এই রকম অমিশ্র ধারণা সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সংবেদনলব্ধ অমিশ্র ধারণাগুলি বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, সংখ্যা, বিস্তৃতি, আকৃতি, স্থিতি ও গতিবিষয়ক। অনুচিন্তনলব্ধ অমিশ্র ধারণার বিষয় হইতেছে স্মরণ, তুলনা, মিশ্রণ ও প্রত্যাহরণের (abstraction) মানসিক ক্রিয়া।

ইন্দ্রিয় সংবেদনে আমরা বিষয়ের প্রকৃত গুণগুলিকে সাক্ষাৎভাবে জানিনা। মন যেন এক প্রকার আয়না, এবং ইন্দ্রিযসংবেদন যেন উহাতে প্রতিফলিত ছায়া অথবা প্রতিবিম্ব। কিন্তু ইন্দ্রিয়সংবেদন কখনও কখনও দ্রব্যের বাস্তব গুণেরই যথাযথ প্রতিলিপি, এবং কখনও কখনও উহা এমন কোন বাস্তব গুণের এক প্রকারচিহ্ন, যাহা ইন্দ্রিয় সংবেদনে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয় না। এইজন্য লক্ জড়বস্তুর প্রধান ও অপ্রধান নামক দুই প্রকার গুণের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে পরে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। লক্ বিশ্বাস করিতেন যে, সংখ্যা বিস্তৃতি, আকৃতি(figure) ও গতির ধারণা বস্তুর প্রকৃত গুণেরই প্রকাশক ; কিন্তু বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও শব্দ এমন কতকগুলি অপ্রধান গুণ যাহাদের অনুরূপধর্ম বাস্তবজগতে নাই।

লক্ যে-যুক্তিতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে বস্তুর প্রধান ও অপ্রধান গুণের মধ্যে

পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দুর্বল ও অনিশ্চায়ক। এই পার্থক্যের সমর্থনে তাহার একমাত্র বক্তব্য এই যে, প্রধান গুণগুলি একাধিক ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার গুণগুলি প্রত্যেকে শুধু এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়েরই বিষয়।

লকের মতে, বাহ্যবস্তুর প্রধান ধর্মগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিশ্চিত ও বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু জড়দ্রব্য সম্বন্ধে অর্থাৎ যে বস্তুতে এই সকল গুণ থাকে অথবা এই সকল গুণ যে বস্তুর ধর্ম, তাহার সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিতজ্ঞান আছে কিনা, সেই বিষয়ে লক্ কিছু সন্দিহান। বস্তুতঃ, জড়বস্তুর অথবা দ্রব্যের ধারণা হইতেছে একটি মিশ্র ধারণা। আমাদের বুদ্ধি প্রধান গুণের কয়েকটি ধারণাকে সম্মিলিত করিয়া, যখন এই মিলিত গুণগুলির কোন আশ্রয় অথবা ভিত্তি খোঁজে, তখনই বুদ্ধি এই মিশ্র ধারণাটিকে সৃষ্টি করে। জড়দ্রব্য আছে, অথবা জড়দ্রব্য নাই, ইহার কোনটিই জোর করিয়া বলিবার মত সাহস লকের ছিলনা। মনে হয়, তিনি যেন এইমত পোষণ করিতেন যে, এইরূপ দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে কী, তাহা না জানিলেও, আমাদিগকে উহা বিনা বিচারে মানিয়া লইতে হয়। জড়দ্রব্য সম্বন্ধে লকের মত অবশ্যই অনিশ্চিত ছিল ; কিন্তু সান্তচেতনদ্রব্য অর্থাৎ ব্যষ্টি-জ্ঞাতা এবং অনন্ত চেতন দ্রব্য অর্থাৎ ঈশ্বর আছে কিনা, এই সম্বন্ধে তাহার মত আরও অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু এ সকল কথা আলোচনা করিবার পূর্বে, আমরা লকের মূল সমস্যার দিকে অর্থাৎ মানব জ্ঞানের বিস্তার ও প্রামাণ্য বিষয়ক প্রশ্নের দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করিব।

জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা অমিশ্ররূপ হইতেছে (সত্তাবিষয়ক) নির্ণয়, অর্থাৎ হাঁ বা না বলার ক্রিয়া। কিন্তু এই নির্ণয় দুইপ্রকার। কতক নির্ণয় এইরূপ যে, উহাদের বিষয়ীভূত হাঁ বা না এর সত্যতা প্রত্যক্ষ দ্বারাই জানা যায়। আবার কতক নির্ণয় অভিমত মাত্র—যে নিশ্চয়ের ভাব প্রকৃত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, তাহা অভিমতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই প্রকার জ্ঞানের পার্থক্য মাত্রাগত নহে, কিন্তু জাতিগত। অর্থাৎ এই পার্থক্য আমাদের মানসিক নিশ্চয়বোধ অথবা বিশ্বাসের জোরের উপর নির্ভর করেনা, কিন্তু উহা এই যুক্তিসম্মত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যে, প্রথম স্থলে আমরা অন্য কোন সম্ভাব্য বিকল্পের ধারণাই পোষণ করিতে পারিনা, অথচ দ্বিতীয় স্থলে এইরূপ বিকল্পের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম প্রকার জ্ঞান একেবারে অন্যনিরপেক্ষ—কোন নূতন প্রমাণ অথবা ভিন্ন পদ্ধতির যুক্তিদ্বারা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। এইরূপ, পুরাপুরি নিশ্চিত জ্ঞান দুই প্রকার : প্রত্যক্ষলব্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। এই প্রকার জ্ঞানের সীমা অতীব সঙ্কীর্ণ। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে আমরা দুই বিভিন্ন ধারণার সামঞ্জস্য অথবা অসামঞ্জস্য, অন্য কোন ধারণার

সাহায্য ছাড়াই, সাক্ষাৎ ভাবে জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, "শ্বেতবর্ণকৃষ্ণ নহে" "বৃত্ত ত্রিভুজ নহে", "তিন দুই হইতে অধিক, এবং এক ও দুইএর যোগফলের সমান"। এইরূপ জ্ঞানের নিঃসন্দিগ্ধতার মাত্রা সর্বাপেক্ষা বেশী। যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান ও, শেষপর্যন্ত প্রত্যক্ষলব্ধ নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে; কারণ, যুক্তি বলিতে কতকগুলি সাক্ষাৎ অনুভূতির এমন একটি শৃঙ্খল বুঝায়, যাহাতে (যৌক্তিক অগ্রগতির) প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেকটি ধারণা পরবর্তী ধারণার সহিত প্রত্যক্ষলব্ধ অনুভূতিদ্বারা সাক্ষাৎ-ভাবে সংযোজিত হয়, কিন্তু প্রথম ধারণাটি অন্য ধারণার সহিত পরোক্ষভাবেই সংযোজিত হয়। যেহেতু এই প্রত্যক্ষানুভূতির সমগ্র শৃঙ্খলটি একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব উহাতে একটি স্মরণের অংশও প্রবিষ্ট থাকে, এবং ইহার দরুণ এই প্রকার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানে অমিশ্র সাক্ষাৎ অনুভূতির ন্যায় সম-পরিমাণ নিঃসন্দিগ্ধতা থাকে না।

লক্ ধরিয়া লইয়াছেন যে, নিজ নিজ আত্মা সম্বন্ধে আমাদের এই প্রকার সাক্ষাৎ অনুভূতি রূপ জ্ঞান থাকে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যুক্তির দ্বারা সিদ্ধকরা সম্ভবপর। এই যুক্তি আমাদের আত্মজ্ঞান ও বাহ্যজগৎ বিষয়ক সংবেদনাত্মক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাক্ষ্য অথবা তর্কসম্মত নিখুঁত যুক্তিশৃঙ্খল দ্বারা স্পষ্টভাবে এই সকল বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দেখান নাই।

প্রকৃতপক্ষে, লক যে সকল হেতুবাক্য হইতে তাহার বিচার আরম্ভ করেন, সেইগুলি অত্যন্ত সাদাসিধা রকমের ছিল; তাহাছাড়া, তিনি মানব-বুদ্ধিকে একটি নিষ্ক্রিয় যন্ত্র, অথবা খুব বেশী হয়ত একটি প্রতিবিম্বগ্রাহী যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। এমতাবস্থায়, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের লৌকিক বিশ্বাসের দ্বারা নির্মিত গৃহটি তাহার চারিদিকে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বাহ্য ও আধ্যাত্মিক জগৎ-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে দৃষ্টি-ভঙ্গী, উহার সহিত তাহার এমন একটি স্বাভাবিক সংযোগ ছিল যে, তিনি তাহার বিচারের প্রত্যেক ধাপেই আপোষ করিয়া চলিলেন, এবং পরিশেষে এমন এক দার্শনিক মতবাদে উপনীত হইলেন, যাহা প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস হইতে খুববেশী ভিন্ন ছিল না। তাহার যুক্তিধারাকে উহার তর্কসম্মত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করা এবং এইভাবে উহার অন্তর্নিহিত সন্দেহবাদের বীজটিকে উদ্‌ঘাটিত করার কাজটি তাহার পরবর্তী অনুগামীদের জন্য রহিয়া গেল।

বার্কলি

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারার দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধি হইতেছেন বার্কলি। তিনি তাহার বিচার লকের এইমত হইতে আরম্ভ করেন যে, প্রত্যক্ষে অথবা অনুচিন্তনে যাহা বুদ্ধির বিষয় হয়, তাহাকে ধারণা বলে। এই কথা সত্য হইলে, আমরা প্রধান অথবা অপ্রধান যে প্রকার গুণই প্রত্যক্ষ করিনা কেন, যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ধারণামাত্র; সুতরাং মনের কখনও জড় অথবা অচেতন দ্রব্য-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতে পারে না। তাই বার্কলি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চেতন দ্রব্যসকল এবং তাহাদের অবস্থানিচয় ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ববান নহে। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, বার্কলি হইতেছেন সম্পূর্ণ ও চরম মনোবাদী।

তিনি নানা ভাবে তাহার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাহার বিচারের একটি অংশ লক্ হইতে গৃহীত হইলেও, আমরা পূর্বে উহার আলোচনা করার সুযোগ পাই নাই বলিয়া উহা হইতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা সঙ্গত হইবে। আলোচ্য বিষয়টি হইতেছে বিধারণাবাদ ও নামবাদের (Conceptualism and Nominalism) মধ্যে বিতর্ক। এই বিতর্ক আধুনিক দর্শন মধ্যযুগীয়-দর্শন হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, দর্শনের ইতিহাসে, প্লেটো সর্বাপেক্ষা আত্যন্তগামী বিধারণা-বাদী ছিলেন। কিন্তু প্লেটোর দর্শনের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিলে, আমরা বর্তমান বিষয় হইতে অতিশয় দূরে চলিয়া যাইব। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মধ্যযুগে দর্শনের দুইটি সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে প্রবল ছিল—একের নাম বিধারণাবাদী এবং অপরের নাম নামবাদী। বিধারণাবাদীদের মতে, ঈশ্বর, দ্রব্য, জড়বস্তু, কারণতা প্রভৃতি সার্বিক ও বিমূর্ত ধারণাগুলির (universal and abstract ideas) এমন এক পূর্ণ সত্তা আছে। যাহা কোনও বিশিষ্ট অথবা ব্যষ্টি অস্তিত্ববান পদার্থের উপর নির্ভর করেনা। নামবাদীরা বিশ্বাস করিতেন, অস্তিত্ববান পদার্থ মাত্রই বিশিষ্ট বা ব্যষ্টিপদার্থ, এবং বিমূর্ত ও সার্বিক ধারণাগুলি শুধু শব্দমাত্র—অস্তিত্ববান বিশিষ্ট বস্তু সকলকে বর্ণনা করিবার জন্য, অথবা কোন নমুনার সাহায্যে উহাদিগকে নির্দেশ করিবার জন্য, মানুষের মনই এই সকল শব্দ নির্মাণ করিয়াছে।

লক্ বিশ্বাস করিতেন, মনের অভ্যন্তরস্থ সর্ব বস্তু হইতেছে কতকগুলি অমিশ্র ধারণা মাত্র। ইহারা সংবেদন অথবা অনুচিন্তন হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু মন নিজস্ব শক্তির সাহায্যে এই সকল অমিশ্র ধারণাকে একত্র করিয়া, মিশ্র ধারণায় পরিণত

করিতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, লকের এই মত ধারণাবাদ-অপেক্ষা নামবাদের বেশী পক্ষপাতী ছিল। বস্তুতঃ, লক্ এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সামান্য বিষয়ক অথবা বিমূর্ত ধারণাগুলি কেবল সুবিধাজনক সার্বিক সঙ্কেত মাত্র। ইহারা আমাদিগকে আমাদের প্রত্যক্ষে উপলব্ধ সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যের সম্বন্ধগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে সাহায্য করে।

বার্কলি তাহার "মানবীয় জ্ঞানের মূল তত্ত্ব সমূহের আলোচনা" (A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge) নামক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দর্শন গ্রন্থে, ও পরে তাহার "কথোপকথন"গুলিতে (Dialogues), এই নামবাদী মতটিকে উহার চরম অবস্থায় লইয়া যান। তিনি বলেন, বিমূর্ত ধারণা কোন বাহ্য বস্তুর অনুরূপ নহে। শুধু ইহাই নহে, অধিকন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনেও এইরূপ কোন ধারণা নাই। আমি যখন বলি, আমার এই অথবা ঐ অশ্ব হইতে পৃথকরূপে কোন অশ্বের এমন একটি ধারণা আছে, যাহা অশ্ব নামক পশুজাতির ধারণা, অথবা অশ্বত্ব নামক এমন কোন গুণের ধারণা, যাহার দরুণ এই সকল পশুকে অশ্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন আমি প্রকৃতপক্ষে একটি অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করি।

আমি যখন আমার মনের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন কখনও সেখানে অশ্বত্বের ধারণা পাই না, কিন্তু এই অথবা ঐ অশ্বের ধারণাই পাই। এই সকল তথাকথিত শ্রেণীর ধারণা অথবা বিমূর্ত ধারণা হইতেছে বিশুদ্ধ কল্পনার সৃষ্টি।

বার্কলি যে জড়বস্তু অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ বিমূর্ত ধারণার অস্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, তিনি বলেন, যখন আমরা জড়বস্তু সম্বন্ধে কথা বলি, তখন প্রকৃতপক্ষে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, অথবা তখন আমাদের যেই বিষয়ে ধারণা থাকে, তাহা হইতেছে কোন বিশিষ্ট এই অথবা ঐ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অভ্যন্তরস্থ বস্তু, উহা কখনও জড় বস্তু নামক কোন বিমূর্ত অথবা সার্বিক দ্রব্য নহে।

কিন্তু বার্কলি ইহা হইতে ভিন্ন অন্য অনেক পথে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার পক্ষে, ইহা প্রদর্শন করা খুবই সহজ ছিল যে, যদি অপ্রধান গুণগুলি উহাদের প্রত্যক্ষকারী মনের উপর নির্ভর না করিয়া অস্তিত্ববান না হয়, তাহা হইলে প্রধান গুণগুলির ক্ষেত্রেও জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা চলেনা; কারণ, প্রধান গুণগুলিও অপ্রধান গুণগুলির মত একই ভাবে ইন্দ্রিয় সংবেদন দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, এবং উহারাও অপ্রধান গুণগুলির মতই জ্ঞাতার বিভিন্ন অবস্থার দরুণ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। জলে নিমজ্জিত যষ্টি নিমজ্জন স্থলে বক্র দেখায়, আবার দৃষ্টির কেন্দ্র

বিন্দু হইতে দৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব অনুসারে উহার দৃষ্ট আকার ও আকৃতি পরিবর্তিত হয়। লক্ যে জড় দ্রব্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল নিহিত থাকে বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও বিচারান্তে কল্পনা মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে। যদি আদৌ এইরূপ জড় দ্রব্যের কোন সত্তা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ সত্তাকে প্রত্যক্ষলব্ধ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, অন্য কোন ভাবে নহে।

কিন্তু অচেতন জড়বস্তুর বিরুদ্ধে বার্কলির সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসোৎপাদক যুক্তিটি লক্ যে-দুই ভিন্ন অর্থে "ধারণা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করে। যদি প্রত্যক্ষে যাহা যাহা বুদ্ধির বিষয় হয়, ধারণা বলিতে সে সকলই বুঝায়, তাহা-হইলে যে কোন সময়েই আমরা যাহাকিছু প্রত্যক্ষ করিনা কেন, তাহা শুধু ধারণাই হইতে পারে, অন্য কিছু নহে। সুতরাং আমরা যখন বলি যে, আমরা কোন বর্ণযুক্ত কঠিন অথবা বর্তুলাকার দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেছে শুধু আমাদের অনুভূত ঐ বর্ণ, প্রতিবন্ধকতা (resistance) ও আকার; কিন্তু তাহা এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের কোন অজ্ঞাত আশ্রয় নহে। বর্ণ, আকৃতি, কাঠিণ্য, বর্তুলতা প্রভৃতি হইতেছে সংবেদন অথবা মানসিক পদার্থমাত্র। উহারা যে উহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রব্য নামক কোন বস্তুর ধর্ম, এইরূপ অনুমান করার যথাযোগ্য হেতু নাই। বার্কলির ভাষায়, **অস্তিত্ববান হওয়ার অর্থ হইতেছে প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়া** *"esse is Percipi"*।

তাই বার্কলি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, চিন্তাকারী মনসমূহ এবং তাহাদের চিন্তা-সকল-ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই অস্তিত্ববান নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, বার্কলির বুদ্ধি শুধু একইদিকে চলিতে জানিত। জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লক্ যে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, বার্কলি তাহার অসঙ্গতিগুলি দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই যে, ঐ একই যুক্তিতে চেতন দ্রব্যের অস্তিত্বও অস্বীকার করা আবশ্যক, এবং তজ্জন্য শুধু যে ব্যষ্টি-আত্মার অস্তিত্বই নিষেধ করা দরকার, তাহা নহে, উপরন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বও নিষেধ করা দরকার। অথচ ঈশ্বর হইতেছেন বার্কলির সমগ্র দর্শনের ভিত্তি।

বস্তুতঃ, বার্কলি শুধু অংশতঃই প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। আমাদের বাহ্যজগৎ-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি তাহার দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রত্যক্ষবাদী ছিল বটে; কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারে তিনি সাক্ষাৎ অনুভববাদ ও বুদ্ধিবাদ এই দুইমতই পোষণ করিতেন। ব্যষ্টি-আত্মার সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস এই যে, আমরা নিজ নিজ আত্মাকে সাক্ষাৎ অনুভবদ্বারা এবং অন্যান্য সান্ত আত্মাকে সাদৃশ্যমূলক যুক্তি দ্বারা অবগত হই।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে বার্কলি যুক্তি এই। তথাকথিত বাহ্য জগতের ধর্ম বলিয়া গৃহীত ইন্দ্রিয়সংবেদনগুলির মধ্যে যে-বিশিষ্ট ক্রম ও পৌর্বাপর্য দেখা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাহার অপরিহার্য নিয়ামক। কারণ, কোন প্রকার জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব না থাকাতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রাকৃতিক ঘটনার সুশৃঙ্খল ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ মরীচিকা, স্বপ্ন অথবা আমাদের সৃষ্ট কল্পনা মাত্র নহে। ইহা যেন ঐশ্বরিক মনের এক প্রকার কল্পনা অথবা সৃষ্টি; আর তিনি এই কল্পনাসৃষ্টি আমাদের নিকট কতকগুলি সুশৃঙ্খল পর্যায়যুক্ত ঘটনার আকারে প্রকাশ করেন।

যে সকল ধারণা বহিরিন্দ্রিযের সহিত সম্বন্ধ, সেইগুলি ঈশ্বরই আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু যে সকল ধারণা কাল্পনিক, সেইগুলি আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। তথাপি, শেষ বিচারে, দেখা যাইবে যে, ঐন্দ্রিয়িক ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত ধারণার পার্থক্য জাতিগত নহে, কিন্তু কেবল মাত্রাগত—ইন্দ্রিয়জ ধারণা অধিক উজ্জ্বল স্থায়ী ও নিয়মিত; আর কাল্পনিক ধারণা ম্লান, দ্রুত-বিনশ্বর ও অনিয়মিত। অবশ্য, প্রশ্ন উঠে, বাহ্যপদার্থ যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণের সমষ্টিমাত্র হয়, তাহা হইলে, যখন আমরা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিনা, তখন উহাদের কি অবস্থা হয়? ইহার উত্তরে বার্কলি বলেন: যেহেতু ঐ সময়ে অন্যান্য মন উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করে এবং অন্ততঃপক্ষে ঈশ্বরের সদাজাগ্রত দৃষ্টি উহাদের উপর নিরন্তর নিবদ্ধ আছে, অতএব তখনও উহারা বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং মানবমন যে-সকল বিষয় জানে, ঐগুলি তিন প্রকার: (১) ইন্দ্রিয়-সংবেদন অথবা স্বসংবেদনে প্রাপ্ত ধারণা, (২) সান্ত মনসকল, এবং (৩) ঈশ্বরের অনন্তমন। ঈশ্বরই আমাদের ঐন্দ্রিয়িক ধারণাসমূহের কারণ। সমভাবে, তিনি আমাদের ও অন্যান্য ব্যষ্টি-আত্মাদেরও অস্তিত্বের কারণ। প্রাকৃতিক কার্যকারণের শৃঙ্খল ও যান্ত্রিক নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—তাঁহার ইচ্ছা এই যে, মানুষের পরিত্রাণের জন্যে, সর্ব পদার্থ পূর্ণ সামঞ্জস্যের সহিত কাজ করিয়া যাইবে। বলিতে হইবে যে, এখানে বার্কলি তাহার ধারণাবিষয়ক চরম নামবাদ কিছু সংযত করিয়াছেন। কারণ, যদি মনের কোন বিমূর্ত অথবা সার্বিক ধারণা না থাকে, তাহা হইলে উহার পক্ষে ব্যষ্টি আত্মা, ঈশ্বর বা নৈতিকতা সম্বন্ধে, অথবা যে উদ্দেশ্যমূলক কারণ ব্যবস্থায় জগৎ নিয়ন্ত্রিত, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভবপর নহে। বার্কলি বলেন, ধারণা হইতে ভিন্ন প্রত্যয় নামক (notions) অন্য এক প্রকার মানসিক অবস্থার সাহায্যে আমরা সান্ত আত্মাসকলকে এবং ঈশ্বরকে জানি।

অনুরূপভাবে, ধারণাসকলের এবং দ্রব্য সকলের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রত্যয়-ও আমাদের আছে। প্রত্যয় কিভাবে গঠিত হয় এবং উহা বিমূর্ত ধারণা হইতে কি ভাবে পৃথক, বার্ক্লি তাহা ব্যাখ্যা কহিতে পারেন নাই। তাহার এই প্রত্যয় বিষয়ক মতের সমর্থনে সম্ভবতঃ শুধু ইহাই বলা যাইতে পারে যে, আমরা নিশ্চয়ই সান্ত ও অনন্ত উভয় প্রকার আত্মাকেই জানি বলিয়া মনে করি, এবং আত্মাগুলিও নিশ্চয়ই ধারণা নহে, কারণ, ধারণা সকল আত্মাতে থাকে এবং চেতন দ্রব্যের অস্তিত্ব ব্যতীত উহাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

হিউম্

সর্বসম্মতিক্রমে হিউম্ ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষবাদী সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। আমরা এখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিব। লক্ কর্তৃক বিনাপ্রমাণে গৃহীত তত্ত্বগুলির উপর তিনি যে কঠোর ও একনিষ্ঠ ভাবে যুক্তি বিচার প্রয়োগ করিযাছিলেন, উহাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। তাহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববান দর্শন গ্রন্থের নাম "মনুষ্য স্বভাববিষয়ক প্রবন্ধ" (Treatise on Human Nature)। কিন্তু এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি চরম নাস্তিক্যবাদী হওয়ায়, ইহাতে তিনি লোকের নিন্দা-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পরে "মানুষের বুদ্ধিবিষয়ক অনুসন্ধান" (Enquiry Concerning Human Understanding) নামক গ্রন্থে তাহার দর্শনের একটি সহজ ও লঘু বিবৃতি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের সহিত কাণ্টের পরিচয় ছিল, এবং কাণ্টীয় দর্শনের বিকাশে ইহা খুব প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল। হিউম্ কিঞ্চিৎ নাস্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে নীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধর্মসম্বন্ধেও পুস্তক লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পুস্তক জনসাধারণের জন্য লিখিত, এবং মনুষ্যস্বভাব বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি তাহার মত যে রকম সোজাসুজি এবং দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল পুস্তকে সেইরকম করেন নাই।

তিনি তাহার "প্রবন্ধে" যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের নিম্নোক্ত আলোচনা আমরা প্রধানতঃ তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব। "প্রবন্ধে"র প্রারম্ভিক বাক্যগুলিতেই তিনি বলিয়াছেন, "মানবমনের সব প্রত্যক্ষাত্মক বৃত্তিগুলিকে (Perception) দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটিকে আমি সম্মুদ্রণ (impressions) বলিব এবং অপরটিকে ধারণা (ideas) বলিব। ইহাদের পার্থক্য কোন্ বৃত্তি কত জোরে ও জীবন্তভাবে মনের উপর আঘাত করে, এবং আমাদের

চিন্তা অথবা চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার উপর নির্ভর করে। যে সকল বৃত্তি সর্বাপেক্ষা অধিকপ্রবল ও প্রচণ্ডভাবে মনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে সম্মুদ্রণ নাম দেওয়া যাইতে পারে ; এবং যে বিশিষ্টরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়সংবেদন (sensations), ইচ্ছা (Passions) ও হৃদয়াবেগ (emotions) সর্বপ্রথম আমাদের আত্মায় উৎপন্ন হয়, সেই বিশিষ্টরূপে আমি উহাদের সকলগুলিকেই এই নামের অন্তর্ভুক্ত করি। ধারণা বলিতে আমি চিন্তা ও যুক্তি বিচারে ব্যবহৃত উহাদেরই ম্লান প্রতিবিম্ব বুঝি।" এই অল্প কয়েকটি বাক্যের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু যে আমাদের ধারণাসমূহের উৎপত্তি বিষয়ক হিউমের সমগ্র মতবাদটিই ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি উহা হইতে সন্দেহবাদের যে সকল দূরগামী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেইগুলিও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর, তিনি তৎপূর্ববর্তী দার্শনিকদের ন্যায় অমিশ্র সম্মুদ্রণ ও ধারণা এবং মিশ্র সম্মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহার মতে, যদিও অমিশ্র ধারণা সর্বদাই অমিশ্র সম্মুদ্রণের প্রতিলিপি মাত্র, তথাপি মিশ্রধারণা একইভাবে শুধু তদনুরূপ সম্মুদ্রণের প্রতিলিপি মাত্র নহে। মিশ্র ধারণা মূল সম্মুদ্রণ-হইতে দুই প্রকারে ভিন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ, উহারা পৃথকভাবে গৃহীত সম্মুদ্রণ-সকলকে সম্মিলিত করিতে পারে, যথা যখন আমার পক্ষযুক্ত অশ্বের ধারণা হয়। দ্বিতীয়তঃ, উহা মূল সম্মুদ্রণের কোন কোন ধর্ম বাদ দিতে পারে, যথা স্মরণে ও কল্পনায়। মনের এই ভাবে সম্মুদ্রণগুলিকে একত্র করা এবং উহাদের কোন কোন ধর্ম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা আছে বটে ; কিন্তু বাস্তব সম্মুদ্রণের অনুরূপ কোন অমিশ্র ধারণা নির্মাণ করিবার শক্তি মনের নাই। উদাহরণ স্বরূপ, যে শব্দ আমি কখনও শুনি নাই, যে বর্ণ অথবা আকৃতি আমি কখনও দেখি নাই, এবং যে হৃদযাবেগ অথবা প্রবল ইচ্ছা আমি কখনও অনুভব করি নাই, তৎসম্বন্ধে আমার কোন ধারণা থাকিতে পারে না।

সম্মুদ্রণ ও ধারণা ব্যতীত হিউম কতকগুলি সম্বন্ধের প্রামাণ্য-ও স্বীকার করেন। এইগুলি হইতেছে **সাদৃশ্য, অভেদ, দেশ ও কাল, গুণ, সংখ্যা, মাত্রা,** এবং **ভেদ**। পরে, তিনি অভেদ সম্বন্ধটিকে আর-ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত উহাকে সাদৃশ্য অথবা নৈকট্য অথবা অব্যবহিতক্রম বলিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পর, তিনি দ্রব্য-সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা আছে কিনা, তাহা বিচার করিয়া, এই মত গ্রহণ করিলেন যে, আমাদের এইরূপ কোন ধারণা নাই। কারণ, যদি আমাদের এইরূপ ধারণা থাকিত, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহা ইন্দ্রিয়-সংবেদন অথবা স্বসংবেদনের কোন সম্মুদ্রণ হইতে নিঃসৃত। যদি ইহা ইন্দ্রিয়সংবেদন

হইতে নিঃসৃত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে হিউম্ জিজ্ঞাসা করিবেন, "কোন্ ইন্দ্রিয়ের সংবেদন হইতে ?" "যদি ইহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংবেদন দ্বারা জনিত হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বর্ণ হইবে ; যদি শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই শব্দ হইবে ; যদি রসনেন্দ্রিয় দ্বারা, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই কোন স্বাদ ; ইত্যাদি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেহই বলিবে না যে, দ্রব্য একটি বর্ণ অথবা শব্দ অথবা স্বাদ।" একই কারণে, স্বসংবেদনও আমাদিগকে দ্রব্যের সম্মুদ্রণ দিতে অসমর্থ। স্বসংবেদনে আমরা যে সকল সম্মুদ্রণের সহিত পরিচিত হই, উহারা হয় ইচ্ছা, নয় হৃদয়াবেগের সম্মুদ্রণ ; কিন্তু ইহাদের কোনটিই দ্রব্যের স্থলবর্তী হইতে পারেনা। সুতরাং কতকগুলি বিশিষ্ট গুণের সংগ্রহরূপে ছাড়া দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের অন্য কোন প্রকার ধারণা নাই। বিশিষ্ট গুণসমূহের এইরূপ একটি সংগ্রহকে আমরা একটি বিশিষ্ট নাম দিই, এবং এই নামের সাহায্যে আমরা উক্ত সংগ্রহটিকে স্মরণ করিতে পারি। একই ভাবে, অন্যান্য বিমূর্ত ধারণার ও তদনুরূপ কোন সম্মুদ্রণ নাই—উহারা হইতেছে পৃথক পৃথক বিশিষ্ট সম্মুদ্রণের ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহকে বর্ণনা করিবার জন্য সুবিধাজনক উপায়মাত্র।

এখন পর্যন্ত, আমরা হিউমের মতের যে বর্ণনা দিয়াছি, তাহা লক্ ও বার্ক্লির তুলনায় অধিক যথাযথ ও যুক্তিসম্মত হইলেও, তাহাদের মতকেই নিকটে থাকিয়া অনুসরণ করিয়াছে। বর্তমানে আমরা হিউমের দর্শনের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ অর্থাৎ কারণতা-সম্বন্ধে তাহার মত বর্ণনা করিব। এই বিষয়ে তিনি তাহার আলোচনা এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন : "দর্শনের একটি সাধারণ মূলসূত্র হইতেছে এই যে, যাহারই অস্তিত্বের আরম্ভ আছে, ঐ অস্তিত্বের জন্য তাহারই একটি কারণ থাকিতে বাধ্য।" হিউম্ প্রথমে প্রশ্ন তুলিলেন, এই বিশ্বাস প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না। কিন্তু এই সম্ভাবনা তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপরোক্ষভাবে যে যে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইতেছে তদ্বিষয়ক সাক্ষাৎ সম্মুদ্রণ ; কিন্তু সম্মুদ্রণ সমূহের অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ-বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ সম্মুদ্রণ নাই। অথচ কারণতার ধারণার সহিত এইরূপ অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ অনিবার্যভাবে জড়িত। খ যে ক-কে অনুসরণ করে, তাহা আমরা আমাদের ধারণাগুলির পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখিয়া জানিতে পারি। কিন্তু খ যে ক-এর পিছনে নিশ্চত ভাবে আসিতে বাধ্য, তাহা আমরা সাক্ষাৎ সম্মুদ্রণ-দ্বারা কখনও জানিতে পারি না। আবার, এইরূপ বিশ্বাস কোনরূপ যুক্তি-দ্বারাও প্রমাণ করা যায় না। ক যে খ-এর কারণ, তাহা দেখাইতে হইলে, প্রথমেই এই সাধারণ নিয়মটি মানিয়া লইতে হয় যে,

প্রত্যেক ঘটনারই একটি কারণ থাকিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস কি করিয়া উৎপন্ন হয়? অথবা কোন বিশেষ কারণ যে কোন বিশেষ কার্য উৎপন্ন করিতে বাধ্য, আমাদের কোন্ সাধারণ অনুভব আমাদিগকে এইরূপ প্রকল্পনায় (assumption) প্ররোচিত করে? প্রত্যক্ষ অনুভবে আমরা যাহা পাই, তাহা হইতেছে দুই বস্তুর মধ্যে অব্যবধানে, একের পর এক, এই নির্দিষ্টক্রমে, এমন একটি সহাবস্থিতির সম্বন্ধ, যাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সহাবস্থিতি কয়েকবার ঘটিলে, আমরা একটিকে কারণ ও অপরটিকে কার্য বলিতে আরম্ভ করি। আমাদের মনে, এইরূপ সম্বন্ধ একবার স্পষ্ট আকার ধারণ করার পর, যখন উহাদের একটির সম্মুদ্রণ দেখা দেয়, তখন আমরা অপরটির অস্তিত্ব অনুমান করি। অপরটির ধারণার উৎপাদক হইতেছে এক প্রকার বিশ্বাস। এই ধারণা এত প্রবল ও জীবন্ত হয় যে, উহা প্রকৃত ও সম্মুদ্রণের ন্যায় সজীব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কার্যকারণ সম্বন্ধের অনিবার্যতায় আমাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহা হইতেছে এক প্রকার মানসিক প্রবণতা অথবা অভ্যাস। এই অভ্যাস দুই ঘটনার সতত-দৃষ্ট সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সততদৃষ্ট সম্বন্ধ এইরূপ যে, যখন উক্ত দুই ঘটনার একটি সম্মুদ্রণের আকারে উপস্থিত হয়, তখন আমরা অপরটিকে ধারণার আকারে চিন্তা করিতে প্রণোদিত হই, এবং এই ধারণা এতই প্রবল অথবা সজীব হয় যে, মনে হয় যেন উহা একটি বাস্তব সম্মুদ্রণ। যদিও এইরূপ সততদৃষ্ট সম্বন্ধ আমাদের মনে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধের অস্তিত্বে একটি জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ (subjective) বিশ্বাস উৎপন্ন করে, তথাপি উহা অবশ্যম্ভব-সম্বন্ধের প্রকৃত সম্মুদ্রণ নহে। আমরা যে এক লম্ফে ক-এর সম্মুদ্রণ-হইতে খ-এর ধারণায়, অথবা বিপরীত ভাবে খ-এর সম্মুদ্রণ-হইতে ক-এর ধারণায় উপনীত হই, তাহা উহাদের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, এইরূপ বিশ্বাসের ফল। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসের কোন বাস্তব প্রমাণ নাই। উহা শুধু সদাদৃষ্ট সম্বন্ধের ফল।

"প্রকৃতির একরূপতার" (Uniformity of Nature) ন্যায় কোন তত্ত্বের সাহায্যেও এই বিশ্বাসকে সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ, প্রকৃতির একরূপতায় আমাদের যে বিশ্বাস, তাহাও সমর্থন-যোগ্য নহে, কারণ, এই বিশ্বাস শুধু সদাদৃষ্ট পৌর্বাপর্যের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ দেখিয়া, যে একটি সাধারণ নিয়ম কল্পনা করা হয়, তাহা হইতে উদ্ভূত। অতীত কালে, কতকগুলি সম্মুদ্রণ একটি বিশিষ্ট ও নিয়মিত ক্রমে ঘটিয়াছে, এইরূপ অভিজ্ঞতা যত বেশীই থাকুক না কেন, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ভবিষ্যতেও উহারা একই ক্রমে ঘটিতে থাকিবে।

অহং পদার্থের একত্ব (personal identity) অথবা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হিউম্ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার ফলও কারণতা-বিষয়ক আলোচনার মতই বিধ্বংসকারক। স্থায়ী অথবা অভিন্ন আত্মার সম্বন্ধে আমাদের কখনও কোন সম্মুদ্রণ হয় না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেছে আমাদের ইচ্ছা অথবা হৃদয়াবেগের সম্মুদ্রণ, কিন্তু উহাদের অনুভবিতা বলিয়া কোন আত্মার সম্মুদ্রণ আমাদের হয় না। আত্মা হইতেছে "কল্পনাতীত বেগে পরস্পরের অনুসরণকারী সদা পরিবর্তমান অথবা গতিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের (perception) একটি সমূহ অথবা সংগ্রহ মাত্র", উহা ছাড়া, অন্য কিছুই নহে। আমরা নিজেদের উপর যে একত্ব আরোপ করি, তাহা জড় বস্তুতে আরোপিত একত্বেরই সদৃশ; এবং ইহা আমাদের সম্মুদ্রণ অথবা ধারণা-সমূহের অবিচ্ছিন্ন ক্রম ও পারস্পরিক সাদৃশ্য হইতে উৎপন্ন হয়। আমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদের বিগত সম্মুদ্রণগুলিকে ধারণার আকারে স্মরণ করিতে পারায়, অতীত ও বর্তমান আত্মার অভেদ-বিষয়ক এই ভ্রান্তি অধিক প্রবল হয়। সম্মুদ্রণের ক্রমিক ধারায়, এবং ধারণারূপে উহাদের স্মৃতিতে, মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে বটে। কিন্তু গতানুগতিকতা অথবা অভ্যাসের দরুণ, এই সকল ফাঁকের দিকে দৃষ্টিপাত না করার আমাদের একটি প্রবণতা আছে। সুতরাং সম্মুদ্রণ দ্বারা আত্মাকে স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ও নিত্যদ্রব্যরূপে জানিতে পারা অসম্ভব। অন্য কোন প্রকার যুক্তির সাহায্যেও উহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ হিউম্ একেবারে সম্পূর্ণ অহমেবাস্মিবাদী (Solipsist) হইয়া গেলেন। আমাদের সম্মুদ্রণ ও ধারণার প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান জড় দ্রব্য বলিয়া কিছুই নাই, এবং এই সকল সম্মুদ্রণ ও ধারণার জ্ঞাতা ও ধর্মীরূপে কোন নিত্য আত্মাও নাই। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, হিউমের এই যুক্তি সদোষ। কারণ, তিনি "বিভিন্ন প্রত্যয় সমূহের পোটলা অথবা সংগ্রহ" বলিতে কি বুঝেন, তিনি তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। অবশ্য পোটলার ঐক্য পদার্থটি কি, এবং কোন একটি পোটলা অন্যান্য পোটলা হইতে কিভাবে পৃথক করা যাইতে পারে, তাহা স্মৃতির সাহায্যে অংশতঃ ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু যেহেতু স্মৃতিধারার মধ্যেও ফাঁক থাকে, (আর, হিউম্‌ও এই কথা স্বীকার করেন), অতএব কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানধারার অবিচ্ছিন্নতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে স্মৃতির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না।

যদিও হিউমের যুক্তি তাহাকে পূর্ণ সন্দেহবাদে লইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি যে অন্তিম দার্শনিক দৃষ্টি সমর্থন করেন, তাহা হইতেছে এক প্রকার ভদ্রজনোচিত সহনশীলতার ভাব; যুযুৎসু অবিশ্বাসীর মনোভাব নহে। এই কথা সত্য যে,

আমাদের জ্ঞানশক্তিগুলিকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্র ক্ষণভঙ্গুর সম্মুদ্রণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহার বাহিরে সম্ভাব্য জ্ঞানের উন্মুক্তক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, এবং স্বাভাবিক মনুষ্যরূপে দার্শনিকের পক্ষে এই জ্ঞানকে রূঢ়ভাবে অবজ্ঞা করা অনাবশ্যক। সন্দেহবাদ আমাদিগকে অন্যের হঠবাদিতার প্রতি অনাদর শিখাইবে, কিন্তু উহার বিপরীত হঠবাদিতা গ্রহণে উৎসাহ দিবে না। বস্তুতঃ, দর্শন ব্যবহারিক জীবনের পথ প্রদর্শক নহে। ব্যবহারিক জীবনের কোন উপকার হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে দর্শনের অনুশীলন করা হয়, তাহা নহে, বরং জ্ঞানজনিত আনন্দের নিমিত্তই দর্শনের অনুশীলন করা হয়। হিউম্ বলেন, "প্রকৃত সন্দেহবাদীর দার্শনিক বিচার-জনিত সন্দেহ ও বিশ্বাস উভয়ের সম্বন্ধেই আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব থাকিবে, এবং উহাদের দ্বারা যে নির্দোষ আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিবেন না।" প্রত্যেক দার্শনিকই এই জ্ঞান ও বিচার-পূর্ণ উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিলে, উপকৃত হইবেন।

৫। উপসংহার

বর্তমান পরিচ্ছেদটি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদের যে অংশটি আলোচনায় সীমাবদ্ধ, তাহার বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হইল। এখানে যে-সকল দার্শনিকের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের মনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা অথবা মূল্য নির্ধারণ বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। ইহারা যে সকল মত প্রতিপাদন করিয়াছেন, হয়ত, পরবর্তী বিচারের আলোকে, তাহাদের মধ্যে কোনটিই সত্য বলিয়া গ্রহণের যোগ্য নহে; তথাপি দার্শনিক চিন্তাধারায় ইংলণ্ডস্থ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের অবদান নিশ্চয়ই মূল্যবান। এই সকল ইন্দ্রিযপ্রত্যক্ষবাদী তাহাদের বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়ের যুক্তিতে যে সকল বিচারদোষ নিহিত আছে, সেইগুলিকে প্রকট করিবার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এবং সত্যানুসন্ধানের নূতন পথও উন্মুক্ত করিয়াছেন; আর এইরূপ নূতন পথের সন্ধানই মানুষের অন্তহীন সত্যানুসন্ধিৎসাকে জীবন্ত রাখে।

অতীতের দিকে তাকাইয়া আমরা যখন লক্, বার্কলি ও হিউমের দার্শনিক কার্যাবলী পরিদর্শন করি, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, তাহাদের অনুসন্ধানক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত ছিল, এবং তাহারা জ্ঞানের উদ্গমস্থল ও উৎপত্তির প্রশ্নটিকে উহার প্রামাণ্যের প্রশ্নের সহিত মিশাইয়া একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিও ইন্দ্রিয়ানুভব হইতেই জ্ঞানের আরম্ভ, তথাপি এইরূপ মনে করার

কোন যোগ্য হেতু নাই যে, জ্ঞানের এমন কোন উপাদান থাকিতে পারে না, যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং যাহার অভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি কতকগুলি সম্মুদ্রণের এমন একটি বিশৃঙ্খল সমুদায়ে পরিণত হয়, যাহার সম্বন্ধে কোন রকম বোধগম্য কথাই বলা যায় না। জ্ঞানের সহিত যেমন ব্যক্তি বা বিশিষ্ট পদার্থের অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে, তেমনই জাতি বা সামান্যেরও অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে। চরম ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদীও জাতি বিষয়ক ধারণা ব্যতীত তাহার কাজ চালাইতে পারেন না। লক্ ও বার্কলি জাতি বিষয়ক সমস্যার আলোচনায় আপোষের মনোভাব দেখাইয়াছেন। একমাত্র হিউম্‌ই তাহার মতবাদে সামান্য পদার্থটিকে স্থান দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাহার দর্শনে মতবাদরূপে জাতি বা সামান্য প্রত্যাখ্যাত হইলেও, স্বীয় মতের ব্যাখ্যার জন্য, তিনি সর্বদাই জাতিবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদের যে বিশিষ্ট রূপটি আমরা এখানে বিবেচনা করিয়াছি, বিশেষতঃ উহাব যে বিশিষ্ট রূপটি হিউমের পূর্ণ অহমেবাস্মিবাদের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে প্রত্যক্ষবাদের একটি মূল নিয়ম পালন করা হয় নাই। এই নিযমটি হইতেছে বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়মটি। আমরা সেখানে বলিযাছিলাম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে শুধু দর্শন বিচারের প্রারম্ভ, তাহা নহে, অধিকন্তু উহারই আলোকে দর্শন বিচারের যথার্থতাও প্রদর্শন করিতে হইবে। স্বাভাবিক মানুষরূপেই আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, দার্শনিকরূপে নহে, এই কথা সমর্থন করিয়া, হিউম্ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার সংশয়বাদ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

পরবর্তীকালে, কাণ্ট জ্ঞানের যে একটি সামান্য বা সার্বিক উপাদান আছে, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন যে, জ্ঞানের ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান হইতে উহার সামান্যীয় উপাদান অত্যন্ত ভিন্ন। কিন্তু তিনি কখনও এই ভেদের সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। অথচ ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি দ্বারা সামান্যগুলিকে অথবা (কাণ্টের ভাষায়) বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে ইন্দ্রিযানুভূতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে জানা সম্ভবপর নহে ; এবং উহারা যদি ঐন্দ্রিয়িক সম্মুদ্রণে প্রাপ্ত উপাদানের সহিত সমপ্রকৃতিক না হইত, তাহা হইলে, উহাদিগকে সেখানে আরোপ করাও সম্ভবপর হইত না। অবশ্য, এই সকল সামান্য কিভাবে জ্ঞাত হয়, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির আলোকে ইহাদের সত্যতা কিভাবে প্রদর্শন করা সম্ভবপর, এক নূতন প্রত্যক্ষবাদী-দর্শন এই প্রশ্নটিকে উহার বিবেচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। জি. ই. মুর্, উইলিয়ম জেম্‌স্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি আমাদের

সমসাময়িক তত্ত্ববিচারকগণ এই নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এই দর্শনকে পূর্ণ আকার দেওয়া যদি আদৌ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই কার্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্যই রক্ষিত আছে।

গ্রন্থবিবরণী

Bacon, Francis. : *The Advancement of Learning.*

Bacon, Francis. : *Essays.*

Hobbes, Thomas : *Leviathan.*

Locke, John. : *Essay Concerning Human Understanding.*

Locke, John, : *Two Treatises of Civil Government.*

Locke, John. : *Some Thoughts Concerning Education.*

Berkeley, George. : *The Principles of Human Knowledge.*

Berkeley, George. : *The Dialogues between Hylas and Philonous.*

Berkeley, George. : *Siris.*

Hume David. : *Treatise of Human Nature.*

Hume, David. : *Enquiry into Human Understanding.*

Hume, David. : *Unquiry Concerning the Principles of Human Morals.*

Hume, David. : *Natural History of Religion.*

অধিক জ্ঞানের জন্য ; নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করা যাইতে পারে :

Russel. Bertrand : *A History of West rn Philosophy* (George Allen & Unwin).

Laird, John : *Hobbes* (Benn).

Gibson, J. : *Locke's Theory of Knowledge* (Cambridge).

Hicks G. D. : *Berkeley* (Benn).

Price, H. H. : *Hume's Thesory of the External World.*

Laing, B. M.· *David Hume* (Benn).

Taylor, A. E. : *Hume and the Miraculous* (Cambridge).

অষ্টাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইমানুয়েল কাণ্ট

১। উপক্রমণিকা

প্রকৃতির মতই দর্শনেও আত্যন্তিক ছেদ বলিয়া কিছু নাই। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ধারা অবিরাম গতিতে চলে; অবশ্য সাধারণতঃ আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্যই করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা এমন এক একটি স্থানে পৌঁছাই, যেখানে যাহা 'হইয়া গিয়াছে' এবং যাহা 'আছে' এই দুইয়ের পার্থক্য নিতান্ত সাধারণ দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন আমরা ইহাকে নবযুগের আরম্ভ বলিয়া স্বাগত জানাই। এই ধরণের বিশেষ অবস্থা বা সীমাচিহ্নের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে আমাদের কিছু লাভও হয়। কারণ, ইহাতে আমরা সমগ্র পরিবর্তনের ক্রমিক অগ্রগতিটিকে আরও ভালভাবে বুঝিতে পারি। ইমানুয়েল কাণ্ট আধুনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য এই কথা শুধু উপরে বর্ণিত অর্থেই সত্য। তাঁহার পূর্বসূরীদের গ্রন্থের সহিত তাঁহার গভীর পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদের দার্শনিক অবদান সকল সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া উহাদের মূল্য নির্ধারণ করিলেন এবং এই ভিত্তির উপর স্বকীয় দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানে স্বীকৃত প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলী এবং মানুষের স্বাধীনতা ও মূল্যবোধের মধ্যে যে আপাতবিরোধ রহিয়াছে, তাহা হইতে কাণ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে প্রচলিত দর্শন মাত্রই অপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ধরিয়া লয় যে প্রত্যেক ঘটনাই তৎপূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইভাবে কার্যকারণ নিয়মের রাজত্ব সমগ্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই মানিয়া লওয়ায় সেখানে মানুষের স্বাধীনতার কোনও অবকাশ রাখা হয় না। কিন্তু মানুষের আত্মসচেতনতা বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক নিয়মসমূহের ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহে। মানুষের সৌন্দর্যসৃষ্টি, তাহার সত্যানুসন্ধান এবং কর্তব্যবোধের প্রেরণা তাহাকে এমন সব নিয়মের সন্ধানে প্রবৃত্ত করে, যাহা বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে 'ঔচিত্যের' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

অবশ্য নূতন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা কাণ্ট ধীরে ধীরেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইয়োরোপের প্রধান ভূখণ্ডে তৎকালে যে বুদ্ধিবাদ প্রচলিত ছিল, তাহারই আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। এই বুদ্ধিবাদের সম্প্রদায়ে স্পিনোজার দর্শনের

দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হইত না। তাহা ছাড়া লাইবনিৎসের চিন্তার গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধেও এই সম্প্রদায় সচেতন ছিল না। এই বুদ্ধিবাদ ইংরেজ দৃষ্টিবাদীদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই; কারণ ইহাতে তাহারা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির কোনও ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পান নাই। কাণ্ট দার্শনিক লকের প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার মতবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বার্কলে ও হিউম সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাঁহাদের রচনার যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। এইজন্য প্রথমে তিনি হিউমের সংশয়বাদের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। প্রমা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যে সকল অন্তর্বিরোধ আছে, স্বতন্ত্রভাবে তাহা উপলব্ধি করার পরেই, তিনি উক্ত সংশয়বাদের তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সমস্যা: (ক) 'ভল্‌ফ' ও 'বাউমাগার্টেন' জ্ঞানের যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাতেই কাণ্ট এতদিন কেন সন্তুষ্ট ছিলেন এবং (খ) কি করিয়া হিউম্ তাঁহাকে তাঁহার বিচারহীন বিশ্বাসের নিদ্রা হইতে জাগাইতে পারিলেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে হয়ত মূল সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের সহায়ক হইতে পারে। অনুভূতির বিষয় মাত্রেরই দুইটি দিক আছে, এই উপলব্ধি হইতেই দার্শনিক বিচারের আরম্ভ। একদিকে অনুভূতির বিষয়সকলে একটা অবিরাম পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; অপরদিকে সেখানে এমন কতকগুলি স্থায়ী উপাদান আছে, যাহা ছাড়া জ্ঞান সম্ভবপর নহে। কোন কোন দার্শনিক বস্তুর স্থায়ী ধর্মের উপরে, আবার কেহ কেহ তাহার অস্থায়ী ধর্মের উপরে, গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্লেটো জ্ঞান ও অনিশ্চিত মতের পার্থক্যের সাহায্যে স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন এই দুইয়েরই ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করিয়াছেন। প্রজ্ঞা আমাদের এমন সব ধারণা দেয়, যাহারা নিত্য এবং সার্বিক। অপরদিকে, ইন্দ্রিয়সকল আমাদের নিকট পরিবর্তনশীল ও বিশিষ্ট বিষয় প্রকাশ করে। আমাদের জ্ঞান হয় ধারণাগুলির সম্বন্ধে; কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কেবল অনিশ্চিত মতই হইতে পারে। কিন্তু প্লেটোর মনে ধারণা ও বিষয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে স্পষ্ট কল্পনা ছিল না। বিষয়কে তিনি কখনও ধারণার অনুকৃতি, কখনও ধারণার কার্য, কখনও বা তাহাদের আংশিক প্রকাশ বলিয়া ভাবিয়াছেন। বুদ্ধিবাদীরা প্লেটোর ধারণাবাদটিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ অনুভূতির জগৎ আভাস মাত্র এবং তাহার কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। অপরদিকে, দৃষ্টিবাদীরা ইন্দ্রিয়ের গুরুত্ব স্বীকার করায়, এই মতে উপনীত হইলেন যে, সাক্ষাৎ অনুভূতিতে প্রকাশিত শুধু বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়াই জ্ঞানের বৃদ্ধি সম্ভবপর।

দেকার্ৎই সর্বপ্রথম আধুনিক ভাষায় জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের সম্বন্ধের

সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কিন্তু বিনাতর্কে মানিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্ঞানমাত্রই কতকগুলি অনুভবনিরপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধ সত্যের অভিব্যক্তি। এই ধরণের মতবাদ জ্ঞানীয় নিশ্চয়তাবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু অনুভূতির জগতে ইহার প্রয়োগ কি করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার বিশ্লেষণে শেষপর্যন্ত এইরূপ দাঁড়াইল যে, জ্ঞান হইতেছে ধারণাসমূহের একটি সুসংবদ্ধ সমাবেশ—উহাদের স্পষ্টতা এবং বিবিক্ততা উহাদের আভ্যন্তরীণ সুসঙ্গতির প্রমাণ, এবং উহাদের যাথার্থ ঈশ্বরের সত্তার উপর নির্ভরশীল।

দেকার্তের মত, লক্‌ও এই সমস্যার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন, এবং মানুষের বুদ্ধিশক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তিনি এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অনুভব নিরপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধ সত্য মানিতে চাহেন নাই; সেইজন্য তিনি জ্ঞানমাত্রকে শুধু প্রত্যক্ষগ্রাহ্যের সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে জ্ঞানকে শুধু কতকগুলি ইন্দ্রিয়সংবেদনের সমষ্টি বলিয়া মনে করা হইল। এইরূপ মতবাদে, জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার ব্যাখ্যা হইলেও, উহার সার্বিকতাকে বিসর্জন দিতে হয়। দেকার্ৎ অথবা লকের অনুগামীরও এই দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। দেকার্ৎ চাহিয়াছিলেন একত্ব; কিন্তু ইহার পরিণাম হইল এই যে, লাইবনিৎস্ অনন্ত সংখ্যক এককের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। লক্ নিশ্চিতজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার ফল হইল এই যে, হিউম্ ক্ষণিক বিজ্ঞানের চেতনা ছাড়া অন্য সর্ব জ্ঞানেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন।

কাণ্ট পদার্থবিদ্যা ভাল করিয়া জানিতেন; তাহার পর, ইংরেজ দৃষ্টিবাদের সহিতও তাঁহার নূতন পরিচয় ঘটিল; ইহাতে তাঁহার নিকট এমন একটি সমস্যা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল, যাহার সমাধান করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার বিচারমূলক দর্শনে উপনীত হইলেন। পদার্থ বিদ্যার ছাত্র হিসাবে কাণ্ট বিনাতর্কে বুদ্ধি নির্মিত রচনা এবং জ্ঞানকে এক বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলেন না। চিন্তারাজ্যের সংযোগ সূত্রগুলি বস্তু জগতের সংযোগসূত্র হইতে পৃথক—হিউমের এই মতের সত্যতা তিনি উপলব্ধি করিলেন এবং ইহাতে এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় আরও বর্ধিত হইল। এইজন্য, যদিও গণিতজ্ঞ কখনও 'বুদ্ধিনির্মিত রচনা বাহ্য বস্তুর ব্যাপারে কি করিয়া সত্য হইতে পারে?' এই প্রশ্ন তুলেন নাই, তথাপি কাণ্ট এই প্রশ্ন তুলিলেন; প্রশ্ন তুলিলেন—'জ্ঞানের যাথার্থ উহার আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করে; কিন্তু উহা বাহ্যবস্তুর সারূপ্যের উপরও কেন নির্ভর করিবে?'

প্রাকৃত বিজ্ঞানের অগ্রগতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়, ইহার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনে আধুনিক দর্শনের জন্ম। বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়, তাহা দৃষ্টিবাদী ও বুদ্ধিবাদী উভয়সম্মত। শুধু এই অগ্রগতির কারণ ও স্বরূপের ব্যাখ্যাতেই ইহাদের মতভেদ। বুদ্ধিবাদীদের মত এই যে, বিজ্ঞানের স্বরূপ বিচারমূলক বলিয়া কয়েকটি পূর্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হইতে নূতন সত্যের অনুমান সম্ভবপর, এবং ইহাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণ। বৈজ্ঞানিক সত্যের অনিবার্যতা ও সার্বত্রিকতা ইহার বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অস্পষ্টভাবে পূর্ব হইতেই যাহা জানা ছিল, নূতন জ্ঞানে তাহাই বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে জানা হয়। সুতরাং বৈশ্লেষিক পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রধান বাহন।

দৃষ্টিবাদীরা অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির এইরূপ ব্যাখ্যাকে মানিবেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি ধারণার বিশ্লেষণ করিলেই উহার অর্থের বিকাশ বা সম্প্রসারণ ঘটে, তাহা হইলে এই বর্ধিত অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ধারণা হইতে জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণ করা যায় না। অপরপক্ষে, যদি জ্ঞানে অর্থের সম্প্রসারণ না হইয়া শুধুমাত্র পদের অর্থেরই পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহা জ্ঞান নহে, কিন্তু শব্দের ব্যাখ্যামাত্র। এইরূপ বিশ্লেষণদ্বারা ধারণাটির উৎপত্তি কি করিয়া হইল, তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং দৃষ্টিবাদীরা পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগকে বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তাঁহাদের মত এই যে, অনুভবলব্ধ জ্ঞান নিজেই নিজের প্রমাণ। এইরূপে জ্ঞানে আমরা সৎবস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধ সাংশ্লেষিক বিচারই জ্ঞানের বাহন।

সুতরাং যুক্তিবাদীরা জ্ঞানের নিশ্চয়তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন; কিন্তু ইহার অভিনবত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। আবার, বিজ্ঞান যদি নূতন কথা কিছুই না বলে, তাহা হইলে উহা শুধুমাত্র পুনরুক্তিতেই পর্যবসিত হয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতির উল্লেখ করিয়া, দৃষ্টিবাদীরা জ্ঞানের এই নূতনত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষত্বের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে, বিজ্ঞানে স্বীকৃত নিয়মাবলীর সার্বত্রিকতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। উপরন্তু যখনই আমরা প্রত্যক্ষত্বের অর্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদিগকে নানাপ্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। একটি বিশেষ ও সীমাবদ্ধ মনের বিশেষ কালের যে একটি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তাহা হয়ত অবিসংবাদিত। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে, 'কি করিয়া আমরা এইরূপ অনুভূতির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু নিরূপণ করিব?' কি করিয়াই বা আমরা বিষয়ী অর্থাৎ মনের যথাযথ বর্ণনা দিব?' বস্তুতঃ, হিউম্ যে জ্ঞানকে কতকগুলি প্রত্যক্ষের ধারা বলিয়া

বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপই প্রমাণিত হয় যে শুধু প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা জ্ঞানের ঐক্য জানিবার কোনও উপায় নাই। দৃষ্টিবাদে, বিভিন্ন প্রত্যয় বা ধারণার মধ্যে কোনও সংযোগসূত্র আছে, এইরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে—ধারণার এইসব পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে বস্তুজগতের সম্বন্ধে কি করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা তো আরও দূরের কথা।

কি দৃষ্টিবাদী, কি বুদ্ধিবাদী, কেহই বৈজ্ঞানিক বিধানসমূহের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই উপলব্ধিই কান্টের বিচারমূলক অনুসন্ধানের মূল। বৈজ্ঞানিক বিধানসকল বিশ্লেষণাত্মক বিচারবাক্যগুলির মত সার্বত্রিক যাথার্থ দাবী করে। তথাপি, সাক্ষাৎ অনুভূতিতে যে সকল বিশিষ্ট এবং সান্ত বিষয় আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহাদের ক্ষেত্রেও এই সকল বৈজ্ঞানিক বিধান প্রত্যক্ষমূলক বিধানের মতই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইভাবে বিজ্ঞানসম্মত বিধানসকল সংশ্লেষাত্মক ও পূর্বতঃসিদ্ধ দুইই। তাহাই, কান্টের "শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা" এই গ্রন্থের সমস্যা মূল হইতেছে—কি করিয়া পূর্বতঃসিদ্ধ সাংশ্লেষিক বিধান সম্ভবপর হয়? অধিবিজ্ঞানকে সমর্থন ও উহার যথাযোগ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে, কাণ্ট তাঁহার অধিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাথমিক বিচার আরম্ভ করেন। তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক বিজ্ঞানের জন্য যাহা প্রয়োজন, এবং মানুষের নৈতিক কর্তব্যবোধের জন্য যাহা প্রয়োজন, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেও তিনি যত্নবান হন। প্রথম দৃষ্টিতে, এই সকল বৃহত্তর সমস্যা হইতে তর্কবিদ্যার এই ক্ষুদ্র সমস্যায় অবতরণ আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আসলে এই সামান্য প্রশ্নের অবতারণা দর্শনের পদ্ধতিতে একটি বিপ্লবের সূচনা করে।

২। জ্ঞান সম্বন্ধীয় মত

শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা: কান্টের পূর্বে দার্শনিকেরা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণের পরিবর্তে সত্তার স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারেই অধিক ব্যস্ত থাকিতেন। বুদ্ধিবাদীদের মতে সত্য হইতেছে জ্ঞাতা কিংবা জ্ঞাত বিষয়ের ধর্ম। দৃষ্টিবাদীদের মতে, আমাদের ধারণাগুলি কখন কখনও সৎবস্তুর কার্য, আবার কখন কখনও উহার প্রতিবিম্ব; এবং সত্য থাকে ধারণা ও সৎবস্তুর সম্বন্ধের মধ্যে। অর্থাৎ কান্টের পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিক জিজ্ঞাসা প্রধানতঃ তত্ত্ববিষয়ক ছিল। এমনকি, যদিও প্রথমে লকের দার্শনিক বিচারের বিষয় ছিল মানববুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয়, তথাপি শীঘ্রই

তিনি এই বিচার পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়গুলির সত্তা কিরূপ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত জ্ঞানের বিষয়সকলের পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্বতঃসিদ্ধ সাংশ্লেষিক বিধান হইতেছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাহন—কাণ্টের এই আবিষ্কারে দার্শনিক বিচারের স্বরূপেই পরিবর্তন ঘটিল। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা নহে—কিন্তু জ্ঞান হইতে গেলে কি কি সর্তের প্রয়োজন—ইহাই এখন দর্শনের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

কাণ্টের মতে, জ্ঞানের অস্তিত্ব একেবারে সন্দেহের অতীত—জ্ঞানের অস্বীকারে স্ববিরোধ আছে ; কারণ, এইরূপ অস্বীকার জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং উহা নিজেই একটি জ্ঞান। জ্ঞানের অস্তিত্ব যখন দেওয়াই আছে, তখন দর্শনের কাজ হইবে, শুধু উহার অস্তিত্বের সর্তগুলি আবিষ্কার করা। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই, যথা—ন্যায়, গণিত ও বিজ্ঞান (এবং বিজ্ঞান বলিতে তিনি পদার্থবিদ্যা বুঝিতেন)—জ্ঞানের সেই সকল ক্ষেত্রের দিকে কাণ্ট লক্ষ দিলেন। কাণ্ট দেখাইলেন যে, এই সকল ক্ষেত্রের সর্বত্রই জ্ঞানের অগ্রগতি পদ্ধতির বিপ্লব দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। এই বিপ্লবের সার কথা হইতেছে, মতের সত্যতাকে বাস্তব জগতে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করা। যে পূর্বতঃসিদ্ধ বিধান অনুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলে। কাণ্টের পূর্বে, জ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ছিল, তদনুসারে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানমাত্রই বিশ্লেষমূলক এবং পরতঃসিদ্ধ জ্ঞানমাত্রই সংশ্লেষমূলক। কিন্তু কাণ্টের মত তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মতে, জ্ঞান মাত্রেই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এই দুইয়েরই মিলন থাকে।

সুতরাং কাণ্টের মতে, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এবং পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ঐকান্তিক বিভাগকে অতিক্রম করিয়াই গণিতবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানে অগ্রগতি আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাই, তিনি অনুমান করিলেন যে, অধিবিদ্যাব অনুরূপ অগ্রগতিও বিচার প্রণালীর অনুরূপ বিপ্লব দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। যে সকল সর্তে কোনও পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, দর্শনকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

তাঁহার প্রথম "সমালোচনা" গ্রন্থে (অর্থাৎ "শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনাতে") কাণ্টের উত্তর এই যে, আমাদের জ্ঞান হইতেছে বিষয়ের জ্ঞান এবং উহা সংবেদনশক্তি ও বোধশক্তি এই দুইটি উপাদানের উপর নির্ভর করে। সংবেদন শক্তির দ্বারা আমাদের নিকট জ্ঞাতব্য পদার্থগুলি প্রদত্ত হয় এবং বোধশক্তির সাহায্যে আমরা এইগুলিকে

বুঝি ও জানি। এইভাবে কাণ্ট দৃষ্টিবাদীদের নিকট হইতে এই মত গ্রহণ করেন যে, সংবেদনশক্তি নিষ্ক্রিয়, এবং বুদ্ধিবাদীদের নিকট হইতে এই মত গ্রহণ করেন যে, বোধশক্তি সক্রিয়। কিন্তু তিনি এই দুই মত হইতে ভিন্ন এই মত পোষণ করেন যে, উক্ত দুই শক্তির সহযোগিতা ছাড়া আমাদের জ্ঞান হয় না। তিনি "অলৌকিক সংবেদন" * শীর্ষক অধ্যায়ে সংবেদনশক্তির ক্রিয়াগুলিকে এবং "অলৌকিক বিশ্লেষণ' † শীর্ষক অধ্যায়ে বোধশক্তির ক্রিয়াগুলিকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন।

অলৌকিক সংবেদন : আমরা প্রথমে যাহা পাই, তাহা হইতেছে সংবেদন—কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেছে বিষয়। ইহা সম্ভব হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, সংবেদনগুলির প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গঠন আছে। 'এই গঠন কি?' তাহা যখন আমরা অনুসন্ধান কবি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, সংবেদনগুলি দেশ ও কালে দেওয়া আছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দেশ ও কালের স্বরূপের সহিত খাপ খাওযা অত্যাবশ্যক। অতএব দেশ ও কালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে, আমরা এমন কতকগুলি ধর্ম আবিষ্কাব করিতে পাবি যাহা অনুভবের যথার্থতার অপরিহার্য নিযামক। "অলৌকিক সংবেদনে" কাণ্ট ইহাই প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। নিউটনের মতের বিরুদ্ধে, তিনি দেখাইলেন যে, দেশ ও কাল মন-নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তু নহে। আবার লাইবনিৎসের মতের বিরুদ্ধভাবে তিনি দেখাইলেন, এই কথা সত্য নহে যে প্রথমে আমাদের দেশ ও কালেব অপেক্ষা না রাখিয়া, বস্তুর জ্ঞান হয়, এবং পরে এইরূপ বস্তুর অনুভব হইতে নিকৃষ্ট কয়েকটি ধারণার অবিবিক্ত সংমিশ্রণই হইতেছে দেশ ও কাল। কাণ্টের মতে, দেশ হইতেছে বাহ্যত্বের আকার, এবং শুধু এই আকাবের মাধ্যমেই, আমবা ইন্দ্রিয়োপাত্ত যে আমাদের বাহিরে, এই কথা উপলব্ধি করিতে পারি। এইজন্য, ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে ইহার অনুমান সম্ভবপর নহে। যেহেতু ইহা সর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতির পূর্বগামী নিয়ামক, সেইহেতু কাণ্ট দেশকে প্রত্যক্ষের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার এই নাম দিয়াছেন।

একইভাবে, কাল হইতেছে (পরিবর্তনের) ক্রমের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার এবং কেবল এই আকারের মাধ্যমেই মন ইন্দ্রিয়সংবেদন ও আন্তরানুভূতিগুলিকে একের পর এক এইভাবে গ্রহণ করিতে পারে। ক্রমের প্রত্যক্ষ মাত্রেরই পূর্বে, এই আকারটি অবশ্যস্বীকার্য, এবং এইজন্য উহাকে ক্রমের প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে না। যেহেতু অনুভবমাত্রেই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেইহেতু দেশ ও কাল অনুভবের

* 1. Transcendental Aesthetic.

† 2. Transcendental Analytic.

সম্ভাবনার পূর্বতঃসিদ্ধ নিয়ামক। দেশ ও কালের আবশ্যতা। দৃষ্টিবাদীরাও অস্পষ্ট-ভাবে আন্দাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝেন নাই। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, আমাদের অনুভবে শুধু পৃথক পৃথক বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়োপাত্তসকল দেওয়া থাকে; কিন্তু আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেছে বিষয়, ইন্দ্রিয়োপাত্ত নহে। এইক্ষণে, এই পরিবর্তন কি করিয়া ঘটে, দৃষ্টিবাদীরা তাহার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন না। ইহাতে হিউমের মনে সন্দেহ হইল, জ্ঞান আদৌ সম্ভবপর কি না।

পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসিদ্ধের মিলনের উপর জোর দেওয়ার ফলেই, কাণ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশিষ্ট বস্তুটি শুধু আকারহীন উপাদান নহে। ইহা হইতে যুক্তিসঙ্গত এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে যে, আমাদের জ্ঞানে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহা কখনই সম্পূর্ণ পৃথক বিশিষ্ট পদার্থ-মাত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে, কাণ্টের মতে সংবেদনের স্বরূপ পরমাণুর ন্যায় হইতে পারে না। কারণ দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ নিজেই বহুর প্রত্যক্ষ। "অলৌকিক সংবেদনেও" তিনি দেশ ও কালকে "অনুভবগ্রাহ্য বহু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং "বিশ্লেষণে" বলেন যে, দেশ ও কাল নিজেরাই বুদ্ধির সংশ্লেষণ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। "'সংবেদনে' আমি এই একতাটিকে শুধু সংবেদনশক্তির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই একতা যে সর্বপ্রকার সামান্য ধারণার পূর্ববর্তী, ইহা দেখাইবার জন্যেই আমি ঐরূপ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই একতার পূর্বে এমন একটি সংশ্লেষণ স্বীকার্য, যাহা সংবেদনশক্তির অন্তর্গত নহে, কিন্তু যাহার সাহায্যে দেশ ও কাল বিষয়ক সর্ব ধারণাই প্রথমে সম্ভবপর হয়।" (খ ১৬০—১৬১)

এইভাবে বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষেও কিছু সংগঠন বা সংশ্লেষণ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কাণ্ট আরও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, প্রত্যক্ষে প্রজ্ঞার ক্রিয়াও নিহিত রহিয়াছে, কারণ প্রত্যক্ষের পূর্বে, সৎবস্তুর একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমগ্রের ধারণা অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং সংবেদন, বোধ ও প্রজ্ঞা এই তিনটি শক্তির সহযোগিতার উপর জ্ঞান নির্ভর করে। এই তিনটির মধ্যে, সংবেদন ও বোধ এই দুইটি আমাদের জ্ঞানের গঠনের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে—কিন্তু প্রজ্ঞা শুধু সংবেদন ও বোধক্রিয়ার সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয় মাত্র। "সুতরাং প্রজ্ঞার বৈতর্কিক প্রয়োগের উদ্দেশ্য হইতেছে, বুদ্ধি লব্ধ জ্ঞানের সুশৃঙ্খল ঐক্য সম্পাদন করা—এবং এই ঐক্য দ্বারা উহার নিয়মগুলির সত্যতা যাচাই হয় (ক ৬৪৭—খ ৬৭৫)।" সুতরাং সুসংগতি হইতেছে সত্যের নির্ণায়ক। বিষয়সমূহ শুধু সেই পরিমাণেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, যে পরিমাণে

উহারা সমগ্র সত্তার সুশৃঙ্খল ঐক্যের ধারণার সহিত খাপ খায়। সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-সম্বন্ধ একটি সমাবেশ বলিয়া মনে করিলে, আমরা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ধরণের একটি সমাবেশের প্রত্যেক অংশই তদতিরিক্ত অন্যান্য প্রত্যেকটি অংশের সহিত এবং সমগ্র সমাবেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত।

কাণ্টের মতবাদকে হিউমের জ্ঞানীয় পারমাণবিকবাদ ও হেগেলের পারমার্থিক নিরপেক্ষসত্তাবাদ হইতে পৃথক করিয়া দেখা প্রয়োজন। হিউমের মতে, অনুভূতিকে কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তসমূহের ধারা বলিয়া গণনা করা হয়। কিন্তু হেগেল মনে করেন, পারমার্থিক সত্তা হইতেছে এমন একটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ সুশৃঙ্খল সমাবেশ, যাহার প্রত্যেকটি অংশ হইতেছে বিরাট অংশীর ক্ষুদ্রায়তন প্রতিকৃতি। হিউমের মতের বিরুদ্ধে, কাণ্টের বক্তব্য এই যে, কেবল সবিশেষ ব্যক্তির ধারণাতেও সার্বিক ও অবশ্যম্ভব ধর্ম নিহিত থাকে। জ্ঞানে প্রদত্ত বিষয়টির মধ্যে উহার বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ থাকে, এই অর্থে, উহা মূর্তদ্রব্য হইতে পারে; কিন্তু একটি স্বসম্পূর্ণ বিশ্ব, এই অর্থে, উহা কখনও মূর্তদ্রব্য নহে, এবং সেই রকম হইতেও পারে না— কাণ্টের এই সাবধানবাণী যেন হেগেলের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হইয়াছিল। "অপরদিকে, কেবল ধারণারূপে এই সুশৃঙ্খল ঐক্যটি হইতেছে উদ্ভাবিত ঐক্যমাত্র; উহার সম্বন্ধে শুধু এইরূপ মনে করাই সঙ্গত হইবে যে, উহা বুদ্ধির নিকট একটি সমস্যারূপে দেওয়া, উহাদের স্বরূপেই সত্য বলিয়া দেওয়া, এই রকম নহে। উহা বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের বিবিধ ও বিশেষ বিশেষ প্রকারের মধ্যে আমাদিগকে একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে; এই ভাবে, উহা যে-সকল বিষয় সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানে দেওয়া থাকে না, তাহাদের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, আমাদের বোধশক্তিকে অধিক সুসংগত করে" (ক ৬৪৭—খ ৬৭৫)।

অলৌকিক বিশ্লেষণ: কাণ্ট শেষ পর্যন্ত কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া লওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। স্বয়ং কাণ্ট বলিয়াছেন: যদিও কার্যকারণের নিয়ম সাংশ্লেষিক, কিন্তু বৈশ্লেষিক নহে, তথাপি উহা সার্বত্রিকতার দাবী করে, হিউমের এই নিশ্চিত অভিমত কাণ্টকে তাঁহার বিচারহীন বিশ্বাসের নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছিল। দৃষ্টিবাদ এই দাবীর সার্বত্রিকতার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। যেহেতু হিউম মনে করিতেন যে, জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সেইহেতু তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই দাবীর ভিত্তি জ্ঞান নহে—সংবেদন। কিন্তু সংবেদন সকল জ্ঞাতার ব্যক্তিগত ধর্ম। সেইজন্য, একজনের সংবেদনের সহিত অপরের সংবেদনের বিরোধের কোনও প্রশ্ন উঠেনা।

তাই জ্ঞানকে সংবেদনের উপর নির্ভরশীল মনে করার অর্থ, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকেই অস্বীকার করা।

কাণ্ট হিউমের এই সকল আপত্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেও, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হিউম শুধু কার্যকারণ নিয়মেরই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কাণ্ট দেখাইলেন, একমাত্র কার্যকারণের নিয়মই এমন যৌগিক বিধান নহে, যাহা সার্বত্রিকতার দাবী করে। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতির সর্বত্রই এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ধরনেব বিধানের সত্যতা অস্বীকার করার অর্থ, অনুভূতির সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা। তাই কাণ্টের সিদ্ধান্ত এই হইল যে, দৃষ্টিবাদীরা জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং বুদ্ধিবাদীরা উহার যে ব্যাখ্যা দিযাছেন এই দুই ব্যাখ্যাতেই কিছু ভুল রহিযাছে। উভয মতেই জ্ঞান হইতেছে কেবল বিশ্লেষণ। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, জ্ঞান হইতেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির তুলনায় পূর্বতঃসিদ্ধ সার্বিক নিয়মসকলের বিশ্লেষণ; আর দৃষ্টিবাদীদের মতে, উহা হইতেছে বহুবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির বিশ্লেষণ। উভয়ের মতেই, জ্ঞানের ব্যাপারে মন একেবারে নিষ্ক্রিয়। প্রথম মতানুসারে, মন বিধারণা সমূহের সম্বন্ধকে পরিস্ফুট করে, এবং দ্বিতীয মতানুসারে উহা ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির সম্বন্ধকে পরিস্ফুট করে। দুইদলের কাহারও চোখেই ইহা ধরা পড়িল না যে, বিশ্লেষণ নিজেই একধরণের ক্রিয়া, এবং নিছক নিষ্ক্রিয় গ্রহণ কোনও প্রকারের জ্ঞানকেই ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

জ্ঞানে বুদ্ধিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আবোপ কবাতে, পূর্বতঃসিদ্ধ বিধানের বিশ্লেষণ কাণ্টকে সত্যসম্বন্ধে নূতন মতবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত করিল। তিনি দেখিলেন যে, শুধু জ্ঞানের বিষয়সকলের দিকে উপরি উপরি দৃষ্টিপাত করিলেই উহাদের সত্যাসত্যতা নির্ধারণ করা যায় না। যাহা সত্য, তাহা যদি সর্বদাই স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য হইত, তাহা হইলে আদৌ কেন ভ্রান্তি হয় তাহা বুঝা অসম্ভব। এই জন্য, কাণ্টের মতে, সত্যের পরখ হইল, বর্তমান অনুভূতি এবং সম্ভাব্য অনুভূতির সম্বন্ধ। অর্থাৎ যখন কোনও একটি প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত উহার পূর্ববর্তী জ্ঞানের মিল থাকে, এবং যখন উহা অন্যান্য নূতন জ্ঞানের নিয়ামক হয়, তখনই আমরা উহাকে সত্য বলিয়া মনে করি। আবার যখন কোনও প্রত্যক্ষ অতীতের অনুভূতির দ্বারা বাধিত হয়, কিংবা ভবিষ্যৎ অনুভূতির সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে, তখন আমরা উহাকে উহার সাক্ষাত্ত্ব সত্বেও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। সুতরাং কাণ্টের মতে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরপেক্ষ নহে, কিন্তু সাপেক্ষ। আমাদের জাগ্রত মুহূর্তের বিভিন্ন অনুভূতিগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই উহারা সত্য। আর

আমাদের স্বাপ্নিক অনুভূতিগুলি এইজন্যই মিথ্যা যে, উহাদের ভিতর ঐরূপ কোনও সামঞ্জস্য নাই।

সংবেদনশক্তি যদি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়, তাহা হইলে সাংশ্লেষিক পূর্বতঃসিদ্ধ বিধানের কোনও রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আমাদের সর্ব অনুভূতিতেই উহাদের সহকারিতা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়। কাণ্ট বলেন, যদিও আমাদিগকে সংবেদনশক্তি ও বোধশক্তিকে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তথাপি উহাদের বিষয় সকল পরস্পর হইতে বিছিন্ন নহে। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়োপাত্তে বুদ্ধির 'প্রকার' প্রয়োগ না করিলে, উহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ই হয না। অপর পক্ষে, যাহা জ্ঞানের নিকট উপস্থাপিত নহে, তাহাতে বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগও হইতে পারে না। "বিধারণা ব্যতীত সাক্ষাৎ অনুভব অন্ধ, আবার সাক্ষাৎ অনুভব ব্যতীত অনুভবসকল শূণ্যগর্ভ।" (খ ৭৫)

আপত্তি হইতে পারে, যে বিধারণার দ্বারা কোনও বিষয়ের কিংবা ঘটনার স্বরূপ প্রকাশিত হয় উহা হইতেছে সার্বিক ও এইজন্য দেশ ও কালের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। অপরপক্ষে, সাক্ষাৎ অনুভূতি বিশেষযুক্ত বলিয়া, উহা দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সংবেদন ও বোধশক্তি উভয়ের বিষয় যদি একই হয়, তাহা হইলে ফলে কি এইরূপ দাঁড়াইবে না যে, বিধারণাটি কোনও না কোনও সাক্ষাৎ অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ হইয়া উহার সার্বত্রিকতা হইতে বিচ্যুত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে কাণ্ট বলেন যে—বিধারণার মূলে রহিয়াছে বিশিষ্ট অনুভবগুলির অস্তিত্বগত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ঐক্যটিকে প্রকাশ করা। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করাই বুদ্ধির কাজ। সংবেদনের নিকট যাহা প্রদত্ত নহে, তাহা প্রজ্ঞারও অনধিগম্য। কাণ্টের ভাষায়: "বিধান মাত্রই ধারণাগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপনকারী ক্রিয়া," আর "ক্রিয়া বলিতে আমি বিভিন্ন ধারণাসকলকে একটি সামান্যধারণার অন্তর্ভুক্ত করারূপ ক্রিয়ার ঐক্যকে বুঝি" (খ ৯৩—ক ৬৮)।

কাণ্টের এই বিচারটি আমরা নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিতে পারি। সামান্য-ধারণার কার্য হইতেছে, অনুভূতিসকলকে শ্রেণীবদ্ধ করা; এবং এইজন্য অনুভূতি ও বিধারণার বিষয় এক হইলেও, উহারা পরস্পর হইতে পৃথক। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, বিধারণা হইতেছে অনুভবের বৈচিত্র্যকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে আনয়ন করিবার প্রণালী। একটি বিশেষ বিধারণা সম্বন্ধে যাহা সত্য, মানবীয় চিন্তার সার্বিক প্রকারগুলি সম্বন্ধেও তাহা একইভাবে সত্য। যেহেতু

"আমরা বোধশক্তির সমস্ত ক্রিয়াসকলকে বিধানে রূপান্তরিত করিতে পারি," (খ ৯৪) সেইহেতু বিধানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া, আমরা অনুভবের স্বরূপ অনুমান করিতে পারি। এই ধরণের বিবরণে আমরা যাহা প্রকাশ করিব তাহা অনুভূতির বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির বর্ণনা হইবে না, কিন্তু তাহা হইবে অনুভবের সম্ভাব্যতার নিয়ামক সকলের বর্ণনা। সুতরাং আমরা যদি বিভিন্ন রকমের বিধানের মূল নিয়মগুলি বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা একই সঙ্গে সেই সকল বিভিন্ন প্রকার-গুলিকেও বাহির করিতে পারিব, যে সকল প্রকার লইয়াই বিষয়সকল আমাদের অনুভবে প্রদত্ত হইতে পারে। নানাবিধ বিধানের এই যে ভিত্তিস্থানীয় নিয়মসকল, উহাদিগকেই কাণ্ট বৌদ্ধিক প্রকার নাম দিয়াছেন। ইহারা আমাদের সর্ব প্রত্যক্ষ ও চিন্তার মূলে নিহিত থাকে। ইহারা অনুভূতির যথার্থতার নিশ্চায়ক এবং এই কারণেই ইহাদের প্রয়োগ অনুভূতির সীমার মধ্যেই আবদ্ধ।

(বৌদ্ধিক প্রকারের) আধিবৈজ্ঞানিক সমর্থন : কাণ্ট ভাবিয়াছিলেন, যে-বিশ্লেষণে সর্বজ্ঞেয় বিষয় হইতে নিষ্কাশন করিয়া বিধানের বিশুদ্ধ আকারটি পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিশ্লেষণের কাজ আকারীয় তর্কবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছিল। সুতরাং তিনি আকারীয় তর্কবিদ্যা বিধানের যে তালিকা দেয়, তাহা হইতেই তিনি স্বীয় বৌদ্ধিক প্রকার সকলের তালিকা প্রস্তুত করেন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আকারীয় তর্কবিদ্যার প্রতি কাণ্টের প্রকাশ্যে স্বীকৃত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তিনি এই তর্কবিদ্যা বিধানের যে-বিশ্লেষণ দেয়, তাহাকে সন্দেহ করিতে এবং নিজের সুবিধামত উহার বিধানের শ্রেণীবিভাগকে পরিবর্তন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সর্ব বিধানের পূর্বতঃসিদ্ধ ভিত্তিরূপে যে বৌদ্ধিকপ্রকার সকল আছে, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তালিকার আকারে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

বিধান সকল

পরিমাণ অনুসারে	গুণ অনুসারে	সংসর্গ অনুসারে	অবস্থা অনুসারে
সামান্য	অস্তিবাচক	অবাধ	সাম্ভবিক
বিশেষ	নাস্তিবাচক	বৈতর্কিক	ভাবিক
ঐকিক	অসীম	বৈকল্পিক	আবশ্যম্ভবিক
পরিমান অনুসারে	গুণ অনুসারে	সংসর্গ অনুসারে	অবস্থা অনুসারে
একত্ব	সত্তা	দ্রব্যগুণভাব	সম্ভব ও অসম্ভব
বহুত্ব	অসত্তা	কার্যকারণ ভাব	অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব
সমগ্রত্ব	পরিচ্ছেদ	পারস্পরিক কার্যকারণতা	অবশ্যম্ভবিকত্ব ও কাদাচিৎকত্ব

বিজ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর হয়, বৌদ্ধিকপ্রকার দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে বিশিষ্ট বস্তুকে পরীক্ষা করিয়া উহার সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার করা। এই আবিষ্কারের সার কথা হইতেছে, উহার ভবিষ্যৎ ক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব হইতে বলিয়া দেওয়া। ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্দাজ অথবা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মনের স্বভাবের সহিত এরূপ জ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া, তিনি উহাকে সমর্থন করেন।

প্রাক্-কাণ্টীয় দর্শনে, বোধ ও সংবেদনকে বিভিন্ন প্রকারের বিষয় গ্রহণকারী পরস্পর হইতে পৃথক শক্তি বলিয়া মনে করা হইত। প্লেটো এই মত পোষণ করিতেন যে, সৎবস্তু শুধু প্রজ্ঞার বিধারণার দ্বারাই প্রকাশিত হয়, কিন্তু সংবেদনে আমরা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত পরিচিত হই। এইভাবে সত্তা ও অবভাসের প্রভেদকে প্লেটো বোধশক্তি ও সংবেদনশক্তির প্রভেদের সহিত এক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সংবেদনশক্তি ও বোধশক্তির এই আত্যন্তিক পার্থক্য কাণ্ট অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, উহারা প্রকৃতপক্ষে মনেরই সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দিকমাত্র। উহাদের উভয়ের সহযোগিতায়, জ্ঞান সম্ভবপর হয়। সংবেদনশক্তিরূপে মন বহিরাগত জ্ঞানের উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে এবং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মনকে গ্রাহক অথবা নিষ্ক্রিয় মনে করা যাইতে পারে। বোধশক্তিরূপে মন এইসকল উপাদানের উপর ক্রিয়া করে এবং সংযোজনদ্বারা উহাদিগকে জ্ঞানীয় বিধানে রূপান্তরিত করে। সুতরাং কাণ্টের মতে, সংবেদন ও বোধের পার্থক্য উহাদের স্বরূপগত নহে, বিষয়গতও নহে,—উহাদের পার্থক্য হইতেছে উহাদের বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াতে।

অতএব কাণ্টের জ্ঞানসম্বন্ধীয় মতবাদের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে :—আমাদের অনুভূতিতে যে অবভাসটি প্রতিভাত হয়, উহা সত্য অথবা পরম তত্ত্ব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। সত্য হইতেছে এমন একটি সমগ্র, যাহার সম্বন্ধে আমাদের কেবল আংশিক জ্ঞানই হয়। এমনকি, যাহা আমরা জানি বলিয়া ভাবি, তাহা কখনও সম্পূর্ণ নহে। উহাতেও অধিক জ্ঞানের অবকাশ সর্বদাই থাকে। সুতরাং সত্তার এই সমগ্রীয় একতা হইতেছে জ্ঞানের পূর্বতঃ স্বীকার্য নিয়ামক। কিন্তু উহা কখনও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

এই একতার প্রথম আকার দেশ ও কাল হইতে আসে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য উপাদানসকল যদি পরস্পর হইতে পৃথক পরমাণুর মত হইত, তাহা হইলে বিষয়ের অনুভূতি অসম্ভব হইত। বর্তমানের প্রত্যক্ষগুলিকে অবশ্যই সম্ভাব্য অপরাপর

প্রত্যক্ষের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এই সংযোগটিকে আকস্মিক অথবা অনিয়ত মনে করা যায় না। কারণ উহা আমাদের বিষয়তাবোধের ভিত্তি। 'ইন্দ্রিয়দত্ত বিবিধ উপাদানগুলি' বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রকমে সুসম্বদ্ধ হয়—কিন্তু যেহেতু উহারা সকলেই আমাদের অনুভূতিতে প্রদত্ত, সুতরাং উহারা আমাদের অনুভূতির প্রকারগুলির দ্বারা নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রিত হইবে। সুতরাং কাণ্টের মতে, দৈশিক ও কালিক ঐক্য হইতেছে অনুভূতির সম্ভাবনার একটি নিয়ামক। এই ধরণের ঐক্যকে মানিয়া না লইলে, আমরা অনুভূতির কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারি না। কিন্তু অনুভূতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিলে স্ববিরোধ হয়। এই দৈশিক ও কালিক ঐক্য শুধু ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতিতে নহে, উপরন্তু সর্ব মানুষের অনুভূতিতেই প্রযোজ্য। ইহার কারণ এই যে, এক মানুষের অনুভূতি অন্য মানুষের অনুভূতি হইতে ভিন্ন রকমের নহে। বিভিন্ন মানুষ শুধু একই বিষয়সকলকে জানে, তাহা নহে। অধিকন্তু তাহারা পরস্পরকে এবং পরস্পরের অনুভূতিকেও জানে। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির দেশ ও কাল বিষয়ক সর্ব অনুভূতিগুলিকে একই সার্বিক দেশ-কালের কাঠামোতে খাপ খাওয়াই-তে হইবে।

অলৌকিক (অথবা অনুভবাতীত) সমর্থন : দৈশিক ও কালিক ঐক্য আমাদের অনুভূতির একটি অত্যাবশ্যক নিয়ামক, কিন্তু শুধু উহার দ্বারাই অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না। এই ব্যাখ্যার জন্য বোধের ক্রিয়াতে যে ঐক্য জড়িত থাকে, তাহাও আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের নিকট যাহা প্রদত্ত হয়, বোধশক্তি তাহা হইতে কিছু নির্বাচন করে, কিছু সংযোজন করে, এবং তাহাকে অর্থ দেয়। যে-কোনও মুহূর্তে, আমাদের অনুভূতিতে বর্ণের হাজার রকমের ছটা, শব্দের বিবিধ সূক্ষ্ম প্রভেদ, গন্ধ ও স্পর্শের বিভিন্ন মাত্রা বিদ্যমান থাকে। যদি আমরা উহাদিগকে নিয়মের সাহায্যে সমষ্টিবদ্ধ না করি, তাহা হইলে এই সকল ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রাচুর্যই আমাদের কোনও রকম যুক্তিসঙ্গত অনুভূতি হইতে দিবে না। আমাদের প্রত্যক্ষ যে কতখানি নির্বাচনশীল, তাহা এই দুইটি উদাহরণদ্বারা বুঝা যাইতে পারে—যথা বহু লোকের মধ্যেও আমরা আমাদের নিজ সঙ্গীর সহিত আলাপ করিতে পারি। এবং শহরের সকল কোলাহলের মধ্যেও যে-মায়ের ঘুম ভাঙ্গে না, সেই মা-ই আবার শিশুর সামান্য কাঁদার আওয়াজেই জাগিয়া উঠে। সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্ত সকলের সুনিয়ন্ত্রিত মেলন ঘটান বোধশক্তির একটি অত্যাবশ্যক ক্রিয়া। কাণ্টের মতে, বোধশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলিকে সুসম্বদ্ধ করিয়াই অনুভূতি সম্ভবপর হয়। এই সুসম্বদ্ধতা বিধানে প্রকাশিত হয়।

দেশ ও কাল কিভাবে অনুভূতির সম্ভাবনার নিয়ামক হয়, কাণ্ট 'সংবেদনে' তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং 'বিশ্লেষণে' বৌদ্ধিক প্রকারগুলিও যে অনুভূতির অপরিহার্য নিয়ামক, ইহা দেখাইয়া, তিনি উহাদের যথার্থতা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা' এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্বর্তী স্বল্প কালের মধ্যেও কাণ্টের চিন্তাধারা কিভাবে ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা উক্ত দুই সংস্করণে বৌদ্ধিক প্রকারেব অনুভবাতীত সমর্থনের যে দুইটি বিভিন্ন বিবরণ আছে, তাহাদের তুলনা দ্বারা বুঝিতে পারি। সমর্থনের দুইটি বিবরণেই কাণ্ট বিনা প্রশ্নে ধরিয়া লইযাছিলেন যে, "সর্ব ধারণার মধ্যে সমন্বয়ই (অথবা সংশ্লেষণই) হইতেছে একমাত্র ধারণা, যাহা বিষয়ের দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। যেহেতু উহা জ্ঞাতারই একটি নিজস্ব ক্রিয়া, তাই জ্ঞাতা ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা উহা সম্পাদিত হইতে পারে না" (খ ১৩০)।

কালের অনুভূতির বিশ্লেষণ হইতে 'ক' প্রমাণের আরম্ভ। আমাদের কাল বিষয়ক জ্ঞানও একটি কালিক প্রক্রিয়া। সুতরাং বর্তমান ও অতীতের উপলব্ধি সকল একই চৈতন্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া, এবং ঐক্যবদ্ধ বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাত (অর্থাৎ স্বীকৃত) হইয়াই, আমাদের কাল-বিষয়ক জ্ঞান সম্ভবপর হয়। কিন্তু এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার সহিত আত্মচেতনা জড়িত থাকে। সুতবাং আত্মচেতনাব্যতীত কোনও রকম চেতনা (বা জ্ঞানই) সম্ভবপর নহে। আত্মচেতনার সহিত বিষয়ের চেতনা জড়িত; কারণ আত্মাকে কখনও শুধু তাহার নিজের চেতনার মধ্যে ধরা যায় না। অতএব আত্মচেতনা ও বিষয়ের চেতনা বোধশক্তির একটি ক্রিয়ার দ্বারা যুগপৎ উৎপন্ন হয। আত্মার জ্ঞানই একই সঙ্গে অনাত্মার জ্ঞান হইতে বাধ্য। ইহা হইতে কাণ্ট প্রমাণ করেন, যে-সকল বৌদ্ধিক প্রকার বিধানকে সম্ভবপর করে, তাহারা আমাদের সর্ব অনুভূতির মূলে থাকিতে বাধ্য।

লক্ষিত হইবে যে চেতনামাত্রই, তাহা আত্মচেতনাই হউক অথবা বিষয়চেতনাই হউক, কি করিয়া বিধানক্রিয়ার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা "ক সমর্থনে" প্রদর্শিত হয় নাই। সেখানে চেতনা ও বিধানক্রিযার এই অবিচ্ছেদ্য সংযোগ প্রমাণ না করিয়া বরং ধরিযা লওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপাবে 'খ সমর্থন' 'ক সমর্থন' হইতে ভাল, কারণ বিষয়চেতনা ও বিধানের এই সম্বন্ধটিকে ইহা আরও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছে। বিষয়ের মধ্যে যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থাকে, তাহা নহে, অধিকন্তু ইহার মধ্যে এমন একটি ঐক্যও থাকে, যাহা অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তকে একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করে। বহু ইন্দ্রিয়োপাত্ত আমাদের সংবেদনে দেওয়া থাকিলেও, শুধু এই

কারণেই উহারা আমাদের বিষয় হইবে, এমন নহে। উহারা শুধু তখনই আমাদের নিকট একটি বিষয় হইতে পারে, যখন উহারা একই জ্ঞানে উহারই বিষয়রূপে সংযুক্ত হয়। সুতরাং আত্মার ঐক্য বিষয়চেতনার একটি পূর্ব নিয়ামক; কিন্তু উহা যদি কেবল একটি শূণ্যগর্ভ বিশুদ্ধ ঐক্য হইত, তাহা হইলে আমরা এই ঐক্যকে জানিতে পারিতাম না। আত্মার বিশেষ বিশেষ অনুভূতিসকলের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের তুলনাতেই আমরা আত্মার এই ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। কান্টের ভাষায়, "আত্মচেতনার বৈশ্লেষিক ঐক্যের পূর্বে, বহু ইন্দ্রিয়সংবেদনের সাংশ্লেষিক ঐক্যকে ধরিয়া লইতে হইবে।" (খ ১৩৮)

কান্ট আরও দেখাইলেন যে, বিষয়কে জানার অর্থই হইতেছে বিচার করা বা বিধান দেওয়া। বিধান বলিতে দুইটি বিধারণার সম্বন্ধ বুঝায়—কান্ট তাঁহার পূর্ববর্তীদের এই মত প্রত্যাখ্যান করিষা বলিলেন যে, "বিধান হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সকলকে স্বচেতনার বৈষয়িক ঐক্যে আনয়ন করার একটি প্রণালী। বিধান ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।" (খ ১৪১) হিউম্ দেখাইয়াছেন যে, আমরা যদি শুধু ধারণাগত সম্বন্ধের দিকেই লক্ষ্য দিতাম, তাহা হইলে বস্তুবিষয়ক বিধানকে মানসিক সংসর্গ হইতে পৃথক করিবার কোনই উপায় থাকিত না। এই পার্থক্যটি যাহার উপর নির্ভর করিতে পারে, এইরূপ একটি সূত্রকে আবিষ্কার করিতে না পারার ফলেই, হিউম জ্ঞানের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। কান্ট আত্মার ঐক্যের সহিত এবং দুইভাবে বৈষয়িক অনুভূতির সম্ভাবনার সহিত বিধানকে সংযুক্ত করিয়া, এই পার্থক্যের যথার্থতা প্রমাণ করিলেন।

ধারণাগত মানসিক সংসর্গ হইতে বিধানের এই পার্থক্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। মানসিকসংসর্গে, ধারণাসকলের সম্বন্ধ অনিয়ত ও আকস্মিক। সুতরাং এই সম্বন্ধ জ্ঞাতার অনুভূতির ঐক্যে কোনও রকম পরিবর্তন না ঘটাইয়াই, পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু বিধানে সম্বন্ধটিকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না, এবং ইহা এমন একটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাহা আত্মার ঐক্যের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং বিধান নিজে ধারণার এই সম্বন্ধটিকে অপরিহার্য বলিয়া বর্ণনা না করিলেও, উহা অপরিহার্য। খ ১৪৩এ কান্ট এই ভাবটিকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া ধারণা সকলের বিষয়গত ঐক্যকে (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রীয় বিধানকে) জ্ঞাতৃগত ঐক্য (অর্থাৎ ধারণাসকলের মানসিক সংসর্গ) হইতে পৃথক করিয়াছেন। এই সম্বন্ধটি যখন মূল স্বচেতনা ও তাহার অপরিহার্য ঐক্যের উপর নির্ভর করে, তখনই তাহাকে বিধান বলা যায়। বিধানটি নিজে ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ এবং (এইজন্য)

আকস্মিক হইলেও, এই কথা খাটিবে। উদাহরণ স্বরূপ, "জড় পিণ্ডের গুরুত্ব আছে" এই বিধানটি লওয়া যাউক। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব "জড়পিণ্ড" ও "গুরুত্বের" মধ্যে একটি অত্যাবশ্যক সম্বন্ধ ব্যক্ত করে, এই বিধানে এইরূপ বলা হয় না। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, আমাদের অনুভূতির ঐক্যের জন্য, এই দুই ধারণার সম্বন্ধটি অত্যাবশ্যক। মানসিক সংসর্গের ক্ষেত্রে, আমরা শুধুমাত্র এই বলিতে পারি যে, আমরা যদি একটি জড়পিণ্ডকে বহন করি, তাহা হইলে আমরা গুরুত্ব অনুভব করি। এই অনুভবটি বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা বলি যে "জড়পিণ্ডটি ভারী" তখন আমরা শুধু এই কথাই বলি না যে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই দুইটি ধারণা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আমাদের কথাটির তাৎপর্য এই যে, গুরুত্ব ও জড়পিণ্ড বস্তুতঃই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ এবং তাহাদের এই বন্ধন যে-কোনও জ্ঞাতার ক্ষেত্রেই থাকিবে।

সুতরাং বোধশক্তির কার্য হইতেছে, ইন্দ্রিয়োপাত্তসকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা। যেহেতু সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিই দেশ ও কালে দেওয়া থাকে, সেইহেতু এই সম্বন্ধগুলিকে দেশ ও কালের স্বরূপের অনুরূপ হইতে হইবে। অনুরূপভাবে, বোধ-শক্তির স্বরূপ দ্বারাও আমাদের অনুভূত বিষয়সকলের জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। অতএব বিধানের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অনুভূতির অধিগম্য বিষয়সকলের বিভিন্ন শ্রেণী নির্ধারণ করা সম্ভবপর। সুতরাং জ্ঞানের [অর্থাৎ বিধানের] বিশ্লেষণ একই সঙ্গে [বিষয়ের] অনুভূতিরও বিশ্লেষণ। জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিচারই সত্তা সম্বন্ধীয় বিচারের একমাত্র দ্বার।

মূল বিধানসকলের বিশ্লেষণ: বিধারণা হইতেছে ধারণাসকলের মধ্যে ঐক্যস্থাপনকারী ক্রিয়াবিশেষ। বৌদ্ধিক প্রকার হইতেছে বিধারণার সংগঠনের মূলসূত্র। সুতরাং বৌদ্ধিক প্রকারগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের মূলে থাকিতে বাধ্য। যেহেতু সকল অনুভূতিরই আরম্ভ হয় ইন্দ্রিয়সংবেদন হইতে, সেইহেতু বৌদ্ধিক প্রকারগুলি অনুভূতিরই ভিত্তিরূপে ক্রিয়া করে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই, বৌদ্ধিক প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির কার্যও হইতে পারে না—ইন্দ্রিয়সংবেদনে প্রদত্তও হইতে পারে না। এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। সাধারণ অনুভূতিতে আমরা প্রায়শঃ অনুভূতির ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধ দিকটি লক্ষ্য করি না। কিন্তু বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধ উপাদান ব্যতীত অনুভূতিই অসম্ভব হইত। সুবর্ণ অথবা রজতকে আমরা বিষয় বলিয়া মনে করি।

কিন্তু যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'এই বিষয়ত্বটি কোথায়?', তাহা হইলে ইন্দ্রিয়োপলব্ধির ভাষায় কিছুতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। সুবর্ণ কঠিন বটে, কিন্তু কঠিনত্ব সুবর্ণ নহে। একই ভাবে বলা যাইতে পারে, যে ইহার বর্ণ, উজ্জ্বলতা অথবা গুরুত্ব এককভাবে কিংবা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াও সুবর্ণের জ্ঞান দিতে পারে না। এই উপাদানগুলির শুধু একটি বিশিষ্ট সংগঠন বা মেলনকেই সুবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য (সত্য), বিষয়ত্ব বা দ্রব্যত্ব সম্বন্ধে তাহা আরও বেশীভাবে প্রযোজ্য। সুবর্ণ, রজত প্রভৃতিকে দ্রব্য বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু যখন আমরা প্রশ্ন করি 'কিসের দ্বারা এই দ্রব্যত্ব সংগঠিত হয়?' তখন শুধু ইন্দ্রিয়োপলব্ধির ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধিকপ্রকারগুলি হইতেছে এমন কতকগুলি মূলসূত্র, যাহারা অনুভূতিকে এবং সাংশ্লেষিক পূর্বতঃসিদ্ধ বিধানকে সম্ভবপর করে। তাহারা হইতেছে ইন্দ্রিয়োপাত্তসকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রণালী।

দেশ ও কাল স্বরূপতঃ সমজাতীয়। একটি কালিক মুহূর্ত অথবা একটি দৈশিক বিন্দুকে অন্য কোনও মুহূর্ত তথবা বিন্দু হইতে পৃথক করা যায়না। সুতরাং উহাদের মধ্যে স্বকীয় গুণগত পার্থক্য না থাকিলে, আমরা উহাদিগকে পৃথক রূপে জানিতে পারিতাম না। শুধু দেশ ও কালরূপ ধর্মদ্বারা ইন্দ্রিয়োপাত্ত সকলকে পরস্পর হইতে পৃথক কবা যায় না। বিভিন্ন উপাদানের সংশ্লেষণ ব্যতীত আমরা দেশ-কালকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। বরং এইরূপ সংশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানের সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইত। সুতরাং জ্ঞানের জন্য অনুভূতির বৈচিত্র্য অত্যাবশ্যক এবং তাহা শুধু দেশ ও কালের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায না। বৈচিত্র্যের সহিত ভেদ জড়িত ; ভেদের প্রত্যক্ষ বিধানের উপর নির্ভর করে ; এবং বিধান বৌদ্ধিক প্রকারেব উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমাদের দেশ ও কালের প্রত্যক্ষের সহিত বৌদ্ধিক-প্রকারও জড়িত।

হিউম্ দেখাইয়াছিলেন যে, আমাদের কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞানকে উক্ত সম্বন্ধের বিধারণার বিশ্লেষণদ্বারা অথবা কোনও ঘটনার প্রত্যক্ষদ্বারা সমর্থন করা যায় না। বহ্নির বিধারণাকে আমবা যতদূর পর্যন্তই বিশ্লেষণ করি না কেন, উহা হইতে আমরা ভস্মের বিধারণা পাই না। ভস্ম বহ্নির অনুগমন করে, এইরূপ দেখিয়াও, আমরা এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারি না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ কবি, তাহা হইতেছে একাধিক ঘটনার কালিক পৌর্বাপর্য। কিন্তু আমরা এই পৌর্বাপর্যেব অন্তর্গত কোনও অলঙ্ঘ্য নিয়তক্রম প্রত্যক্ষ করি না। যেহেতু প্রত্যক্ষ বিষয়ের

পারম্পর্য হইতে বাস্তবিক পারম্পর্যের প্রত্যক্ষ হয় আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি না, সেইহেতু হিউমের মতে শুধু পারম্পর্য ও নিয়ত পারম্পর্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

কাণ্ট হিউমের এই যুক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে কোনও আপত্তি তুলেন নাই। কিন্তু তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, হিউমের মত গ্রহণ করিলে, অনুভূতির কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। কাণ্ট বলেন যে, যদি আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানসকলের পারম্পর্য এবং প্রত্যক্ষের নিকট যাহা প্রকাশিত হয় তদ্গত পারম্পর্য, এই দুই পারম্পর্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য ধরিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা পারম্পর্যের কোনও ধারণাই করিতে পারিতাম না। যখন আমরা প্রথমে মেঝের দিকে তাকাইয়া পরে ছাদের দিকে তাকাই, কিংবা যখন আমরা প্রথমে বহ্নি দেখিয়া পরে ভস্ম দেখি, এই উভয় ক্ষেত্রেই এক অনুভবের পরে অন্য অনুভব আসে কিন্তু যখন আমরা এই দুইটি স্থল পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমটিতে প্রত্যক্ষের ক্রমজ্ঞাত বস্তুর স্বরূপের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক—কিন্তু আমাদের বিষয়ানুভূতির কোনও অর্থ থাকিলে, দ্বিতীয় স্থলে প্রত্যক্ষের ক্রমটিকে নিয়ত ও অনিবার্য বলিয়া মানিতে হইবে। সুতরাং কাণ্ট প্রথমে আন্দাজ করিলেন যে, যেখানে প্রত্যক্ষের ক্রমটি অপরির্তনীয় সেখানে কার্য কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শুধু ক্রমের অপরিবর্তনীয়তাই 'কেবল পারম্পর্য'কে 'নিয়ত পারম্পর্য' হইতে পৃথক করিতে পারে না। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষের কোনও ক্রমকেই বিপরীত করা যায় না—কারণ প্রত্যেক প্রত্যক্ষই অনন্যসাধারণ। সেইজন্য কাণ্ট বলিলেন যে, অপরিবর্তনীয়ত্ব নহে, বোধগম্যত্বই বিষয়গত ক্রমের নির্ধারক। যখন প্রত্যক্ষের একটি বিশেষ ক্রম বিষয়ের স্বরূপের অন্তর্গত হয়, তখনই এই ক্রমটিকে বিষয়গত বলা হয়। যখন ক্রমটি বিষয়ের স্বরূপগত হয় না, তখন উহা জ্ঞাতৃসাপেক্ষ।

অতএব অন্যান্য বৌদ্ধিকপ্রকারের মত, কার্য-কারণের নিয়মও অনুভূতির ভিত্তিস্থানীয় একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু উহার এই সাধারণত্বের জন্যই উহা দুইটি সর্তের অধীন। প্রথমতঃ, নিয়মটির সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ কি কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে পারি না। ইহা জানিবার জন্য, বিশেষ বিশেষ অনুভূতির সাহায্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু বৌদ্ধিকপ্রকারগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্তসকলকে সুবিন্যস্ত করিবার মূলসূত্র, সেইহেতু তাহারা কখনই ইন্দ্রিয়োপাত্তসকলকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে না। বিভিন্ন ঘটনার

পারম্পরিক সম্বন্ধ এবং পারম্পর্যের ধারণা—এ সবগুলিই কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা অনুভূতির জগৎকে অতিক্রম করিতে যাই, সেই মুহূর্তে কার্য-কারণ-নিয়মের প্রয়োগ অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এইভাবে সংবেদন ও বোধশক্তি উভয়েই সকল প্রকার অনুভূতির সহিত জড়িত থাকে। অনুভূতি হইতেছে উহাদের মেলন। অথচ ঠিক এই কারণেই সংবেদন ও বোধ, ইহাদের কাহারও ক্ষেত্রই অনুভূতির বাহিরে নহে। পারমার্থিক সত্তা মানবীয় জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে বাধ্য,—তথাপি উহা এই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আমরা অনুভূতির ভিতরেই একটি স্ববিরোধ দেখিতে পাই। একদিকে, অনুভূতির বিষয় আমাদের নিকট শুধু সংবেদন ও বোধশক্তির সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়; অপরদিকে, এই কথার সত্যতা স্বীকার করিলে, আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে, আমাদের জ্ঞানের বাহিরে কোনও এক পারমার্থিক সত্তা বিদ্যমান। অর্থাৎ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা কখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। আমাদের বিষয়জ্ঞান হইতেছে ক্রমবর্ধমান একটি প্রবাহতুল্য। সংবেদন অথবা বোধশক্তি কেহই সত্তার রহস্যকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেনা।

অলৌকিক যুক্তাভাস: কিন্তু মানুষের মন জ্ঞানের এইরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই, সে বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে অনুভূতির ক্ষেত্রের বাহিরেও প্রয়োগ করিতে চাহে। বিজ্ঞানের সফলতা দেখিয়া, আমরা বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে পারমার্থিক সত্তায় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হই। অনুভূতির সমগ্র ক্ষেত্রেই কার্য-কারণ নিয়মের রাজত্ব। কিন্তু আমরা উহার বিস্তার আরও বাড়াইয়া অনুভূতিকেই কোনও অজ্ঞাত কারণের কার্যরূপে বুঝিতে চাহি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এইরূপ হওয়া অপরিহার্য; কারণ বিজ্ঞানের পক্ষে অবভাস ও প্রকৃত সত্তার পার্থক্য স্বীকার করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কাণ্টের মতে অনুভূতির জগতের বাহিরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হইতে কতকগুলি স্ববিরোধযুক্ত বিধান উদ্ভূত হয়।

শুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রকল্পনা: মানুষের মন সর্ব জ্ঞানকে সমগ্রভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে পাইতে চাহে। এইরূপ সমগ্র ও ঐক্যবদ্ধ জ্ঞানের আদর্শের সহিত প্রজ্ঞার তিনটি প্রকল্পনা জড়িত: (১) অনুভূতির জ্ঞাতারূপে আত্মা (ইহাই মনোবৈজ্ঞানিক প্রকল্পনা); (২) উহার বিষয় রূপে সমগ্র বিশ্ব (ইহাই হইতেছে বিশ্বোদ্ভব বিদ্যার প্রকল্পনা) এবং (৩) আত্মা ও বিশ্বের সমগ্র সম্মেলনরূপে ঈশ্বর (ইহাই হইতেছে ঈশ্বরবিদ্যার প্রকল্পনা)। স্বভাবতঃই, আমরা আত্মাকে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যরূপে না ভাবিয়া পারি না। একইভাবে, বিশ্বকেও আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত সমগ্র

বস্তু বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। আত্মা ও বিশ্বের সম্মেলনরূপে ঈশ্বরের স্বরূপে কোনও রকম অন্তর্বিরোধ থাকিতে পারে না। এই সকল প্রকল্পনার কোনটিই অনুভূতিতে প্রকাশিত হইতে পারে না; কারণ ইহারা সংবেদন ও বোধ উভয়েরই আয়ত্তের বাহিরে। সুতরাং কাণ্ট উহাদিগকে বৌদ্ধিক প্রকার বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহার মতে, উহারা হইতেছে শুদ্ধ প্রজ্ঞার এমন কতকগুলি প্রকল্পনা, যাহারা সংবেদন ও বোধ উভয়েরই ক্রিয়ার মূলে বিদ্যমান। সুতরাং সমগ্রতা ও ঐক্য হইতেছে জ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু মানুষের জ্ঞান এই লক্ষ্যে কখনও পৌঁছিতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অনুভূতির,জ্ঞাতাকে বাদ দিলে এই দুইটির কোনটিরই অর্থ থাকেনা। এইজন্য আমরা স্বভাবতঃই আত্মার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু যে 'আমি' আমাদের অনুভূতিতে দেওয়া আছে, তাহা হইতেছে সংবেদনসাপেক্ষ। উহা কালে অবস্থান করে, এবং উহা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি সকলের জ্ঞাতা। এই অনুভূতিগুলি ক্রমিক; কিন্তু তাহারা যদি একটি ঐক্যবদ্ধ আত্মার অনুভূতি না হইত, তাহা হইলে আমাদের অনুভূতি একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা হইতে পারিত না। একই 'আমি'র অনুভূতি হইতে হইলে, অতীত ও বর্তমানের অনুভূতিগুলির একই সঙ্গে বিধৃত হইয়া থাকা প্রয়োজন; এবং কাণ্টের মতে, অতীত অনুভূতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বর্তমানের অনুভূতির সহিত সংযোগসাধন কেবল কল্পনার সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের জন্য কল্পনা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ, আমরা বলিতে পারি যে, যে সকল নিয়মের দ্বারা দেশ ও কালের স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়—সেই সকল নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কল্পনাই হইতেছে জ্ঞান। কল্পনার উপর এই যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইল, তাহার দ্বারা জ্ঞানে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়েই অনুভূতির জন্য সমান ভাবে অপরিহার্য। যে পরিমাণে অনুভূতি আমাদের নিকট বহু প্রত্যক্ষকে প্রকাশ করে, সেই পরিমাণেই আমরা জ্ঞাতাকে জানি। আমাদের বহির্জগতের জ্ঞানের যেরূপ কোনও শেষ হয় না, তেমনই আমাদের 'আমি'র জ্ঞানেরও কোনও শেষ নাই।

দ্রব্যরূপে আত্মাকে কখনও জানা যায় না। ইহা দেখাইবার পর, সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের যে সকল কল্পনা আছে, কাণ্ট তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিজ্ঞান অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করার কার্যেই নিবদ্ধ থাকে; কিন্তু অনুভূতি কখনও বিশেষ অনুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। অতএব সমগ্র অনুভূতি সম্বন্ধে মানুষের কোনও অনুভূতি নাই। তথাপি যখন আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে কথা বলি, তখন

আমরা বাস্তবিক এবং সম্ভাব্য অনুভূতি এই সমষ্টিকেই বুঝি। কাণ্ট দেখাইলেন যে, এই কারণবশতঃই সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে যে-কোনও উক্তি হইতে স্ববিরোধ উদ্ভূত হয়। 'বিপরীত বিধানগুলি'তে* তিনি এই অন্তর্বিরোধের কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। বিশ্ব কি সসীম অথবা অসীম? যদি আমরা ইহাকে সসীম বলি তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে— ইহার সীমার বাহিরে কী আছে? অপরদিকে, যদি আমরা ইহাকে অসীম বলি, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা হইতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে, কার্য কারণের বৌদ্ধিকপ্রকারটি প্রয়োগ করিলেও অনুরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাণ্টের মতে, 'বিশ্বের কোনও আদি নাই' এই কথা যতখানি দুর্বোধ্য 'বিশ্বের আদি আছে' এই কথাও ততখানিই দুর্বোধ্য। আমাদের আত্মজ্ঞানের যেরূপ কোনও অবধি নাই, সেইরূপ বিশ্বসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের কোনও অবধি নাই। আমাদের বিধানগুলি আমরা যাহা জানি শুধু তাহার ক্ষেত্রেই যথার্থ; এবং যেহেতু বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের কখনই পূর্ণ জ্ঞান হয় না, সেইহেতু সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে যে কোনও উক্তি হইতেই বিরোধের সৃষ্টি হইতে বাধ্য।

আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পর্কেও অনুরূপ সমস্যা উত্থিত হয়। কাণ্টের মতে, বিশ্বের অস্তিত্ব হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমানের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। ঈশ্বর যদি স্বয়ং-ভূ হইতে পারেন, বিশ্বও স্বয়ং-ভূ হইতে পারে। বিশ্বকে ভাল কিংবা মন্দ কিছুই বলা যায় না। আমরা ঈশ্বরকে সত্য, শিব ও সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করি; কিন্তু আমাদের অনুভূতিতে আমরা ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কতকগুলি ধর্মকেও দেখিতে পাই। সুতরাং ঈশ্বর যদি সমগ্র অনুভূতির সমষ্টি হন, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য হই যে অসত্য, অশিব ও অসুন্দরও তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে কাণ্ট অনুমান করেন যে, বৌদ্ধিকপ্রকারগুলি আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বরে প্রযোজ্য নহে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবারও কিছু নাই। কারণ বৌদ্ধিক প্রকারগুলি হইতেছে বোধশক্তিরই নিয়ম এবং সেইজন্য তাহারা শুধু অনুভূতিতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অনুভূতিকে লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার বলিয়া, উহা বৌদ্ধিকপ্রকারের অনুগামী এবং বৌদ্ধিকপ্রকার হইতেই উহার যাথার্থ নিঃসৃত হয়। সুতরাং বৌদ্ধিকপ্রকার সকল হইতেছে বোধশক্তির নিয়ম; এবং অনুভূতির এলাকার ভিতরে তাহারা সর্বত্র প্রযোজ্য; কিন্তু যে মুহূর্তে, আমরা উহাদিগকে অনুভূতির বাহিরে প্রয়োগ করিতে যাই, সেই মুহূর্তেই উহারা আমাদের চিন্তায় শুধু বিরোধের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান কোনও পদার্থেরই 'কেন'

* Antinomies.

বা নিমিত্তের ব্যাখ্যা দিতে পারেনা ; এবং বিজ্ঞানের পক্ষে, উহা করার চেষ্টাও উচিত নহে। বিজ্ঞানের একমাত্র কার্য হইতেছে অনুভূত বিষয়সকলের চলনরীতি আবিষ্কার করিয়া, উহারা 'কেমনভাবে' চলে, তাহা বর্ণনা করা। সুতরাং বিজ্ঞান সফল হয় তখনই, যখন উহা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি সকলের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু উহা যখন অনুভূতিকে সমগ্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে যায়, তখন উহা ব্যর্থ হয়।

নীতিবিজ্ঞান : প্রেরণাত্মক প্রজ্ঞার আলোচনা * : বৈজ্ঞানিক অথবা ধার্মিক ব্যক্তি উহাদের কেহই কাণ্টের এই সমাধানে সন্তুষ্ট হন নাই। কাণ্টের আধি-বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানকে সমর্থন করিয়া বৈজ্ঞানিক বিধানের অনিবার্যতা ও সার্বত্রিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া। তাঁহার বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েই যথার্থ, এবং পারমার্থিক সত্য সর্বদাই বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে। এই সিদ্ধান্ত ধার্মিকের পক্ষেও ইহা-অপেক্ষা বেশী সন্তোষজনক নহে। যেহেতু জ্ঞান অনুভূতির জগতেই সীমাবদ্ধ, সেইহেতু আমাদের ধর্মবিষয়ক চেতনা আমাদিগকে জ্ঞান দিতে পারেনা। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস অন্ধ এবং এইক্ষেত্রে আমরা শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এমন কতকগুলি কথা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য, যাহাদের কোনও প্রমাণ নাই। যেহেতু যে-আত্মাকে আমরা জানি, তাহা সংবেদন-লব্ধ, সেইহেতু উহা বোধশক্তির প্রকারগুলির দ্বারা অবশ্য নিয়ন্ত্রিত। অতএব ইহার ক্রিয়াসকল কার্য-কারণ নিয়মের অনুযায়ী হইতে বাধ্য। কার্য-কারণ-নিয়মের দ্বারা যাহা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইতেছে বস্তুজগতের পদার্থ। বস্তুজগতের পদার্থ অস্তিত্ববান ; এবং অস্তির রাজ্যে উচিতের কোনও স্থানই নাই। অতএব ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের স্বাধীনতা ভ্রম মাত্র এবং মূল্যবাচক বিধান সকলের ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আবার মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাণ্ট সংবেদনগ্রাহ্য আত্মাকে পারমার্থিক আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া স্বীকার করেন। জ্ঞাতা ও বিষয় কার্য-কারণ-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; কিন্তু যেহেতু জ্ঞাতা ও বিষয় হইতেছে সংবেদন-গ্রাহ্য পদার্থ, সেইহেতু কার্য-কারণের নিয়ম আত্মার অলৌকিক স্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না। কর্তব্যবোধে যে-আত্মা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, সেই আত্মার ক্ষেত্রে বৌদ্ধিকপ্রকারগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রযোজ্য নহে। এই কর্তব্যবোধ

* Critique of Practical Reason.

একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সুতরাং ইহা নিজেই নিজের যথার্থতার প্রমাণ। এই কর্তব্যবোধ মানুষকে প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসাহ দেয়। বিজ্ঞান আমাদের পর্যবেক্ষণের সীমা বাড়াইতে পারে; কিন্তু ইহা বিজ্ঞানকে অতিক্রম করার প্রেরণাকে উপপন্ন করিতে পারে না। এই প্রেরণা আসে "সর্তবিহীন আদেশ" হইতে। উহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-জনিতও নহে, অথবা কল্পনা-জনিতও নহে। কিন্তু উহা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞারই প্রকাশ।

ব্যবহারিক অথবা সংবেদনগ্রাহ্য আত্মার এমন একটি ইতিহাস আছে, যাহা বৌদ্ধিকপ্রকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মনোবিজ্ঞান এই আত্মাকেই বংশপরম্পরাগত গুণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত ইতিহাসের দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে। কাণ্টের মতে, যেহেতু ইহা মনোবিজ্ঞানে স্বীকৃত নিয়মসকলের অধীন, সেই-হেতু ইহার দ্বারা আমাদের নৈতিক কর্তব্যবোধের ব্যাখ্যা হয় না। এই বোধ একটি অনন্যসাধারণ ব্যাপার এবং বংশপরম্পরা ও পারিপার্শ্বিকের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যেও ইহা অপরিবর্তিত থাকে। কর্তব্য কী, তাহা স্বরূপতঃ আমরা কি চাহি কিংবা কি চাহি না, কি করি কিংবা কি করি না, তাহার উপর নির্ভর করে না। যখন আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারি না, তখনও আমরা আমাদের এই অক্ষমতা জানি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমরা কি করিতে পারি কিংবা পারি না, ইহার উপর এই নৈতিক বাধ্যতা নির্ভর করে। অন্তর্দর্শনে আমরা কেন লোভের বশবর্তী হইয়াছিলাম, তাহা হয়ত আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু উহা আমাদের কর্তব্য হইতে আমাদের রেহাই দেয় না। সুতরাং আমরা প্রকৃতপক্ষে যাহা করিয়াছি তাহা অপেক্ষা ভিন্ন কিছুও করিতে পারিতাম—এই জ্ঞানই নৈতিক বাধ্যতাবোধের ভিত্তি। দুইটি পক্ষের ভিতরে একটিকে নির্বাচন করিবার ক্ষমতা নৈতিক স্বাধীনতা।

সুতরাং কর্তব্যবোধ ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিরূপে উহা বিজ্ঞানের কোনও আবিষ্কারের মতই সমান যথার্থতা দাবী করিতে পারে। কাণ্ট এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কর্তব্যবোধে মানুষ এই আভাসিক জগৎকে অতিক্রম করে। ব্যবহারিকরূপে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী; কিন্তু নৈতিক কর্তব্যের সম্পাদকরূপে মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে এবং পরম সত্তার স্বরূপের অংশীদার হয়। তাহার স্বাধীনতাবোধের জন্যই মানুষ মনে করে যে, সে অবস্থার দাস নহে, প্রভু। নিজের কার্যের জন্য মানুষ দায়িত্ব স্বীকার করে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে এই দায়িত্ব স্বীকৃতির দাবী করে।

মানুষ স্বাধীন বলিয়া নিজের কার্যের কি ফলাফল হইবে, ঐ দিকে লক্ষ্য না

দিয়া স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে। কাণ্টের মতে ফলের জন্য যাহা করা হয়, তাহা হইতেছে প্রয়োজনমূলক, কর্তব্যমূলক নহে। সুখ বা দুঃখের আশা বা ভয় যে পরিমাণে আমাদিগকে স্পর্শ করে, সেই পরিমাণে উহা আমাদের নির্বাচনের স্বাধীনতা খর্ব করে। কর্তব্য হইতেছে স্বাধীনতার প্রকাশ, সুতরাং উহা স্ববহির্ভূত কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে না। কর্তব্য শুদ্ধপ্রজ্ঞা হইতে নিঃসৃত হয়, তাই উহা সার্বিক ও সর্ত্তবিহীন। নৈতিক নিয়ম হইতেছে একটি "সর্ত্তবিহীন আদেশ।" "যদি তুমি সুখ চাহ, তাহা হইলে ইহা কর" এইরূপ যদি-যুক্ত নিয়মকে চতুর বা বিজ্ঞব্যক্তির নিয়ম বলা চলে। কিন্তু কর্তব্যের নিয়ম এইপ্রকার যদিযুক্ত নিয়ম নহে। কোনও সর্ত্ত না রাখিয়াই, প্রজ্ঞা এইরূপ আদেশ করে যে—"তুমি তোমার কর্তব্য অবশ্য পালন করিবে।"

সুতরাং কাণ্ট কর্তব্যকে সাংসারিক বিজ্ঞতা অথবা চতুরতা হইতে একান্তভাবে পৃথক বলিয়া মনে করেন। যে-কার্যের সহিত কর্তব্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহা কর্তব্যের দৃষ্টান্ত নহে। "কর্তব্য" বলিয়া সাধারণতঃ যাহা গৃহীত হয়, তাহার অধিকাংশই "সুবিধা" ছাড়া আর কিছুই নহে। সততা হইতেছে সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এইজন্য যদি কেহ সাধু আচরণ করে, তাহা হইলেও কাণ্টের মতে এইরূপ আচরণ কর্তব্যমূলক নহে, কিন্তু সুবিধামূলক। যখন আমরা কর্তব্যবোধে কাজ করি, শুধু তখনই আমরা কর্তব্য পালন করি।

কিন্তু কাণ্টের কর্তব্যসম্বন্ধীয় ধারণা হইতে আমরা শুধু একটি আকারীয় নিয়মের বেশী কিছু পাই না। সার্বিকতা এবং একত্ব হইতেছে এই নিয়মের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে, যে-কার্যের মূল সূত্রটিকে একটি সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য সাধারণ নিয়মের আকার করা যায় না, তাহা কর্তব্য হইতে পারে না। যে কার্য সার্বত্রিকতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাই কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু এই নিয়মে সার্বত্রিকতার আকার ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেইহেতু এই নিয়মের দ্বারা কোনও বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কি, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন।

পারমার্থিক স্বরূপে আমাদের আত্মা স্বাধীন এই কথা মানিয়া লইলেও, কাণ্ট নিজেই ইহা দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এই স্বাধীনতার কোনও জ্ঞান থাকিতে পারে না। কার্যকারণের নিয়ন্ত্রণ হইতেছে বস্তুর আভাসিকস্বরূপ এবং স্বাধীনতা হইতেছে তাহার পারমার্থিক স্বরূপ, এইরূপ বলিলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। কার্য কারণের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত পারমার্থিক সত্তা যতখানি দুর্বোধ্য, স্বাধীনতা ব্যতীত আভাসিক সত্তাও ততখানিই দুর্বোধ্য। এই অসুবিধাজনক পরিস্থিত হইতে বাহির

হইবার একমাত্র পথ হইতেছে, এই দুইটির অন্তর্গত পার্থক্যকে মাত্রাগত পার্থক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। যাহাতে স্বাধীনতার অংশ প্রায় উপেক্ষণীয়, তাহা হইতেছে আভাসিক সত্তা এবং যাহাতে কার্যকারণের নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অত্যল্প, তাহা হইতেছে পারমার্থিক সত্তা।

বৌদ্ধিক প্রকার সকলের কাণ্ট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। কারণ, বৌদ্ধিকপ্রকার হইতে শুধু অনুভূতির সাধারণ আকারটিই পাওয়া যায়, কিন্তু এই অনুভূতিব খুঁটিনাটি বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলি সংবেদন হইতে আসে। কার্যকারণের প্রকারটি হইতে আমরা শুধু ইহাই জানি যে, বিভিন্ন ঘটনা পরস্পরের সহিত কার্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য; কিন্তু ইহার দ্বারা আমরা কোনও বিশিষ্ট ঘটনার কার্য অথবা কারণ জানি না এবং জানিতে পারিও না। বিশেষ বিশেষ কার্য কারণ সম্বন্ধ সাধারণ কারণীয় নিয়ম হইতে নিঃসৃত করা যায় না। কিন্তু নীতির জগতে মানবীয় জ্ঞানের এই সর্বত্রপ্রযোজ্য নিয়মের ভঙ্গ হয়। কাণ্ট দৃশ্য ও নৈতিক জগতের মধ্যে যে ঐকান্তিক ভেদ স্বীকার করেন, তাহাতে এইরূপ ধরিয়া লইতে হয় যে, নৈতিক নিয়মের এই বিশুদ্ধ আকারটি হইতে বিশেষ নৈতিক কর্মের মূল সূত্রগুলিও নিঃসৃত হয়।

তাহা ছাড়া, আমাদের জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন কর্তব্য কর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়—কাণ্টের এই মতবাদ এইরূপ বিরোধেরও কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের উপরে বিভিন্ন কর্তব্যের দাবী রহিয়াছে এবং কোন্ দাবীটি যে অবশ্য স্বীকার্য তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না, তখনই কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। যে-সকল সর্তাধীনে কোনও দাবী কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেইসকল সর্ত থাকিলে উক্ত দাবীগুলির মধ্যে যে কোনটিই কর্তব্য হইতে পারে; এবং সমস্যা এই দাঁড়ায় যে, কোন্ দাবীটি যে প্রধান, তাহা আমরা নির্ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের বিরোধ হইতেছে এমন দুইটি নিয়মের বিরোধ, যাহাদের মধ্যে একটিকে কর্তব্যের এবং অপরটিকে অ-কর্তব্যের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে শুধু কর্তব্যের ধারণা, ততক্ষণ বিশেষ কোনও মতবিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু যখন আমরা ধারণাটিকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করিতে যাই, তখনই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যদি বিশেষ বিশেষ কর্তব্যগুলি কর্তব্যের সামান্যধারণা হইতে পাওয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, এই সকল বিশেষ বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

কাণ্ট তাঁহার চিন্তার ক্রমিক ধাপে কি ভাবে স্বাধীনতার ধারণার বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা খুবই কৌতুকাবহ। "শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা"র "বিশ্লেষণ" নামক বিভাগে কাণ্ট গণিতীয় ও গতিবিজ্ঞানীয় বৌদ্ধিকপ্রকারগুলির মধ্যে যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে স্বাধীনতার তারতম্যবাদ নিহিত আছে। "পরস্পরের বিপরীত বিধান" শীর্ষক বিভাগে স্বাধীনতা বলিতে শুধু স্বয়ংসৎ বস্তুর সক্রিয়তা বুঝায়। এই বর্ণনায় স্বাধীনতার কি ভাবাত্মক স্বরূপ প্রকাশিত হইল, তাহা বুঝিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাতে শুধু বস্তুর আভাসিক এবং পারমার্থিক স্বরূপের পার্থক্যই বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যখন স্বাধীনতাকে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রাণীর বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষকে জড় বস্তু হইতে পৃথক করা যায়, তাহা বলিয়া মনে করি, তখন আমরা স্বাধীনতার আরও বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট অর্থ পাই। মানুষ দুই বিভিন্ন জগতের অনুগত, এবং স্বাধীনতা তাহারই দ্বি-আনুগত্যের পরিচয়ক। মানুষ একই সঙ্গে নৈতিক আদর্শের এবং যান্ত্রিক নিয়মের জগতের অধিবাসী। যদি স্বাধীনতাব আরও যথাযথ কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ যখন একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে এবং অসাধারণভাবে কাজ করে, অর্থাৎ যখন সে শুদ্ধ-প্রজ্ঞা হইতে নিঃসৃত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কাজ করে তখনই স্বাধীনতা তাহার ধর্ম হয়। সুতরাং শুধু নৈতিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গেই স্বাধীনতা উহার বিশিষ্ট অর্থটি লাভ করে।

সুতরাং কাণ্টের জ্ঞানসম্বন্ধীয় মতবাদ এবং নীতিসম্বন্ধীয় মতবাদ এই উভয় মতকেই ঠিকঠিকভাবে বুঝিতে হইলে, মানুষের অনুভূতিমাত্রেরই দ্বিরূপতা স্বীকার করা প্রয়োজন। আভাসিক বস্তু-সকলের মধ্যেও সক্রিয়তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহা না হইলে কার্য কারণের বিধারণাটিও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। আভাসিক জগতে মানুষ অনিবার্য নিয়মের বশীভূত, কিন্তু স্বগতসত্তা বস্তুর জগতের ব্যক্তিরূপে সে স্বাধীন। কিন্তু কাণ্ট সবসময়েই এই কথা স্বীকার করেন নাই। কারণ, কাণ্ট প্রেরণাত্মক এবং জ্ঞানিক প্রজ্ঞার মধ্যে যে ঐকান্তিক প্রভেদ মানিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহাকে স্বাধীনতা ও অনিবার্য নিয়ম এই দুইটিকে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছে।

অনিবার্য নিয়মের সহিত স্বাধীনতার যে সম্বন্ধ, তাহা সামান্যের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধের অনুরূপ। আমরা ইহাকে মূলতঃ ব্যক্তির বিশিষ্ট স্বরূপের সমস্যা বলিয়া মনে করিতে পারি। "শুদ্ধ প্রজ্ঞার" প্রথম এবং দ্বিতীয় এই উভয় সমালোচনার কোনটিই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ গঠন-

কারী সূত্রগুলির যথার্থতা আমাদের বোধশক্তি নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু অনুভূতির ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ স্থলগুলিতে এই সূত্রগুলির প্রয়োগ কি করিয়া হয়, তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। নীতির ক্ষেত্রে, প্রজ্ঞার স্বরূপের একটি প্রকাশের সহিতই আমাদের কারবার, তথাপি আমরা উহা জানিতে পারি না। কারণ, এই প্রকাশ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়া আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে ব্যক্তিকে জানা যায় না।

কাণ্ট মানবীয় স্বাধীনতা এবং কার্য-কারণের নিয়ম এই দুইয়ের বিরোধের মীমাংসা নিম্নলিখিতরূপে করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ আকস্মিক অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিতরূপে সে স্বাধীন। তথাপি উহা যে-সামান্যের উদাহরণ, সেই সামান্যর দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত। একদিক হইতে, ব্যক্তিকে সামান্য বা জাতির প্রতিবিম্ব বলা যায়, আবার অপর দিক হইতে উহাকে স্বাধীন বলিতে হয়। ব্যক্তি হইতেছে একটি জাতিরই অন্তর্গত ব্যক্তি; কিন্তু শুধু উহার এই সামান্য বা জাতীয় ধর্ম দ্বারাই উহাকে সম্যকভাবে বুঝিতে পারি না; সুতরাং উহা সামান্য বা জাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও, এক অর্থে উহা স্বতন্ত্র। তথাপি এই স্বাতন্ত্র সামান্য বা জাতির সামান্যধর্মের উল্লঙ্ঘন করে না। আবার ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যকে শুধু দৈশিক ও কালিক বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, নির্বিশেষতা দেশের স্বরূপ; কালের স্বরূপও তাহাই। সুতরাং দেশ ও কালের ধর্মদ্বারা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য গঠিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, দৈশিক ও কালিক পার্থক্য সত্বেও ব্যক্তির অভিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিচারশক্তির সমালোচনা*: সৌন্দর্য বিচার ও প্রয়োজন বিচার: কাণ্টের তৃতীয় "সমালোচনা" গ্রন্থে তিনি আমাদের রসানুভূতির বিশ্লেষণদ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের অনুভূতি কল্পনার কার্য এবং সেইজন্য তৃতীয় সমালোচনা গ্রন্থে প্রথম গ্রন্থ হইতে আরও বিশদভাবে জ্ঞানে এই কল্পনার গুরুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধারণা হইতেছে ধারণাগুলির ভিতরে ঐক্য স্থাপনকারী ক্রিয়া এবং সেইজন্য একমাত্র বিধানের উপাদানরূপেই উহার যথার্থতা স্বীকার্য। কিন্তু আমরা আদৌ বিধারণা কি করিয়া পাই এই প্রশ্নের উত্তর ইহা হইতে পাওয়া যায় না। সংবেদনসাপেক্ষ বিধারণাও সামান্যীকরণের অর্থ হইতেছে বিবিধ পদার্থকে ঐক্যবদ্ধ করা, সুতরাং উহা একটি পূর্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এই নিয়মটি হইতেছে বিভিন্ন অনুভূতিগুলিকে বুঝিবার

* Critique of Judgement.

অথবা তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়ার জন্য মনের দাবী। অর্থাৎ, জ্ঞানের জন্য শুধু যে বহু বিশেষকে একই বিধারণার অধীনে আনা প্রয়োজন তাহা নহে; অধিকন্তু উহাঁদিগকে একই সমগ্রের উপাদানরূপে সুসজ্জিত করাও প্রয়োজন।

কাণ্ট বলেন, এইরূপ সুসংবদ্ধ সমগ্রের সর্বাপেক্ষা ভাল উদাহরণ হইতেছে শিল্পীর সৃষ্টি; কারণ শিল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহার আকার ও উপাদানের মধ্যে সুসংবদ্ধতা। সুতরাং অমূর্ত বিধারণার দৃষ্টান্ত না হইলেও উহাকে বুঝিতে পারা যায়। অতএব রসবিচারের বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানে বোধশক্তি ও কল্পনার কার্যকে বুঝিতে সাহায্য হইতে পারে। রসসম্বন্ধীয় বিচারকে কাণ্ট সৌন্দর্য বিষয়ক ও সুমহান বিষয়ক এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। আমাদের সৌন্দর্যবোধ বিভিন্ন জ্ঞানীয় শক্তিগুলির সামঞ্জস্যের উপরে নির্ভর করে; অথবা কাণ্টের ভাষায়, উহা "কল্পনার স্বাধীন ক্রিয়া এবং বোধশক্তির নিয়মানুগ ক্রিয়া, পরস্পরকে সঞ্জীবনকারী এই দুই ক্রিয়ার" উপর নির্ভর করে। সুমহানের মধ্যে একটি বিরোধ অথবা অসামঞ্জস্যের পরাজয় থাকে এবং সুমহান বিষয়ক বিচার সামঞ্জস্যের অনুভূতি অপেক্ষা স্বাধীনতা ও অসীমতা বোধের উপর অধিক নির্ভর করে। কল্পনা সরাসরি প্রজ্ঞা ও তাহার ধারণাগুলিকে উল্লেখ করে। সুতরাং যে সকল পরিচ্ছেদদ্বারা আমাদের বোধশক্তি বিচারকে সীমায়িত করে, কল্পনাশক্তি সেই সকল পরিচ্ছেদ হইতে মুক্ত; কারণ উহা সাক্ষাৎভাবে প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার ধারণা সকলকে ব্যবহার করে।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টিই আমাদের অনুভূতির এমন একটিমাত্র বিষয় নহে, যাহাতে আমরা এই ধরণের অন্তর্সংগতির ইঙ্গিত পাই। প্রাণ বিদ্যায় আমরা এমন কতকগুলি অঙ্গী বা শরীরীকে জানিতে পারি, যাহাদের কার্যকলাপ শুধু যান্ত্রিক কার্য কারণ নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের বিধারণাটি প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে আমাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, জগৎ এক ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—কাণ্ট এই সাবধান বাণীও দিয়াছেন। কাণ্ট বিশেষ ভাবে বলেন যে, যান্ত্রিকতা এবং উদ্দেশ্যমূলকতা এই দুইটিই আমাদের জ্ঞানে সর্ব জ্ঞানে শৃঙ্খলা স্থাপনকারী তত্ত্ব। কিন্তু ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, উহারা আভাসিক সত্তার নিরূপক তত্ত্বর এবং উহার স্বরূপে সংগঠক।

রসানুভূতির স্বরূপ হইতেছে সৌন্দর্যের উপভোগ। সুন্দরকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিব যে, উহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে উহার বোধগম্যতা এবং সক্রিয়তা, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা। সুন্দরের শ্রেষ্ঠ প্রকার হইতেছে শিল্পকার্য, যাহা একাধারে

অনন্যসাধারণ এবং সার্বিক। কোনও শিল্পরূপায়ণ ঐ বস্তু কি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তথাপি উহা বস্তুর এমন কতকগুলি সাদৃশ্য এবং ধর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলিকে সকলেই উহার প্রকৃত ধর্মের দ্যোতক বলিয়া মনে করে। এইভাবে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানীয় সত্য দেওয়ার দাবী পরিহার করাতে, রসবিচার বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ হইতেও মুক্তি পায়।

তৃতীয় "সমালোচনা" গ্রন্থে, যে দুইটি সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বাধীনতার সহিত কার্য কারণ নিয়মের সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন অনুভূতির বিশেষ বিশেষ স্বরূপের সহিত বৌদ্ধিক প্রকারগুলির সম্বন্ধ। উভয় সমস্যারই বিষয় হইতেছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি করিয়া সাধারণ নিয়মের প্রয়োগ করা যায় এই প্রশ্ন ; এবং সমস্যাগুলির মূল হইতেছে ব্যক্তি কি করিয়া একই সঙ্গে সাধারণ নিয়ম অথবা সার্বিক ধর্ম প্রদর্শন করিতে পারে, এই সমস্যা। শুধু ব্যক্তির বিশিষ্ট স্বরূপ হইতে উহার এই সাধারণ ধর্ম নির্ধারণ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট বস্তুসকলের মধ্যে যে-অনন্ত সংখ্যক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে জ্ঞানের জন্য তাহাদের মধ্যে শুধু কয়েকটিরই সার্থকতা আছে। অতএব সার্থক বা আবশ্যক সাদৃশ্যগুলিকে অনাবশ্যক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য হইতে পৃথক করিবার জন্য, আমাদের এমন একটি তত্ত্বের প্রয়োজন যাহার দ্বারা এই নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে ; তথাপি এই ব্যাপারে ব্যক্তিকে লইয়াই আমরা বিচার আরম্ভ করি আবার ঐ তত্ত্বটিও আমাদের নিকট দেওয়া থাকে না। সুতরাং আমরা নিম্নলিখিত দুইটি কার্যের ভিতরে শুধু একটিই করিতে পারি (১) আমরা আমাদের নিকট পূর্ব হইতেই যেন সকল বিধারণা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন একটিকে বাছিয়া লইতে পারি, যাহা আলোচ্য অনুভূতির সহিত খাপ খায় বলিয়া মনে হয়, (২) অন্যথায় আমরা একটি নূতন অনুভূতিকে বর্ণনা দেওয়ার জন্য একটি নূতন বিধারণা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি। অবশ্য এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক নহে। যখন কোনও একটি পুরাতন বিধারণা নির্বাচন করা হয়, তখন আমরা উহাতে কিছু নূতন অর্থ যোগ করিয়া দিই। আবার অনুভূতির সাহায্য ব্যতীত নূতন বিধারণার সৃষ্টিও অসম্ভব।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞান নিজেই এক ধরণের ক্রিয়া, সব কিছু বোধগম্য করার চেষ্টা হইতে ইহার উৎপত্তি। আবার আমাদের জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আমাদের অনুভূতি কখনই সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য হয় না ; কিন্তু উহা আমাদের সম্মুখে একটি পরিপূর্ণ বোধগম্যতার আদর্শ তুলিয়া ধরে। এই আদর্শের দাবী চরিতার্থ করিতে গিয়া আমাদের বোধশক্তি অনবরত আমাদের জ্ঞানের

গণ্ডী বিস্তৃত করিয়া যাইতেছে। পরিপূর্ণ জ্ঞানের এই দাবীর মধ্যে বৌদ্ধিক প্রেরণা যতখানি, নৈতিক প্রেরণাও ততখানিই বিদ্যমান।

জ্ঞান যেরূপ একটি ক্রিয়া, তেমনই নৈতিক ক্রিয়াতেও একটি জ্ঞানের দিক আছে। কর্তব্যের জ্ঞান ব্যতীত কর্তব্যপালন সম্ভবপর নহে। কিন্তু কর্তব্যকে জ্ঞানীয় চৈতন্যের নিকট বাহির হইতে উপস্থাপিত বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। উহা প্রজ্ঞার স্বরূপেরই প্রকাশ, এবং এই অর্থে উহা স্বপ্রকাশ। কর্তব্য করিতে গেলে উহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। বাহ্যজগতের জ্ঞান ব্যতীত নৈতিক কর্ম সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ একমাত্র অনুভূতির জগতেই স্বাধীনতাকে বাস্তব করা যায়।

সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই প্রজ্ঞার অন্তরতম স্বরূপটিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় উহারা শুধু আংশিক ভাবে সফলকাম হয়, কারণ উহাবা স্বয়ং অপূর্ণ। একই অনুভূতি উভয়েরই বিষয়; সুতরাং উহারা অনুভূতিকে কি করিয়া সুবিন্যস্ত করা যায় তাহার নিয়ামক মাত্র, কিন্তু অনুভূতির সংগঠক নহে। অতএব স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার প্রভেদ হইতেছে মাত্রাগত—গুণগত নহে। তাই, সুন্দরের বোধগম্যতা হইতেছে প্রজ্ঞারই বোধগম্যতার পূর্বাভাস। এই জন্যই কাণ্ট সুন্দরকে আভাসিক জগতে অনুভবাতীত তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাণ্টের মতে, সুন্দর হইতেছে বহু ও একের এবং সামান্য ও বিশেষের মিলন। উহা যান্ত্রিকতা ত্রবং উদ্দেশ্যমূলকতারও মিলন। সুন্দরের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও একরূপতা দেখা যায়, তাহা বোধশক্তির নিয়মসকলের মধ্যে প্রকাশিত শৃঙ্খলার ও একরূপতার দ্যোতক। উহার অনন্যসাধারণত্বের সহিত আমাদের নৈতিক চেতনার অনন্যাসাধারণত্বের সাদৃশ্য আছে।

বিজ্ঞানের মতে, জগৎ কতকগুলি ব্যতিক্রমহীন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উহার প্রত্যেকটি অংশের অন্যান্য অংশ এবং সমগ্রের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ দ্বারা প্রত্যেকটি অংশ নিরূপিত। সুতরাং বিশ্বকে জানিতে হইলে, আমাদিগকে অবশ্যই উহার প্রত্যেকটি অংশসকলের জ্ঞানের মাধ্যমে জানিতে হইবে। অপরদিকে নীতি এবং ধর্ম জগতের অংশগুলিকে সমগ্রের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। সমগ্রের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে, আমরা একটি বিশিষ্ট অংশের ক্রিয়া বুঝিতে পারি না। কাণ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি উভয় পদ্ধতিরই ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজ্ঞান ব্যক্তির অসাধারণত্ব ও মর্যাদার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবার উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিকোণও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের প্রয়োজনকে সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে।

অনুভূত বিষয়ে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অনুভূতির উপর নির্ভর না করিয়া, আমরা যদি কোনও এক উদ্দেশ্য ধরিয়া লই, তাহা হইলে ঐরূপ উদ্দেশ্যের ধারণা হইতে অনুভূতির বিষয় সকলকে আরোহ পদ্ধতিতে অনুমান করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমরা বোধশক্তির নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়া জগতের বিভিন্ন উপাদান সকলের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করি। যেহেতু জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সেইহেতু আমাদের বিশ্বকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত সফল হইতে পারে না। উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করিবার সময়ও মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে না। অনুভূতিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তুলনা এবং সংযুক্ত করিয়াই আমাদিগকে জগতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটিকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু জগতকে সমগ্রভাবে বুঝিবার পূর্বে, উহার চরম উদ্দেশ্যকে জানা যায় না। যেহেতু এই রকম সমগ্র জ্ঞান উপলব্ধ হয় না, সেইজন্য বিশ্বের উদ্দেশ্যগুলিকে সম্যক ভাবে নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চেষ্টামাত্রই থাকিয়া যায়—উহা কখনও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারেনা। সুতরাং কান্টের মতে উদ্দেশ্যমূলকতা ও যান্ত্রিক নিয়ম উভয়েই অনুভূতিকে সুবিন্যস্ত করার নিয়ামক কল্পনা মাত্র। উহাদের কোনটিই আমাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে সত্তার পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারে না।

সুতরাং প্রথম দুই "সমালোচনা" গ্রন্থে যে-সকল আত্যন্তিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই তৃতীয় "সমালোচনা" গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চিন্তার জন্য, বিভিন্নভাবে হইলেও বোধশক্তি এবং প্রজ্ঞা উভয়েরই একটি জীবন্ত বিশিষ্ট উপাদানের প্রয়োজন, ইহা প্রদর্শন করিয়াই ঐ চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম "সমালোচনা" গ্রন্থে, কাণ্ট এই কথা বার বার বলিয়াছেন যে, বোধশক্তি আমাদিগকে জ্ঞান দেয়, কিন্তু সে জ্ঞান বিশিষ্টের জ্ঞান নহে। কিন্তু এইরূপ বলিলে, জ্ঞানের সম্ভাবনাই অস্বীকার করা হয়। আবার দ্বিতীয় "সমালোচনা" গ্রন্থে, কাণ্ট বার বার বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিকে লইয়াই প্রজ্ঞার কারবার, তথাপি প্রজ্ঞা আমাদিগকে জ্ঞান দেয় না। কিন্তু অনুরূপভাবে ইহাতেও নৈতিক আচরণের বোধগম্যতাকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং নৈতিক আচরণের তথা জ্ঞানের বোধগম্যতা উভয়েই রস-সম্বন্ধীয় বিচারের উপর নির্ভরশীল, কারণ, এই ধরণের বিচার ব্যক্তিকে লইয়া ব্যাপৃতও থাকে, আবার জ্ঞানও প্রদান করে।

চিন্তার সাধারণ নিয়মগুলির সার্বিকতা তাহাদের অনিবার্য স্বরূপের উপর নির্ভর করিতে পারে—কারণ চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগকে এইগুলিকে ব্যবহার

করিতেই হইবে। কিন্তু সংবেদনমূলক বিচারের বেলায়, এই কথা সত্য নহে। সংবেদনমূলক বিচার, এমনকি বৈজ্ঞানিক বিচারও, সকল প্রকার চিন্তারই অত্যাবশ্যক উপাদান নহে। যদিও তাহারা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, তথাপি তাহাদের দাবী এই যে, সকলেই তাহাদের সত্যতা স্বীকার করুক। সুতরাং চিন্তার সাধারণ নিয়মগুলির বিবেচনার দ্বারা উহাদের প্রামাণ্য অনুমিত হইতে পারে না। সমগ্র জগৎ কখনও আমাদের অনুভূতির একই বিষয়রূপে আমাদের নিকট প্রদত্ত হয় না ; তথাপি সংবেদনমূলক বিচারগুলি একই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে চাহে, শুধু এই কথার উপরেই উহাদের প্রামান্য নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞান-মূলক বিচারগুলিও জগতের ঐক্য নির্ণয় করিতে চাহে, কিন্তু যে পরিমাণে এই সকল বিচারের দাবীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়, শুধু সেই পরিমাণেই জগতের এই ঐক্য নির্ধারিত হয়। জগৎকে আমরা এমন একটি সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত কার্যরূপে জানিতে পারি না, যাহার বিভিন্ন অংশ বা দিকসকল আমাদের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়। যে পরিমাণে আমরা এই ক্রমিক প্রকাশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের কথা ভাবিতে পারি। জ্ঞান এমন কোনও নিষ্ক্রিয় পদার্থ নহে, যাহার মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জগৎ ক্রমশঃ আমাদের মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়। বরং জ্ঞান মূলতঃ নির্বাচনপ্রিয়, এবং ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, অনুভূতির অনন্ত সংখ্যক বিশেষ বিশেষ উপাদানের মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলিই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ, অন্যগুলি নহে। কোনও এক তত্ত্বের ভিত্তিতেই প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকের ভেদ নির্ধারিত হইতে পারে ; এবং এই তত্ত্বটি হইতেছে বিনা বিচারে জগৎকে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া। যেহেতু ইহা একটি বিনা বিচারে গৃহীত তত্ত্ব, অতএব উহা কল্পনার নির্মিতি এবং এইরূপ কল্পনা নির্মিতিই রস-বিষয়ক বিচারের মূল স্বরূপ। সুতরাং সংবেদনলব্ধ বিচার এবং রস-সম্বন্ধীয় বিচার যে সার্বিকতা দাবী করে, তাহাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও পার্থক্য নাই।

ইহার পরিণাম এই যে, বোধশক্তি, বিচারশক্তি এবং প্রজ্ঞার আত্যন্তিক ভেদ আর অক্ষুণ্ণ থাকিল না। প্রত্যেকটি শক্তিরই, নিজ নিজ পদ্ধতিতে, সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ লইয়া কারবার ; অবশ্য প্রত্যেকেরই পদ্ধতি বিভিন্ন ; আবার প্রত্যেকের পক্ষেই জ্ঞানের ঐক্যকে সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। কাণ্ট ভাবিয়াছিলেন যে, বোধশক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়েরই ক্রিয়ার কোনও রকম ব্যাখ্যা দেওয়া বিশেষভাবে বিচার শক্তিরই কার্য। এইভাবে বোধ শক্তিকে পদার্থ নিরূপক বিচারের সহিত একরূপ করা যায়, আবার প্রজ্ঞার কতকগুলি ক্রিয়াকে নিয়ামক

বিচারের ক্রিয়া হইতে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং তৃতীয় সমালোচনা গ্রন্থে কাণ্ট স্বীকার করিলেন : প্রজ্ঞা যে-অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তাকে জানিবার চেষ্টা করে, শুধু তাহার চিন্তার জন্যই নহে, উপরন্তু যে অন্তিম বিশিষ্ট পদার্থটিকে বোধশক্তি বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে প্রয়োগ করিয়া ধরিতে চাহে, তাহার জ্ঞানের জন্যও, মনের এই স্বনিঃসৃত সৃজনী ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। বিচারের নিয়মগুলি সকল জ্ঞানেই বিদ্যমান। যখনই আমরা কোনও বিশিষ্ট পদার্থকে বুঝিতে চাহি, সেই মুহূর্তেই উহারা সক্রিয় হয়—বিশিষ্ট পদার্থটিকে নির্ধারণ এবং বর্ণনা করিবার পরে, উহা আরম্ভ হয়, এরূপ নহে।

উপসংহার

সুতরাং কাণ্টের মূল অবদান হইতেছে—একদিকে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমা সম্যকভাবে নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপরদিকে এই সীমার মধ্যে বিজ্ঞানের অনিবার্যতা এবং সার্বিকতা স্থাপন করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সর্বজনগোচর প্রগতি-সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞানকে সমগ্র অনুভূতির সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। আবার একই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, ভৌতিকই হউক অথবা মানসিকই হউক, যে কোনও দৃশ্য পদার্থের ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তিনি তাহাদের নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতরে সর্বপ্রকার মানবীয় অনুভূতিরই যথার্থতা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। সত্য, শিব ও সুন্দর যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে সজাগ থাকিয়াও, তিনি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং একচ্ছত্রতার উপরে জোর দেন। জ্ঞানে ক্রিয়া আছে, ক্রিয়াতে জ্ঞান আছে রসানুভূতিতে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়েই বিদ্যমান। তথাপি আমাদের অনুভূতিতে বিজ্ঞান, কলা ও নীতির যে বিশেষ কার্য আছে, তাহা যদি সম্যকভাবে বুঝিতে চাহি, তাহা হইলে কলা হইতে বিজ্ঞানকে, এবং নীতি হইতে কলা ও বিজ্ঞান উভয়কেই পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। কাণ্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে এই যে, তিনি জীবনের বহু জটিলতাকে একটি সরল আদর্শের ঐক্যে পরিণত করার প্রলোভন সংবরণ করিয়াছিলেন।

কাণ্টের এই সার্বিক দৃষ্টিই পরবর্তী দর্শনে তাঁহার গভীর ও স্থায়ী প্রভাবের মূল। বর্তমানকালে, যে সকল কার্যোপযোগিতাবাদের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও কাণ্টের বিশ্লেষণের নিকট সেই পরিমানেই ঋণী, বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবাদ ও বস্তুবাদ যে পরিমাণে কাণ্টের নিকট ঋণী। কাণ্টের সহিত কার্যোপ-

যোগিতাবাদীরা বৈজ্ঞানিক নিয়মের চরম সত্যতাকে গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় তাঁহারা অনুভূতির ক্ষেত্রেও এই সকল নিয়মের যথার্থতার ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। কাণ্টের ন্যায় জ্ঞানবাদীরা জ্ঞানে মনের অবদান স্বীকার করেন এবং এ কথাও মানেন যে, জ্ঞান এক প্রকার ক্রিয়া। কিন্তু তাঁহারা মনের ক্রিয়ার দ্বারাই সৎবস্তু সৃষ্ট হয়, এইরূপ প্রমাণ করিবার এবং অধিবিজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়াতীত বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করিবার চেষ্টা করেন—এই ব্যাপারে ইঁহাদের মত কাণ্টের মত হইতে পৃথক। বস্তুবাদীরা কাণ্টের ন্যায়ই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহির হইতে প্রদত্ত উপাদানের গুরুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা মনের সাহায্য ব্যতীতই এই সকল উপাদানের বিভিন্ন বিন্যাস ও মিলন দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। সংশয়বাদের জন্যও কতকগুলি সার্বিক সত্যের ভিত্তি প্রয়োজন, কাণ্টের এই শিক্ষা কার্যোপযোগিতাবাদীরা গ্রহণ করেন নাই। আবার অনুভূতির সাধারণ গঠন ও আকার হইতে নিঃসৃত অনিবার্যতা এবং সার্বিকতা যে কেবলমাত্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানবাদীরা কাণ্টের এই সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা বাহির হইতে প্রদত্ত তাহা শুধু যে পরিমাণে **পরিজ্ঞাত** হয়, সেই পরিমাণেই মানবীয় চেতনার নিকট **বিষয়ে** পরিণত হয়, কাণ্টের এই সুদৃঢ় মতকে বস্তুবাদীরা উপেক্ষা করেন।

বোধহয়, এই সার্বিক দৃষ্টি এবং অনুভূতির প্রত্যেকটি দিকের প্রতিই সুবিচার করার চেষ্টা কাণ্টীয় দর্শনের সুষ্টতম বৈশিষ্ট্য। এই কথা বলার অর্থ এই নহে যে, কাণ্টের অনুভূতির বিবরণ সব দিক দিয়াই সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক। আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপই এই যে, এইরূপ বিবরণ কখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইতে পারে না। তাঁহার পরবর্তী বা যে তাঁহার এই বিচিত্রমুখী দর্শনের একটি অথবা অপর একটি দিকের উপর জোর দিয়াছিলেন, ইহাই এই কথার সত্যতার একটি বাহ্য প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার পরবর্তীদের হস্তে তাঁহার দর্শনের এইরূপ পরিবর্ধনের সম্ভাবনা তাঁহার নিজস্ব উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁহার মত এই ছিল যে, যে পরিমাণে আমরা আমাদের জ্ঞানে জগতকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারি, সেই পরিমাণেই উহার সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা সম্যক হইতে পারে। যেহেতু জ্ঞান একটি ক্রমবিকাশশীল প্রক্রিয়া, সেইহেতু অনুভূতিতে এই ঐক্যকে কখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব আকার দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টাও যে সম্পূর্ণ সফলকাম হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য, এই ঐক্য একটি আদর্শরূপে কাজ করে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু

এই পরিবর্তনশীল দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিকে অবশ্যই অনুভূতির সাধারণ স্বরূপের অনুরূপ হইতে হইবে। কাণ্ট জ্ঞানের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহা অনুভূতির প্রত্যেক দিককে তাহার প্রকৃত মূল্য দিতে চাহিয়াছে। অনুভূতি সম্বন্ধেও কাণ্টের মত মানবীয় মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির প্রত্যেকটিরই অবদান স্বীকার করিতে চাহিয়াছে। তাহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, নীতি ও কলার একচ্ছত্র অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কাণ্ট যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদার মানবিকতা সুস্পষ্ট। সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি বিশ্বশাসনতন্ত্র গঠন করিয়া উহার সাহায্যে বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার ধারণাতেও কাণ্টের এই উদার মানবিকতার প্রকাশ বিদ্যমান।

কাণ্টের গ্রন্থাবলী

1. *Critique of Pure Reason.*
2. *Critique of Practical Reason.*
3. *Critique of Judgment.*
4. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals.*
5. *Prolegomena to Any Future Metaphysic.*
6. *On Philosophy in General.*
7. *Perpetual Peace.*

কাণ্টের দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী

(i) *Kant's Metaphysics ol Experience,* H. J. Paton.
(ii) *A. Commentary to Kant's Critique of Pure Reason,* by N. K. Smith.
(iii) *The Categorical Imperative,* by H. J. Paton.
(iv) *Studd of Kant.* by J. Ward.
(v) *Kant,* by A. D. Lindsay.
(vi) *The Critical Philosophy of Kant,* by Edward Caird.
(vii) *Kant's Theory of Knowledge,* by H. A. Prichard.
(viii) *Philosophy of Kant.* by Watson.
(ix) *On the Philosophy of Kant,* b y R. Adamson.
(x) *The World as Will and Idea,* by Sehopenhauer.

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ফিশ্‌টে, শেলিং ও হেগেল্‌

কাণ্ট যে চিন্তাধারাপ্রবর্তন করেন, এবং যাহা হেগেলের দর্শনে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, তাহা সংক্ষেপে জার্মান ধারণাবাদ নামে বর্ণিত হইতে পারে। যে সকল ভারতবাসী স্বদেশের দার্শনিক ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত, তাহাদের নিকট এই চিন্তাধারা বিশেষ কৌতূহলজনক হইবে। ভারতবর্ষে দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ আত্মা (self) অথবা চৈতন্যের (spirit) স্বরূপ নির্ধারণ, এবং এই দর্শন মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায়ীভূত আন্তরিক আধ্যাত্মিক সাধনার একটি অঙ্গ ছিল। জার্মান ধারণাবাদেরও প্রধান উদ্দেশ্য আত্মা বা চৈতন্যের স্বরূপ নির্ধারণ, এবং এই মতবাদে (যথা হেগেলের মতবাদে), দর্শনকে আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চস্তরে স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

১। জহান গট্‌লিব্‌ ফিশ্‌টে (খৃঃ ১৭৬২-১৮১৪)

যেহেতু কাণ্ট ধারণাবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন. এবং স্বরূপস্থ বস্তুর (thing in itself) অস্তিত্বে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, তাই ফিশ্‌টেকেই জার্মান ধারণাবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইতে পারে। ফিশ্‌টে কাণ্টের শিষ্যরূপে স্বীয় দর্শন চর্চা আরম্ভ করেন। এমন কি, তিনি বলিতেন যে, তাহার পরবর্তী চিন্তাতেও, তিনি শুধু কাণ্টের দর্শনকেই সুসমঞ্জস করার চেষ্টা করিয়াছেন। রাইনহল্ড-এর ন্যায়, তিনিও বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে (categories) একটি সর্বোচ্চ তত্ত্ব হইতে নিগমন করার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। অবশ্য, কাণ্ট নিজস্ব প্রণালীতে এই সকল বৌদ্ধিক প্রকারকে নিগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু স্বসংবেদনের ঐক্যকে (unity of apperception) অনুভবের চরম নিয়ামক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ সূচনা দিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্রকারগুলি এই ঐক্যের রূপভেদ। কিন্তু এই সকল প্রকার কি ভাবে স্বসংবেদনের ঐক্য হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা তিনি মোটেই স্পষ্ট করেন নাই। স্বরূপস্থ বস্তু সম্বন্ধে সাধারণতঃ গৃহীত মত কি ভাবে কাণ্টের দর্শনের সহিত অসমঞ্জস, মাইমন্‌ তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছিলেন ; এবং এই ব্যাপারে, ফিশ্‌টে তাহার সহিত

একমত হইলেন। ইনি কাণ্টের মত হইতে এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে আমাদের নিকট শুধু কাণ্টীয় দর্শনের কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাবই করিলেন, তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি তাহার "বিজ্ঞান বিষয়ক মতবাদ" (Wissenschaftslehre) নামক গ্রন্থে একটি নূতন দর্শনই আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাহার এই নূতন দর্শনে কাণ্টীয় দর্শনের তত্ত্বই উহার বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কাণ্ট নিজ দর্শনে যে সকল অযৌক্তিক ও অসংলগ্ন মতকে স্থান দিয়াছিলেন, সেইগুলিকে বর্জন করা হইয়াছে।

রাইনহল্ড বলিতেন, দার্শনিক বিচারের জন্য তত্ত্বের একত্ব অত্যাবশ্যক। রাইনহল্ডের এই মত ফিশ্‌টে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিলেন, এবং বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন, "ইহা অত্যাবশ্যক যে, প্রত্যেক পদার্থ একই বলয়ে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া, উহা হইতেই লম্বিত থাকিবে।" তাই তিনি এমন একটি আদিতত্ত্ব খুঁজিতে থাকিলেন, যাহা নিজ আলোকে উজ্জ্বল, যাহা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেনা, কিন্তু যাহার উপর অন্য সকল কিছু নির্ভর করে। তিনি এই তত্ত্বটিকে কাণ্ট-সম্মত স্বসংবেদন অথবা স্বচেতনার ঐক্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি এই চেতনাকে "অহম্" বলিতেন। কিন্তু তাহার মত কাণ্টের মতকে অতিক্রম করিয়াছিল। কাণ্ট মনে করিতেন, স্বচেতনা হইতেছে এমন একটি ঐক্যবিন্দু, যাহার সহিত প্রত্যেক জ্ঞানই সম্বন্ধ হইতে বাধ্য। কিন্তু ফিশ্‌টের মতে, "অহম্" এমন একটি ঐক্য যাহার মধ্যে প্রত্যেক পদার্থকেই (তাহা বস্তুজগতেরই হউক অথবা জ্ঞানজগতেরই হউক) অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। কাণ্টের দৃষ্টিতে যাহা শুধু তর্ক-বৈজ্ঞানিক (logical) অথবা প্রমা-শাস্ত্রীয় (epistemological তত্ত্ব ছিল, ফিশ্‌টের মতে তাহা আধি-বৈজ্ঞানিক (metaphysical) তত্ত্বও হইল। বস্তুতঃ, স্বচেতনাকে ফিশ্‌টে যে-অর্থে বুঝিয়াছেন, সেই অর্থে, উহাতে জ্ঞান ও সত্তার অভেদ সম্পাদিত হইয়াছে। কারণ, অহম্-এর ক্ষেত্রে জানা ও থাকা পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু এক ও অভিন্ন। আমরা যে কোন পদার্থকেই তৎ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদার্থ হইতে কল্পনায় সরাইয়া দিতে পারি, কিন্তু অহম্ পদার্থকে এই ভাবে অপসারণ করা সম্ভবপর নহে। উহার ক্ষেত্রে, অস্তিত্বকে কখনও শুধু সম্ভবপর বলা যায় না। অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধে যেমন উহা আছে কি নাই এইরূপ অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, অহম্-এর ক্ষেত্রে, তেমন পারা যায় না। কারণ, এইরূপ প্রশ্ন করিবার পূর্বেই প্রশ্নকর্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়।

বলা অনাবশ্যক যে, ফিশ্‌টে অহম্ শব্দ দ্বারা কোন ব্যষ্টি আত্মা বুঝেন না।

ব্যক্তিত্ব হইতেছে চৈতন্যের একটি বিশিষ্ট সীমিত প্রকার; সুতরাং চৈতন্যের সর্ব বিশিষ্ট প্রকারের মধ্যে যে সাধারণ চৈতন্য বিদ্যমান, তাহার সহিত উক্ত ব্যষ্টি আত্মাকে অভিন্ন মনে করা যায় না।

স্বসংবেদনরূপ তত্ত্বটি স্বকীয় আলোকে প্রকাশমান। অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক; বরং সর্ব প্রমাণ-প্রবৃত্তির পূর্বেই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দার্শনিক উহাকে কি করিয়া প্রাপ্ত হন? ফিশ্‌টে বলেন উহা আমরা বৌদ্ধিক সাক্ষাৎ অনুভূতিতে (intellectual intuition) জ্ঞাত হই। আমাদের প্রত্যেক অনুভবেই, নিজেদের সম্বন্ধে একটি অপরোক্ষ জ্ঞান থাকে, এবং বৌদ্ধিক সাক্ষাৎ-অনুভূতি বলিতে, ফিশ্‌টে ইহা-অপেক্ষা অধিক রহস্যময় কিছু বুঝিতেন বলিয়া মনে হয় না। সাক্ষাৎ-অনুভূতি বলিতে, শুধু কোন বহিরাগত পদার্থকে জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা বুঝায় না। "ইহা সর্বদাই একটি সংগঠক ক্রিয়ার (constructive act) ফল।" (Adamson) উদাহরণ স্বরূপ, ত্রিভুজের সাক্ষাৎ অনুভূতি হইতেছে ত্রিভুজ নির্মাণের নির্দিষ্ট প্রণালীর জ্ঞান। তাহার "বিজ্ঞান বিষয়ক মতবাদ" নামক গ্রন্থের দাবী এই যে, উহাতে এই মূল বৌদ্ধিক সাক্ষাৎ-অনুভূতির অভ্যন্তরস্থ তত্ত্বগুলিরই একটি প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে চিন্তা ও সত্তার সমগ্র জগৎকেই স্বচেতনা হইতে নিগমণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কিন্তু নিগমনের অর্থ নির্মাণ নহে। স্বচেতনা হইতে জগৎ কিভাবে উৎপন্ন হয়, আমাদের নিকট ফিশ্‌টে তাহাব বর্ণনা দিবেন না। জগৎকে বুঝিবার জন্য আমরা যে সকল ধারণার সাহায্য গ্রহণ করি, উহারা স্বচেতনার ধারণার সহিত কিভাবে প্রথম হইতেই জড়িত থাকে, তিনি শুধু উহাই প্রদর্শন করিবেন। এই সকল ধারণারই অপর নাম হইতেছে বৌদ্ধিক প্রকার। কিন্তু উহারা শুধু শূন্যগর্ভ আকার অথবা চিন্তা মাত্র নহে। স্বচেতনার ক্ষেত্রে, যেমন জ্ঞান ও সত্তা দুইই একসঙ্গে থাকে, তেমনই এই সকল বৌদ্ধিক প্রকারে-ও, চিন্তা এবং সত্তাকে একই সঙ্গে পাওয়া যায়; উহারা একদিকে চিন্তা, আবার অপরদিকে চিন্তার বিষয়। এখন আমরা সংক্ষেপে ফিশ্‌টের এই নিগমন প্রক্রিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অহম্‌ তত্ত্বের পশ্চাতে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা এই মূল উপস্থাপন হইতে (thesis) দার্শনিক বিচার আরম্ভ করিতে পারি যে, (১) অহম্‌ নিজেকে উপন্যস্ত করে (posits)। কিন্তু কেবল অহম্‌ থাকিলেই জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানের জন্য সর্বদাই বিষয় আবশ্যক, আবার অহম্‌ হইতে জ্ঞানকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত উপস্থাপনের সহিত আমরা এই

প্রত্যুপস্থাপনও (antithesis) পাই যে, (২) অহম্ অনহম্‌কে উপন্যস্ত করে। কিন্তু অসীমিত অহম্ ও অসীমিত অনহম্ পরস্পরের বিরোধী হওয়ায়, এখানে একটি অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয়। উহা এই সমুপস্থাপন দ্বারা (synthesis) দূরীভূত হয় যে, (৩) অহম্ নিজেকে সীমিত-অনহম্ দ্বারা সীমিত বলিয়া উপন্যস্ত করে। এখানে আমরা অহম্ ও অনহম্‌কে পরস্পরের দ্বারা সীমিত অথবা নিরূপিত (determined) বলিয়া পাই। সীমিত অহম্ ও সীমিত অনহম্ অসীমিত অহম্ ও অসীমিত অনহমের ন্যায় পরস্পরের বিরোধী নহে, এবং এইজন্য পূর্বোক্ত অসামঞ্জস্য-দূরীভূত হইল। মনে হয় যে, ফিশ্‌টে তাহার এই উপস্থাপন, প্রত্যুপস্থাপন ও সমুপস্থাপন দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতে চাহেন যে, স্বসংবেদনের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর দ্বারা সীমিত হইয়া এইং পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত থাকে।

উপরের সমুপস্থাপনটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দুইটি উক্তি অন্তর্ভুক্ত: (১) প্রথমতঃ, অহম্ নিজেকে অনহম্ দ্বারা নিরূপিত বলিয়া উপন্যস্ত করে; এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, অহম্ অনহম্‌কে অহম্ দ্বারা নিরূপিত বলিয়া উপন্যস্ত করে। প্রথম উক্তিটি জ্ঞান বিষয়ক দর্শনের (theoretical philosophy) এবং দ্বিতীয় উক্তিটি কৃতি-বিষয়ক দর্শনের (practical philosophy) ভিত্তি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, অনহম্ অর্থাৎ বিষয় হইতেছে বিষয়ীর নিয়ামক—আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী জানিতে পারি না, কিন্তু বিষয়টি যেইরূপ, উহাকে ঠিক সেইরূপেই আমরা জানিতে বাধ্য। কৃতি বা সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেইরূপ ইচ্ছা করি, বিষয়টিও সেইরূপ; সুতরাং এখানে উহা বিষয়ী দ্বারা নিরূপিত।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে, অবশ্যই আমরা বিষয়দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। তথাপি এই বিষয় (অনহম্) অহম্ হইতে ভিন্ন ও তাহার প্রতিকূল কোন স্বয়ংসিদ্ধ বাহ্য বস্তু নহে, কিন্তু উহা অহম্-দ্বারাই উপন্যস্ত পদার্থ বিশেষ। মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্থলে, ফিশ্‌টে আমাদের অনুভবের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং অনিবার্যতা অনুভবের একটি স্বরূপগতধর্ম। সাধারণতঃ, কোন স্বয়ংসিদ্ধ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া এই অনিবার্যতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ফিশ্‌টের মতে, "স্বয়ংসিদ্ধ বিষয়" এই কথাটি অর্থহীন; কারণ, তিনি বিষয় বলিতে সর্বদাই এমন কিছু বুঝেন, যাহা নিজের জন্য অস্তিত্ববান নহে, কিন্তু শুধু বিষয়ীর জন্যই অস্তিত্ববান। জ্ঞানের মধ্যে যে অনিবার্যতা বোধ থাকে, তাহা তিনি বিষয়ীর স্বাবচ্ছেদন দ্বারা (self-limitation) জনিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

অহম্-এর এই মূল স্বাবচ্ছেদন-ক্রিয়া হইতে ফিশ্‌টে কিভাবে কারণতা, দ্রব্যত্ব

প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে নিগমন করেন, এবং তাহার মতে আমরা কিভাবে ইন্দ্রিয় সংবেদন, ধারণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীয় ক্রিয়াগুলি গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্নিরীক্ষণ-দ্বারা প্রাপ্ত হই, তাহা বর্ণনা করার মত এখানে যথেষ্ট স্থান নাই।

লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, যে মূল ক্রিয়াদ্বারা অহম্‌-এর অসীমতা সীমিত হয়, এবং উহা পুরোবর্তী বিষয়যুক্ত বিষয়ীর আকার ধারণ করে, ফিশ্‌টে উহাকে সৃষ্টিকারী কল্পনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা আক্ষরিকভাবে বুঝিলে, বলা যায় যে, কোন কোন ভারতীয় দর্শনের ন্যায় ফিশ্‌টের মতেও সমগ্র বিশ্বই কল্পিত।

প্রশ্ন উঠে, অহম্‌ কিভাবে অনহম্‌কে নিজের বিরুদ্ধে রাখিয়া নিজেকে সীমিত করে? ইহার উত্তর তাহার জ্ঞান বিষয়ক মতবাদে পাওয়া যাইবে না। কারণ, অহম্‌ ও অনহম্‌-এর পরস্পর বিরোধ ও অবচ্ছেদন হইতেই এই মতবাদের আরম্ভ। উক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য, ফিশ্‌টে আমাদিগকে তাহার দর্শনের কৃতিবিষয়ক অংশ অধ্যয়ন করিতে বলেন। তাহার মতে, সত্তার মূল ভিত্তি জ্ঞানীয় চেতনা নহে, কিন্তু কৃতিবিষয়ক অথবা নৈতিক চেতনা উহার ভিত্তি। কৃতি বিষয়ক চেতনার স্থান সকলের উর্ধ্বে, কাণ্টের এই উক্তিটিকে ফিশ্‌টে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিশ্‌টের মতে, জ্ঞান অপেক্ষা স্বাধীন ক্রিয়াই আত্মার মূল স্বরূপ। নিজেকে উপন্যস্ত করা, শুধু ইহাই আত্মার বিশুদ্ধ ক্রিয়া; আবার এই ক্রিয়া নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আত্মা হইতেছে চিন্তা ক্রিয়ার কর্তা, এই ভাবে দেখিলে, এই ক্রিয়া কেন্দ্রাভিকর্ষী (Centripetal); আবার আত্মা হইতেছে চিন্তা ক্রিয়ার কর্ম, এই ভাবে দেখিলে, এই ক্রিয়া কেন্দ্রাপসারী (Centrifugal)। যদি এই ক্রিয়া কিছু দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা কিছুই নিষ্পন্ন হইত না। বহির্মুখী ক্রিয়া যেন কোন একটা আঘাত (anstoss) পাইয়া, নিজের উপরে ফিরিয়া আসে; এবং তখন আত্মার বিশুদ্ধ ক্রিয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক্রিয়া-রূপে আত্মা অভিব্যক্ত আকারে থাকে না, কিন্তু শুধু বীজরূপে বিদ্যমান থাকে। তখন উহা শুধু একটি সম্পাদ্য কার্য রূপে থাকে, অথবা এমন একটি আদর্শরূপে থাকে, যাহার প্রাপ্তির জন্য আমরা নিরন্তর চেষ্টা করি। আমাদের যেন দুইটি আত্মা: একটি আদর্শস্বরূপ, অপরটি বাস্তব। এই আদর্শীভূত অথবা বিশুদ্ধ আত্মাকে অথবা ধারণারূপ আত্মাকে (ফিশ্‌টে কখনও কখনও ইহাকে এই নামেও অভিহিত করেন) সাধারণ অর্থে অস্তিত্ববান বলা দুষ্কর, এবং উহা নিশ্চয়ই চেতন নহে। যখন বাহ্য আঘাতের ফলে, শুদ্ধ আত্মার অনুচিন্তন (reflection) আরম্ভ হয়,

তাহার মধ্যে একটি বিভাগ উৎপন্ন হয়, এবং উহা পুরোবর্তী বিষয়ের সম্মুখে বিষয়ী রূপে আবির্ভূত হয়, তখনই উহা জ্ঞান-যুক্ত হয়।

এই "বাহ্য আঘাত" শব্দটি আলঙ্কারিক বর্ণনা মাত্র। সম্ভবতঃ, প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমাদের নৈতিক চেতনায় যে একটি অবরুদ্ধ ক্রিয়ার বোধ থাকে, তাহার সহিত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্রিয়ার আদর্শ এবং যে-বাধা আমরা অতিক্রম করিতে চাই, এইরূপ একটি বাধার ধারণাও জড়িত থাকে।

বৌদ্ধিক সাক্ষাৎ অনুভূতিতে, আমরা স্বসংবেত্তা (self-conscious) অহম্‌কে জানি। কিন্তু ইহা প্রযত্নবান অহম্, এবং ইহার সহিত আমাদের আদর্শীভূত এমন একটি অহম্-ও জড়িত থাকে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণেই বিদ্যমান, এবং যাহা আমাদের সম্মুখে এমন এক অন্তহীন কর্তব্য রাখিয়া দেয়, যাহা কখনও কালের অবধিতে সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। ইহাই অমরত্বে বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি (আদর্শীভূত অহম্ ও স্বসংবেত্তা অহম্ এর পার্থক্য ভারতীয় দর্শনের পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্যের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়)।

ফিশ্‌টের মতে, কর্তব্য-বোধ আছে বলিযাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে সত্তাবান বলিযা জানি। শুধু ধারণার (Vorstellung) মাধ্যমে কোন প্রকার সত্তাই আমাদের নিকট সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হয় না। আমাদের স্বসংবেদনের সহিত একটি নৈতিক প্রয়োজনের ধারণা জড়িত আছে বলিয়াই, আমরা নিজ অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। ফিশ্‌টে স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি নিজেকে শুধু নৈতিক নিয়মের মাধ্যমেই জানি"। নৈতিক কর্মের কর্তারূপেই আমি জ্ঞান ও সত্তার স্বামী ; এবং আমার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্ররূপেই বাহ্য জগৎ আমার নিকট অস্তিত্ববান।

২। শেলিং (খৃঃ ১৭৭৫—১৮৫৪)

প্রারম্ভে ফিশ্‌টে যেমন কাণ্টের অনুগামী ছিলেন, শেলিং তেমনই ফিশ্‌টের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ফিশ্‌টের দর্শন অত্যাধিক পরিমাণে জ্ঞাতৃসাপেক্ষ (Subjective)। শেলিং ও হেগেল উভয়েই, ফিশ্‌টের বিরুদ্ধে জ্ঞানিকতার (subjectivism) আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু কোন এক বিশিষ্ট জ্ঞাতার জ্ঞান-সাপেক্ষ, এই অর্থে ফিশ্‌টের দর্শনকে নিশ্চযই জ্ঞাতৃসাপেক্ষ বলা চলেনা। অবশ্য, ফিশ্‌টে অহম্-এর ভিত্তিতে তাহার দর্শন রচনা করেন। কিন্তু ইহা কোন বিশিষ্ট অহম্ নহে। অকিঞ্চন এই অহম্, উহার

বিশুদ্ধরূপে, জ্ঞাতা-ও নহে। তথাপি তাহার দর্শনকে, এক অর্থে, জ্ঞাতৃ সাপেক্ষ বলা যায়। কারণ, ফিশ্‌টের মতে, এই বিশুদ্ধ অহম্‌কে বিশিষ্ট জ্ঞাতাদেরই মধ্যে বাস্তব করা প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে উহাকে বাস্তব করার কথা উঠে না; তাহা ছাড়া, যে অনহম্‌ সম্পূর্ণভাবে অহম্‌ সাপেক্ষ এবং অহম্‌ এর উপর নির্ভর করে, প্রকৃতির সমগ্র রাজ্যকে তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। অপর দিকে, শেলিং-এর বিচারের একটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃতিকে তাহার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া। শেলিং-এর দর্শনে, বহু রূপান্তর ঘটিয়াছিল। উহাদের মধ্যে এখানে আমরা শুধু ঐ দুইটি রূপের দিকেই দৃষ্টি দিতে পারিব, যাহাদের সহিত হেগেলের দর্শনের কিছু সম্বন্ধ আছে।

একটি রূপের নাম নিসর্গ-দর্শন (Natur-Philosophie); এবং উহার প্রধান বক্তব্য এই—নিসর্গের প্রকৃতস্বরূপ হইতেছে এমন একটি বুদ্ধিযুক্ত ক্রিয়া, যাহা স্বসংবেদনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতিকে চৈতন্যের বিরোধী শুধু একটি প্রাণহীন যন্ত্ররূপে কল্পনা করা ভুল। উহাকে কেবল অনাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা অসঙ্গত। নিসর্গ-ও এক অর্থে আত্মা। কারণ, নিসর্গস্থ সর্ব বস্তুর অঙ্গসংস্থানে (structure) বুদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, চেতন ও বুদ্ধিমান জীব-সকল নিসর্গেরই অংশ, এবং এক অর্থে নিসর্গদ্বারাই জনিত। যদি বুদ্ধি নিসর্গ-স্বভাব হইতে পৃথক হইত, তাহা হইলে এইরূপ হইত না। শেলিং নিসর্গ ও চৈতন্যের ভেদ স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে, নিসর্গ হইতেছে দৃষ্ট চৈতন্য, এবং চৈতন্য হইতেছে অ-দৃষ্ট নিসর্গ।

শেলিং-এর উপর কাণ্টের "বিচারশক্তির সমালোচনা" (Critique of Judgement) নামক গ্রন্থের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। মনে হয়, তিনি এই গ্রন্থ হইতে জৈব শরীরের (organism) ধারণাটি গ্রহণ করিয়া, সমগ্র প্রকৃতিতে উহা প্রয়োগ করেন। আমরা জানি যে, জৈব শরীর হইতেছে এমন একটি সমুদায়, যাহা নিজেই নিজের আকারের স্রষ্টা। উহা একই সঙ্গে উৎপাদন-ক্রিয়া এবং উৎপন্ন দ্রব্য। ইহার বৃদ্ধি ও অঙ্গবিন্যাস উভয়ই বুদ্ধ্যনুগত। সুতরাং ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, এখানে, প্রাণহীন জড়বস্তুর উপর বাহির হইতে উহার পরকীয় কোন বুদ্ধি কতকগুলি বৌদ্ধিক আকার আরোপ করে। বরং এইরূপ ভাবাই সঙ্গত হইবে যে, সর্ব শরীরী প্রাণীর ভিতর হইতেই, কোন চেতন তত্ত্ব ক্রিয়া করিতেছে। জৈব শরীর সম্বন্ধে যে কথা সত্য, সমগ্র প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। শেলিং জড়প্রকৃতি ও সজীব প্রকৃতিকে একই ক্রমিক ধারার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। জড়প্রকৃতিতে যাহা

রাসায়নিক প্রক্রিয়া (উদাহরণ স্বরূপ, দহন), তাহাই সজীব প্রকৃতিতে প্রজনন শক্তিরূপে (reproduction) দেখা দেয়। সজীব প্রকৃতিতে বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তির অনুরূপ ধর্ম হইতেছে উত্তেজিতা (irritability) ও সংবেদিতা (sensibility)। শেলিং সহজেই দেখাইতে পারিলেন যে, জড়প্রকৃতির পরিবেষ্টন ব্যতীত সজীব প্রকৃতির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে, এবং ইহা হইতে তিনি অনুমান করিলেন যে, সজীব ও নির্জীব প্রকৃতির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান না থাকিলে, ইহা সম্ভবপর হইত না। এই ভাবে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একই সাধারণ আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জৈবশরীর রূপে ধারণা করিয়াছেন।

শেলিং নিসর্গকে চৈতন্য বা বুদ্ধির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাহার কারণ এই যে, নৈসর্গিক পদার্থ সমূহের সর্ব নিয়ম ও আকার বুদ্ধির অনুগত। যাহা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন ও উহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান, বুদ্ধি তাহার উপর কখনও বুদ্ধিগম্য-আকার চাপাইতে পাবে না। এই বুদ্ধিগম্য আকার বুদ্ধিরই আকার, এবং যাহা এই সকল আকার ধারণ করে, তাহা নিজে বুদ্ধিযুক্ত হইতে বাধ্য। যদি কেহ বলে যে, প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধিক আকারে পরিণত করা অসম্ভব, তাহা হইলে শেলিং এর উত্তর এই যে, প্রকৃতির যে-উপাদান অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাহা শুধু আমাদের বুদ্ধির অপূর্ণতাবশতঃ বিমূর্তন-জনিত (abstraction) তাহার দৃষ্টিতে, প্রকৃতি অদ্বয় ও সক্রিয়স্বভাব। এবং প্রকৃতি কি করিয়া উহার বিভিন্ন আকার ও স্তবের মধ্য দিযা, স্বংবেদনরূপ সর্বোচ্চ আকারের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা তিনি বিকাশতত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগদ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিযাছেন। তিনি মন ও জড়বস্তুর মধ্যে এবং ব্যক্তিত্ব (personality) ও নিসর্গের মধ্যে কোন মূলগত ভেদ স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে, উহারা সকলে একই বুদ্ধ্যনুগত সংযোজনাব (intelligent scheme) অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বসংবেদনকে বুদ্ধির সর্বোচ্চ আকাব বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন যে, নিজস্বরূপে স্বসংবেদন হইতেছে শুধু একটি আকার, এবং এই আকারের অভ্যন্তরে যে যুক্তিসম্মত পদার্থ (rational content) আছে, তাহার উপরেই স্বসংবেদনের মূল্য নির্ভর করে। শেলিং-এর মতে প্রাণশক্তি (spirit) যে শুধু চৈতন্যেই আত্মপ্রকাশ কবে তাহা নহে, কিন্তু চৈতন্যের বুদ্ধ্যনুগত বিষয়বস্তু-গুলিতেও নিজেকে প্রকাশ করে।

শেলিং-এর মতে, প্রকৃতিদর্শন ও ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানবাদ (Transcendental idealism) পরস্পরের সমকক্ষ। প্রথমটি চৈতন্যকে প্রকৃতির কার্য বলিয়া মনে

করে, এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃতিকে চৈতন্যের কার্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু দুইটিই একদেশদর্শী। প্রকৃত দৃষ্টি এই উভয় দর্শনের অতীতে। এই স্থলে, আমরা শেলিং-এর দর্শনের অন্য একটি রূপ অভেদ দর্শনের পরিচয় পাই। এই দর্শনের উদ্দেশ্য হইতেছে প্রজ্ঞা বা যৌক্তিক বুদ্ধির প্রকৃত স্বরূপ প্রকট করা।

প্রজ্ঞা বলিতে শেলিং এখানে এমন এক পূর্ণ প্রজ্ঞা বুঝেন, যাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রজ্ঞাকে উহার নিজ-স্বরূপে জানিতে হইলে, চিন্তাকারী জ্ঞাতাকে বাদ দিতে হইবে, এবং আমরা যদি ইহা করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যদিও আমরা সাধারণতঃ প্রজ্ঞাকে কোন বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়া মনে করি, তথাপি প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে। আবার উহাকে জ্ঞেয় বলিয়া মনে করাও সঙ্গত হইবেনা। কারণ, জ্ঞাতার জন্যই ত জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব, তাই কোন পদার্থকে জ্ঞেয়-দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা উহার প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাই না। দার্শনিক দৃষ্টি হইতেছে প্রজ্ঞার দৃষ্টি, এবং দার্শনিক জ্ঞান হইতেছে বস্তুর স্বরূপ যে-রকম সেই রকমে, অর্থাৎ উহা প্রজ্ঞার চোখে যেরকম সেই রকমে, তাহার জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানে, আমরা শুধু প্রজ্ঞাকেই তাহার নিজের সহিত অভিন্নরূপে পাই। প্রজ্ঞার স্বরূপ হইতেছে নিজের সহিত অভেদ, আবার প্রত্যেক পদার্থ প্রজ্ঞার সহিত অভিন্ন, এবং প্রজ্ঞার বাহিরে কিছুই নাই। প্রজ্ঞা ভেদ অথবা বিভাগশূন্য। প্রজ্ঞার নিয়ম হইতেছে অভেদের নিয়ম। কিন্তু পরিপূর্ণ অভেদ নিজেকে বিষয়ী ও বিষয়রূপে স্থাপন না করিয়া, নিজেকে জানিতে পারে না। কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ অথবা গুণগত ভেদ নাই, আছে শুধু মাত্রার ভেদ। বিষয়ে যে-অভেদ বিদ্যমান, তাহা বিষয়ীতেও বিদ্যমান। কিন্তু বিষয়ীতে বিষয়িতার প্রাধান্য। অনুরূপভাবে, বিষয়েও একই অভেদ-তত্ত্ব বর্তমান, কিন্তু সেখানে বিষয়তার প্রাধান্য। কিন্তু আমরা যখন ভেদের কথা ভাবি, তাহার পূর্বেই আমরা এই পরিপূর্ণ অভেদ তত্ত্ব হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে হয়, এবং তখন আমরা সসীম পদার্থের রাজ্যে বিচরণ করি। অভেদতত্ত্ব হইতে আমাদের এই আপাত প্রতীয়মান পৃথকত্ব হইতেছে ব্যক্তিত্ব ও সসীমতার মূল ভিত্তি, এবং এই পৃথকত্ব অনুচিন্তন অথবা কল্পনার কার্য। কোন ব্যষ্টি-বস্তুই স্বাধিকারের জোরে অস্তিত্ববান নহে, কিন্তু অভেদতত্ত্বের একটি প্রকার রূপেই অস্তিত্ববান। আমরা যদি বস্তুসকলকে সমগ্রের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ সমগ্ররূপে জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের মধ্যে এমন একটি সাম্য দেখিতে পাইতাম, যাহা বিশুদ্ধ অভেদতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং যাহাতে কোন কিছুই অন্য কিছু হইতে পৃথক্

করা অসম্ভব। শেলিং-এর এই সর্ববিশেষ-বর্জিত স্বাভিন্ন পরমতত্ত্বের ধারণা সহজেই অদ্বৈত বেদান্তের দ্বৈতহীন ব্রহ্মের কথা মনে করাইয়া দেয়।

৩। গেয়োর্গ ভিলহেল্‌ম্ ফ্রিডরিশ্ হেগেল্ (খৃঃ ১৭৭০—১৮৩১)

জীবনের প্রথম দিকে, হেগেল্ বিশেষভাবে শেলিং-এর প্রভাবাধীন ছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, সত্তা অথবা পরম তত্ত্ব বিষয়ক শেলিং-এর মতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। হেগেলের যুক্তি প্রধান মনের পক্ষে এইরূপ তত্ত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল, যাহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, এমন কি যাহাতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ-ও সম্পূর্ণ বাহ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার মতে, পরমতত্ত্বের স্বরূপ বৌদ্ধিক; সুতরাং উহা বিষয় ও বিষয়ীর বিরোধ দ্বারাই নিজ সত্তাকে উপলব্ধি করে, এবং এইজন্য বিষয়ী ও বিষযের ভেদ পরমতত্ত্বের বাহ্য ধর্ম নহে, কিন্তু উহার স্বরূপগত ধর্ম। আবার শেলিং যে রকম মনে করিতেন যে, বিষযী ও বিষয় হইতেছে পরমতত্ত্বের দুইটি সমান্তরাল ও সমগুরুত্ববান বিকাশ, তাহাও তিনি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। যদিও তিনি বিষয়ের অস্তিত্বকে অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকার কবিলেন, তথাপি তাহার মতে, বিষয়ীর স্থান সর্বদাই বিষয়ের উপরে। কিন্তু তিনি শেলিং-এর প্রকৃতি-দর্শন হইতে যাহা শিক্ষণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাহার মতে, পরমতত্ত্বের স্বরূপ আধ্যাত্মিক হইলেও, তিনি ফিশ্‌টের ন্যায়, উহাকে শুধু জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ বলিয়া ভাবেন নাই, কিন্তু তাহার মতে, পরমতত্ত্বের মধ্যে জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ ও বিষয়-সাপেক্ষ উভয় ধর্মই মিলিতভাবে বিদ্যমান।

শেলিং-সম্মত পরমতত্ত্ব হইতেছে যেন পিস্তল হইতে নির্গত একটি গোলক, এইরূপ বর্ণনা দ্বারা, হেগেল শেলিং-এর মতের দোষ দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপও বলিয়াছেন যে, উহা এমন একটি ঘোরনিশা, যাহাতে গরু মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এই সকল কথা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমাদের বুদ্ধি যে পরমতত্ত্বে কতকগুলি বোধগম্য ও যুক্তিসম্মত ক্রমিক ধাপে আরোহণ করিতে পারেনা, দর্শনে উহাকে কখনও সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহার দ্বিতীয় সমালোচনাটির তাৎপর্য এই যে, পরম-তত্ত্বে পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদগুলিকে সরাসরি ভাবে নিষেধ বা বাতিল করিয়া দেওয়া

উচিত নহে; কিন্তু উহাদের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়া, পরম তত্ত্বে উহাদের স্থান করিয়া দেওয়াই উচিত। ইহা হইতে পরম তত্ত্বের স্বরূপ কিরূপ হইলে, হেগেল উহাকে সন্তোষজনক মনে করিবেন, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরমতত্ত্ব যেমন এক হইবে, তেমনই বহুও হইবে, যেমন বিষয়ী হইবে, তেমনই বিষয় ও হইবে। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই পরস্পর-বিরোধী ধর্মগুলি কি করিয়া একই ধারণার মধ্যে সমাবিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে হেগেল্‌ ইহার সন্তোষজনক উত্তরের জন্য আমাদিগকে তাহার দ্বন্দ্বমূলক বিচার পদ্ধতির (Dialectical Method) সাহায্য লইতে বলিবেন।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি :—দর্শন সম্বন্ধে হেগেলের ধারণা এই যে, উহা হইতেছে বিজ্ঞান (Wissenschaft) এবং বিজ্ঞান বলিতে তিনি ব্যবস্থিত জ্ঞান বুঝেন। তাহার মতে, সত্যের স্বরূপ হইতেছে এক প্রকার জ্ঞান-সংস্থিতি (System of knowledge) এবং দর্শন নামক বিজ্ঞান এই সংস্থিতিকে অর্থাৎ বিশুদ্ধপ্রজ্ঞার সংস্থিতিকে স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শন করে। শুধু এক বিশিষ্ট পদ্ধতি দ্বারাই এই বিজ্ঞান রচনা সম্ভবপর; এবং এই বিশিষ্ট পদ্ধতি জ্ঞানের অন্য কোন শাখা হইতে, যথা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান (Positive Science) অথবা গণিত হইতে ধার করিলে চলিবে না। হেগেলের মতে দর্শনের উপযুক্ত একমাত্র পদ্ধতি হইতেছে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি; এবং দর্শনের বিষয়বস্তু দ্বারাই এই পদ্ধতির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, ইহা হইতেছে দর্শন বিচারের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর স্বনিঃসৃত আভ্যন্তর গতি; সুতরাং এই পদ্ধতির অগ্রগমন দ্বারাই বিষয়বস্তুর অগ্রগমনেরও সীমা নির্দিষ্ট হয়। ইহা বাহির হইতে প্রযোজ্য কোন পদ্ধতি নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হইতেছে বিজ্ঞান রূপ প্রক্রিয়ার "গতিশীল আত্মা" (The moving soul)। "ইহা হইতেছে সেইমূল তত্ত্ব, যাহার সাহায্যে বিজ্ঞানের (অর্থাৎ দর্শনের) বিষয় বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সম্বন্ধেও অনিবার্যতা সম্ভবপর হয় এবং প্রকট করা যায়।"

কিন্তু পদ্ধতিটি তর্ক বিজ্ঞানের এমন একটি মতের উপর নির্ভর করে, যাহার সহিত আমাদের সাধারণবুদ্ধি কিছু অপরিচিত। মতটি এই যে নঞর্থক উক্তিতে (negative judgment) আমরা পূর্বাপেক্ষা উচ্চতর এইরূপ একটি ধারণায় উপনীত হই, যাহা এই নিষেধের দরুণ অধিক অর্থ-সমৃদ্ধ হয়। 'না' বলার অর্থই হইতেছে পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী নিরূপণ করা। যখন একটি ভাববাচক উক্তি কোন নঙ্‌বাচক উক্তির দ্বারা নিরাকৃত হয়, তখন আমরা একটি তর্ক বৈজ্ঞানিক বিরোধের সম্মুখীন হই। কিন্তু এইরূপ বিরোধের সম্মুখে, আমাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা

সম্ভবপর নহে। কারণ, এইরূপ যৌক্তিক বিরোধের সহিত বিচার বুদ্ধির বৈরিতা আছে। তাই এই বিরোধ নিরসনের জন্য, আমরা এই প্রথম নিষেধটিকে নিষেধ করিতে প্রণোদিত হই। কিন্তু এই দ্বিতীয় নিষেধ কেবল মূল ভাববাচক উক্তিটিকে পুনরায় স্থাপন করেন—এই দুই নিষেধের ফলে মূল উক্তিটি অধিক অর্থযুক্ত হইয়াই পুনঃস্থাপিত হয়।

হেগেলের মতে, প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন ধারণার মধ্যেই, উহার বিপরীত ধারণাও নিহিত থাকে। কাজে কাজেই আমরা যদি প্রথমটিকে সত্য বলি, তাহা হইলে দ্বিতীয়টিকেও অর্থাৎ উহার বিপরীত ধারণাটিকেও সত্য বলিতে আমরা বাধ্য। আবার পরস্পরের বিপরীত দুই ধারণার বিরোধের মধ্যেও, আমরা স্থির থাকিতে পারিনা, কিন্তু এমন এক তৃতীয় দৃষ্টি গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, যাহাতে ঐ বিরোধ দূরীভূত হয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণা দুইটি এক উচ্চতর ধারণার উপাদন হয়, এবং তজ্জন্য উহাদের বিরোধ মিটিয়া যায়। এই ভাবে, যে-কোন সান্ত ধারণাই সদবস্তুর বিধেয় রূপে গৃহীত হইলে, উহা আমাদিগকে উহার বিপরীত ধারণায় লইয়া যায, এবং তখন আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা উভয়েই শুধু আংশিক ভাবে সত্য এবং এমন এক তৃতীয় ধারণার অংশ, যাহাতে আমরা সদ্‌বস্তুর অধিক যথাযথ পরিচয় পাই। উপস্থাপন ও প্রত্যুপস্থাপন পরস্পরকে সম্পূর্ণ ভাবে বাধ করেনা (Cancel)। কিন্তু উভয়েই সংস্থাপনের মধ্যে কিছু সংশোধিত আকারে সংরক্ষিত হয়।

যে কোন ধারণা হইতেই আমরা বিচার আরম্ভ করিনা কেন, বিচারের আরম্ভরূপে উহা অপরোক্ষ ও অন্যান্য ধারণা হইতে পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু ঐ ধারণার অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্বাত্মক ক্রিয়া শীঘ্রই তন্মধ্যস্ত অব্যক্ত ভেদকে অভিব্যক্ত করে, এবং আমরা এই ভেদের নিরূপক অন্য ধারণাটিকে প্রাপ্ত হই। সুতরাং এই অন্য অথবা দ্বিতীয় ধারণাটি পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অপরোক্ষ পদার্থই পরোক্ষ হয়, তথাপি অপরোক্ষ পদার্থ পরোক্ষের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় না। আমাদিগকে পুনরায় অপরোক্ষ ধারণায় আসিতে হয়, এবং তখন উহা আমাদের নিকট একটি পরোক্ষীকৃত অপরোক্ষতার আকার ধারণা করে। ইহাই প্রকৃত বিচারের প্রত্যেক স্তরে, উহার বৈশিষ্ট্য। অপরোক্ষ ধারণা হউক, অথবা পরোক্ষ ধারণা হউক, ইহাদের কোনটির দ্বারাই আমরা প্রকৃত সত্যকে পাই না। আবার উহাদের কোনটিকেই অন্যটি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে-ও পাওয়া যায় না। বিমূর্ত বিচারে (abstract thought) যেমন উপস্থাপিত ও প্রত্যুপস্থাপিত উভয় উক্তিকেই অবিচলিত ভাবে স্থির বলিয়া মনে হয়, তেমনই অপরোক্ষতা ও পরোক্ষতাকে পরস্পরের বিপরীত

এবং পরস্পরের সহিত মেলনের অযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু হেগেলের মতে, একমাত্র অখণ্ড বিচার লইয়াই দর্শনের কারবার এবং এই অখণ্ড বিচারের একটি স্বভাব হইতেছে দ্রবত্ব অথবা গতিশীলতা—উহা একই সঙ্গে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুইই। এই ভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, উপস্থাপন প্রত্যুপস্থাপনের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে, আবার উহারা উভয়ে এমন এক সংস্থাপনের অঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়, যাহাতে উপস্থাপন ও প্রত্যুপস্থাপনের সত্যতা অধিক পর্যাপ্তভাবে ব্যক্ত হয়।

সুতরাং দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি এইরূপ দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ ধারণার মধ্যে মিলন ঘটায়। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, বিরোধকে বিরোধরূপে স্বীকার করা হয় না। ইহার অর্থ শুধু এই যে, বিরুদ্ধ উপাদানগুলি এমন এক উচ্চতর ঐক্যের অংশ বলিয়া প্রদর্শিত হয়, যাহা ঐ বিরুদ্ধ উপাদানগুলির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব লাভ করে।

ধারণার নিষেধাত্মক স্ব-সম্বন্ধ হইতেছে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববান্‌ দিক। ধারণা নিজের বাহিরে গিয়া নিজের অন্য হয় (প্রথম নিষেধ), কিন্তু উহা এই বিরোধকে পরাভব করিয়া আবার নিজের কাছে ফিরিয়া আসে (দ্বিতীয় নিষেধ)। দ্বন্দ্বমূলক বিচারের ফল হইতেছে সেই অখণ্ড সত্য, যাহা নিজের সহিত অভিন্ন ; কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার এই ফলের পূর্ববর্তী ধাপগুলি উহার বিমূর্ত (abstract) অংশমাত্র।

প্রথম সমুপস্থাপনটি ভাবাত্মক হইলেও, পুরাপুরি অখণ্ড নহে, এবং উহাতে পূর্বোক্ত বিরোধও সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হয় না। তাই এই সমুপস্থাপন এমন এক নূতন উপস্থাপনের আকার ধারণ করে, যাহা তদুপযুক্ত অপর এক প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, এবং উহারা এমন এক নূতন সমুপস্থাপনে পুনর্মিলিত হয়, যাহা উহাদের উভয়কে অতিক্রম করে, আবার উহাদের সত্যাংশটুকুও বজায় রাখে। এই ত্রিভাগযুক্ত দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া একটি সম্পূর্ণ অখণ্ড সমুপস্থাপনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত, অবিরাম চলিতে থাকে। এই অখণ্ড সমুপস্থাপনে-সর্ত বিরোধের অন্তিম বিরাম ঘটে ; এবং সেইজন্য উহা হইতে আর কোন নূতন বিরোধের উৎপত্তি হয়না। এই অন্তিম সমুপস্থাপন হইতেছে পরম তত্ত্বের সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত লক্ষণ।

দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়াতে কোন কিছুই নষ্ট বা পরিত্যক্ত হয়না, কিন্তু ইহাতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহাই সংরক্ষিত এবং অধিক সমৃদ্ধ হয়। দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া যেন সম্মুখে এবং পশ্চাতে, উভয় দিকেই চলে : প্রত্যেক স্তরেই আমরা একটি নূতন ধারণা প্রাপ্ত হই, কিন্তু প্রাচীন ধারণার সহিত, অথবা যাহা হইতে আমাদের প্রক্রিয়া

আরম্ভ হইল তাহার সহিত, এই নূতন ধারণা সংযুক্ত থাকে। এই ভাবে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞানকে একদিকে অধিক ব্যাপক এবং অন্যদিকে অধিক গভীর করে।

হেগেলের মতে, দর্শন হইতেছে প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধ জ্ঞান। কাণ্টের মতে যেমন বৌদ্ধিক প্রকারগুলিই (categories) প্রজ্ঞার লক্ষণ, তেমনই হেগেলের মতে, বিশুদ্ধ ধারণাগুলিই প্রজ্ঞার লক্ষণ। এই সকল ধারণা অথবা মূল প্রকার (categories) সম্মিলিক ভাবে একটি সুশৃঙ্খল ঐক্যের সৃষ্টি করে। ইহাই প্রজ্ঞার ঐক্য। যে দ্বন্দ্বমূলক প্রণালী দর্শনের প্রণালী, তাহা প্রজ্ঞারই নিজস্ব ক্রিয়া পদ্ধতি। বিশুদ্ধ ধারণাগুলিকে যে আমরা আমাদের বৈয়ক্তিক (individual) সুবিধা অনুযায়ী পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ করি, তাহা নহে। কিন্তু উহারা স্বতঃই দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া একটি সুশৃঙ্খল সমুদায় (system) নির্মাণ করে। এই সকল ধারণা পরস্পর হইতে যে সুশৃঙ্খল ধাবায বিবর্তিত হয়, এবং যে-ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ থাকে, তাহা হেগেলের "তর্ক বিজ্ঞান" (Science of Logic) নামক গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে, এই বিচার-সোপানের কয়েকটি প্রধান প্রধান ধাপের ধারণাগুলিকে আলোচনা করিয়া হেগেল বস্তুতঃ কিভাবে এই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ করিব।

তর্কবিজ্ঞান—হেগেলের মতে, মূল প্রকারগুলি (Categories) শুধু অনুভবে প্রযোজ্য চিন্তার প্রকার নহে। উহারা সত্তারও ধর্ম। উহারা সত্তা অথবা পরম তত্ত্বের লক্ষণ। যেহেতু এই সকল লক্ষণ শুধু আমাদের মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা জনিত (due to subjective acts) নহে, কিন্তু পরমতত্ত্বেরই স্বরূপ দ্বারা নিরূপিত, অতএব উহাদিগকে পরমতত্ত্বেব স্বগত লক্ষণ (self definition) বলা যাইতে পারে। হেগেলের মতে, যে তর্ক-বিজ্ঞানে উহাদের আলোচনা হয়, তাহা ঈশ্বরকেই তাঁহার শাশ্বতরূপে প্রকাশ করে। ইহার অর্থ এই যে তর্ক-বিজ্ঞানে আলোচিত ধারণাগুলি সর্বচিন্তা ও সত্তার অধিষ্ঠান।

সত্তা, অ-সত্তা এবং **ঘটন** (Being, Nothig, Becoming)।—পরমতত্ত্বের আদ্য মূলপ্রকার অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিমূর্ত লক্ষণ হইতেছে সত্তা। পরমতত্ত্বের ন্যূনতম বর্ণনা হইতেছে এই যে, উহা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেহেতু এই বর্ণনায় বলা হয় যে, পরমতত্ত্ব শুধু আছে, ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু নহে, এবং উহার কোন নির্দিষ্ট স্বভাব নাই, অতএব এই বর্ণনায় বলা হয় যে, পরমতত্ত্ব কিছুই নহে। এইভাবে, হেগেলের তর্ক-বিজ্ঞানে আমরা সর্বপ্রথমে সত্তা ও অ-সত্তা এই পরস্পরবিরোধী ধারণাযুগল

দেখিতে পাই। আমরা যখন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উল্লেখ না করিয়া শুধু আছে, এইরূপ বলি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্তার অভাবই বলি। আমরা যখন কোন কিছু সম্বন্ধে, শুধু আছে, এইরূপ ভাবি, তখন আমরা বিশেষভাবে কোন বস্তুকে ভাবিনা, অর্থাৎ তখন আমরা কোন কিছুকেই ভাবিনা, অথবা অ-সত্তাকেই ভাবি। এইভাবে, বুঝিতে পারা যায় যে, বিশুদ্ধ চিন্তারূপে সত্তা ও অ-সত্তা সমার্থক।

অবশ্য, অ-সত্তা বলিতে আমরা সেই পূর্ণ শূন্যকে বুঝিনা, যাহাতে সর্ব সত্তা বাধিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিধেয়ের বিধানই অসম্ভব। কিন্তু প্রথমে যাহা সত্তা নামে কথিত হয়, তাহাই পরে অ-সত্তা বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে এক প্রকার বিরোধ থাকে বটে, তথাপি এখানে একের দ্বারা অন্যের বাধ হয় না।

ঘটন নামক প্রকারে এই বিরোধ দূরীভূত হয়। ঘটনে সত্তা ও অ-সত্তার ধারণ সম্মিলিত হয়। যখন কোন বস্তু ঘটে, তখন উহা সত্তা হইতে অ-সত্তায় এবং অ-সত্তা হইতে সত্তায় রূপান্তরিত হয়। সত্তা ও অ-সত্তা এই ঘটনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অথবা বিমূর্ত রূপ; তাই উহাদের অপেক্ষা ঘটন অধিক পূর্ণ ধারণা। প্রকৃত পক্ষে, ঘটন হইতেছে পরমতত্ত্বের আদ্য অখণ্ড রূপভেদ।

(যেহেতু ঘটন বিশুদ্ধ চিন্তার একটি মূল প্রকার, তাই উহাকে পরিবর্তন বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না। পরিবর্তনের সহিত কাল জড়িত থাকে। কাল আবার প্রকৃতির একটি রূপ। উহা চিন্তার মূল প্রকার নহে। "যদি আমরা পরমতত্ত্বকে এমন এক পদার্থ বলিয়া ভাবি, যাহা সসীম পদার্থ সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের অন্তহীন ধারার মধ্য দিয়া এবং উক্ত ধারারূপে নিজের সহিত অভেদ অক্ষুণ্ণ রাখে, এবং তাহার পর যদি আমরা এই অংশতঃ ঐন্দ্রিয়িক ধারণা হইতে সর্বকাল সম্বন্ধ ও বিশিষ্ট বিষয়বস্তু দূর করিয়া দেই, তাহা হইলে বিশুদ্ধ চিন্তার যে-অবশেষটুকু থাকিয়া যাইবে, উহাই হইবে মোটামুটি ভাবে পরমতত্ত্বের স্বনিরূপণ-রূপে "ভবন" বলিতে হেগেল যাহা বুঝেন।")(মিউর : Mure)।

ভবন হইতেছে, চঞ্চলভাবে অস্তিত্বে আগমন এবং তাহা হইতে নির্গমণ। ইহা হইতে আমরা তর্কবিজ্ঞানের পরবর্তী ধাপে "নিরূপিত অথবা নির্দিষ্ট সত্তার" ধারণায় উপনীত হই। নির্দিষ্ট সত্তার অর্থ সবিশেষ সত্তা। এখানে আমরা গুণের ধারণাকেই পাই—গুণের সহিত পরিচ্ছন্নতা ও সান্তত্ব (limit and finitude) জড়িত। আমরা জানি যে, কোন বস্তু উহার গুণবশতঃ নিজের সহিত অভিন্ন ও অন্যবস্তু হইতে ভিন্ন হয়। সুতরাং গুণ দ্বারা বস্তু পরিচ্ছিন্ন ও তজ্জন্য সান্ত হয়।

সান্ত, কৃত্রিম-অনন্ত ও অনন্ত ঃ—যখন আমরা কোন কিছুকে সান্ত বলিয়া মনে করি, তখন উহাকে অন্য দ্বারা সীমিত বলিয়া ভাবি। কিন্তু এই অন্যপদার্থটিও "একটা কিছু", আবার এই "একটা কিছু" হইতে প্রথম বস্তুটিও "অন্য"। এইভাবে "একটা কিছু" প্রথমে "অন্য" হইয়া যায় এবং এই "অন্য"টিও নিজে "একটা-কিছু", এবং উহাও প্রথমটির ন্যায় "অন্য" হইয়া যায় এবং এই ধারা অন্তহীন ভাবে চলিতে থাকে। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অনন্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল বিরামহীনতা মাত্র, এবং হেগেল যাহাকে কৃত্রিম অনন্ত বলেন, এখানে আমরা তাহার ধারণাটিকে প্রাপ্ত হই।

এই স্থলে, একটি বিরোধ দেখা যায়। সান্ত একটা-কিছুকে উহা হইতে অন্য কিছু দ্বারা নিরূপণ করার কথা ছিল, কিন্তু এই অন্য-কিছু একটি বিরামহীন ধারার মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া, উক্ত নিরূপণ-ক্রিয়া কখনও সম্পাদিত হইতে পারেনা। সান্তবস্তু উহার অন্যদ্বারা নিরূপিত হয়-ও বটে, আবার নিরূপিত হইতেও পারে না। এই বিরোধ প্রকৃত অনন্তের ধারণায় দূরীভূত হয়। এক পদার্থ অন্য পদার্থ দ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু অন্য পদার্থটিও একটা কিছু। সুতরাং একটা কিছু উহার নিজের দ্বারাই নিরূপিত হয়। এই স্ব-নিরূপণের অর্থাৎ স্বাধীনতার ধারণাই অনন্তের প্রকৃত ধারণা। ইহার জন্য আমাদিগকে উহার বহিঃস্থ কোন কিছুব অপেক্ষা রাখিতে হয় না।

হেগেলের তর্কবিজ্ঞানে যে বহু সংখ্যক মূল ধারণা আলোচিত হইয়াছে, উহাদের সকলগুলির উপর দৃষ্টিপাত করা এবং তাহারা পরস্পর হইতে কি ভাবে নির্গমিত হয়, তাহা প্রদর্শন করা বর্তমান স্থলে সম্ভবপব নহে। দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া কি ভাবে অগ্রসর হয়, এবং উহাব উদ্দিষ্ট বিষয়টি কিরূপ, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিযাছি। এখানে, আমবা সর্বান্ত্য মূল-ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। এক অর্থে, এই ধাবণাটি সমগ্র তর্ক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার, উহা পরমতত্ত্বের পূর্ণ লক্ষণ। হেগেল্ ইহাকে "নিরপেক্ষ ধারণা" (the Absolute Idea) এই নাম দিয়াছেন।

নিরপেক্ষ ধারণা ঃ—দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার স্বরূপ হইতে আমরা জানি যে, পূর্ববর্তী ধারণাগুলি উহাদের পরবর্তী ধারণার অর্থের মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং নিরপেক্ষ ধারণার অর্থ সম্যক্-ভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে তৎপূর্ববর্তী সর্ব-ধারণার সাহায্য লইতে হইবে। এখানে তাহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এইরূপ সাহায্য না লইযাও, "নিরপেক্ষ ধারণার" ধারণাটিকে মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা সম্ভবপর।

তর্কবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে (সত্তা-তত্ত্বে—The Theory of Being) অপেক্ষাকৃত বেশী অমিশ্র (simple) ধারণা সকল আলোচিত হইয়াছে। এইগুলি স্পষ্টতঃ অন্যধারণার কোন অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজ নিজ স্বরূপেই বোধগম্য। ইহারা ঐক্য নামে অভিহিত হইতে পারে, এবং ইহাদিগকে অপরোক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই সকল ধারণার উদাহরণ হইতেছে সত্তা, গুণ, পরিমাণ প্রভৃতি। অবশ্য, ইহারাও উহাদের বহিঃস্থ ধারণার অপেক্ষা রাখে; কিন্তু এই সাপেক্ষতা স্পষ্ট নহে, দ্বিতীয় বিভাগে (স্বরূপ-তত্ত্বে—The Theory of Essence) ধারণাগুলি যুগলরূপে উপস্থিত হয়; তাই নিজের বিপরীত ধারণার অপেক্ষা না রাখিয়া, শুধু নিজস্বরূপে উহারা বোধগম্য নহে। ইহাদিগকে "ভেদ" বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে এবং পরোক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহাদের উদাহরণ হইতেছে "অন্তর এবং বাহ্য," "আকার এবং উপাদান" (Form and Content), "দ্রব্য এবং ধর্ম" (Substance and Accident) প্রভৃতি। সর্বশেষ বিভাগের (ধারণা-তত্ত্বের The Theory of Concept) ধারণাগুলি একদিকে যেমন ভেদ, অপরদিকে তেমনই ঐক্য। উহারা ভেদের মধ্যে অভেদের প্রতিরূপ, এবং উহাদিগকে একই সঙ্গে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখানে আমরা ধারণার ধারণা হইতেই আমাদের বিবৃতি আরম্ভ করিব। ধারণাশব্দ সার্বিকতার (Universality) দ্যোতক এবং ইহার বিপরীত পদার্থটি হইতেছে ব্যষ্টিত্ব (particularity)। কিন্তু আমাদের চিন্তার বাস্তব অখণ্ড রূপে, আমরা কখন-ও ব্যষ্টি হইতে পৃথক ভাবে কিম্বা বিরুদ্ধ রূপে সামান্যকে পাই না। ব্যষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষীকৃত অথবা বিশেষিত সামান্য হইতেছে "ব্যক্তি" (individual), এবং ইহাই অখণ্ড সামান্য (concrete universal)। সামান্য ও বিশেষ পৃথক পৃথক ভাবে পরস্পরের বিরোধী, কিন্তু অখণ্ড সামান্য হইতেছে উহাদের ঐক্য। যেহেতু "নিরপেক্ষ ধারণা" হইতেছে ধারণা তত্ত্বের সর্বশেষ ধারণা, তাই উহাও অখণ্ড সামান্যের এই বৈশিষ্টটুকু প্রকাশ করে, অর্থাৎ উহা একাধারে ভেদ ও অভেদ দুইই; এবং বিষয়িতা ও বিষয়তার একটি সমতোল (balanced) সমন্বয়।

এই ধারণাটিকে উহার পূর্ববর্তী ধারণা দ্বয়ের সাহায্যে বিশদ করিলেই সর্বাপেক্ষা ভাল হইবে। এই সকল ধারণা জ্ঞান (Erkellen) নামক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীকে "প্রকৃত অর্থে জ্ঞান" ও "সঙ্কল্প" এই দুইটি বিশেষ প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে। "প্রকৃত অর্থে জ্ঞান" ও "সঙ্কল্প" কে অন্য ভাষায় জ্ঞানীয় ধারণা ও ক্রিয়াত্মক ধারণা অথবা সত্যের ধারণা ও কল্যাণের ধারণা, এইরূপ-ও বলা হইয়া

থাকে। জ্ঞানে বিষয়ী ও বিষয় শুধু পরস্পরের বিরোধিতা করে, তাহা নহে, অধিকন্তু উহারা, পরস্পরের সহিত একতা ও সুসামঞ্জস্যের সূত্রে-ও সম্বদ্ধ হয়। উহাদের মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে, যাহা উহাদের ভেদকে বিলোপ করিয়া দেয় না। এইরূপ ব্যাপক অর্থ-দ্যোতক জ্ঞান শব্দটিকে উহার অন্তর্গত "প্রকৃত অর্থে জ্ঞান" হইতে পৃথক করা উচিত।

প্রকৃতার্থক জ্ঞানে, বিষয়ী বিষয়ের দ্বারা নিরূপিত হয়। অপূর্ণ অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানের স্থলে, আমরা বিষয়ীকে দোষ দেই বিষয়কে নহে। বিষয়ী নিজেকে বিষয়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবে, এই প্রকার এক-পক্ষপাতিত্ব এই ধারণার একটি দোষও আছে। এইরূপ জ্ঞানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, বিষয় হইতেছে জ্ঞাতার নিকট প্রদত্ত (given) অথবা জ্ঞাতাকর্তৃক শুধু আবিষ্কৃত পদার্থ। ইহার মধ্যে কোন যৌক্তিক অনিবার্যতা নাই। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাব জন্য, বিষয়ে এই যৌক্তিক অনিবার্যতা থাকা প্রয়োজনীয়। কান্টের ন্যায়, হেগেলও বলেন যে, এই অনিবার্যতা বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহা বিষযী হইতে আসিতে বাধ্য। সুতরাং যদি বিষয়ে কোন অনিবার্যতা থাকে, তাহা হইলে উহা নিশ্চযই বিষয়ীর দ্বারা উৎপন্ন হয। অর্থাৎ বিষয়ীদ্বারাই বিষয়কে নিরূপণ করিতে হইবে। এই স্থলে, আমরা সঙ্কল্প অথবা ক্রিয়াত্মক ধারণার সাক্ষাৎ পাই। এই ধারণা অনুসারে, বিষয়ী নিজের ও বিষয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ঘটায়। কিন্তু প্রকৃতার্থক জ্ঞানের স্থলে যেমন বিষয়ী নিজেকে বিষয়ের সহিত খাপ খাওযাইয়া এই সামঞ্জস্য উৎপন্ন করে, এখানে তেমন ভাবে কবে না। কিন্তু এখানে বিষয়কে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে বিষয়ীকে গড়িয়া লইতে হয। বিচারের এই ধাপে, আমরা কল্যাণের ধারণাকে পাই। কল্যাণের অর্থ হইতেছে বিষয়ীগত ধারণার সহিত বিষয়েব সামঞ্জস্য।

(প্রকৃতার্থক জ্ঞানে যে অনিবার্যতা পাওয়া যায় নাই), এখানে আমরা (সেই) অনিবার্যতাকে-ও লাভ করি। কারণ এখানে বিষয়কে শুধু আকস্মিক ভাবে পাওয়া হয়, এমন নহে, কিন্তু বিষয়ী উহাকে অনিবার্যভাবে চাহে বলিয়াই উহাকে পাওয়া যায়। তথাপি এখানে বিষয়ীদ্বারা বিষয় নিরূপিত হয় বলিয়া একটি পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকে। ইহার অপর দোষ এই যে, এই স্থলে কর্মদ্বারা যে আদর্শটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে এক অর্থে অবাস্তব বলিয়া ভাবা হয়। যখন আদর্শ অথবা বিষয়ীগত ধর্ম-ও সত্য বলিয়া উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ যখন সঙ্কল্প ও জ্ঞানীয় চেতনা এবং সত্য ও মঙ্গল পরস্পর হইতে অভিন্ন বলিয়া

পরিগণিত হয়, তখন এই দোষ দূরীভূত হয়, এবং এই সংশোধন-কার্য নিরপেক্ষ ধারণার দ্বারা সংসাধিত হয়।

কাণ্টের মতে, যেমন প্রজ্ঞার ধারণা (Idea) হইতেছে জ্ঞানের সুব্যবস্থা সম্পাদক (regulative) ধারণামাত্র, কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত বিষয় নহে, হেগেলের মতে, সেইরূপ নহে; এবং ফিশ্‌টের মতে যেমন উহা শুধু একটি আদর্শ মাত্র এবং সেইজন্য কিছু অবাস্তব, হেগেলের মতে সেইরূপ-ও নহে। কিন্তু তাহার মতে, প্রজ্ঞার ধারণা হইতেছে সম্পূর্ণ সৎ; এবং প্রকৃত পক্ষে, সদ্বস্তুকে যখন প্রজ্ঞার ধারণা দ্বারা বুঝা হয়, শুধু তখনই উহা পূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়। আমরা যখন বিশ্বকে সমগ্ররূপে ধারনা করি, তখন এই কথা না ভাবিয়া পারিনা যে, এই বিশ্বে যে আদর্শ নিজেকে বাস্তব করিযাছে, তাহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থে সত্তাবান। সে যাহা হউক, নিরপেক্ষ ধারণার মধ্যে সত্য ও মঙ্গলের থারণা একীভূত হয়—উহাতে বিষয়ী ও বিষয় শুধু যে পরস্পরের সহিত সমতোল ও সমঞ্জস ভাবে সম্মিলিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়। এখানে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে, বস্তু ও আদর্শের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। ইহা হইতেছে এমন এক চিন্তা যাহা নিজেকেই চিন্তা করে, স্বভিন্ন অন্য কিছুকে নহে। এরিষ্টটল্‌কে অনুসরণ করিয়া হেগেল্‌ এই নিরপেক্ষ ধারণাকে প্রজ্ঞা (hoesis-noesews) নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্লেটোর ভাষায়, ইহাকে সম্ভবতঃ **ধারণাসমূহের ধারণা** বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা হইতেছে সর্বধারণার এমন এক সম্মিলিতরূপ যাহা নিজেই নিজের বিষয়।

নিরপেক্ষ ধারণার অন্তঃস্থ বিষয়বস্তু (content) হইতেছে শৃঙ্খলবদ্ধ সম্পূর্ণ তর্ক বিজ্ঞান, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ারদ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ধারণা সমূহের সুশৃঙ্খল সমুদায়। নিরপেক্ষ ধারণার আকারটি হইতেছে ঐ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিই; আবার ঐ দ্বন্দ্বমূল পদ্ধতি হইতেছে এই সকল ধারণার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

নিরপেক্ষ ধারণা সত্য সত্যই অনন্ত; কারণ, উহা সম্পূর্ণ-ভাবে স্বনিরূপিত। এইভাবে উহা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-ও বটে।

তর্কবিজ্ঞানের অবসান নিরপেক্ষ ধারণায়। যেহেতু উহার মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি অথবা অসামঞ্জস্য নাই, সুতরাং উহার পূর্ববর্তী ধারণাগুলি যেমন অনিবার্য ভাবে নিরপেক্ষ ধারণাতে আসিয়া পৌঁছায়, তেমনভাবে নিরপেক্ষ ধারণার মধ্যে স্ববহির্ভূত কোন উচ্চ ধারণার দিকে যাওয়ার প্রবণতা থাকেনা। বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্যে, আমাদের প্রাপ্তির যোগ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছুই নাই। নিরপেক্ষ

ধারণা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্ব-রূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া (self-estrangement) নিজের অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃতি হইতে আবার আত্মা বা চেতনবস্তুরূপে নিজের মধ্যেই ফিরিয়া আসা। এখানে আমরা তর্কবিজ্ঞান হইতে প্রকৃতির দর্শনে উপনীত হইলাম।

প্রকৃতির দর্শন :—নিরপেক্ষ ধারণা হইতে প্রকৃতিতে কি করিয়া আসা যায়, তাহার ব্যাখ্যা কিছু অস্পষ্ট। আমরা জানি যে, শুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বন্দ্বমূলক গতি ইহার পূর্বেই নিরপেক্ষ ধারণাতে সমাপ্ত হয়। এই গতির প্রত্যেক স্তরে, উহা যেন একটি বৃত্ত অঙ্কন করে। উহা কোন এক ধারণা হইতে বাহির হইয়া, উহার বিরুদ্ধ ধারণায় গমন করে, এবং পরিশেষে প্রথম ধারণাতেই ফিরিয়া আসে। এই বহির্গমন ও প্রত্যাগমন দ্বারা মূল ধারণাটি গভীরতর হয়। এই গতির বিভিন্ন স্তরে, উহার এবং উহাদ্বারা অঙ্কিত বৃত্তের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়। মনে হয় যে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বন্দ্বমূলক গতি সমাপ্ত হওয়ার পর, কিছু অন্যরকমের দ্বন্দ্বমূলক গতি আরম্ভ হয়। এই গতির উদ্গম স্থল হইতেছে সমগ্ররূপ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা—এই সমগ্র বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা তদ্বিপরীত প্রকৃতিতে গমন করে, এবং পরে আত্মা বা চৈতন্যরূপে নিজের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। এই আত্মা উক্ত গতির গভীরতর ও সর্বশেষ বিরামস্থল।

সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট যে, হেগেলের মতে, প্রকৃতি হইতেছে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অন্য অথবা বিপরীত। প্রকৃতি হইতেছে অন্যতা-রূপে ধারণা (the idea in the form of othernes)। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা যে সকল ধর্মদ্বারা বিশেষিত, প্রকৃতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মদ্বারা বিশেষিত। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় আমরা বিশুদ্ধ সামান্যগুলিকে পাই। কিন্তু প্রকৃতিতে কেবল বিশিষ্টরূপ সকলই পাওয়া যায়। তর্কবিজ্ঞানের শুদ্ধ চিন্তাগুলি এক অর্থে বিমূর্ত এবং উহারা বাহির হইতে প্রদত্ত বস্তু অথবা অপরোক্ষতার সাক্ষাৎ পাই। তর্কবিজ্ঞানে সর্ববিরোধের অবসান ঘটে; কিন্তু প্রকৃতি হইতেছে এমন সকল বিরোধের রাজ্য, যাহার সমাধান হয় নাই; কারণ বহিঃস্থতার আকারে ধারণা নিজের সহিতই নিজে অসমঞ্জস। তাই প্রকৃতির রাজ্যে আমাদিগকে আকস্মিক ও অযৌক্তিক পদার্থ লইয়া কারবার করিতে হয়। প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট বস্তুকেই ধারণার সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে নিরূপণ অথবা নিগমন করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ক্রুগ্ যখন হেগেলকে প্রশ্ন করিলেন, "আমি যে-কলম দিয়া লিখিতেছি, আপনি কি তাহা যৌক্তিক পদ্ধতিতে নিগমন করিতে পারেন?" তখন তাহার এই প্রশ্ন সঙ্গত হয় নাই। বিশিষ্টতা নিগমন করা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট পদার্থগুলি নিগমন করা অসম্ভব। হেগেল

ইহার জন্ত প্রকৃতির অক্ষমতাকেই দায়ী করিয়াছেন,—মনে হয় যেন প্রকৃতিতে প্রজ্ঞা নিদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া পরে আত্মার আকারে জাগ্রত হয়। প্রকৃতি যেন উদ্‌ভ্রান্ত প্রজ্ঞা। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তই হউক অথবা নিদ্রাগ্রস্তই হউক. প্রকৃতিতে প্রজ্ঞা একেবারেই নাই, এইরূপ বলা চলে না। বস্তুতঃ, হেগেল তাহার প্রকৃতিদর্শনে, প্রকৃতি কি করিয়া উহার বিভিন্নস্তরে আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা কি করিয়া নিজের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির বিভিন্নস্তরগুলির উৎপত্তিক্রম বর্ণনা করেন নাই। বরং, যে সকল বিভিন্ন ধারণা দ্বারা আমরা প্রকৃতিকে বুঝি, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই তাহার উদ্দেশ্য। যে-সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই সকল ধারণাকে পূর্বেই প্রয়োগ ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিল, তিনি তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই এই কার্য সম্পাদন করেন।

এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের মূল ধারণা সকলের ব্যাখ্যা দেওয়া নিশ্চয়ই একটি বিশাল ও দুষ্কর কর্ম; সুতরাং হেগেল যে এই ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। অন্ততঃ আজকাল, তাহার এই গ্রন্থের তেমন কিছুই মূল্য নাই। ইহার কারণ শুধু এই নহে যে, এই সকল ধারণার মধ্যে অনেকগুলিই এখন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, উপরন্তু হেগেলের দিনেও তিনি ইহাদিগকে যেভাবে যৌক্তিক পদ্ধতির দ্বারা নিগমন করিয়াছিলেন, বহুক্ষেত্রে তাহা তৎকালীন লোকের নিকটও অগভীর, যুক্তিহীন, এমন কি কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হইয়াছিল। (উদাহরণস্বরূপ, হেগেল বলিয়াছেন: বিন্দু হইতেছে দেশের নিষেধ, কিন্তু এই নিষেধ স্বরূপতঃ দৈশিক; এবং এইজন্য উহা রেখা হইয়া যায়, আর, এই নিষেধের নিষেধই হইতেছে তল বা ক্ষেত্র।—ক্রোচে, "হেগেলের দর্শনে মৃত কি এবং জীবন্ত কি?" What is Dead & What is Living of the Philosophy of Hegel? পৃঃ ১৮৬)।

কিন্তু প্রকৃতি-দর্শনে হেগেল ঠিক কি করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তাহার সমগ্রদর্শনে উহার স্থান কি, ইহা বুঝা ভাল। ইহার স্থান তর্ক বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-দর্শন এই দুই এর মধ্যস্থলে; এবং ইহা তাহাদের সংযোগ সূত্র। প্রকৃতি দর্শনের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অধ্যাত্ম দর্শনে যাইতে হয়। প্রথমটিতে হেগেল নিম্নলিখিত তিনটি বিজ্ঞানবর্গের সাহায্যে প্রকৃতিকে গভীরভাবে বুঝিতে চাহিয়াছেন: (১) যন্ত্র-সম্বন্ধীয়—জ্যামিতি ও যন্ত্রবিদ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত, (২) জড় সম্বন্ধীয় এবং (৩) জৈব-সম্বন্ধীয়—ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্ব ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি

কিভাবে সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত, অন্যাসম্বন্ধ ও উদাসীন অবস্থা হইতে ক্রমশঃ ঐক্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সর্বশেষে মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা লাভ করে, হেগেল তাহা দেখাইয়াছেন।

প্রকৃতি বিষয়ক যে-সকল ধারণা আছে, তাহাদের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা বিমূর্ত ও সার্বিক, সেই ধারণা হইতে হেগেল তাহার প্রকৃতি দর্শনের বিচার আরম্ভ করেন। তিনি এই ধারণাটিকে "বহিঃস্থতার আকার" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তর্ক বিজ্ঞানের ধারণাগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে অন্তঃস্থতা—এখানে এক ধারণা অপর ধারণার সহিত জড়িত থাকে, সুতরাং একে অপরের অন্তঃস্থ; কিন্তু প্রকৃতিতে ব্যষ্টি পদার্থ সকল পরস্পরের পাশাপাশি অথবা বাহিরে থাকে।

দেশ হইতেছে বহিঃস্থতারই নিজস্ব আকার। ইহাতে বিন্দু সকল পরস্পরের বাহিরে থাকে বলিয়া ধারণা করা হয়। কাণ্টের দর্শনে যেমন দেশ হইতেছে সাক্ষাৎ সংবেদনের আকার, হেগেলের মতে তাহা নহে। তিনি মনে করেন যে, ইহা হইতেছে একটি বিমূর্ত ধারণা, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধ অস্তিত্ব ও বহিঃস্থতারই বিমূর্তন। অনুরূপভাবে, কাল-ও একটি বিমূর্ত মানসিক পদার্থ। ইহাকে স্ব-বহিঃস্থতার নিষেধাত্মক ঐক্য-(Aussersichsein) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা এমন এক সত্তা, যাহা বিদ্যমান থাকা কালেও নাই; আবার যখন উহা নাই, তখনও উহা আছে; ইহাই সাক্ষাৎ উপলব্ধ ঘটন (intuited becoming)। যেমন দেশকে, তেমন কালকে-ও সর্ব বস্তুর আধাররূপে ধারণা করা সঙ্গত হইবে না। কাল হইতেছে শুধু তিরোধানের (Verzehren) বিমূর্ত আকার।

গতির ধারণা দেশ ও কালের একীকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ, গতিতে দেশ ও কাল উহাদের বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। গতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ গতিমান পদার্থ হইতেছে জড়বস্তু। জড়বস্তু উহার মাধ্যাকর্ষণে ঐক্য ও অন্তঃস্থতার দিকে একটি প্রবণতা প্রদর্শন করে; পদার্থ বিদ্যায় আলোচিত মূর্ত ব্যষ্টি দ্রব্যে এই প্রবণতা আরও বর্ধিত হয়। উদ্ভিদ্ ও জৈব অবয়বীতে আমরা অধিক সুসঙ্গতি ও ব্যক্তিত্বে উপনীত হই; এবং সর্বশেষে প্রকৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শন যে মানুষ, তাহার মধ্যে প্রকৃতির আত্মার রূপান্তর লক্ষিত হয়।

হেগেলের দর্শনের এই অংশে শেলিং এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

অধ্যাত্মদর্শন :—তর্কবিজ্ঞান হেগেলীয় দর্শনের ভিত্তি, আর অধ্যাত্মদর্শন উহার চূড়া। হেগেল তাহার অধ্যাত্মদর্শনে আমাদিগকে শুধু যে আত্ম-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান ও কৃষ্টি বিষয়ক একটি ব্যাপক দর্শন দিয়াছেন, তাহা নহে, অধিকন্তু উহাতে তিনি

অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানেরও (Geistes-wissenschaften) ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

তর্কবিজ্ঞান ও প্রকৃতিদর্শন, উভয়েরই সমাপ্তি অধ্যাত্মদর্শনে। তর্ক বৈজ্ঞানিক ধারণা ও বাহ্য প্রকৃতি, এই দুইটিই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ব নিয়ামক (presupposition), এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যেই ধারণা উহার বাস্তবতাকে প্রাপ্ত হয়, ও প্রকৃতি উহার সত্যতাকে প্রাপ্ত হয়। নিরপেক্ষ ধারণা অবশ্যই পরমতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা পর্যাপ্ত লক্ষণ, তথাপি উহা বিমূর্ত। বস্তুতঃ পরমতত্ত্ব হইতেছে আত্মা, এবং হেগেলীয় দর্শনের শেষকথা। পরমতত্ত্ব নিরপেক্ষ ধারণা নহে, কিন্তু উহা হইতেছে পরম আত্মা।

যে-সকল বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মা তাহার স্বনির্মিত অন্যতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া, নিজের প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি করে ও পরমতত্ত্বরূপে পরিণত হয়, অধ্যাত্মদর্শনে তাহাদের সম্বন্ধে যত্ন সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার যে, শুধু কতকগুলি ধারণা এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়াই এই দর্শনের কারবার। এখানে বিকাশের কথা বলিলে, তাহা তর্কশাস্ত্রীয় অথবা ধারণা সম্বন্ধীয় অর্থেই বুঝিতে হইবে, ঐতিহাসিক অর্থে নহে।

বিমূর্ত সংক্ষিপ্ত আকারে অধ্যাত্ম দর্শনের অর্থ সমৃদ্ধ বিবিধ ভাব সমূহের পর্যাপ্ত ধারণা দেওয়া সম্ভবপর নহে। হেগেল যে-সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাদের সম্বন্ধে শুধু একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়ারই চেষ্টা করিব।

আত্মাকে তিনটি ভিন্নরূপে আলোচনা করা হইয়াছে: বিষয়ি-সাপেক্ষ, বিষয়-সাপেক্ষ এবং অনন্য-সাপেক্ষ।

বিষয়ি সাপেক্ষ আত্মা:— বিষয়ি সাপেক্ষ আত্মা বা চৈতন্যকে নৃবিজ্ঞান (anthropology), দৃশ্য-বিজ্ঞান (phenomenology) ও মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হইয়াছে। হেগেল এই শব্দগুলিকে, বিশেষতঃ প্রথম ও শেষ শব্দটিকে উহাদের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন নাই। নৃ-বিজ্ঞানে আত্মার সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক স্তরের অবস্থা সকল বিবেচিত হইয়াছে, এবং তখন আত্মাকে জীবাত্মা (soul) নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতিতে আত্মা সুপ্ত; এবং এখানে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কি করিয়া, চৈতন্য উহার এই সুপ্ত অবস্থা হইতে চৈতন্য জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রথম স্তরে, চৈতন্য এখনও প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠে নাই, এইরূপ বলিলেই চলে। কার্যতঃ, উহা তখন প্রকৃতির সহিত প্রায় অভিন্ন। তখন উহার নাম নৈসর্গিক জীবাত্মা (Natural soul)। এই নৈসর্গিক আত্মাও জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব-রহিত এক প্রকার উৎপাদোন্মুখ মন। ইন্দ্রিয়-সংবেদনে এই প্রাকৃতিক আত্মা কিছু উচ্চস্তরে

উঠে ; এবং সুখ দুঃখের বেদনায়, উহা আরও উপরে উত্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-সংবেদন অথবা সুখ দুঃখের বেদনা, ইহাদের কোনটিকেই প্রকৃত অর্থে চেতন বলা যায় না। অবশ্য, উহাদের মধ্যে বিষয়িতা ও ব্যক্তিত্বের দিকে একটি ধীর অগ্রগতি লক্ষিত হয়। এই আত্মা যখন চৈতন্যের স্তরে উঠে, তখন উহা দৃশ্য-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়।

বিজ্ঞানে যে-আত্মা একটি অমিশ্র ঐক্য অথবা অপরোক্ষত্বের আকারে বিদ্যমান ছিল, তাহাই দৃশ্য বিজ্ঞানে জ্ঞান ও বিষয়রূপে ভিন্ন হইয়া যায়। এই আত্মা বা চৈতন্যকে তিনটি প্রধান ধাপে আলোচনা করা হয়।

প্রথমে শুধু বিষয়গত চৈতন্যই বিদ্যমান থাকে। ইহা ঐন্দ্রিয়িক নিশ্চয় হইতে ক্রমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও (বৈজ্ঞানিক) বোধের স্তরে উন্নীত হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, আমরা চেতন অহম্ রূপজ্ঞাতার সম্মুখে একটি বিষয়কে দেখিতে পাইব। দ্বিতীয় স্তরে আছে স্ব-সংবেদন। এই স্ব-সংবেদন ইচ্ছার আকারে থাকুক, অথবা অহম্-বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞার আকারে (অর্থাৎ স্বসদৃশ অন্যান্য অহম্ এর জ্ঞানের আকারে) থাকুক, উহাতে সর্বদাই কোন বিষয়কে বিষয়ীর সহিত আত্মসাৎ ও একরূপ করিয়া লওয়া হয়। তৃতীয় স্তরে আছে প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাতে সংবেদন ও স্ব-সংবেদনের মিলন হয়। প্রজ্ঞার নিকট বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্ন-ও বটে। বিষয় যখন বিষয়ীর অতিরিক্ত কিছু নহে বলিয়া জ্ঞাত হয়, যখন উহার বহিঃস্থতা দূরীভূত হয়, তখন আমরা সাধারণ অর্থে যাহাকে চৈতন্য বলে, তাহার স্তরে উপনীত হই। ইহা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চৈতন্য বা আত্মা বিষয়কে ছাড়িয়া থাকে না বটে, তথাপি এখানে বিষয়কে বিষয়ীর নিজস্ব বলিয়া, অর্থাৎ বিষয়ীর বহিঃস্থ কিছু নয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই স্তরে, বাহ্য জগতের সহিত আমাদের আর কোন সংশ্রব থাকে না, কিন্তু শুধু চৈতন্যেরই অংশীভূত মানসিক প্রতিরূপ (representation) চিন্তা (thinking) এবং সঙ্কল্পের (willing) সহিত সম্বন্ধ থাকে। প্রথম অবস্থায়, চৈতন্য হইতেছে জ্ঞানীয় ; তখন উহা বিষয়কে শুধু **প্রাপ্ত হয়**, অথবা আবিষ্কার করে। অবশ্য, ইহাকে চৈতন্য নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে। দ্বিতীয় স্তরে, চৈতন্য হইতেছে ক্রিয়াত্মক। এখানে বিষয় চৈতন্য দ্বারা **নির্মিত** হয়। যে বিষয়ী বিষয়কে নির্মাণ অথবা গঠন করে, তাহাকে সঙ্কল্প বলে। পরিশেষে, আমরা স্বাধীন চৈতন্যের সাক্ষাৎ পাই। এই স্বাধীন চৈতন্য একই সঙ্গে জ্ঞানীয় এবং ক্রিয়াত্মক। স্বাধীন চৈতন্য যে শুধুই স্বাধীন, তাহা নহে, কিন্তু উহা নিজেকে স্বাধীন বলিয়া জানে-ও। ইহা নিজাতিরিক্ত অন্য কিছুকেই, অথবা স্বীয় স্বাধীনতাকে বাস্তব করা ব্যতীত অন্য

কিছুকেই, সঙ্কল্প করে না। স্বাধীনতাকে বাস্তব করার অর্থ হইতেছে উহাকে জ্ঞাতৃ নিরপেক্ষ বিষয়ের আকার দেওয়া ; এইভাবে, চৈতন্য নিজেকে বৈষয়িক খামখেয়াল হইতে বিমুক্ত একটি জগতের আকারে পরিণত করে। যে জগৎ স্বাধীনতার ধারণার, অর্থাৎ স্বাধীন-চৈতন্যের দেহস্বরূপ, তাহাই বিষয়রূপ চৈতন্য অথবা বিষয়-চৈতন্য।

বিষয় চৈতন্য ঃ—বিষয়চৈতন্য সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদে, তাহার অধিকার বিজ্ঞান (Philosophy of Right), নীতিবিজ্ঞান (Ethics), রাজনীতিদর্শন (Political Philosophy) ও ইতিহাস-দর্শন (Philosophy of History) অন্তর্ভুক্ত। আমরা, এখানে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যতটুকু সম্ভবপর, শুধু হেগেলের বিষয়চৈতন্যের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার, এবং সংক্ষেপে উহার অভিব্যক্তি সমূহের বিস্তার ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিব।

চৈতন্যকে বুঝিতে হইলে, প্রথমে আমাদিগকে চৈতন্য কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে। সন্দেহ নাই যে, চৈতন্যের ধারণাটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ; এবং হেগেলের সমগ্র দর্শনকেই এই ধারণার একটি ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই ইহাকে স্ব-সংবেদী বুদ্ধি ও সঙ্কল্প অর্থাৎ প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণনা করিয়া, তৎসম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দিয়াছি। ইহাকে অনন্ত, সার্বিক ও স্বাধীন বলা হয়। ইহাই প্রকৃতি ও ইতিহাসের অধিষ্ঠান, এবং ইহা তাহাদের মধ্যে, ও তাহাদের মাধ্যমে, নিজেকে বাস্তব করে। ইহা হইতেছে সেই ধারণা অথবা প্রজ্ঞা, যাহা সর্ব অস্তিত্ব ও অনুভূতির মধ্যে নিজেকে বিবর্তিত ও চরিতার্থ করে।

প্রকৃতির মধ্যে যে-যুক্তিসম্মত উপাদান আছে, কাণ্ট তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ স্বীকৃত হয় যে, কতকগুলি যুক্তির আকার দ্বারা, অর্থাৎ কতকগুলি যুক্তিসম্মত নিয়ম দ্বারা, প্রকৃতির স্বরূপ গঠিত হয়। কিন্তু আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইরূপ যুক্তিসম্মত নিয়মের অধীন বলিয়া কেহ মনে করে না। বরং অনেক সময় মনে করা হয় যে, উহারা মনুষ্য স্বভাবস্থ কতকগুলি অযুক্তি সিদ্ধ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু হেগেল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা কম যুক্ত্যধীন, অর্থাৎ যুক্তিসম্মত নিয়মের কম অধীন, নহে।

দর্শনের কার্য হইতেছে সর্ব পদার্থে যুক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা। কিন্তু দার্শনিক কখন-ও যুক্তিকে বাহির হইতে আনিয়া পদার্থের উপরে রাখেন না। সেখানে প্রথম হইতেই যুক্তি থাকে, এবং দার্শনিক তাহা শুধু আবিষ্কার করেন। প্রজ্ঞাই,

আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আকারে, দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে ; এবং এই দেহধারী প্রজ্ঞাকে বিষয়চৈতন্য বলে।

পূর্ব পরিচ্ছেদে, আমরা বিষয়িচৈতন্যের আলোচনা করিয়া, উহার স্বরূপ সম্বন্ধে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, উহা হইতেছে স্বাধীনতা অথবা স্বাধীন সঙ্কল্প। প্রকৃত সঙ্কল্প সর্বদাই স্বাধীন। পরাধীন সঙ্কল্প সঙ্কল্পই নহে। চৈতন্যের স্তরে আমরা ইতঃপূর্বেই বিষয়ী ও বিষয়ের ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং স্বাধীন চৈতন্য যাহা সঙ্কল্প করে, তাহা কোন পরকীয় বিষয় নহে, কিন্তু তাহা হইতেছে স্বাধীন ও সার্বিকরূপে স্বয়ং চৈতন্যই।

আমার স্বাধীনতা ও সার্বিকতা যে প্রাথমিক বিষয়ের আকারে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয, তাহা হইতেছে অধিকারের (right) আকার। এই ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা কিছু দুষ্কর। কারণ, মূল জার্মান রেশ্‌ট শব্দটির অর্থ বিধি বা আইন (law) ও অধিকার, (right) দুইই ; এবং এই অর্থে, ইংরেজি ভাষায় কোন একটি প্রতিশব্দ নাই। সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার অধিকার অতিক্রম না করিয়া, বিধি অনুসারে কাজ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিধি নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবস্থায, আমরা স্বাধীনতাকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। বিধি শব্দের প্রকৃত অর্থে, উহার স্বরূপ সার্বিক হইতে বাধ্য ; এবং যেহেতু চেতনরূপে আমি সার্বিক, এইজন্য বিধি পালন করিযা, আমি নিজের আদেশই পালন করি, ও নিজের স্বাধীনতাকে বাস্তব আকার দেই। কিন্তু বিধি সর্বদাই বাহ্য-পদার্থ-সাপেক্ষ। আমাব অন্তঃস্থ বিষযিগত জীবনের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। বিষয়িনিষ্ঠ সঙ্কল্পেব দৃষ্টিতে অধিকাব পদার্থটি কর্তব্যের আকার ধাবণ করে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পব সাপেক্ষ ধারণা। এইভাবে, আমরা সহজেই বিধিসম্মত অধিকারের (legal right) ক্ষেত্র হইতে নৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে উপনীত হই।

হেগেল নীতিকে বিযয়ি-সাপেক্ষ অর্থাৎ শুধু আমাদের সঙ্কল্প-সাপেক্ষ বলিযা মনে করেন।- নৈতিক হইতে হইলে, আমার পক্ষে স্বাধীন ভাবে সঙ্কল্প করা আবশ্যক, অর্থাৎ নিজেকে সার্বিক বলিযা ইচ্ছা করা দরকার। কিন্তু হেগেলের মতে, সার্বিক আত্মা আমার নিকট শুধু একটি আদর্শ রূপে প্রতিভাত হয়। নৈতিক জীবনে, আমরা কখনও আদর্শ এবং বাস্তবের ভেদ অতিক্রম করিতে পারিনা। ইহার ফলে, যাহা শুধু আদর্শ, তাহাকে বাস্তব করার জন্য, আমরা এক অন্তহীন প্রযত্ন ধারায় রত থাকিতে বাধ্য। তাহাছাড়া, আমার আত্মাব সার্বিকতা দ্বারা আমার সঙ্কল্পিতব্য পদার্থের শুধু আকার-গত স্বরূপটিই নির্ধারিত

হয়; ইহা হইতে আমরা নীতির ভাবাত্মক বিষয়-বস্তুটিকে পাইনা। এই ত্রুটি ও অসঙ্গতিবশতঃ, বিষয়সাপেক্ষ নীতিরক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে সামাজিক নীতিতে, অথবা বিষয়ি নিরপেক্ষ (Objective) নৈতিক ব্যবস্থায় (Sittlichkeit), যাইতে হয়। এখানে আমরা আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একটি ঐক্য সম্পাদন করিতে পারি, এবং আমার সার্বিকতা একটি ভাবাত্মক বিষয়বস্তু লাভ করে। পরিবার, সভ্যসমাজ ও রাষ্ট্রের আকারে এই নৈতিক ব্যবস্থা দেহ পরিগ্রহ করে।

পরিবারের মধ্যে যেটুকু সার্বিকতা মুর্ত্ত হইযাছে, পরিবারের সভ্যরূপে আমি তাহার অধীনে আসি; এবং পুত্র অথবা পিতারূপে, আমার পারিবারিক স্থান অনুযায়ী আমার কর্তব্য নির্ধারিত হয়। পরিবারের ধারণা এমন একটি নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করে, যাহা আবার বাস্তব-ও বটে। প্রতিষ্ঠানরূপে, পরিবার একটি বাস্তব পদার্থ, বিমুর্ত পদার্থ নহে। কিন্তু পরিবার সর্বদা উহার সকল সভ্যকে একটি সমঞ্জস একতার মধ্যে রাখেনা। যে সকল সভ্য এককালে অন্যের অধীন ছিল, তাহারাই পরে স্বাধীন হয়, এবং ইহাতে পরিবারে ভাঙন দেখা দেয়। পরিবারের সভ্যরূপে তত্রত্যব্যক্তিদের কোন বৈয়ক্তিক প্রয়োজন থাকেনা। তাহাদের উদ্দেশ্য পরিবারের উদ্দেশ্যের সহিত অভিন্ন। কিন্তু স্বাধীন পুরুষ রূপে তাহাদের বৈযক্তিক প্রয়োজন-ও থাকে, এবং প্রত্যেকে অন্যান্য সভ্যদিগকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে ব্যবহার করিয়া, সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। কিন্তু এইভাবে তাহারা আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। স্বাধীন ব্যক্তিদের এই পরস্পর নির্ভর-শীলতা হইতেছে সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য, এবং ইহাই সেই ব্যক্তিনিষ্ঠ নীতির (indi-vidulistic ethics) ক্ষেত্র, যেখানে আমাদের বৈয়ক্তিক স্বার্থের দাবী অন্যান্য সকল স্বার্থের দাবী অপেক্ষা অধিক। পরিবারে, সার্বিকতার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয, কিন্তু সভ্যসমাজে (Civil society), ব্যষ্টিই প্রাধান্য লাভ করে। পারি-বারিক প্রয়োজন-ব্যতীত পরিবারস্থ সভ্যদের কোন স্বকীয় প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সভ্যদের প্রয়োজন ব্যতীত সভ্যসমাজের কোন স্বকীয় প্রয়োজন নাই। যখন সার্বিকতা ও ব্যষ্টিতার এই দুইটি দিক সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন আমরা রাষ্ট্রের ধারণাকে পাই। রাষ্ট্রের প্রয়োজন নাগরিকদের প্রয়োজনের সহিত এক।

রাষ্ট্রের মধ্যে, পারিবারিক সার্বিকতার সহিত সভ্যসমাজের ব্যষ্টিতাকে সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্র হইতেছে একটি ব্যক্তি। ইহা উহার নাগরিকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উহা তাহাদের বৈয়ক্তিক স্বাধীনতাকে রোধ করে না, বরং ইহাকে

বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অবকাশ নির্মাণ করে। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা অসঙ্গত। কারণ, তাহা করিলে, আমাদের উচ্চতর ও সার্বিক আত্মারই বিরুদ্ধে যাওয়া হইবে। অবশ্য, সর্ব নাগরিকের সাধারণ কল্যাণের জন্য যে-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, সেইরূপ প্রকৃত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই, এই কথা প্রযোজ্য। রাষ্ট্র যদি শুধু কোন বিশিষ্ট শ্রেণী অথবা ব্যক্তির স্বার্থই সাধন করে, তাহা হইলে উহা আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য পাওয়ার নৈতিক দাবী করিতে পারে না। (হেগেলকৃত "অধিকার দর্শন"—Philosophy of Right—পৃঃ ১৬০-১, ২৮০, নক্সের অনুবাদ, অক্সফোর্ড দেখ)।

রাষ্ট্র হইতেছে জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ চৈতন্যের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। ইহাকে "পৃথিবীতে বিদ্যমান দিব্য ধারণা" বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। কারণ, রাষ্ট্রের জীবনেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অথবা আধ্যাত্মিকতাকে জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ আকারে (Objectively) চরিতার্থ করিতে পারি।

হেগেলের দর্শনে, এই সকল নৈতিক প্রতিষ্ঠান এমন কতকগুলি অধিবৈয়ক্তিক (Super individual) পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়, যাহাদের মধ্যে বিষয়চৈতন্যের বিভিন্ন ক্রমোন্নত স্তরগুলি বাস্তবতা লাভ করে। ইহাদিগকে "নৈতিক দ্রব্য" (Ethical substance) নামে-ও বর্ণনা করা হয়। কারণ, ইহাদের মধ্যে কোন না কোন নৈতিক আদর্শ বাস্তবতা লাভ করে।

হেগেল ব্যক্তিনিষ্ঠ নীতিমত্তা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সমাজব্যবস্থাকে উচ্চতর বলিয়া মনে করেন। ভারতবর্ষে, আধ্যাত্মিক অধিকারকে (ধর্মকে) সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থায় (বর্ণাশ্রমের মধ্যে) দেহ পরিগ্রহ করে বলিয়া মনে করা হয়। হেগেলের উক্ত ধারণা এই ভারতীয় ধারণার তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

রাষ্ট্রের ধারণাই শেষ কথা নহে। নৈতিক ধারণা শুধু কোন এক জাতির জনসাধারণের জাতীয় চেতনারূপেই বাস্তব, এবং উহাদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে এই জাতীয় চেতনা মূর্ত আকার ধারণ করে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির জাতীয় চেতনাগুলির সত্যতা শুধু মূর্ত ধারণার (concrete Idea) পূর্ণ সার্বিকতার মধ্যেই পাওয়া যায়। এই মূর্ত ধারণাকে জগৎ-চেতনা (Weltgeist) বলা যাইতে পারে। এই বিশ্ব-চৈতন্য ইতিহাসের গতিধারার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। হেগেলের মতে, ইতিহাসের গতি-প্রবাহ হইতেছে মুক্তি বা স্বাধীনতার গতিপ্রবাহ। ইহার মাধ্যমে চৈতন্য নিজস্বরূপে ফিরিয়া আসে এবং নিজের সত্যতাকে বাস্তব রূপ দেয়। এই মুক্তিই হইতেছে সর্বোচ্চ এবং পূর্ণতম অধিকার। জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ চৈতন্য বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া বিশ্বচৈতন্য হয়। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্ররূপে পরিণত

চৈতন্য সান্তভাদোষে দুষ্ট, কারণ, উহা শুধু একটি বিশিষ্ট জাতির চেতনাকেই প্রকাশ করে। এমন কি, বিশ্ব-ইতিহাস ও উহাতে অভিব্যক্ত বিশেষ বিশেষ জাতিগুলির বিশিষ্ট জাতীয় চেতনার সসীমতার দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়। সুতরাং বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে উহার উর্ধে উঠিয়া "জাগতিকত্ব (Worldiness)" বর্জন করিতে হইবে এবং শাশ্বত সত্য-স্বরূপ পূর্ণচৈতন্যের জ্ঞানে, নিজের মূর্ত সার্বিকতাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতি ও ইতিহাস হইতেছে এই শাশ্বত সত্যের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র বা উপায়।

পূর্ণচৈতন্য ঃ (The absolute spirit)—হেগেলের পূর্ণ-চৈতন্য বিষয়ক মতবাদে, তাহার সৌন্দর্যতত্ত্ব (Æsthetics), ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের ক্ষেত্র বিশাল। আমরা এখানে শুধু হেগেলের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস ও তাহার প্রধান সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারিব।

চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপে এবং উহার উচ্চতম চরিতার্থতায়, চৈতন্য নিজেই পরমতত্ত্ব। বিষয়ি-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য একদেশিতা দোষে দুষ্ট। বিষয়ি-চৈতন্য শুধুই অন্তর্মুখ যদিও ইহাতে জ্ঞানরূপ আধ্যাত্মিকতার স্ফুলিঙ্গ আছে, তথাপি ইহা এখনও বিষয়রূপ দেহে নিজেকে প্রকট করে নাই। অপরদিকে, বিষয়চৈতন্য শুধুই বহির্মুখ—উহার যে কোন ঐক্য-সম্পাদক চেতনা আছে, তাহা বলা দুষ্কর। এই সকল দোষ নিরপেক্ষ-চৈতন্যে সংশোধিত হয়। কারণ, উহা একই সঙ্গে বিষয়ি-সাপেক্ষ এবং বিষয়-সাপেক্ষ। প্রকৃতির বিভিন্নরূপে, এবং সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে, চৈতন্য স্ব-স্বরূপে ক্রমশঃ প্রত্যাগমন করিয়া, এখন নিরপেক্ষ চৈতন্যের আকারে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ ও পারমার্থিক স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে। ইহা হইতেছে সেই প্রজ্ঞা, যাহা নিজেকে পারমার্থিক ও সমগ্র সত্তারূপে জানে। কলা, ধর্ম ও দর্শনের মধ্য দিয়া, তিন স্তরে, এই জ্ঞান সম্পাদিত হয়। কলা, ধর্ম ও দর্শন হইতেছে তিনপ্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার নিদর্শন। এই তিনটিতে চৈতন্য নিজেকে, অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে, ক্রমান্বয়ে ঐন্দ্রিয়িক মনশ্চিত্র (sensuous imagery), ধারণা এবং বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে অবগত হয়। যে পরমতত্ত্বকে আমরা দর্শনে সত্য বলিয়া জ্ঞাত হই, এবং ধর্মে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি, তাহাই রসানুভূতিতে সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত হয়।

কলা ঃ—আমরা যদি মনে রাখি যে, হেগেলের কলা সৌন্দর্যতত্ত্ব তাহার নিরপেক্ষ চৈতন্য বিষয়ক দর্শনেরই একটি অংশ, তাহা হইলে, তিনি কি করিয়া পরমতত্ত্বকেই কলার প্রকৃতবিষয় বলিয়া মনে করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিব।

কলায় যে সৌন্দর্যের ধারণাকে মৌলিক মূল্য দেওয়া হয়, তাহা কোন বিমূর্ত পদার্থ নহে। নিরপেক্ষ ধারণা যখন ব্যষ্টিসত্তার আকার গ্রহণ করিয়া, উহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে অভেদাপন্ন হয়, তখন উহাকেই সৌন্দর্যের ধারণা কহে।

কলার বিষয়বস্তু হইতেছে ধারণা এবং কলায় এই ধারণা নিজেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে উপস্থাপিত করে। সেখানে এই ঐন্দ্রিয়িক রূপ (sensuous) আধ্যাত্মিক (spiritual) বলিয়া এবং আধ্যাত্মিকরূপ ঐন্দ্রিয়িক বলিয়া প্রতিভাত হয় ; আন্তর-বস্তু বাহ্যবস্তুর মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয় হয়, আর, বাহ্যবস্তু আন্তর বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কলার সৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে দেখা দেয়, কিন্তু তখন আর উহা শুধু জড়ধর্মান্বিত থাকে না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ এখানে ধারণার আকার অথবা আদর্শের আকার, গ্রহণ করে বটে, তথাপি উহা বাহ্য পদার্থেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং কলাসৃষ্টিতে প্রদর্শন (show) অথবা প্রতিভাস (appearance) লইয়াই আমাদের কারবার। কিন্তু এই প্রতিভাস প্রতারণা নহে, অথবা ব্যবহারিক জগতে পরিদৃষ্ট প্রতিভাস অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কিছু নহে। ব্যবহারিক জগতে বস্তুর স্বরূপ একটা বিশৃঙ্খল ও আকস্মিক রূপে প্রতিভাত হয় ; কিন্তু কলা এই প্রতিভাসের অন্তঃস্থ প্রকৃত স্বরূপটিকে ব্যক্ত করিয়া একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তা প্রদান করে।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করা কলার উদ্দেশ্য নহে, অথবা নৈতিক উপদেশ দেওয়াও উহার কার্য নহে। সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসাত্মক আকারের মাধ্যমে উপন্যস্ত ও অভিব্যক্ত করাই কলার স্বভাব, এবং এই স্বভাবের মধ্যেই উহার উদ্দেশ্য নিহিত।

কলাসৃষ্টিতে দুইটি অংশ থাকে : (১) ধারণা অথবা চিন্তা এবং (২) উপাদান। এই দুইটি অংশেব মধ্যে কোন একটির প্রাধান্য অথবা উভয়ের সম্পূর্ণ ভারসাম্য অর্থাৎ সমকক্ষতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর কলা উৎপন্ন হয়। চৈতন্যের মধ্যে স্বাভিব্যক্তির দিকে একটি অন্তঃপ্রেরণা থাকে। যখন উপাদানের জড়ত্ব অথবা কাঠিন্যের মাত্রা এত বেশী হয় যে, তাহাতে চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তখন আমরা প্রতীকমূলক কলার (যথা, স্থাপত্য শিল্পের) সাক্ষাৎ পাই। ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ কলায়, থারণা ও উপাদানকে সমতোল করিয়া, উহাদের পূর্ণ মিলন সংসাধিত হয় (যথা ভাস্কর্য শিল্পে)। কলার রোমান্টিক অর্থাৎ বিস্ময়-রম্যতামূলক প্রকারে (যথা, চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত ও কাব্যে) উপাদানের স্থান অত্যন্ত গৌণ এবং সেখানে ধারণারই সাতিশয় প্রাধান্য। এই সকল ক্রমোন্নত আকারে, আমরা ধারণার অধিকাধিক প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। কিন্তু বস্তু-

স্বভাববশতঃই, প্রস্তর হউক অথবা শব্দ হউক, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই কখনও চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য যোগ্য মাধ্যম হইতে পারে না। চৈতন্য শুধু আধ্যাত্মিক মাধ্যমে অর্থাৎ চিন্তার মধ্যেই নিজেকে ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু এক লম্ফে হঠাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে আমরা চিন্তার রাজ্যে পৌঁছাইতে পারি না। তাহার জন্য, আমাদিগকে উহাদের মধ্যবর্তী মানসিক প্রতিরূপের (representation) স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এবং ইহাই ধর্মের ক্ষেত্র।

ধর্ম :—যে পরমতত্ত্বকে আমরা কলায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করি, ধর্মে তাহাকেই আমরা মানসিক প্রতিরূপের মাধ্যমে উপলব্ধি করি। মানসিক প্রতি-রূপকে প্রকৃত অর্থে চিন্তা বলা যায় না। ইহা হইতেছে এমন একপ্রকার চিত্র সংবলিত চিন্তা, যাহাতে মানসিক প্রতিচ্ছায়াগুলিকে (images) সামান্যীয় আকারে (generalised form) ব্যবহার করা হয়। বিশুদ্ধ চিন্তায় যেমন প্রকৃত সত্যকে পাওয়া যায়, চিত্র সংবলিত চিন্তায় সেইরূপ নহে। কিন্তু উহাতে যেন আমরা সত্যের একটি বিকৃত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই। ধর্ম, কলা ও দর্শন প্রত্যেকেরই বিষয়-বস্তু পরমতত্ত্ব। কিন্তু ধর্মে উহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করা হয়। আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের রাজা অথবা পিতা। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই চিত্র সংবলিত চিন্তা। কারণ, ঈশ্বর হইতেছেন আত্মা বা চৈতন্য ; তাই জগতের সহিত তাঁহার শুধু আধ্যাত্মিক সম্বন্ধই থাকিতে পারে। তিনি কখনও বাস্তব স্রষ্টা, অথবা প্রকৃত অর্থে রাজা বা পিতা হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের ধারণা ধর্মের একটি মূলগত ধারণা। বস্তুতঃ, ইহা কোন এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরই ঐক্যকে ব্যক্ত করে। ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বিতীয় এক অঙ্গ এই যে, ঈশ্বর তদ্বিষয়ক ব্যক্তিনিষ্ঠজ্ঞান হইতে পৃথক। ধর্মীয় চেতনা নিজের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি পার্থক্য স্বীকার করে, এবং এইরূপ পার্থক্যের ভিত্তিতেই ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভবপর। এই স্তরে, চৈতন্যকে ঈশ্বর ও মানুষ, এই দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়। ধর্মবিশ্বাসের তৃতীয় অঙ্গ হইতেছে উপাসনা দ্বারা (Kultus) ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তি-জ্ঞাতার ঐক্য সম্পাদন। উপাসনা দ্বারা আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বিভক্ততাকে সংশোধন করিয়া, মূলের একতাকে পুনরায় স্থাপন করিতে চাহি।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ধর্মীয় চেতনায় আমরা মানসিক প্রতিচ্ছায়ার (representation) স্তরে বাস করি। ব্যবহারিক জগতে যেমন আমাদের লৌকিক বুদ্ধি উহার বিমূর্ত দৃষ্টিতে পদার্থ সকলকে পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝে, এবং তজ্জন্য তাহাদের বাস্তব ঐক্যটিকে উপলব্ধি করিতে পারে না, মানসিক প্রতিচ্ছায়াতেও

তাহাই হয়। এই ভাবে, আমরা ভাবি যে, যাহা অনন্ত (ঈশ্বর), তাহাই সান্ত জগৎ ও মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করে, এবং এই সৃষ্ট জগৎ ও মনুষ্যসকল উহাদের স্রষ্টা হইতে ভিন্ন এবং তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হওয়া পর্যন্ত তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রকৃত পক্ষে সান্ত জগৎ ব্যতীত অনন্তের কোন অস্তিত্ব নাই, এবং অনন্তের মধ্যেই সান্ত-জগতের অস্তিত্ব ও সত্যতা। জগতের তথাকথিত সৃষ্টি, মানুষের ঈশ্বর হইতে, পৃথক অবস্থিতি ও পরে তাঁহার সহিত পুনর্মিলন, এই সকল ধারণা কোন বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্ত করে না। উহারা শুধু এই চিরন্তন সত্যেরই ইঙ্গিত দেয় যে, অনন্ত সত্তা স্বাধীনভাবে নিজেকে অসংখ্য সান্ত পদার্থের মধ্যে ভেদবিশিষ্ট করিয়া, আবার উহাদের ঐক্যের মধ্যে নিজের সহিত অভিন্নই থাকিয়া যায়। আমরা যখন বিশ্বের পদার্থ-সমূহকে দেখি, তখন আমরা দর্শনের ক্ষেত্রে আগমন করি।

দর্শন :—প্রকৃত পক্ষে, প্রথম হইতেই, আমরা দর্শনের ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতেছি। যেহেতু দর্শন হইতেছে সত্তাবিষয়ক ধারণারই বিশদীকরণ বা ব্যাখ্যা, অতএব এতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনই আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা-কার্যের বিভিন্ন ধাপ আছে, এবং এই সকল ধাপ সত্তার বিভিন্ন স্তরের ইঙ্গিত দেয়। বর্তমান প্রসঙ্গে, দর্শন শব্দ দ্বারা, নিরপেক্ষ-চৈতন্য বিষয়ক মতবাদের সর্বশেষ অংশটি বুঝিতে হইবে। তাই, এখানে দর্শনের অর্থ হইতেছে সত্তার বা পরমতত্ত্বের অন্তিম অথবা সর্বাপেক্ষা পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা। দর্শনকে যখন কলা ও ধর্মের মিলন বলিয়া কিংবা উহাদের ত্রুটিগুলির সংশোধন এবং উহাদের সমুপস্থাপন (Synthesis) বলিয়া মনে করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ অনুভূতি ও মানসিক প্রতিচ্ছায়া রূপ জ্ঞানের প্রকার দুইটিকে স্ব-প্রকাশ চিন্তারূপ প্রকারে উন্নীত করা হইয়াছে। কলা অথবা ধর্ম, যে কোন নিরপেক্ষ চেতনার ক্ষেত্রই হউক না কেন, আমরা এখানে কোন না কোন আকারে পরমতত্ত্বকেই জানি। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত, পরমতত্ত্বের যে সকল আকার আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিরপেক্ষ চৈতন্যের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত আকার একমাত্র দর্শনেই পাওয়া যায়। এখানে অপূর্ণতার শেষ চিহ্নটিও মুছিয়া যায়। কারণ, এখানে আকার নিজেকে বিষয়বস্তুরূপে পরিণত করিয়া বিষয়বস্তুই হইয়া যায়; আকার ও বিষয়বস্তুর ভেদ অতিক্রান্ত হয়; এবং ধারণা নিজেই নিজের বিষয় হয়। তর্ক বিজ্ঞানের অন্তে, আমরা এরিষ্টটলের যে প্রজ্ঞার ধারণাকে দেখিয়াছিলাম, এখানে আবার সেই ধারণাতেই উপনীত হই; সেখানে যাহা শুধু একটি

বিমূর্ত বৌদ্ধিক প্রকার ছিল, এখানে তাহাই সর্বাঙ্গযুক্ত অখণ্ড সত্তায় পরিণত হইয়াছে।

কলা ও ধর্ম হইতেছে পরমতত্ত্বরূপ চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু দর্শন হইতেছে উহার পূর্ণতম প্রকার। ইহা হইতেছে সেই ধারণা, যাহা নিজেকে চিন্তা করে (die sich denkende Idee) ; ইহা হইতেছে সেই সত্য, যাহা নিজেকেই জানে (die wissende Wahrheit)।

হেগেলের মতে, প্রজ্ঞার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে বিশুদ্ধ ধারণা সকলের দ্বন্দ্ব মূলক অভিব্যক্তি। তর্কবিজ্ঞানে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে, এবং আসলে তর্কবিজ্ঞানই হেগেলীয় দর্শনের ভিত্তি। প্রকৃতি-দর্শন ও অধ্যাত্মদর্শন, এই দুইটিকে ব্যবহারিক তর্কবিজ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, উহারা প্রকৃতি এবং আত্মার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা কিভাবে কাজ করে, শুধু তাহাই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। সর্বশেষে, আমরা প্রজ্ঞার ধারণায় উপনীত হই। এই প্রজ্ঞার ধারণা হইতেছে এমন একটি দ্বন্দ্বাত্মক বিবর্তনের আদর্শ প্রক্রিয়া, যাহা প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে এবং তাহাদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়া, কলা, ধর্ম ও দর্শনে নিজেকে জানে ও বাস্তব করে। ইহা হইতেছে সেই শাশ্বত ধারণা, যাহা নিজস্বরূপে এবং নিজের জন্য অস্তিত্ববান (existing in and for itself), যাহা নিরপেক্ষ চৈতন্যরূপে নিত্য ক্রিয়াশীল এবং নিজেকে উৎপন্ন ও উপভোগ করে (die ewige an—und fiir sich seyende Idee sich ewig als absolu ter Gcist bethatigt. erzeugt und geniesst.—Hegel, Vol. 10, পৃ: ৪৭৫)।

৪। উপসংহার

আমরা উপরে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে যে দর্শনের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্বাপেক্ষা জমকালো বিচার-সংস্থিতি (System of thought)। এই দর্শনের বিশাল কুক্ষিতে মানবীয় চিন্তা ও কার্যের প্রায় প্রত্যেক শাখাই সমাবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে আমাদের অনুভবের প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

হেগেল পারমার্থিক সত্তাকে পূর্ণ ও অনন্ত এবং সচেতন সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতের বর্ণনা দিতে গিয়া, কেহ কেহ হয়ত "সত্যম্‌ জ্ঞানম্‌ অনন্তম্‌ ব্রহ্ম—উপনিষদের এই উক্তিটি ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ হইবেন। কিন্তু

হেগেলের পরমতত্ত্ব বিশুদ্ধ ব্রহ্ম নহে—উহা হইতেছে মায়া-সম্বন্ধ ব্রহ্ম অথবা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত পুরুষ। তাঁহার দ্বন্দ্বমূলক তর্কবিজ্ঞানের অনুপপত্তিগুলির কথা বাদ দিলেও, যাহারা ভারতীয় চিন্তায় শিক্ষিত, তাহারা হেগেলের প্রজ্ঞাবিষয়ক মতের মধ্যে কিছু দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করিবেন। কারণ, এই প্রজ্ঞা অন্য কোন তত্ত্বের সাহায্য অথবা হস্তক্ষেপ ছাড়াই, নিজ স্বরূপের বাহিরে গমন করিয়া, জড়ীয় বস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই স্থলে প্রধান সমস্যা হইতেছে প্রজ্ঞার এই স্বরূপটিকে বুঝিতে পারা; কারণ, এই প্রজ্ঞা শুধু যে নিজেকে একটি ক্রিয়া রূপে নিজের বাহিরে যাইতে দেয়, তাহা নহে, উপরন্ত সেই ক্রিয়াব ফলটিকেও উক্ত ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন করিয়া রাখে।

কিন্তু টীকা অথবা সমালোচনা করা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। আধুনিক দার্শনিকের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষবাদী; এবং মুখ্যতঃ, তিনি বিশেষ বিশেষ সমস্যার পৃথক পৃথকভাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই, ইহা সম্ভবপর যে, এই বিরাট বিচার-সংস্থিতির স্রষ্টার প্রতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দার্শনিকের প্রতি, তাহার পক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন না হওয়া সম্ভবপর। তথাপি আমরা স্বীকার না করিযা পারি না যে, হেগেল বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের আদর্শটিকে অভ্রান্তভাবে বুঝিযা ছিলেন এবং উহাকে স্বীয় বিচার-কার্যে সুশৃঙ্খলভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিবাদীর আদর্শ হইতেছে প্রজ্ঞার স্বরূপ ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে নিজেকে সচেতন করা এবং উহাদের আলোকে স্বীয় অনুভবের প্রত্যেকটি শাখাকে উদ্ভাসিত অথবা বিশদ করা। আলোচ্য বিষয়ের সূক্ষ্মত্ব, জটিলতা ও বিশালত্বের কথা মনে রাখিলে, হয়ত আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, এই ক্ষেত্রে কোন সসীম বুদ্ধির পক্ষে পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমরা যদি দর্শনে কোন মূল্যবান কার্য করিতে চাই, তাহা হইলে হেগেল যে প্রকার কার্য বৃহৎ ভাবে করিযাছিলেন, তাহাই আমাদিগকে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে করিতে হইবে।

গ্রন্থবিবরণী

Seth, A.: *The Development from Kant to Hegel* (Williams & Norgate)
Adamson, R.: *Fichte* (Blackwood)
Caird, E.: *Hegel* (Blackwood)
Reyburn, H. A.: *The Ethical Theory of Hegel* (Clarendon Press)
Mure. G. R. G.: *An Introduction to Hegel* (Clarendon Press)
Wallace, W.: *Prolegomena to the Study of Hegel's Philosophy* (Clarendon Press)

ফিশ্‌টে, শেলিং ও হেগেল্‌

Stace, W. T. : *The Philosophy of Hegel* (Macmillan)
Baillie, J. B. : *Hegel's Logic* (Macmillan)
Croce, B. : *What is Dead & What is Living of the Philosophy of Hegel* (Macmillan)
Mctaggart, J. M. E. : *Studies in the Hegelian Dialectic* (Cambridge University Press)
Mctaggart, J. M. E. : *A Commentary on Hegel's Logic* (Cambridge University Press)

হেগেলের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ

Baillie, J. B. : *The Phenomenology of Mind* (Allen & Unwin)
Johnston, W. H. and Struthers, L. G. : *Science of Logic* (Allen & Unwin)
Wallace, W. : *The Logic of Hegel* (Clarendon Press)
Wallace, W. : *Philosophy of Mind* (Clarendon Press)
Macran. H. S. : *Doctrine of Formal Logic* (Clarendon Press)
Macran, H. S. : *Logic of World and Idea* (Clarendon Press)
Knox, T. M. : *Philosophy of Right* (Clarendon Press)
Haldane, E. S. : *Lectures on the History of Philosophy* (Kegan Paul)
Speirs, E. B. and Sanderson, J. B. : *Philosophy of Religion* (Kegan Panl)
Osmaston, E. P. B. : *The Philosophy of Fine Art* (Bell)
Sibree, S. B. : *Lectures on the Philosophy of History* (Bell & Daldy)

জার্মান গ্রন্থাবলী

Hegel's Samtliche Werke, "Jubilaumsausgabe in 20 Banden" (*Frommans*)
Hartmann, N. : *Die Philosophie des deutschen Idealismus* (de Gruyter)
Kroner, R. : *Von Kant bis Hegel* (Mohr)
Moog, W. : *Hegel und die hegelische Schule* (*Reinhardt*)

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

শোপেন্‌হাউয়ের ও নিট্‌সে

১. আর্থুর শোপেন্‌হাউয়ের (১৭৮৮-১৮৬০)

যুক্তিবাদের চরম পরিণতি হেগেলীয় দর্শন। যুক্তি ও মননের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এই যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রাণোচ্ছ্বাসবাদ নামে খ্যাত এই প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন শোপেন্‌হাউয়ের। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং প্রভূত পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিয়া শোপেন্‌হাউয়ের গেটিংগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এইখানে তিনি দর্শন ও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান পাঠে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তাহার গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ক্লাসিক অধ্যয়নও অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। গে, এ সুল্‌ৎসে-এর নিকট হইতে তিনি পাঠ গ্রহন করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন প্লেটো আর কাণ্ট। ১৮১১ সালে শোপেন্‌হাউয়ের গেটিংগেন্ হইতে বার্লিনে আসেন এবং এখানে ফিশ্‌টে ও শ্লাইয়ের মাখের-এর অধ্যাপনার সহিত পরিচিত হন। নেপোলিয়নের কবল হইতে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য তখন জার্মাণীতে প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছিল। জার্মান জাতির স্বাধিকার লাভের জন্য এই যে আন্দোলন—এই আন্দোলনে ফিশ্‌টে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। তাহার প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা ও লেখা জার্মান জাতিকে এক প্রদীপ্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। শোপেন্‌হাউয়ের কিন্তু এই সংগ্রামে কোনো অংশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি এখন বার্লিন হইতে রুডলফ্‌ষ্টাড্‌ট্ নামক ছোট শহরটিতে সরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি গভীর মননে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই মননের ফল—এখানে রচিত "অন্ দি ফোরফোল্ড রুট্ অব্ দি প্রিনসিপ্‌ল্ অব্ সাফিসিয়েণ্ট্ রিজন্"। ইহা তাহার প্রথম রচনা।

উক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮১৩ সালে। শোপেন্‌হাউয়ের মনে করেন যে পুস্তিকাখানি তাহার দর্শনের ভূমিকা স্বরূপ। তাহার প্রধান রচনা "দি ওয়ারল্ড্ এজ্ উইল্ এ্যাণ্ড্ আইডিয়া" এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে উক্ত পুস্তিকা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "উক্ত ভূমিকা ও প্রাথমিক-পাঠ-এর সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বর্তমান গ্রন্থখানি বোধগম্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে ঐ প্রবন্ধটির সব বক্তব্য পূর্বস্বীকাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কল্পনা করা ভাল যে ঐ প্রবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থের

প্রারম্ভে ইহার সূচনারূপে যুক্ত আছে"। উক্ত পুস্তিকায় যে মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে-হেতু, কারণ অর্থে হেতু, চার প্রকার: জ্ঞানের হেতু, সত্তার হেতু; উৎপত্তির হেতু এবং সর্বশেষে কৃতি বা উদ্দেশ্যের হেতু। এই পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই প্রবন্ধেই শোপেন্‌হাউয়ের বলা বাহুল্য কাণ্টীয় দর্শনের প্রভাবে গাণিতিক যুক্তি ও তার্কিক যুক্তির মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করেন; বলেন যে গাণিতিক যুক্তি বোধি নির্ভর আর তার্কিক যুক্তি নির্ভর করে হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্তের অবরোহণের উপর।

"দি ওয়ারল্‌ড্‌ এজ্‌ উইল্‌ এ্যাণ্ড আইডিয়া" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। ইহার অর্ধার্ধ শতাব্দী ব্যবধানের পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক কিছু সংযোজিত হইয়াছে ঠিক; কিন্তু প্রথম সংস্করণের সাধারণ কাঠামটি অব্যাহত রাখা হয়। কাণ্টের দর্শন কি গভীরভাবে শোপেন্‌হাউয়েরকে প্রভাবিত করিয়াছিল উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়। শোপেন্‌হাউয়ের নিজেও এই প্রভাবের কথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার একটি অপরিহার্য সর্ত হইল কাণ্টের রচনার সঙ্গে পরিচয় এবং তাহার মতে কাণ্টের রচনা "দুই হাজার বৎসরের দর্শনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা"। তারপর কাণ্টীয় দর্শন মানুষের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন "দৃষ্টিদানের উদ্দেশ্যে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষুর অস্ত্রোপচারের সহিত ইহার তুলনা করা যায়"। আলোচ্য গ্রন্থে প্লেটোর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। শোপেন্‌হাউয়ের নিজে আরও একটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় চিন্তাধারার, বিশেষতঃ উপনিষদের চিন্তাধারার-প্রভাব। শেষোক্ত প্রভাবের স্বীকৃতি তিনি যে চিরস্মরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারা যায় না। তিনি বলিয়াছেন: "...উপরন্তু ইহার সহিত বেদদত্ত প্রসাদও যুক্ত হইতে পারে, কেননা উপনিষদের সাহায্যে আমরা বেদে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছি। আমার মনে হয় বেদে প্রবেশাধিকার লাভ বর্তমান শতকের মহত্তম সুযোগ। বিগত শতাব্দী সমূহ হইতে এখানেই অদ্যাপি-নবীন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পঞ্চদশ শতকে গ্রীক্ সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইবে তাহার চেয়ে ব্যাপকতর ও গভীরতর। আমি বলিতে চাই যে সুপ্রাচীন ভারতের পূতঃ প্রজ্ঞা যে পাঠকের আয়ত্ত ও অধিগত তিনিই আমার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ

অধিকারী"। আবার বলিয়াছেন: "সমগ্র বিশ্বনিখিলে উপনিষদের ন্যায় এমন অতিশায়ী অনুশীলন আর দ্বিতীয় নাই। ইহা আমার জীবনের শান্তি, মরণের সান্ত্বনা"।

১৮৩৬ সালে তাহার "দি উইল্ অব্ নেচার" প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি তাহার নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্ব পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেন। ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয় তাহার "টু মেন্ প্রবলেমস্ অব্ এথিকস্"। এইবার জনমত তাহার অনুকূলে বহিতে আরম্ভ করিল। কয়েকজন লেখক তাহার রচনা সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি তাহার মুখ্য রচনাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে পঞ্চাশটি নূতন অধ্যায়ে নূতন উপকরণ-তাহার পরিণত চিন্তার প্রতিফলন সংযোজিত হয়। উক্ত সংযোজন তাহার দর্শনের বহু অস্পষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। সর্বশেষে ১৮৫১ সালে **পারেরগা উণ্ড পারালিপোমেনা** নামে এক প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠক আগ্রহশীল এমন কতকগুলি বিষয় এই প্রবন্ধগুলির বিষয়-বস্তু। সংকলন খানি পাঠক সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়, এবং ফলে গ্রন্থকার তাহার বহুআকাঙ্খিত খ্যাতি অর্জন করেন। তাহার ক্রমবর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তার অন্য কতকগুলি কারণও ছিল। তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শ্লাইয়েরমাখের, ফিশ্টে, শেলিং ও হেগেলের খ্যাতি তখন ক্ষীয়মান; ফলে পাঠক সমাজ তাহার নিকট দর্শনের নূতন দিক্‌দর্শন প্রত্যাশা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদিকে তাহার কয়েকজন শিষ্যও জুটিতে লাগিল। আব প্রধান শিষ্য য়ুলিয়ুস্ ফ্রাউয়েনষ্টাড্ট্ তাহার প্রচার-প্রতিনিধির কাজ করিতেন। প্রথমে তাহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে বিদ্বৎ সমাজ বহির্ভূত মানুষের মধ্যে। সওদাগর, সৈন্য, আইনজীবী প্রভৃতির মধ্যে। ক্রমশ বিদ্বৎগোষ্ঠী ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও-তাহার রচনা সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইয়া উঠে। ইয়ট্. এ. এরড্‌মান্ "জার্মান স্পেকুলেশন্ সিন্‌স্ কাণ্ট" নামক পুস্তকে শোপেন্‌হাউয়েরের দার্শনিক মতবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করেন। চারিদিক হইতে এখন যশোস্বীকৃতি আসিতে লাগিল। ফলে তাহার জীবনের শেষ দশ বৎসর সব চেয়ে সুখে কাটিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শোপেনহাউয়ের-এর দর্শন যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া। ইহাকে যুক্তিবাদের প্রতিবাদী দর্শন বলা যায়। কারণ, যুক্তি ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রবৃত্তি ধারাবাহিকতা অস্বীকার করে; যুক্তি ভালবাসে প্রশান্তি ও সামঞ্জস্য, আর চঞ্চলতা ও সংঘাতেই প্রবৃত্তির আনন্দ; যুক্তি স্থাণু কিন্তু প্রবৃত্তি

গতিশীল, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই যে প্রবৃত্তি যুক্তির প্রতিষেধকের কাজ করে। যে হেবল্‌টশাউউং (বিশ্বদৃষ্টি) কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে সে বিশ্বদৃষ্টি যে একদেশদর্শী তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং যুক্তি সৎ-এর যে সব দিক অগ্রাহ্য করে সে সব দিক নির্দেশক কোনো দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা উক্ত যুক্তিসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরণ প্রয়োজন। যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া রূপে উদ্ভূত গেফিউলস্‌রোমান্‌টিক ও হ্বিলেন রোমান্‌টিক-এর (অনুভবোচ্ছ্বাসবাদ ও প্রবৃত্ত্যুচ্ছ্বাসবাদ-এর) ইহাই ঐতিহাসিক যুক্তিভিত্তি। শোপেন্‌হাউয়েরের দর্শন উক্ত হ্বিলেনরোমান্‌টিকের পরাকাষ্ঠা। ইহাতে উক্ত বিশ্বদৃষ্টির প্রকৃতিগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এ উভয়েরই প্রকটপ্রকাশ দেখা যায়।

প্রতিবাদী দর্শন হিসাবে, অর্থাৎ নিছক যুক্তি নির্ভর দর্শনের প্রতিষেধক হিসাবে, দেখিলে এই দর্শন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা অনস্বীকার্য। সৎ-এর যে আরো বহু যুক্তি অবহেলিত দিক আছে—ইহা এই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রতিবাদী দিকের কথা বাদ দিয়া ইহার গঠনমূলক দিকের কথা বিচার করিলে বলিতে হয় যে সৎ-এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে ইহা খুব মূল্য-বান কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। নিচে আমরা এই উক্তির যথাযথ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু শোপেন্‌হাউয়ের প্রবৃত্তি বলিতে ঠিক কি বুঝেন এবং যুক্তি থেকে ইহার সঠিক পার্থক্য কি প্রথমে তাহা বুঝার দরকার। "দি ওয়ারল্ড্ এজ্ উইল এ্যাণ্ড আইডিয়া"-তে প্রবৃত্তির স্বরূপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক তিনি নিম্নোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "প্রবৃত্তি—স্বরূপত প্রবৃত্তি—অবোধ, ইহা এক অন্ধ ও অবারিত প্রণোদনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংহতিবিহীন পদার্থে, জৈব প্রকৃতিতে এবং আমাদের জীবনের জৈব অংশে এই অন্ধ প্রণোদনার প্রকাশ দেখিতে পাই। ধারণানুগত জগত ইহার-আশ্রয়েই পরিপুষ্টি লাভ করে। ধারণানুগত জগতের সহিত যুক্ত হইয়া প্রবৃত্তি অসচেত হয়, উপলব্ধি করে যে প্রবৃত্তিই প্রবৃত্ত করায় এবং অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ত করায়। আর ইহাই (প্রবৃত্তির সচেতন রূপ) ধারণানুগ জগত বা জীবন, আমাদের বাস্তব জীবন। সেজন্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে আমরা প্রবৃত্তির দর্শন বা ইহার বিষয়তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এবং যেহেতু জীবনই প্রবৃত্তির অভীপ্সিত বিষয় কেননা জীবন প্রবৃত্তির ঈপ্সিত বিষয়ের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়—সেইহেতু প্রবৃত্তি ও জীবন অভিন্ন; "প্রবৃত্তি"র পরিবর্তে বাঁচিবার প্রবৃত্তি কথাটি ব্যবহার করিলে অকারণ পুনরুক্তি হইত।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে

"প্রবৃত্তি স্বগতসত্তা, আন্তর উপাদান বা বিশ্বের অন্তঃসার। জীবন, দৃশ্যমান বা অবভাসিত জগত, হইল প্রবৃত্তির দর্পন। কাজেই ছায়া যেমন কায়া অনুসরণ করিয়া চলে সেরূপ জীবনও প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য সহচর, এবং প্রবৃত্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জীবন বা জগতও থাকিবে। সুতরাং বাঁচিবার প্রবৃত্তি জীবনের সুনিশ্চয় অঙ্গীকার-পত্র। যতক্ষণ আমরা বাঁচিবার প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ ততক্ষণ আমাদের—এমন কি মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও—আপন সত্তা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ নাই"।[২]

এখন প্রশ্ন : উক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতির অর্থ কি ? প্রথমতঃ, প্রবৃত্তি স্বগতসত্তাক পদার্থ অর্থাৎ পরপদার্থ, আর ধারণা ইহার অবভাস। দ্বিতীয়তঃ, বুঝা গেল যে এই স্বগতসত্তা অজ্ঞান, এক অন্ধ অবারিত প্রণোদনা। সুতরাং মনে হয় যে শোপেন্‌হাউয়েরের মতে প্রাথমিক সত্তা এক অন্ধ, অবাধ্য ও অচেতন প্রণোদনা। এই প্রণোদনা জীবন ও চৈতন্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, নিজেকে বিষয়িত করে। এখন, উক্তরূপ সত্তার সহিত প্রাকৃতিক বলের বিশেষ পার্থক্য নাই। আলোচ্য মতানুসারে উক্ত সত্তা হইতেই জীবন ও চেতনার উদ্ভব হয়। সুতরাং জড়বাদ হইতে উক্ত মতের পৃথকীকরণ সহজ নহে। জড় বা বল হইতে কি করিয়া চেতনার উদ্ভব হয়—এই সমস্যা সর্বকালের জড়বাদের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। শোপেন্‌হাউয়ের এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কি ?

মনে হয় তিনি মনে করিতেন যে তিনি যাহাকে "অন্তর্বর্তী নির্বিচারবাদ"[৩] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই তত্ত্বের সাহায্যে তিনি উক্ত বাধা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত তত্ত্ব অনুসারে সব কিছুর—কি চেতন কি অচেতন পদার্থের—পশ্চাতে এক অদৃশ্য শক্তি গোপনে গোপনে কাজ করিয়া যায় ; বলা বাহুল্য যে এই শক্তির ক্রিয়াভূমির পর্যায়ভেদ আছে। কিন্তু উক্ত তত্ত্বের সাহায্যে তাহার দর্শনের মূল সমস্যা—উল্লিখিত বাধা—দূরীভূত হয় না। ঐ সমস্যার সহিত অন্তর্বর্তিতা বা বহির্বর্তিতার কোনো সম্পর্ক নাই। অচেতনের মধ্যে যদি চেতনার বীজ সুপ্ত না থাকে তাহা হইলে অন্তর্বর্তিতার সাহায্যেও অচেতন হইতে চৈতন্য সৃজনরূপ ইন্দ্রজালসৃষ্টি সম্ভব নহে ; কাজেই যে বহির্বর্তীবাদীরা জগতিরিক্ত ভগবদিচ্ছা কল্পনা করেন এবং আরো কল্পনা করেন যে এই ঐশ্বরিক ইচ্ছা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে সেই বহির্বর্তীবাদীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি যে আত্মসন্তুষ্টি বোধ করিয়াছেন—সে আত্মতুষ্টি অহেতুক।[৪]

উপরে "দি ওয়ারল্ড্ এজ্ উইল এ্যাণ্ড আইডিয়া" হইতে দুইটি অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে শোপেন্‌হাউয়েরের "অন্তর্বর্তীনির্বিচারবাদে"-র

চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। এখানে তিনি জীবনকে প্রবৃত্তির দর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সূর্যকে কিরূপে অন্ধকারের, আলোককে কিভাবে ছায়ার, দর্পণ বলিয়া অভিহিত করা যায়? দর্পণে প্রদত্ত পদার্থের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়; প্রতিফলনীয় বিষয়ের বিপরীতধর্মী বিষয় প্রতিফলিত হইতে পারে না। অথচ শোপেন্‌হাউয়েরের তাত্ত্বিক জগতে এই যাদুক্রিয়া প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে।

আসল ব্যাপার এই যে শোপেন্‌হাউয়েরের স্বগতসত্তা বস্তুতঃ অবভাস, আর যাহাকে তিনি অবভাস বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বগতসত্তা; কেননা তাহার মতে অন্ধ প্রবৃত্তিই স্বগতসত্তা আর সচেতন ধারণা কিনা অবভাস। মনে প্রাণে কিন্তু তিনি জানেন যে ধারণা হইল স্বগতসত্তা আর প্রবৃত্তি অবভাস। "দি ওয়ার্ল্ড্‌ এজ্‌ উইল এ্যাণ্ড আইডিয়া"র প্রথম খণ্ডের চতুর্থভাগে তিনি নিজেই অতি চমৎকাররূপে দেখাইয়াছেন যে আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধারণাকেন্দ্রিক, দেখাইয়াছেন যে সৌন্দর্যাবধারণেই মানুষের মুক্তি। কিন্তু এ কথা ঘোষণা করিয়াই পরক্ষণে তিনি যেন বলিয়া উঠেন "না, না, মানুষের মুক্তি নাই, কেননা অন্ধপ্রবৃত্তি এই সৌন্দর্যাবধারণকে, গ্রাস করিয়া ফেলিবে।"

মনে হয় শোপেন্‌হাউয়ের এখানে তাহার নিজের কূটযুক্তির পাপচক্রে বন্দী। কারণ তিনি এই ভ্রান্ত ও অসম্ভব মূলসূত্র লইয়া আরম্ভ করেন যে স্বগতসত্তা সদাচঞ্চল এক শাশ্বত অতৃপ্তি, এক সীমাহীন সংগ্রাম। এবং সেই হেতু ইহাকে তিনি একটি সর্বমূল্যগ্রাসী দানবরূপে কল্পনা করেন। এই দানবের কবল হইতে আত্মরক্ষা না করিতে পারিলে মানুষের মুক্তি নাই। এজন্য তিনি বলেন "স্বগতসত্তা হইতে পলায়ন কর, আত্মরক্ষা কর"। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কোনো দার্শনিক—প্রাচীন কি অর্বাচীন, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য—এ রকম কথা বলেন নাই। অবভাস হইতে মুক্ত হও, স্বগতসত্তায় আত্মরক্ষা কর—এ নীতির অর্থ বুঝা যায়। অবশ্য অত্যুক্ত হইলে ইহা নিরাশাবাদে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু একথাও সত্য যে ইহা একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি। সব চেয়ে অটল নিরাশাবাদীরাও—কি প্রাচীন কি নবীন, প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য—ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই, বলিতে পারেন নাই; স্বগতসত্তা হইতে আত্মরক্ষা কর।

কেন তাহারা এরূপ বলিতে পারেন নাই? কারণ, উক্ত নীতিটি অর্থহীন। অশিব হইতে পলায়ন করিতে বলা যায়, এবং বলা উচিত। কিন্তু "যাহা শিব তাহা হইতে আত্মরক্ষা কর"—এ উক্তির কোনো অর্থ আছে কি? অথচ স্বগতসত্তা হইতে আত্মরক্ষা কর—এ কথা বলিলে প্রকারান্তরে এ কথাই বলা হয় যে, শিব হইতে

পলায়ন কর। কেননা স্বগতসত্তাকে অবশ্যই শিবরূপে কল্পনা করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহীত মানদণ্ডে স্বগতসত্তা অশিবরূপে প্রতিভাত হয় তাহা হইলে সে দোষ স্বগতসত্তার নয়, আমাদের। সে ক্ষেত্রে ঐ ভ্রান্ত মানদণ্ড পরিবর্তন করার দরকার অথবা, নিট্‌শের সুভাষিত ভাষায় বলা যায়, এ রকম অবস্থায় প্রয়োজন উম্‌হেবরটুং আলের হেবরটে—সর্বপ্রকার মূল্যের অতিমূল্যায়ন। মিল্‌টনের শয়তান বলিয়াছিল "অশিব, তুমিই আমার ঈপ্সিত শিব"। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের লেখকরা দেখাইয়াছেন, "কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব নহে।[৫]

সম্ভবতঃ শোপেনহাউয়ের বুঝিয়াছিলেন যে তাহার উক্ত মতবাদ অদ্ভুত। ফলে তিনি যেন শেষে এমন এক স্বগতসত্তা খুজিতেছিলেন যাকে অন্ধ প্রবৃত্তি বলা যায় না এবং অন্ধ প্রবৃত্তি ঐ অম্বিষ্ট স্বগতসত্তার অবভাস। এইজন্য কখনও কখনও তিনি প্রবৃত্তিকে উরপ্‌ফানো মেন্‌ বা প্রাথমিক অবভাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৬] শেষোক্তরূপ বর্ণনার জন্য হফ্‌ডিং তাহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, কেননা এ কথা স্বীকার করিলে প্রবৃত্তিই যে স্বগতসত্তা এ মূল তত্ত্ব অস্বীকার করিতে হয়।[৭] কিন্তু আমাদের মনে হয় যে উক্ত মূলতঃ ভ্রান্ত তত্ত্ব আঁকড়াইয়া সঙ্গতি রক্ষা করার চেয়ে অসঙ্গতি অনেক ভাল। স্পিনোজার দর্শনে ঠিক ইহাই দেখা যায়। "স্পিনোজা" (ব্ল্যাক্‌উড্‌ ফিলসফিক্যাল ক্লাসিকস্‌ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত) নামক গ্রন্থে জন্‌ কেয়ারড্‌ দেখাইয়াছেন যে স্পিনোজার সিদ্ধান্ত তাহার প্রাথমিক বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাহার সমগ্র বক্তব্যের সামঞ্জস্যের বিনিময়েও স্পিনোজা যে তাহার প্রথম-দিককার যুক্তিসহ বক্তব্য খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে দার্শনিক হিসাবে তাহার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শোপেন্‌হাউয়েরের নিরাশাবাদের কারণ এই যে তিনি স্বগতসত্তাকে অশিব-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বগতসত্তা—এ উক্তি স্ববিরোধী। শোপেনহাউয়ের বলিয়াছেন—সৎ থেকে পলায়ন করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্তত এই পরম শ্রেয়কে (পলায়ন প্রচেষ্টাকে) আন্তরিকভাবে কামনা করা উচিত। কিন্তু সৎ-এর সান্নিধ্যে থাকার চেয়ে শ্রেয়তর কিছুর ধারণা করা যায় কি? অথচ শোপেন্‌হাউয়ের ইহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া গণ্য করেন। এইরূপ মনে করাই তাহার নিরাশাবাদের মূল কারণ। আমরা সর্বদাই সৎ-এর সান্নিধ্যে থাকি, এবং শত চেষ্টা করিলেও সৎ-এর বাহিরে চলিয়া আসিতে পারি না। সৎ-হইতে বহির্গত হওয়ার অসম্ভবতা নিরাশানির্দেশক নহে। বরং ইহা চরম আশা-বাদী মতবাদরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

"সিলেক্‌সনস্‌ ফ্রম্‌ শোপেনহাউয়ের" (চার্লস্‌ স্ক্রাইবনারস্‌ সন্স প্রকাশিত)-এর ভূমিকায় সম্পাদক ডি. এইচ্‌. পার্‌কার্‌ বলিয়াছেন: "শোপেনহাউয়ের উপর হিন্দুচিন্তাধারার প্রভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত তাহার নিরাশাবাদ।" কিন্তু হিন্দু-চিন্তাধারা সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণা একটি অতিস্থূল ভ্রান্তি। হিন্দুচিন্তাধারা বলিতে যদি ঔপনিষদ চিন্তাধারা বুঝায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে ইহা নিরাশাবাদী নহে। যে উপনিষদের ঋষিগণ বলিতে পারিতেন "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (এইখানে, এই দেহেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে) এবং যাহারা ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেন কোনো অতি উর্বর কল্পনাতেও তাহাদের নিরাশাবাদী বলিয়া কল্পনা করা যায় না। উপনিষদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকে[৮]:

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি। অর্থাৎ (পশ্য বা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করেন না। রোগও অনুভব করেন না, এবং দুঃখও অনুভব করেন না; পরন্তু পশ্য ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সর্ববিষয় প্রাপ্ত হন)।

ইহাকে কোনোরূপেই নিরাশাবাদ বলিয়া গণ্য করা যায় না। এ কথা সত্য যে প্রাচীন ঋষিদের এই প্লবমান আশাবাদ পরবর্তী কালে অনেকখানি স্তিমিত হইয়া আসে, আর অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। এই দৃষ্টিতে অশিবের অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করা হয় যে অশিব কলঙ্কনীয় নয়—অর্থাৎ স্বীকার করা হয় যে অশিব আছে কিন্তু অশিব হইতে আত্মরক্ষা করার শক্তিও মানুষের আছে। শোপেনহাউয়ের যে অর্থে অশিব কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন সে অর্থে অশিবের, অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় অশিবের, স্থান ভারতীয় চিন্তাধারায় নাই। ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনই সর্বাপেক্ষা নিরাশাবাদী দর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু এই দর্শনেও অশিবকে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করা হয় নাই কেননা ইহাতে একথা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে তৃষ্ণোচ্ছেদ (বা কামনা-বাসনার মূলোৎপাঠন) করিলে নির্বাণ অধিগম্য হয়, আর নির্বানলাভের পর সর্বরূপ দুঃখদৈন্যের অবসান ঘটে। মানুষের মুক্তির সম্ভবপরতা স্বীকার করে না—ভারতীয় দর্শনে এমন কোনো চিন্তাধারার সাক্ষাৎ মিলে না।

তাহা হইলে বলা যায় যে শোপেনহাউয়েরের নিরাশাবাদ ভারতীয় দর্শন হইতে আহরিত হয় নাই। ধারণা, শান্তি ও প্রশান্তির প্রতি শোপেন্‌হাউয়েরের যে অনুরাগ তাহা মনন-উদ্ভূত, আর এ অনুরাগ ভারতীয় চিন্তাধারার দান। এ কথা

অনস্বীকার্য যে মননানুরাগী জীবনের প্রতি তাহার যে সুতীব্র আকর্ষণ তাহার মূলে ছিল ভারতীয় দর্শন। ধারণা ও ইহার বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে যেখানে তিনি আলোচনা করিয়াছেন তাহার রচনার সে অংশগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ—এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। দুঃখের বিষয় যাহা তাহার প্রাণের কথা তাহাকে তিনি তাহার তাত্ত্বিক জগতে উচ্চাসন দিতে পারেন নাই, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল পশ্চাদ্দেশের একটি গৌণাসন। তাহার এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের কারণ বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব—প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মধ্যে যে প্লবমাণ আশাবাদ দেখা যায় সেই আশাবাদে আস্থার অভাব।

তথাচ ধারণাই তাহার চিন্তার কেন্দ্রস্থল, এ কেন্দ্রবিন্দুই তাহার মননের আশ্রয়। মিল্‌টনের "পারাডাইস্ লস্ট"-এ শয়তানের যে স্থান শোপেনহাউয়েরের রচনায় ধারণারও তদনুরূপ স্থান। বাইবেলের ঐতিহ্য অনুসরণের প্রয়োজনে মিল্‌টনের শয়তানকে অতিশয় দুরাত্মারূপে চিত্রিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, মিল্‌টনের সমালোচকরা যথার্থই বলিয়াছেন, শয়তানই উক্ত মহাকাব্যের প্রকৃত নায়ক। সেইরূপ যদিও শোপেন্‌হাউয়ের তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া ধারণাতত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। তবু অণু প্রবৃত্তিকে সৎ-এর জগতে সর্বপ্রধান স্থান দিয়া তিনি যে "প্রাথমিক পাপ" করিয়াছেন তাহার ফলে ধারণাকে তাহার তত্ত্বজগতে গৌণ স্থান দিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রায়ই এ বিপর্যয় ঘটিতে দেখা যায়। দেখা যায়—আধুনিক মূল্য বিষয়ক দর্শন বস্তুত মূল্যের আত্মাহুতির অবিচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত, সৎ-এর বেদীমূলে মূল্যের বলিদানের বিবরণ। বস্তুত সৎ অনেকটা অমোঘ মোলক্ দেবতায় পরিণত হইয়াছে; মূল্য বলি দিয়া এই নিষ্ঠুর (শিশুখাদক) দেবতাকে তুষ্ট করিতে হয়।

দর্শন সমালোচকরা প্রায়ই শোপেন্‌হাউয়েরকে হেগেলের সঙ্গে তুলনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে সাধারণত বলেন যে হেগেলীয় দর্শনের চেয়ে শোপেন্‌হাউয়েরের দর্শন অধিকতর প্রাণবন্ত। আর এখানেই শোপেন্‌হাউয়েরের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হেগেলের দর্শনই অধিকতর প্রাণবন্ত। হেগেলের চিন্তাধারা ছিল বিদ্রোহী। চিন্তা বলিতে সাধারণত যে স্থৈর্যের ধারণা আমাদের মনে আসে হেগেলীয় চিন্তা-ধারায় সে স্থাণুতা ছিল না। নিজের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এই চিন্তার ধর্ম নয়, ইহার ধর্ম নিজের বাহিরে আসিয়া বিরুদ্ধ চিন্তার সহিত যুক্ত হওয়া। এজন্য হেগেলের দর্শনে চেতনা বা চিন্তা আর সৎ-এর মধ্যে কোনো ভেদ নাই, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা অভিন্ন। হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যা দর্শনের রাজ্যে এক বিপ্লব সূচনা করিয়াছে; ইহার

উদ্দেশ্য সৎ-স্বরূপের অবধারণ। এজন্য এরিষ্টটলের আকার-বিষয়ক আর কাণ্টের বিষয়-বিষয়ক যুক্তিবিদ্যা হইতে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যাকে সৎ-বিষয়ক যুক্তি-বলিয়া অভিহিত করা যায়।[৯]

দুইটি ব্যাপারে কিন্তু শোপেন্‌হাউয়ের হেগেলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ মৌল সত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপকরণ-গুলির অবচ্ছেদন দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে চৈতন্য-শক্তি তত্ত্বের সাহায্যে শ্রীঅরবিন্দ এইরূপ অবচ্ছেদন করিয়াছেন, দেখাইয়াছেন যে তাহার কল্পিত ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি বর্তমান। সেইরূপ শোপেন্‌হাউয়েরও দেখাইয়াছেন যে সৎ-এর মধ্যে জ্ঞান উপকরণ ছাড়া আরও একটি উপকরণ বর্তমান, তাহা হইল প্রবৃত্তি। হেগেলের সর্বগ্রাসী মূল সূত্রের, পরাচৈতন্যের, মধ্যে প্রবৃত্তির স্থান নাই, সব কিছু এক অদ্বৈতের মধ্যে বিলীন। এই একক চৈতন্যকে দিয়া হেগেল তাহার দর্শনে জ্ঞানের কাজ চালান, আবার প্রবৃত্তি ও বোধির কাজও চালান।[১০] দ্বিতীয়তঃ শোপেন্‌হাউয়ের দেখান যে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন নয়, কোনো তাত্ত্বিক যাদুতে এ ক্রম-বিচ্ছিন্নতাকে অবিচ্ছিন্নতায় রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং এ তত্ত্বকে আমরা এক প্রকারের উৎক্রান্তিশীল অভিব্যক্তিবাদ বলিতে পারি।[১১] বর্তমান প্রবন্ধের লেখক অন্যত্র দেখাইয়াছেন যে সৎ-কে মূল্য হিসাবে দেখিলেও উক্ত অভিব্যক্তি তত্ত্ব সমভাবে গ্রাহ্য। এই তত্ত্ব হেগেলের অনবিচ্ছিন্নতা বিশেষিত অভিব্যক্তিবাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত; কারণ তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সৎ-কে দেখিলে হেগেলীয় তত্ত্ব দিয়া কাজ চলে সত্য, কিন্তু সৎকে পরামূল্য হিসাবে দেখিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

সংক্ষেপে, বিশ্বাভিব্যক্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য—এ স্বীকৃতির গুরুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শোপেন্‌হাউয়ের একটি অত্যাবশ্যকীয় দার্শনিক কর্ম করিয়াছেন। কিন্তু প্রবৃত্তিকে অন্ধ শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। দেখান যায় যে এই ভুলের পরিণতি তাহার নিরাশাবাদ। আমরা এখন এমন একজন দার্শনিকের কথা বলিব যিনি প্রবৃত্তির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াও ইহাকে অন্ধশক্তিরূপে কল্পনা করেন নাই এবং সেইহেতু শোপেন্‌হাউয়েরের নিরাশাবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছেন।

২। ফ্রিড্রিশ্ নিট্স্শে (১৮৪৪-১৯০০)

নিট্স্শে প্রথম জীবনে শোপেন্হাউয়ের ও হবাগ্নের-এর, বিশেষত হবাগ্নের-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাহার প্রথম বই ডি গেবুর্ট ডের ট্রাগ্যেডি (বিয়োগান্ত নাটকের জন্ম)-এর পাতায় পাতায় হবাগ্নেরের উদ্দেশ্যে সোচ্ছ্বাস সাধুবাদ। এ বইর প্রধান লক্ষ্য স্বভাব ও শীলনের সংযুক্তিকে, ডায়োনি-সীয় ও এ্যাপোলনীয় দৃষ্টিভঙ্গির মিলনকে, আদর্শ হিসাবে দাঁড় করান। তাহার পরবর্তী ডি উনৎসাইট গেম্যায়সে বেট্রা কুটুংগেন্ (অ-কালোচিত বিচার) ১৮৭৩-৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা একটি দীর্ঘ-প্রবন্ধ সংকলন। ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ডাফিড ষ্ট্রাউস্। ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধে জার্মাণীর জয়লাভের পর যে নব্য জার্মান জাতিচেতনার উদ্ভব হয় নিট্স্শের মতে ষ্ট্রাউস্ তাহার সর্বাপকৃষ্ট রূপের প্রতিনিধি। আর একটি প্রবন্ধের বিষয় ইতিহাসের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ। তৎকালীন জার্মাণীতে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইতিহাসের অবদানের উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ করার ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে নিট্স্শে সেই ঝোঁকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এই সংকলনের আর একটি প্রবন্ধেয় বিষয়বস্তু-শিক্ষাবিদের ভূমিকায় শোপেন্হাউয়ের। শোপেন্হাউয়েরের রচনা তাহার পাঠকদের কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, কিরূপে তাহাদের সংস্কারমুক্তি ঘটাইয়াছিল উক্ত প্রবন্ধ তাহারই বিবরণী। অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে বেরয়থ্-এ হবাগ্নের-এর কথা। শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ পায় যে হবাগ্নেরের সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিট্স্শের মনেও দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধার পরিণতি ১৮৭৬ সালের বেরয়থ্ উৎসবের সময় হ্বাগ্নেরের সঙ্গে তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ!

তাহার পরবর্তী গ্রন্থ ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত মেনশ্লিশেস্ আলৎস্যুমেনশ্-লিশেস্ (মানবিক, শুধু মানবিক)-তে দেখা যায় যে হ্বাগ্নের ও শোপেনহাউয়েরের প্রভাব থেকে নিট্স্শে এখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি লক্ষ করিলেন যে বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় চিন্তায় যে জীবন বিমুখিতা হ্বাগণের ও শোপেন্হাউ-য়েরের মধ্যে সেই জীবন বিমুখিতার দিকেই ঝোঁক। উপরোক্ত গ্রন্থখানি তাহার রচনার একটি বিশেষ পর্বের সূচনা। এ পর্বকে বলা যায় নেতিবাচক সমালোচনা পর্ব। তাহার প্রধান রচনা সমূহ যেমন ১৮৮১ তে প্রকাশিত মরগেন্র্যোট্হে (প্রভাতোন্মেষ), ১৮৮২ তে প্রকাশিত ডি ফ্রেলিশে হ্বিসেন্শাফট্ (পুলকিত বিজ্ঞান) এবং ১৮৮৬ সালের ইয়েনজাইটস্ ফন্ গুট্ উণ্ট রোজে (ভাল ও মন্দের ওপারে)

-এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহার সমসাময়িক প্রাণোচ্ছ্বাসবাদ প্রভাবিত শিল্প, ধর্ম ও নীতির চলিত ধারণাগুলিকে এই বইগুলিতে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। অবশ্য, অচিরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার নিজের দর্শনও এক ধরণের প্রাণোচ্ছ্বাসবাদ।

আলজো স্প্রাখ্‌ ৎসারাটহস্‌ট্রা (জরুথুস্ত্রের বাণী) (১৮৮৩-৯১) একখানি অনুপম গ্রন্থ। ইহাকে কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাহার রচনার মধ্যে ইহাই সব চেয়ে বেশি স্বচ্ছ, ব্যক্তিমানসের আলোয় ইহা উদ্ভাসিত। এ বইতে তিনি হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার রচনা শৈলী অন্যান্য বইর রচনাভঙ্গি হইতে পৃথক ; এ শৈলী বাইবেলের রচনাভঙ্গির মত, মনে হয় বইখানি যেন মন্ত্রদাতা গুরুর বাণী সংগ্রহ। ইহার যাহা শিক্ষা তাহা ইরাণীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরুথুস্ত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে। কতকগুলি সদ্‌গুণের জন্য যে গুণগুলিকে নিটস্‌শে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিতেন-নিটস্‌শে জরুথুস্ত্রকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন, এবং সেই হেতু তাহাকে নিজের তত্ত্বের মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন! অতিমানব-তত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। এই তত্ত্বের জন্য, এ উত্তরাধিকারের জন্য, নিট্‌স্‌শে আজিও স্মরণীয়। কাজেই উক্ত গ্রন্থখানিকে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিয়া নিটস্‌শে ভুল করেন নাই। এ কথা সত্য যে ব্রাণ্ডেস্‌ বইখানার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা একখানি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

ৎসুর গেনেয়ালগি ডের মরাল্‌ (নীতির জন্ম কাহিনী প্রসঙ্গে), ১৮৮৭, নিটস্‌শের রচনাবলীর সর্বশেষ ও পূর্বোক্ত পর্বের সন্ধিস্থল। সর্বশেষ পর্বের মধ্যে পড়ে : ডি গ্যেৎসেন্‌ড্যামেরুং (বিগ্রহের সন্ধ্যালোক) ১৮৮৬, ডের ফাল্‌ হ্বাগ্‌নেরস্‌ (হ্বাগনারের ব্যাপার), ১৮৮৮। নিট্‌স্‌শে কণ্ট্রা হ্বাগ্‌ণের (নিট্‌সশে বনাম আর এ্যান্টিখ্রাইষ্ট সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় নিট্‌স্‌শের রচনা সংগ্রহ সংস্করণে। এবং একৃসি্ হোমো আর ডের হিল্‌ ৎসুর মাখ্‌ট্‌ (ক্ষমতা অভিপ্সা) প্রকাশিত হয় তাহার মৃত্যুর পর।

১৮৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে নিট্‌স্‌শে বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। ইহার পরও তিনি এগার বছরের কিছু অধিককাল বাঁচিয়া ছিলেন ; ১৯০০-এর ২৫শে আগষ্ট তাহার মৃত্যু হয়। তাহার চিত্তভ্রংশের কারণ অতিশ্রম ও আত্যন্তিক একাকিত্ব। শেষোক্ত কারণের কথা তিনি নিজেই তাহার ভগ্নির নিকট ১৮৮৬-র ৮ই জুলাইতে লিখিত পত্রে [১১] উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "বাস্তবিক আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেবল্‌ আমার হৃদয় অত্যধিক সংবেদনশীল এবং আমার নিজের মত কয়েকজন বন্ধুর আকাঙ্খায় আকুল। যদি আমি একটু ক্ষুদ্র

বন্ধু গোষ্ঠী পেতাম, যে বন্ধুরা আমার কথা শুনবে, আমায় বুঝবে-তাহলে আমি সেরে উঠতাম"। তাহার বাতুলতার সঠিক কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জেমস্ হেষ্টিংস সম্পাদিত "এ্যানসাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজিয়ন্ এ্যাণ্ড এথিকস্"-এর অন্তর্ভুক্ত নিট্‌স্‌শে বিষয়ক প্রবন্ধে যথার্থ ই বলা হইয়াছে যে "উন্মাদ হইয়া গেলেও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে সাধারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে না নিট্‌স্‌শের দৃষ্টান্ত সম্ভবত তাহারই আর একটি সাক্ষ্য"।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে নিট্‌স্‌শের দর্শন শোপেন্‌হাউয়েরের ইষ্টিবাদের পরিবর্ধিত রূপ। তবে নিট্‌স্‌শে শোপেন্‌হাউয়েরের নিরাশা-বাদ বর্জন করিয়া কেবল ইষ্টিবাদ গ্রহণ করেন। শোপেন্‌হাউয়ের মনে করিতেন, কিন্তু নিট্‌স্‌শে মনে করিতেন না, যে প্রবৃত্তি অশিব। অপরপক্ষে নিট্‌স্‌শের মতে যাহা কিছু প্রবৃত্তি পীড়ন করে তাহাই অশিব। প্রচলিত নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ এই যে প্রচলিত নীতি ও ধর্মে প্রবৃত্তির স্ফুরণের স্থান নাই। শোপেন্‌হাউয়েরের সঙ্গে তাহার আরও একটি বিষয়ে মতভেদ আছে। শোপেন্‌হাউয়েরের মতে প্রবৃত্তি বিশ্বজাগতিক ব্যাপার। কিন্তু নিট্‌স্‌শে এইরূপ সার্বিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহার মতে প্রবৃত্তি মাত্রই ব্যক্তিগত। বস্তুত তাহার দর্শনে কোনো বিশ্বগত সূত্রের স্থান নাই শোপেন্‌হাউয়েরের অন্তবর্তী নির্বিচারবাদ অনুসারে সমগ্র বিশ্ব এক বিশ্ব-প্রবৃত্তির বিশ্বব্যাপক অভিব্যক্তিস্বরূপ। একটি অভিব্যক্তি-ফলের সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য স্তরভেদের পার্থক্য।

নিট্‌স্‌শের দর্শনে কোনো বিশ্বমানসের স্থান নাই; আছে কেবল ব্যক্তি—সংগ্রামশীল ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামীরূপে, অর্থাৎ প্রবৃত্তি পরিচালিত পদার্থরূপে, কল্পিত ব্যক্তি। আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিকে সর্বদা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বপ্রকার মিথ্যা ও ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, এবং ডায়োনিসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং শান্তি-অভিলাসী ও পরিবেশের সহিত সংগতিকামী এ্যাপোলনীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিতে হইবে। এজন্য, যে সব মতবাদ নিয়তির বিধানের নিকট প্রশস্ত আত্মসমর্পণের উপদেশ দেয়, নিট্‌স্‌শে সে সব মতবাদের বিরোধী। মানুষের যে ধর্মকে তিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করেন তাহা হইল—সর্বপ্রকার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রবণতা আর নির্বোধ ও অন্ধ অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামপ্রীতি।

ইহা নিট্‌স্‌শের দর্শনের নেতিবাচক দিক, তাহার গঠনমূলক দর্শনের ভূমিকামাত্র। শোপেন্‌হাউয়ের তত্ত্ব নেতিবাচক, কিন্তু নিট্‌স্‌শে কেবল নেতিবাচক তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ

থাকেন নাই। "অমিত বীর্যবান মানুষ" বা প্রতিভাবান পুরুষ স্বজনের প্রয়োজন প্রদর্শনই তাহার বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্দেশ্য ; উক্ত উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বপ্রকার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সমস্ত বিধানের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রোটাগোরাসের উক্তি ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, সব কিছুর মানদণ্ড মানুষ— কিন্তু যে কোনো মানুষ নয়, বিশেষ প্রকারের মানুষ, নরোত্তম। তাহার মতে ইতিহাস সাধারণ মানুষের কাহিনী নয়, প্রতিভাবান পুরুষদের ইতিবৃত্ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, "ইউজ্ এ্যাণ্ড এ্যাবিউজ অব হিস্ট্রি"-তে তিনি বলিয়াছেন, "এমন দিন আসিবে যখন আমাদের বিশ্ব জাগতিক স্বজন-ধারা হইতে, এমন কি মানুষের ইতিহাসের ধারা হইতেও, দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে ; সেদিন জনগণ আর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হইবে প্রতিভাবান পুরুষের উপর। তাহারাই বিমলিন উদ্‌গতি স্রোতের উত্তরণ সেতু। লিশ্‌টেন্‌বেরগের তাহার "গস্‌পেল্ অব সুপারম্যান"-এতে দেখাইয়াছেন যে : নিট্‌স্‌শের মতে একপাল মানুষ ডজনখানিক মহামানব স্বজনের পরোক্ষপন্থা ; প্রকৃতি এই ঘুরপথে প্রতিভা স্বজন করে ; এবং তিনি এই নীতি রচনা করিয়াছেন যে "পৃথিবীতে প্রতিভাবান পুরুষদের আনয়নের উদ্দেশ্যেই মানুষের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত, ইহাই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন করণীয় নাই।" এজন্য নিট্‌স্‌শে বলেন যে মানুষ স্বজন-পথে একটি ক্ষণস্থায়ী বিরাম-ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার গন্তব্যস্থল অতিমানব স্বজন। "দাস্ স্পেক্ জেরাথুস্ট্র"-তে তিনি মানুষকে শুধু একটি সেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ পুস্তকের এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন" ; ১২ "মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হইল এই যে সে সৃষ্টিপথের সেতু, লক্ষ্যস্থল নহে। মানুষের মধ্যে যাহা আমাদের প্রিয় তাহা হইল এই : মানুষ একটি বিলীয়-মান পর্ব, একটি পর্যায়-সন্ধি। উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে "মানুষ (নামক সৃষ্টি পর্ব) অবশ্য অতিক্রমনীয়।" এ জন্য নিট্‌স্‌শে অতিমানবকে বজ্রাগ্নির সহিত তুলনা করিয়াছেন। বজ্রাগ্নি যেমন সবকিছু দীর্ণবিদীর্ণ করিয়া দেয় অতিমানবও সেরূপ সব তুচ্ছতা ও আবিলতা ধ্বংস করিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

পুরাতনের চিন্তাভস্ম থেকেই নবীনের অভ্যুদয়। কেবল পরিবর্তন বা রূপান্তর হইতে নবীনের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে ; নবীনের আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন পুরাতনের পূর্ণ বিনাশ। ক্ষীনপ্রাণ ও জরাজীর্ণের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় নিট্‌স্‌শের কোনো আস্থা ছিল না। তাহার মতে এ সম্পর্কে একমাত্র গ্রাহ্য পন্থা ইহাদের সম্পূর্ণ সংহার। নীতিশাস্ত্রে ইহার তাৎপর্য হইল মূল্যমানের পূর্ণ পরিবর্তন, অর্থাৎ নিট্‌স্‌শে

যাহাকে মূল্যের অতিমূল্যায়ণ বলেন তাহার দ্বারাই উন্নতর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। প্রচলিত নীতি অনুসারে পরপীড়ন, অত্যাচার বা শোষন হইতে বিরত থাকা একটা সদ্গুন। নিট্‌স্‌শের মতে জীবন বিমুখিতাই উক্তরূপ নীতির ভিত্তি, সুতরাং স্বতঃ-নিন্দিত ; কেননা তাহার মতে জীবনের ধর্ম অজানাকে বশ করা, দুর্বলকে আত্মসাৎ, নিপীড়ন ও বশীভূত করা, জীবনের ধর্ম দমন, নির্মমাচরণ, বিকার-ব্যাহতকরণ, করায়ত্তকরণ এবং, ন্যূনপক্ষে, শোষন। শোষন কেবল দুর্নীতি পরায়ন বা অনুন্নত আদিম সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা প্রাণীমাত্রেরই স্বধর্ম, প্রাণীদেহের প্রাথমিক জৈবপ্রক্রিয়া, সহজাত প্রাণধারন প্রবৃত্তির অনুবন্ধী পরিণতি"।১৩

নিট্‌স্‌শে মনে করেন যে নীতি দুই প্রকার প্রভু-নীতি ও ভৃত্য-নীতি। বর্তমানে যাহা নীতি বলিয়া প্রচলিত তাহাকে তিনি ভৃত্য-নীতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় প্রচলিত নীতি অনুসারে সমবেদনা বা সহানুভূতি অতিশয় মূল্যবান, কিন্তু নিট্‌স্‌শের মতে ভৃত্য নীতি ভিন্ন অন্য কোনো দিক হইতে ইহাকে সদ্গুন বলা যায় না। প্রভু-নীতি বা "মহান" নীতিতে সহানুভূতির কোনো স্থান নাই নিট্‌স্‌শের নিজের ভাষায় "মহামানব নিজেকেই মূল্যের বিধায়ক মনে করে, সে কাহারও অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না। তাহার বিচার এরূপ : 'আমার পক্ষে যাহা ক্ষতিকর তাহা স্বতঃই ক্ষতিকর'। সে জানে যে সে নিজেই বস্তুর উপর মূল্য আরোপ করে, সে-ই মূল্যের স্রষ্টা। তাহার নিজের মধ্যে যাহা আবিষ্কার করে তাহাকেই সে মূল্যবান মনে করে। প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ নীতি হইল আত্মগরিমাকীর্তন। মহামানব চারিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋদ্ধিবোধ, কূলছাপান শক্তিচেতনা, উগ্র উদ্ধতির আনন্দ ও বিতরণোন্মুখ সম্পদ চেতনা। মহামানব দুর্ভাগাদেরও সাহায্য করে, কিন্তু সাহায্য করে করুণাবশে নয়, দুর্নিবার শক্তি-চেতনার আতিশয্য উদ্ভূত আবেগবশে।" উপরোক্ত ভঙ্গিতে আরও অগ্রসর হইয়া নিট্‌স্‌শে বলিয়াছেন "এই জাতীয় মানুষ (অতিমানব) এই বলিয়া গর্ববোধ করে যে 'সহানুভূতি প্রদর্শন আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। মহান বীরগাঁথার এই মহানায়ক উল্লাসভরে ঘোষণা করে : 'নিষ্করুণ হৃদয় লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে নাই সে কখনও আর পাষান হৃদয় হইতে পারে না।' যে-নীতি দেসিন্‌তেরেসম (পর পরায়ণতা) তে—অর্থাৎ সহানুভূতিতে বা অন্যের মঙ্গলের জন্য কৃত কর্মে-নীতির যাথার্থ্য দেখিতে পায় সেই প্রচলিত নীতির সহিত উক্তরূপ মহান বীরপুরুষদের চিন্তাধারার কোনো সম্পর্কই নাই।"

উক্তরূপে নিট্‌স্‌শে তাহার কল্পিত মহামানব ও মহামানবের নীতির, তাহার

ভাষায়—প্রভু-নীতির, বর্ণনা করিয়াছে। এই বর্ণনায় দেখি "নির্ভীক-জীবন দর্শন"-এর বল্গাহীন বাতুলতা। কিন্তু কেবল নীতিসৌধ ধ্বংস করিয়াই তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাহার উন্মত্ত দর্শন—শক্তি-অভিপ্সা দর্শন—যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ভিত্তিভূমিও দুর্বল করিয়া দিয়াছে। কারণ, কেবল যে নীতির ক্ষেত্রে তিনি তাহার মূল্যের অতিমূল্যায়ন তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নহে, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও তিনি উক্ত তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন: ১৪ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে—এরূপ কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য হই কিসের জোরে? কেন, এ কথা স্বীকার করাই কি যথেষ্ট নয় যে আপাত দৃষ্টতার মাত্রাভেদ আছে, যেমন আছে সাদৃশ্যের হাল্কা ও গাঢ় বর্ণরাগের, চিত্রকরদের ভাষায়, বিভিন্ন ভ্যাল্যর-এর। এইরূপে নিট্‌সশে সত্য ও মিথ্যার বিভেদ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন, যেমন চাহিয়া ছিলেন শিব ও অশিবের পার্থক্য দূর করিতে। কিন্তু উক্তরূপ প্রচেষ্টার কোনো অর্থ আছে কি? বর্তমান প্রবন্ধের লেখক অন্যত্র দেখাইয়াছেন যে সত্য ও শিবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া না লইলে অর্থবহ কোনো আলোচনাই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর নিট্‌সশে নিজেও উক্ত প্রভেদসমূহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি যাহা দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা হইল এই যে শক্তি-অভিপ্সাই একমাত্র সত্য, আর অতিমানবতাই একমাত্রশ্রেয়।

টীকা

১। দ্রষ্টব্য: "দি ওয়ার্ল্ড্ এজ্ উইল্ এ্যাণ্ড আইডিয়া" (হলডেন ও কেম্প অনূদিত) এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ।

২। দি ওয়ারল্ড্ এজ উইল্ এ্যাণ্ড আইডিয়া, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ৫৪ম বিভাগ।

৩। দ্রষ্টব্য: পাবেরগা উন্টপারালিপোমেনা।

৪। ঐ

৫। ম্যাকেন্‌জি: ম্যানুয়েল অব এথিকস্, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১১শ বিভাগ।

৬। দি ওয়ারল্ড এজ উইল্ এ্যাণ্ড আইডিয়া, ২য় খণ্ড ১৮শ অধ্যায়, ৩০৭-৮ পৃ: (হলডেন ও কেম্প-এর অনুবাদ)।

৭। হফ্‌ডিং: হিস্ট্রি অব্ মডার্ণ ফিলজপি (বি, ই, মায়ের-এর অনুমোদিত অনুবাদ), ২য় খণ্ড ২২৬ পৃ:।

৮। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭,২৬,২।

৯। দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ—লজিক্ অব্ দি রিয়েল (প্রসিডিংস অব্ দি সেকেণ্ড সেশন অব দি ইন্‌ডিয়ান ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস, ১৯২৬)।

১০। মিউর : এ্যান ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু হেগেল।

১১। চতুর্থ সংস্করণের এ্যানসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় নিট্‌সশে বিষয়ক প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

১২। আলজো স্রাখ্‌ৎসারা টুহুস্টা (নয়মান্ সংস্করণ) ১৬ পৃঃ।

১৩। বিয়ণ্ড্ গুড অ্যাণ্ড ইভিল্ (হেলেনৎ সিমার্‌ন্ অনূদিত) ২৫৯ সংখক সূত্র।

১৪। ঐ ৩৪ সংখ্যক সূত্র।

১৫। দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখকের দি নিও রোমান্টিক মুভমেণ্ট্ ইন্ কনটেমপোরারি ফিলজপি, ৩৫-৩৬ পৃঃ।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইংরাজ-দর্শনে অধ্যাত্মবাদ

১। ভূমিকা

আধুনিক দর্শনে—বিশেষতঃ যে দর্শনের প্রবণতা মুখ্যতঃ সন্দেহ-বাদের অভিমুখে সেই সমসাময়িক ইংরাজ-দর্শনে—জগৎকে প্রত্যক্ষবাদ ও বস্তু-স্বাতন্ত্র্য-বাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার যে পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাহাতে হিউমের মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশীয় সন্দেহবাদী দার্শনিক যাহাকে মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞান এবং জগৎকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বলা যায় তাহার সামর্থ্য নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন; আবার অধ্যাত্মবাদী দর্শনে লোকে যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে মানবমনের প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতার প্রভাব অতিক্রম করা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের স্তরে উঠিয়া আমাদের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করা কত কঠিন। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে; যখন আমরা কোন দার্শনিক তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি তখন "ইহা কেবলমাত্র পণ্ডিতদের ন্যায় চিন্তা করা এবং সাধারণ লোকদের ন্যায় কথা বলার প্রশ্ন মাত্র নয় (বার্কলে যেমন মনে করিতেন); আমাদের সমস্যা কেবলমাত্র ভাষাগত নয় কিন্তু আমাদের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারার প্রভাবকে নিরাকরণ করা সম্বন্ধেই।"[১]

চিন্তার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অধ্যাত্মবাদের স্থায়ী দান কি তাহা এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার ভাণ করা যে হাস্যকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন দার্শনিক মতবাদ যে সকল প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়াছে সেইগুলিকে প্রথমে আলোচনা করা এবং এই সকল প্রতিক্রিয়ার কারণসমূহ পর্যালোচনা করাই উহাকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ পরোক্ষ প্রণালী দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলিয়া টি এইচ্ গ্রীণ যে প্রখ্যাত অধ্যাত্মবাদের প্রবর্তক এবং এফ্ এচ্ ব্র্যাড্‌লে, বি বোসাঙ্কেট এবং ম্যাক্‌টাগার্টের হস্তে যাহা বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই অধ্যাত্মবাদের কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিক্ সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করা হইবে। এই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেও আবার তত্ত্ববিশ্লেষণের যে সকল মূল্যবান চিন্তাধারা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অধ্যাত্মবাদ যথার্থই গর্ব অনুভব করিতে

পারে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির আলোচনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। দার্শনিক মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে কেবলমাত্র অজ্ঞতা বৃদ্ধি করে তাহা বুঝিলেও আমরা একটি প্রখ্যাত চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, এবং ইহা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেক লেখা হইলেও ইহার যে দিকটি কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই অথবা অবহেলিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

২। টমাস্ হিল গ্রীন (১৮৩৬-৮২ খৃঃ)

ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে যে "গ্রীণের পূর্বে নয় কিন্তু গ্রীণের সময়েই জার্মান অধ্যাত্মবাদ এ্যাংলো সাক্সন ভূখণ্ডে যথার্থই তাহার কাজ আরম্ভ করিয়াছিল।"[২] ইহাও সত্য যে "গ্রীণই প্রথমে ব্রিটেনের সযত্নরক্ষিত দার্শনিক সীমান্তকে নূতন চিন্তার অবাধ প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" গ্রীণ তাঁহার গ্রন্থগুলিতে স্বভাববাদ এবং অজ্ঞেয়বাদ এই দুই ঐকান্তিক মতবাদকে পরিহার করিয়া একটি সমন্বয়মূলক মতবাদ গঠন করিবার এক সবল চেষ্টা করিয়াছিলেন এইরূপ বলিলে এই নূতন স্থানে নূতন চিন্তাসমূহ যে কার্য করিতেছিল তাহার মূল্য ভালভাবে বুঝা যাইবে। একদিকে মিল্, লিউইস্, স্পেন্সার কর্তৃক গৃহীত জগৎ সম্বন্ধে স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপরদিকে ম্যান্সেল এবং হ্যামিলটন প্রভৃতি কর্তৃক সমর্থিত অজ্ঞেয়-বাদের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁহার চিন্তার গতি নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল। কাণ্ট এবং হেগেলের মতবাদে যেরূপ সম্পূর্ণভাবে স্বভাববাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং "হেগেলীয় চশমা পরিয়া" কাণ্টের দর্শন পাঠ করিয়া অজ্ঞেয়বাদ পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বভাব-বাদের বিরুদ্ধে গ্রীণ যে যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার 'সম্বন্ধ' বিষয়ক মতবাদে পাওয়া যায়। এই মতবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে সম্বন্ধগুলিকে জ্ঞেয় বস্তুগুলির মধ্যে সম্বন্ধ এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। কোন বস্তু হইতে দেশ, কাল ও কার্যকারণঘটিত সম্বন্ধগুলি অপসরণ করিলে তাহা যে আমাদের পক্ষে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়—কাণ্টের এই মত সামান্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পুনরায় প্রতিপাদন করিয়া বস্তুগুলির মধ্যে সম্বন্ধ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন এ বিষয়ে তাহাই তাঁহার দান। কোন বস্তু যে প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া পরে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় এমন নহে, বরং কোন

বস্তুকে থাকিতে হইলেই উহাকে দেশ-কাল এবং কার্য-কারণ-ঘটিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কাণ্ট হিউমের সমস্যার যে সমাধান করিয়াছিলেন ইহাই তাহার সার কথা। সকল বস্তুই পরস্পর হইতে পৃথক, তাহাদের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ বহু পর্যবেক্ষণের ফলে প্রাপ্ত দুইটি বস্তুর মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে হিউমের ছিল ইহাই মত। কিন্তু কাণ্টের মতে তথাকথিত পৃথক বস্তুগুলি কাল্পনিক মাত্র; প্রত্যেক জ্ঞেয় বস্তুকে অন্ততঃ দেশ ও কালে একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে হইবে, এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ সার্বিক এবং অবিচ্ছেদ্য হইলে তবেই বস্তুর পক্ষে দেশ কালে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান সম্ভবপর। এইজন্যই কাণ্ট বলিয়াছেন যে, বস্তু সমূহের ক্রিয়া এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি (Analogies of Experience)র বিশেষত্ব হইতেছে এই যে বস্তুগুলির অস্তিত্ব এবং ঐ অস্তিত্বের নিয়ামক পারস্পরিক সম্বন্ধগুলিই উহাদের বিষয়।

গ্রীণ যে কাণ্টের বিশ্লেষণের মৌলিক সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; সেই জন্যই বুদ্ধি জগৎকে নির্মাণ করে এই মতবাদকে সমর্থন করিয়াই তিনি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাণ্টের মতকে যেরূপ নূতন-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়ত কাণ্টের পক্ষেও কঠিন হইত। কাণ্ট 'বুদ্ধি' (Understanding) শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে যেন মনে হয় যে ইহা মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে একটি বৃত্তি; কিন্তু গ্রীণ ইহাকে যাবতীয় বিশিষ্ট বস্তুর অপেক্ষিত সর্বসাধারণ নিয়ামকতত্ত্ব অর্থেই লইয়াছেন। গ্রীণ বলেন "চিন্তা (Thought) বলিতে যদি একটি মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই না বুঝায় তাহা হইলে যাহা জ্ঞেয় বস্তুগুলিকে নির্মাণ করে তাহা চিন্তনকারী জ্ঞাতা ভিন্ন আর কিছু নয় এইরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধ অসঙ্গতি হইবে।"[৩] সুতরাং তাঁহার পরামর্শ এই যে, কাণ্ট প্রদত্ত অনুভবের বিশ্লেষণের মর্মগ্রহণ করিতে হইলে 'বিশিষ্ট বস্তু সমূহের' সমষ্টিকে জানিবার জন্য "আমরা যে চিন্তা ব্যবহার করি সেই চিন্তা সম্বন্ধে আমাদের অভ্যস্ত ধারণাগুলিকে পরিবর্তন করিতে হইবে"। কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বের যে বিষয়ীনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, যদিও তাঁহার জ্ঞানবিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যক্ষবাদীদের যে চেষ্টা তাহা একান্ত নিষ্ফল, তাহা হইলেও জ্ঞান এবং চরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলিকে মনোবিজ্ঞানের

দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাধানের চেষ্টা করিতে গেলে যে সকল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাচক এবং দ্বিত্ববাচক বাক্য অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া পড়ে সেগুলি হইতে তিনি সব সময়ে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষবাদ এবং বুদ্ধিবাদ এই দুইয়ের মধ্যে সুদীর্ঘদ্বন্দ্বের ফলে যে দার্শনিক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং চিন্তা মাত্র এই দুইটিকেই জ্ঞানের সম্ভাব্য উৎস বলিয়া মনে করা হইত এবং ইহা ধরিয়া লওয়া হইত যে জ্ঞান হয় প্রত্যক্ষ না হয় চিন্তা এই দুইটির মধ্যে একটি হইতে উৎপন্ন হইবে। জ্ঞান্ যে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অথবা কেবলমাত্র চিন্তা হইতে উৎপন্ন হয় না, পরন্তু তাহাদের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়, দ্বিত্ববাদীয় ঐতিহ্যের প্রভাবে কাণ্ট প্রথমে এই কথা বলিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং চিন্তা যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন গ্রহণ করিবার ক্ষমতারূপে অপর একটি মনোবৃত্তির মতই একটি মনোবৃত্তি, কাণ্ট এই অর্থেই 'চিন্তা' শব্দটিকে ব্যবহার করিতে থাকিলেন। বৌদ্ধিক আকারগুলি ক্রিয়া না করিলে কোন জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না ইহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "কোন কিছু কি অধিকার বলে আছে ?" এই প্রশ্নের উত্তর "বস্তুতঃ কি আছে" এই প্রশ্নের উত্তর হইতে পাওয়া যাইবে না এবং বৌদ্ধিক আকারগুলি প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে জাত এই কথা বলিলে ইহারা সম্পূর্ণ বিজাতীয় বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই কথা বলিয়া তিনি যে মনোবিজ্ঞান মনের বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করে (Faculty Psychology) তাহা দ্বারা সমর্থিত যে দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে জ্ঞানের উৎপত্তির প্রশ্ন অর্থযুক্ত হয় তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছেন।

সাধারণতঃ যাহাকে বস্তুনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ অথবা সর্বাতিঃক্রমী অধ্যাত্মবাদ বলা হয় তাহাকে যাঁহারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণাবাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাহারা বস্তুভূত চিন্তার যে ভাবগম্ভীর ধারণা হেগেলের সুনিপুণ-জ্ঞান-বিশ্লেষণের দিন হইতে অধ্যাত্মবাদের বহু মূল্যবান্ কৃতিত্বসূচক মতবাদের একটি হইয়া আছে তাহার প্রতি অবিচারই করিয়া থাকেন। হেগেল তাহার লেখার কয়েকটি বহুখ্যাত অথচ যাহাদের অর্থ-নিতান্ত ভুল বুঝা হইয়াছে এমন কয়েকটি অংশে আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, "চিন্তা" শব্দটি প্রত্যক্ষ, ধারণা, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বহু মনোবৃত্তির একটি এবং উহাদের সম-পর্যায়ভুক্ত চিন্তা করিবার বৃত্তি এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে অথবা ইহাকে 'প্রজ্ঞা' এই বস্তুনিষ্ঠ অর্থেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'মানুষ চিন্তা করে' যখন এই কথা বলা হয় তখন এই দ্বিতীয় অর্থেই বলা হয় এবং চিন্তক

হিসাবে মানুষ সার্বভৌমিক। গ্রীণও সেইরূপ জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, চিন্তনক্রিয়ার কর্তা বিষয়ী জগতের মূলস্বরূপ, অধ্যাত্মবাদী যে এই কথা বলেন তাহা চিন্তাকে একটি মনোবৃত্তি মাত্র বলিয়া মনে করিলে "যুক্তিবিরুদ্ধ অসঙ্গতি" হইবে, এবং এইজন্যই স্নাতক-শ্রেণীর ছাত্রদের অধ্যাত্মবাদের ধারণাকে তিনি যে কেন অবজ্ঞাভরে নিন্দা করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়।

দেকার্ৎ হইতে হিউম্ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তার যে বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহাতে জ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল দ্বিত্ববাদমূলক মতের আবির্ভাব হইতে বাধ্য তাহাদের সর্বনাশকর কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তনক্রিয়াশীল দ্রব্য এবং দেশে বিস্তৃত দ্রব্য এই দুই প্রকার দ্রব্যের বৈপরীত্য দেকার্ৎ যেভাবে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের মন কিভাবে তাহার ধারণাগুলির গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে সে সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা হইতে ধারণা-প্রতীক বাদ (Representationism) এবং প্রায়শঃই ঈশ্বরীয় কার্যের ব্যাখ্যা রূপে নিমিত্তবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মতবাদের কৃত্রিমতা এবং অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি 'ধারণা' (Idea) শব্দের অর্থের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল এবং পরিশেষে বার্কলে বুঝিয়াছিলেন যে একটি ধারণা অপর একটি ধারণা ভিন্ন আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির পূর্ণ তাৎপর্য কি তাহা বার্কলে নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। দেকার্ৎ হইতে হিউম্ পর্যন্ত দার্শনিকগণ 'ধারণা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা একপ্রকার কার্যকারণ সম্বন্ধীয় মতবাদের সহিত জড়িত ছিল, সুতরাং ধারণাকে মনের বাহিরের কোন বস্তুদ্বারা উৎপন্ন কার্য বলিয়া মনে করা হইত। ইহাকে একপ্রকার জ্ঞাতৃনিষ্ঠ অথবা মানসিক প্রতিকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত এবং ইহাকে জ্ঞাতা মন এবং ইহার বাহিরে অবস্থিত একটি উৎপাদক এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু 'ধারণা' শব্দের মনোবিজ্ঞানে গৃহীত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি সূক্ষ্মতর এবং গূঢ়তর অর্থ আছে এবং লক্-এর পূর্বে এই অর্থটির কেহই পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। লক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মানুষ যখন চিন্তা করে তখন তাহার চিন্তার যাহা কিছু বিষয় হয় তাহাই ধারণা (Idea)। ইহা মানস প্রতিকৃতি মাত্র নয়, কারণ মানস প্রতিকৃতির যে কারণকে এই প্রতিকৃতি হইতে পৃথক বলিয়া মনে করা হইত তাহাও উক্ত দ্বিতীয় অর্থে ধারণা। কান্ট কার্যকারণ সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রভাব হইতে ধারণা শব্দটিকে সম্পূর্ণভাবে না হউক অধিক

সুনির্দিষ্টভাবে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জ্ঞেয় বস্তুগুলি যে সকল নিয়ামক ব্যাপারের অধীনে আসিলে জ্ঞাতা তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে কাণ্ট সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে কাণ্ট কেবলমাত্র চিন্তার নির্মাণশক্তি এবং ঐক্যবিধায়ক ক্রিয়ার মাধ্যমেই জগৎ আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে এই মত প্রচার করিয়া কাণ্ট যে সমুচিত কার্যই করিয়া-ছিলেন কাণ্টের পরবর্তী অধ্যাত্মবাদিগণ এ-বিষয়ে একমত হইলেও তাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত বস্তু সম্বন্ধে কাণ্টের মতকে পরিহার করিয়াছিলেন; কারণ এই মতের সহিত বৌদ্ধিক আকার ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না ইহা বুঝাইয়া কাণ্ট যে-ভাবে জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহার কোন সঙ্গতি নাই। এইভাবেই 'ধারণা' শব্দটি কার্যকারণ নিয়মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছিল, এবং তাহার পরে কোন অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকই 'ধারণা'কে মানস প্রতিকৃতি অথবা চৈতন্যের অবস্থা অর্থে ব্যবহার করেন নাই। গ্রীণ 'ধারণা'র এই নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে জ্ঞানগোচর বিষয় (Phenomenon)ও বলিয়াছিলেন এবং স্পেন্সারকে এইভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত অধ্যাত্মবাদকে স্নাতক শ্রেণীর প্রথম শিক্ষার্থীদের অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে ধারণার সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

'ধারণা' শব্দের অর্থ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'মন', চিন্তা' প্রভৃতি শব্দের অর্থেরও প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছিল এবং এক্ষেত্রেও দার্শনিক সাহিত্যে এই শব্দগুলির অর্থ যে অস্পষ্ট ছিল তাহা আবিষ্কার করিবার গৌরব কাণ্টের প্রাপ্য। মনের প্রত্যক্ষ জগতে ঐক্যবিধায়ক ক্রিয়া এবং প্রাক্‌প্রত্যক্ষ ঐক্যবিধায়ক ক্রিয়া এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া এবং 'আমি জানিতেছি' এই চিন্তাকে সকল অনুভবেরই প্রাক্‌-প্রত্যক্ষ নিয়ামক বলিয়া নির্দেশ করিয়া কাণ্ট মনের যে দুইটি রূপ আছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছিলেন। যথা—মন অন্যান্য জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুও বটে, এবং যে বিষয়ী সকল জ্ঞেয় বস্তুর অপেক্ষিত তাহাও। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া গ্রীণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞেয় জগৎকে বর্ণনা করিতে হইলে বিষয়ী-বিষয় সম্বন্ধই তাহার সাধারণ উপকরণ; কারণ জড়বস্তু জ্ঞাত হইলে উহা বিষয়ী-বিষয়ের সম্বন্ধে পরিণত হয় এবং মনও জ্ঞাত হইলে তাহাই হয়।[৪] তিনি আরও বলেন যে, জড় ও মনের সম্বন্ধ এবং বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ একই ইহা বলিলে ভুল করা হইবে। "প্রথম সম্বন্ধটির দুইটি সম্বন্ধীর অস্তিত্ব দ্বিতীয় সম্বন্ধের একটি বিশেষ প্রকারের উপর নির্ভর করে।" বিষয়ী-বিষয় সম্বন্ধ যে

বিষয়সমূহের সম্বন্ধের সহিত এক এই ভুল ধারণা একবার দূর হইলে অধ্যাত্ম-বাদীরা জ্ঞানের বিশ্লেষণে 'চিন্তা' শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেন সেই অর্থে ইহা কোন·বিশেষ জ্ঞাতৃসাপেক্ষ মানস ক্রিয়াকে বুঝাইতে পারে না।

এখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ব্যক্তিসাপেক্ষ বিজ্ঞানবাদের ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা মনকে অন্যান্য জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে একটি বলিয়া মনে করে কিন্তু সকল বস্তুরই অপেক্ষিত জ্ঞাতা বলিয়া নয়। মনসম্বন্ধে এইভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে জড়বস্তুর ন্যায় মনের·পক্ষেও দ্রব্য, কার্য-কারণ প্রভৃতি বৌদ্ধিক আকার-রূপে কতকগুলি অপরিহার্য পূর্বস্বীকার্য আছে। তাহা হইলে এই সকল পূর্ব-স্বীকার্য আকার মন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ইহা বলা ত্রিভুজের নিয়ম সমূহ বর্গক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে এইরূপ বলার মতই একান্ত অযৌক্তিক হইবে। এই বৌদ্ধিক আকারগুলি মন এবং জড়বস্তু উভয়েরই নিয়ামক হওয়ায় যেগুলি ব্যতীত মন আছে বলিয়া কল্পনাই করা যায় না সেই নিয়ামক ব্যাপারগুলিই মন হইতে আসিয়াছে 'এইরূপ চিন্তা করা একান্ত অযৌক্তিক হইবে। সেইজন্য গ্রীণ বলিতেছেন "যে স্বয়ং চেতন চিন্তা হইতে কারণ এবং দ্রব্যের ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে সেই চিন্তাকেই এই সকল ধারণার অধীনে আনিবার চেষ্টা করিলে শ্রেষ্ঠ লেখককেও নিশ্চয়ই· গোলযোগে পড়িতে হয়। যাহা থাকার জন্য জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর তাহাকে অন্য যে কোন বস্তুর ন্যায় জানিবার চেষ্টা করিবার প্রস্তাব করায় লক্-এর তাহাই হইয়াছিল।"[৫]

যে ব্যক্তি-সাপেক্ষ বিজ্ঞানবাদ 'ধারণা' 'মন' এবং 'চিন্তা'কে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করে তাহার সহিত সর্বাতিক্রমী অধ্যাত্মবাদকে অভিন্ন বলিয়া মনে না করিলে এই মতবাদের কোন সমালোচনা কার্যকরী হইবে না, কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাব্যতা যে সকল নিয়ামকের উপর নির্ভর করে কাণ্ট কর্তৃক সেইগুলির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার পর হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকৃত অধ্যাত্ম-বাদে স্থান পায় নাই। গ্রীণ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন নাই যে তিনি জড়দ্রব্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন; বস্তুতঃ তিনি নিজেই বহু বার বলিয়াছেন যে, যে জগৎ আমরা জানিতেছি তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন এবং মৃত্যুর সঙ্গে তিরোহিত হয় না। তাঁহার প্রকৃত অভিযোগ এই যে, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী 'ধারণা', 'মন', 'চিন্তা' প্রভৃতি শব্দগুলির মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা এই দুইটির অযথা সংমিশ্রণের ফলে 'ভিন্ন' এবং 'বহিঃস্থ' এই দুইটিকে সমার্থক

বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মন-বাদ (অর্থাৎ, যাহা কিছু আছে সে সমস্তই মন অথবা মনের বিকার মাত্র এই মত) এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ এই উভয় মতবাদই বস্তুসমূহের যৌক্তিক পূর্বস্বীকার্যগুলিকে বস্তুসমূহের সহিত এক পর্যায়ে আনিয়া যে ভ্রম করিয়াছে সে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই ভ্রমকে অবিষয়ঘটিত স্থানচ্যুতিরূপ ভ্রম (Fallacy of transcendental dislocation) অথবা "যাহা সামান্য তাহাকে অসঙ্গতঃ ভাবে বিশেষ বলিয়া মনে করা" এই ভ্রম বলা যাইতে পারে। জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলি যে দেশের উপর নির্ভরশীল তাহার সহিত উহারা এক পর্যায়ের পদার্থ অথবা উহার পাশে স্থান পাইবার যোগ্য এরূপ মনে করিলে যে ভ্রম হয় তাহার সহিত এই ভ্রম তুলনীয়। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে এই ভ্রম ঘটাকাশ বা মঠাকাশকে মহাকাশের সহিত একপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করার ন্যায়।

জ্ঞান সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী এই দুইয়ের অযথা একীকরণের ফলে যে অবিষয় ঘটিত স্থানচ্যুতিরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহা পরিহার করিতে সক্ষম হইলে তবেই গ্রীণ জ্ঞানের যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন আমরা তাহার অপর একটি গভীরতর স্তরের মূল্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। এ পর্যন্ত তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিষয় সমূহের মধ্যে যাবতীয় সম্বন্ধের অপেক্ষিত এবং বৌদ্ধিক প্রকারগুলি এই আন্তঃবৈষয়িক সম্বন্ধসমূহের জগতে একান্তভাবেই সত্য। ইহার পর তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন যে বিষয়ী বিষয়ের সম্বন্ধও চরম নহে, কিন্তু ইহাও এক স্বয়ং-সিদ্ধ চেতন-তত্ত্বকে ইহার ধারক রূপে নির্দেশ করে। গ্রীণ বলেন যে চিন্তা করার অর্থই হইতেছে কোন কিছুকে প্রভাবিত করা এবং কোন বস্তু কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হইলে বুঝিতে হইবে যে চিন্তার কার্য হইতেছে। যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা সম্ভব তাহার সহিত যে বস্তুদ্বারা উহা প্রভাবিত হইয়া থাকে উহার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই থাকিবে, অর্থাৎ চিন্তার প্রত্যেক বিষয়ই নিজেকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং বৌদ্ধিক প্রকারগুলি জগৎ যে সকল জ্ঞানের বিষয় দ্বারা নির্মিত সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করিবার বিভিন্ন উপায় মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, "জ্ঞেয় জগতের অস্তিত্ব এমন একটি ঐক্য বিধায়ক তত্ত্বের নির্দেশ দেয় যাহা নিজে জ্ঞেয় জগতের অংশ নয়, যে সকল সম্বন্ধ দ্বারা এই জগৎ গঠিত তাহাদের মধ্যে এক বা একাধিক সম্বন্ধ নয়, ইহা একটি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব, ইহার সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই বস্তুসমূহ পরস্পরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।" ..."ইহা এমন একটি চেতনতত্ত্ব যাহা কোনও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত নয়।"৬ এই স্বয়ং-সিদ্ধ চেতনতত্ত্বকে যাহাতে সকলে জ্ঞান এবং অনুভবের মূল তত্ত্বরূপে স্বীকার করে সেইজন্য গ্রীণ প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ইহাকে কোনও বিশিষ্ট বস্তুরূপে জানা না গেলেও বিশিষ্ট বস্তুগুলির মূলতত্ত্বরূপে ইহাকে অস্বীকারও করা যায় না। ইহার এমন একটি ক্রিয়া আছে "যাহা আমরা নিজেরাই জগতের জ্ঞান অর্জন করিবার সময়ে, যতই স্বল্পমাত্রায় হউক না কেন, সম্পাদন করি" এবং "ইহা সম্বন্ধে আমরা নঞর্থক ভাষায় বলিতে পারি যে ইহার ক্রিয়ার ফলে যে সকল সম্বন্ধদ্বারা বস্তুসমূহ গঠিত হইয়া থাকে তাহারা উহার সহিত জড়িত সম্বন্ধ নয়, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা উহা গঠিত হয় নাই।" ৭

আমরা উপরেই দেখাইয়াছি যে গ্রীণের বিশ্লেষণের মূল্য যদি আদৌ সঠিকভাবে বিচার করা যায় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত যে সাধারণ বুদ্ধি সব কিছুকেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন খণ্ডের সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করে তাহার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অথবা যে বুদ্ধিমূলক জ্ঞান সম্বন্ধ যুক্ত পদার্থসমূহের স্তরে অনিবার্যভাবে ক্রিয়া করে তাহার জ্ঞানতত্ত্বায় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহাকে বিচার করা চলিবে না। কিন্তু আমাদের যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত তাহা এই যে, যে সকল বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে জ্ঞান নিজেই যদি সেরূপ কোন বস্তু হয় তাহা হইলে সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে পারে কি না, অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে যে সকল বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে আমি নিজেই যদি সেরূপ কোন একটি বস্তু হইতাম তাহা হইলে আমি কখনও কোনও সম্বন্ধকে জানিতে পারিতাম কিনা। উদাহরণ স্বরূপ, দুইটি ঘটনার মধ্যে কালিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু গ্রীণ ঠিকই বলিয়াছেন যে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু হিসাবে সম্বন্ধযুক্ত ঘটনাসমূহের জ্ঞান এবং সেই ঘটনাগুলি এক নহে। যে জ্ঞানে এই ঘটনাগুলি পূর্বাপররূপে সম্বন্ধ তাহাতে পৌর্বাপর্য বলিয়া কিছু নাই। যে চিন্তা ভাষার প্রভাবগ্রস্ত, যাহা দ্বৈতবাদমূলক এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সঞ্চরমান তাহার স্বভাব অনুসরণ করিয়া যদি এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত চৈতন্য বা জ্ঞানকে দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে আমরা এই সকল উক্তির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান মোটেই পাইব না।

যে মত জগৎকে পরস্পরের সহিত মৌলিক সম্বন্ধরহিত খণ্ড বস্তুর সমষ্টিমাত্র বলিয়া মনে করে তাহা সংশোধিত হইলে এবং তাহার পরিবর্তে যে মতানুসারে জগতের বস্তুসমূহ সম্বন্ধ দ্বারাই গঠিত তাহা গৃহীত হইলে দ্বিতীয় মতবাদের সিদ্ধান্ত-

গুলিকে প্রথম মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমালোচনা করা যেমন সঙ্গত হইবে না, তেমনই জগতের চরমতত্ত্ব যে সকল সম্বন্ধের উর্ধ্বে সেই মত সম্বন্ধমূলক চিন্তার প্রকৃতির অনুযায়ী নয় এই কারণে উহার সিদ্ধান্তগুলিকে অসার বলিয়া মনে করা অথবা প্রত্যাখ্যান করাও সেইরূপ সঙ্গত হইবে না। শঙ্কর প্রদত্ত অনুভবের বিশ্লেষণ যেমন, গ্রীণের বিশ্লেষণেও তেমনই বহু-স্বতন্ত্র-বস্তুবাদ হইতে এক নিত্য মূলগত চৈতন্যতত্ত্বে যৌক্তিক গতি কোন বাধা পায় নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহার ফলে দ্বিতীয় মতটিকে প্রত্যাখ্যান করিলে জগৎ সম্বন্ধে বহু-স্বতন্ত্র-বস্তুবাদ গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

শঙ্করের বিশ্লেষণের সহিত গ্রীণের বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে, তবে গ্রীণ স্বয়ংসিদ্ধ চৈতন্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা অবশ্য একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তিনি যে এক্ষেত্রে সর্বত্র কৃতকার্য হন নাই তাহা মৎপ্রণীত "আত্মার স্বরূপ" নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-গুলির মধ্যে একটি। কিন্তু এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে গ্রীণের দর্শনের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা এখন সকল সম্বন্ধের অতীত চরমতত্ত্বে পৌঁছাইবার জন্য যে অপর একটি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইংরাজ অধ্যাত্মবাদের যে অংশে আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি তাহাতে ঈ. কেয়ার্ডের দানের বিশেষ গুরুত্ব নাই বলিয়া তাঁহার মতবাদের বিশেষ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি গ্রীণের দর্শনে অজ্ঞেয়বাদের অভিমুখে প্রবণতা আছে বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন (মাইণ্ড—অষ্টম বর্ষ, ১৮৮৩, পৃঃ ৫৬০ দ্রষ্টব্য) এবং অধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্র হইতে সম্বন্ধাতীত চরমতত্ত্বকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইংলণ্ডের অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকে পুনরায় হেগেলীয় চিন্তার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এই মন্তব্য করিয়া আমরা এফ্. এইচ্. ব্রাড্লের দর্শনের আলোচনায় অগ্রসর হইব।

৩। ফ্রান্সিস্ হারবার্ট ব্রাড্লে (১৮৪৬—১৯২৪ খৃঃ)

এফ্. এইচ্. ব্রাড্লের দার্শনিক মতবাদ অংশতঃ গ্রীণ প্রদত্ত অনুভবের বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং অংশতঃ উহারই পরবর্তী পরিণতি। আত্মজ্ঞান এবং যে সকল প্রত্যয় দ্বারা ইহা জগৎকে আত্মসাৎ করে তাহাদের কোন প্রাকৃতিক ইতিহাস থাকিতে পারে না গ্রীণ ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আমাদের জগতের

জ্ঞানের সহিত যে সকল প্রত্যয় জড়িত তাহাদের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিগুলিকে দেখাইয়া ব্রাডলে তাহাদিগকে অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীণের মত এই ছিল যে চিন্তার বাহিরে কোন কিছুরই সার্থকসত্তা থাকিতে পারে না, কিন্তু ব্রাডলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে চিন্তা, বস্তু এবং সম্বন্ধের ধারণার সাহায্যে ক্রিয়া করে বলিয়া ইহার মাধ্যমে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহা অবভাসমাত্র, জগতের স্বরূপ নহে। যে অপরিবর্তনীয় সুসংহত সম্বন্ধ সমষ্টি গ্রীণের জগৎ সম্বন্ধীয় মতবাদের কেন্দ্রীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাহা ব্রাড্লের অতিসূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে গুরুত্ব হারাইয়া কেবলমাত্র একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং ব্যবহারিক আপোষে পরিণত হইল। এইভাবে হার্কিউলিসের স্তম্ভগুলির উপর গ্রীণ তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সমগ্র ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাহা ব্রাড্লের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নাগার্জুন এবং চন্দ্রকীর্তির নেতৃত্বে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণও চিন্তার নিকট জগৎ যে শূন্যমাত্র ইহা দেখাইবার জন্য অনুরূপভাবে আমাদের মৌলিক প্রত্যয়গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিগুলি উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ প্রতিভাত জগতের অনির্বচনীয়তা প্রতিপাদন করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহারাও, বিশেষ করিয়া শ্রীহর্ষ এবং চিৎসুখ, অদ্বৈতবাদের সমর্থনে এই নেতিমূলক তর্কপদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহাদের দার্শনিক মত বহুলাংশে বিভিন্ন এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকটেও এই বিশিষ্ট নেতিমূলক তর্কপদ্ধতির সমাদর ছিল।

কিন্তু, পাশ্চাত্য দর্শনেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা প্রশ্ন করিতে পারি যে ব্রাড্লে চিন্তা এবং তাহার প্রকারগুলির অসারতা প্রতিপাদন করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন কি? অপরপক্ষে, তাঁহার পূর্বে হিউম যে ভুল করিয়াছিলেন তিনি নিজেও কি সেই একই ভুল করেন নাই? যে সকল নীতিকে তিনি সজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেগুলিকে কি তিনি নিজেই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন নাই? তিনি দর্শনকে অসঙ্গতিপূর্ণ অবভাস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অথচ নিজেই দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেইরূপ, কোনও সম্ভবপর সত্যই সম্পূর্ণ সত্য নয় ইহা বলিয়াও তিনি তাঁহার নিজের মত যে অভ্রান্ত সত্য এইরূপ দাবী করিয়াছেন। অবধারণ ক্রিয়া যে অসঙ্গতি পূর্ণ ইহা দেখাইয়াও তিনি জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে অসংখ্য অবধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে ব্রাডলের বিচারপদ্ধতিতে এই অসঙ্গতি হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত

করিতে হয় যে, দর্শন, সত্য বা অবধারণ নিন্দনীয় নহে, কিন্তু তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে ধারণা, সত্য সম্বন্ধে মতবাদ এবং অবধারণ ক্রিয়ার বিশ্লেষণ এইগুলিরই সংশোধন প্রয়োজন।

কিন্তু ব্রাডলে যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দার্শনিক ছিলেন তাহাতে বিশুদ্ধ সন্দেহবাদের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্ত সন্দেহবাদীর আক্রমণ হইতে চিন্তার দাবীগুলিকে রক্ষা করিতে তিনি সযত্ন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমরা "সঙ্গতি রক্ষা করিয়া জগৎ সম্বন্ধে কোন চরম সন্দেহ পোষণ করিতে পারি না," কারণ, চিন্তা করিতে গেলেই "আমাদিগকে সত্যের এমন একটি মান স্বীকার করিয়া লইতে হয় যাহাতে বুঝা যায় যে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের চরম জ্ঞান আছে। ইহাকে সন্দেহ করিলেও ইহাকেই স্বীকার করিতে হয়, ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেও ইহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।" এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ব্রাডলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে "মূল তত্ত্ব এমন একটা কিছু যাহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাই হইতেছে চরম মান। ইহা যে চরম তাহার প্রমাণ এই যে ইহাকে অস্বীকার এমন কি সন্দেহ করিবার চেষ্টা করিলেও আমাদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়।"

এই সকল উক্তি হইতে আমরা স্বভাবতঃই ইহা আশা করিতে পারি যে ব্রাড্‌লে অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীদের সহিত একমত হইয়া ইহাই বলিবেন যে স্বয়ং-সিদ্ধ চরম তত্ত্ব চিন্তার বহির্ভূত হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাড্‌লে যখন আমাদের মনে করাইয়া দেন যে এই চরম তত্ত্বের পক্ষে "আমাদের সমস্ত সত্তাকে পরিতৃপ্ত করা উচিত" এবং ইহাতে "সত্য এবং জীবন, সৌন্দর্য এবং মঙ্গল এই সকলের জন্য আমাদের প্রধান প্রধান আকাঙ্ক্ষাগুলি পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত" তখন সেই আশা চূর্ণ হইয়া যায়। যেহেতু কেবলমাত্র আমাদের বুদ্ধিই মতবাদ গঠন করে এবং তত্ত্ব-বিদ্যা বিশুদ্ধ মতবাদমাত্র সেহেতু এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বুদ্ধিকেই তৃপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বুদ্ধি ব্যতীত বেদনাত্মক অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তিও আছে এবং চরম সদ্বস্তুর পক্ষে "আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে তৃপ্ত করা উচিত", সুতরাং চরম সদ্বস্তু কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সমগ্র-সত্তা নয়। "ইহা বুদ্ধির অতীত একটি সমগ্র-সত্তা—একটি সামগ্রিক অনুভূতি—যাহাতে সমস্ত প্রতিভাত বস্তুর পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অনুভূতি একটি উচ্চতর স্তরের অপরোক্ষানুভূতি কিন্তু ইহার সমৃদ্ধির কোন ন্যূনতা নাই।" সুতরাং ব্রাড্‌লের মতে চরম সদ্বস্তুতে "চিন্তা ভিন্ন

'অপর একটা কিছু' আছে।" সেই সঙ্গে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে এই 'অপর কিছু' বুদ্ধির বাহিরে নাই, কারণ "যাহা চিন্তার প্রকৃত বা সম্ভাব্য বিষয় নহে চিন্তা এমন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে স্ব-বিরোধ দোষ ঘটিয়া থাকে।"[৮] তাহা হইলে এ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে এই 'অপর কিছু' চিন্তার বহির্ভূত নহে।

এইভাবে ব্রাড্‌লে একদিকে বলিতেছেন যে চরম সদ্বস্তুতে চিন্তার অতিরিক্ত কিছু আছে এবং অপরদিকে স্বীকার করিতেছেন যে চিন্তার বিষয় নয় এমন কিছুই ইহাতে নাই। এইস্থলে আমরা ব্রাড্‌লের দর্শনের যাহা কেন্দ্রীয় সমস্যা অথচ শক্তিশালী অংশ তাহার সম্মুখীন হই, এবং সেইজন্য এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধেও ইহার আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে উৎসুক যে, যদিও প্রত্যেক বস্তুই চিন্তার বিষয় তাহা হইলেও চিন্তা এবং বস্তু এক নয়। তাঁহার প্রথম উক্তিটি তাঁহার মতবাদকে অজ্ঞেয়বাদ হইতে এবং দ্বিতীয় উক্তি উহাকে সর্বচিন্তাবাদ হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁহার সমালোচকেরা সাধারণতঃ তাঁহার মতবাদের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই এবং তিনি তাঁহার বিরোধী মতবাদসমূহে যে সকল ভ্রম অবিরামভাবে দেখাইয়া আসিয়াছেন তিনি নিজেই ঠিক সেই সকল ভ্রমই করিয়াছেন এই বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিয়াছেন।[৮] বস্তুকে চিন্তামাত্রে পর্যবসিত করার তিনি যেমন বিরোধী তেমনই যাহা সম্পূর্ণভাবে চিন্তার অগম্য এমন কোন সদ্বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও তিনি বিরোধী। সুতরাং তিনি তাঁহার মতবাদে সর্বচিন্তাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা বলা অথবা তাঁহার মতবাদকে রহস্যমূলক অনুভূতিবাদ বলিয়া অভিহিত করা সমানভাবেই অবিবেচনার কাজ হইবে।[৯] রক্তহীন (নির্জীব) বৌদ্ধিক 'প্রকার'গুলির ব্রাড্‌লে যে ভাবে নিন্দা করিয়াছেন এবং অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই এই সকল মন্তব্যের অসারতা বুঝা যাইবে।

ব্রাডলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন তাহা শেষ পর্যন্ত যুক্তিসহ কি না অবশ্য অন্য প্রশ্ন। তিনি ইহাতে যে উভয়সঙ্কটের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তিনি নিজেই ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই।[১০] তিনি বলেন সে সদ্বস্তু যথার্থজ্ঞান হইতে পৃথক্ 'অপর কিছু,' কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে সত্যই পৃথক বলিয়া মনে করা যায় না। এই উভয়সঙ্কটের সমাধান না করিয়া তিনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়াছেন যে "আমরা সদ্বস্তুকে বিস্তৃত অর্থে অনুভূতি অথবা সংবেদনের সহিত একীভূত করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" ইহা নিশ্চয়ই কোন প্রকৃত সমাধান নয়, পরন্তু সঙ্কটময় অবস্থায় আত্মপ্রতারণার নীতিমাত্র।

বস্তুতঃ, যাহা সকল জ্ঞেয় বস্তুর অপেক্ষিত তাহাকে জ্ঞেয়বিষয়রূপে গণ্য করার যে সর্বনাশকর প্রবণতা তাহা হইতে দর্শনশাস্ত্র নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম না হইলে এই সঙ্কটের কোন সমাধান হইতে পারে না। ব্রাড্‌লে প্রায়ই 'চিন্তা' কথাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে লইয়া ইহাকে অন্যান্য বস্তুর পার্শ্বে অবস্থিত অপর একটি বস্তু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে তিনি কখনও কখনও ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কোন বিশেষ বস্তুর যে বৈশিষ্ট্য তাহা চিন্তাই নির্দেশ করে।[১১] ইহা সুস্পষ্ট যে চিন্তাকে যদি সকল প্রকার ভেদের সাধারণ পটভূমিকা বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে ইহাকে আমাদের স্বভাবের অন্যান্য অংশ যেমন বেদনাভূতি, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদির সমতুল্য অন্য একটি উপাদান বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এরূপ করিলে যাহা সামান্য তাহাকে অসঙ্গতভাবে বিশেষে পরিণত করিয়া ভ্রম করা হয়। চিন্তা যে ধারণা জগতেই সীমাবদ্ধ ইহা দেখাইবার জন্য ব্রাড্‌লে যে শ্রমসাধ্য তর্ক করিয়াছেন এবং চিন্তাকে আত্মহত্যা দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন তাহাতে এই সামান্যকে বিশেষে পরিণত করিবার ভ্রম বর্তমান। কারণ, তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, "যখন কোন সাধারণ নিয়মকে সন্দেহজনক বলিয়া প্রমাণ করিতে গেলে প্রতি পদেই উহাকে বিনা সর্তে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয় তখন ঐরূপ চেষ্টা অপেক্ষা অযৌক্তিক আর কি হইতে পারে?" নিজের করণীয় সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে এরূপ কোন অধ্যাত্মবাদীই চিন্তাকে মনের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় একটি বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিলে যে অযৌক্তিক কার্য করা হয় তাহা করিতে সম্মত হইবেন না এবং এই চিন্তাকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত চিন্তার একটি বিষয়ে পরিণত করিয়া স্বভাববাদীদের ন্যায় ভ্রম করিবেন না।[১২] সকল বস্তুর অবিচ্ছেদ্য সহগামী বলিয়া সমস্ত অবধারণ ক্রিয়ার সহগামী বিরোধ বাধক নিয়মের মতই চিন্তার দোষ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক ইহাকে বিষয়ীভূতও করা যায় না। এই সম্পর্কে, ইংরাজ অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে যে চিন্তাকে তাহার নিজের বিষয়ে পরিণত করার প্রবণতা আছে এই বলিয়া ইতালীয় অধ্যাত্মবাদীরা যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা কিয়দংশে সমর্থনযোগ্য।[১৩] জগতের গণতন্ত্রে অন্যান্য জ্ঞেয় বিষয়ের ন্যায় চিন্তাও একটি বিষয় এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা না থাকিলে বস্তুকে চিন্তায় পরিণত করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

বস্তুতঃ ইংরাজ অধ্যাত্মবাদে এই ভ্রম একটি স্থায়ী প্রবণতারূপে রহিয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের যাহা অপেক্ষিত তাহাকে বিষয়ীভূত করিবার প্রচেষ্টা যে স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী ব্রাড্‌লের উভয়সঙ্কট ইহাই সূচিত করে। তাহা হইলেও

ইংরাজ অধ্যাত্মবাদের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে গ্রীণ এবং ব্রাড্‌লে এই দুইজন ইংরাজ অধ্যাত্মবাদী সম্বন্ধমূলক অনুভূতির ক্ষেত্রেই যে চরম তত্ত্বকে পাওয়া যায় এই বিশ্বাস ধ্বংস করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ শেষ পর্যন্ত এই যে গ্রীণ[১৪] ইহাকে স্বয়ংসিদ্ধ চৈতন্য বা কূটস্থ আত্মা বলিয়াছেন এবং ইহা বৌদ্ধিক প্রকারসমূহের আকর বলিয়া উহাতে এই প্রকারগুলি প্রয়োগ করা যায় না বলিয়াছেন, আর ব্রাড্‌লে এই বস্তুগুলি সম্বন্ধদ্বারা কলুষিত বলিয়া উহাদের যথার্থ সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন এবং চরম সদ্বস্তুকে বিশুদ্ধ ইচ্ছা-শক্তি এবং বিশুদ্ধ চিন্তার পার্থক্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং পার্থক্য এবং সম্বন্ধ বর্জিত নিম্নস্তরের অনুভূতির অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর অপরোক্ষত্ব বিশিষ্ট সামগ্রিক অনুভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাড্‌লে মনে করেন যে চৈতন্যের মৌলিক সত্তা নাই[১৫] এবং আত্মা সকল প্রকার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইলে উহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।[১৬] এইজন্যই এই ক্ষেত্রে গ্রীণের মত ব্রাড্‌লেকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে অপরোক্ষ অনুভূতিকে সর্বপ্রকার সম্বন্ধমূলক জ্ঞানের চরম ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এমন কি তাহাও অনুরূপ সমস্যা হইতে মুক্ত নহে। তিনি বলেন যে চরম সমস্যাগুলি সমাধান করিবার যে একমাত্র পথ আছে তাহা অপরোক্ষানুভূতিই মুক্ত করিতে পারে, ইহা একাধারে চৈতন্য ও সত্তা, সর্বপ্রকার সম্বন্ধবিযুক্ত সাক্ষাৎজ্ঞান। ইহাকে ব্যাখ্যাও করা যায় না, বর্ণনাও করা যায় না। এস্থলে কি আমরা যাহাকে অবর্ণনীয় বলা হইয়াছে তাহাকে বর্ণনা করিবার এবং যাহা সম্বন্ধসংস্পর্শ বর্জিত তাহাকে বুঝাইতে সম্বন্ধ নির্দেশক শব্দ ব্যবহারের যে সমস্যা তাহার সম্মুখীন হইতেছি না? ব্রাড্‌লের সমালোচকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে সম্বন্ধমূলক অনুভূতির যাহা চরম অপেক্ষিত তাহার স্বভাব সম্বন্ধে ব্রাড্‌লে যাহা মনে করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। কিন্তু তাঁহার এই মত যদি ভ্রান্ত না হইয়া সত্য হয় তাহা হইলে উহাকে আত্মা বা চৈতন্য বা জ্ঞান বলাই উচিত। ইহার অস্তিত্বকে খণ্ডন করিতে অথবা সন্দেহ করিতে হইলেও ইহাকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে অনুভূতি বলা উচিত নয়, কারণ অন্যান্য শব্দগুলি অপেক্ষা ইহারই সহিত সম্বন্ধের অধিক ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এক্ষেত্রে গ্রীণ নিশ্চয়ই যে সকল শব্দদ্বারা চরমতত্ত্বকে বর্ণনা করা উচিত তাহাদের নির্বাচনে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

৪। বার্নার্ড বোসাঙ্কেট (১৮৪৮-১৯২৩ খৃঃ)

গ্রীণের দর্শনে যে অধ্যাত্মবাদ মোটের উপর হেগেলীয় দর্শনের অনুগামী ছিল ব্রাড্‌লে সম্বন্ধমূলক চিন্তার আপোষহীন সমালোচনা করিয়া তাহাকে এক নূতন রূপ দিয়াছিলেন। গ্রীণের সহিত বোসাঙ্কেটের মতভেদ কোনও কোনও বিষয়ে গ্রীণের সহিত ব্রাড্‌লের মতভেদ অপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ছিল এবং তিনি গ্রীণের দর্শনে আরও অধিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। সেইরূপ, যদিও ইহা সত্য যে ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কেট পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট সহ-যোগিতায় জগৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, এবং বোসাঙ্কেট সর্বত্রই কোনও পদার্থ সম্বন্ধে "ইহা হয় এইরূপ হইবে অথবা অন্যরূপ হইবে ইহা ছাড়া অন্য কোনও সম্ভাবনাই নাই" ব্রাড্‌লের এই ধরণের মতকে "ইহা উভয়ই হইতে পারে" এইরূপ মতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু Metz ঠিকই বলিয়াছেন যে বোসাঙ্কেটের এই আপোষমূলক মনোভাবের জন্য তাঁহাকে এমন কতকগুলি মত স্বীকার করিতে হইয়াছিল যাহাদের তাঁহার নিজের মতবাদের সহিত সঙ্গতি ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্বভাববাদ এবং অধ্যাত্মবাদের মধ্যে যে বিষয় লইয়া বিবাদ তাহা তিনি এমন নূতনভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন যে তাহাতে গ্রীণের মত এবং তাঁহার মতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হয়। গ্রীণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞেয় জগতের অস্তিত্ব হইতে এই জগতের অংশ নয় অথচ ইহাকে ঐক্য দিয়াছে এমন কিছুর অস্তিত্ব সূচিত হয়। কিন্তু বোসাঙ্কেট বলেন "ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমরা যদি মনে করি যে জ্ঞান জগতের 'অংশ' হইলে ইহা সত্য হইতে পারে না, তাহা হইলে জ্ঞানকে সত্য হইতে হইলে ইহাকে জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং জগতের অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে।"[১৭]

সুতরাং, বোসাঙ্কেটের মতে জ্ঞানকে জগতের আত্ম-প্রকাশের মূল আকার বলিয়া মনে করিতে হইবে, এবং মন ইহার ব্যাখ্যারূপ ক্রিয়াদ্বারা এই আত্ম-প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়া ইহাকে বিশ্বেরই একটা অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা সুস্পষ্ট যে স্বভাববাদ এবং অধ্যাত্মবাদ এই দুইয়ের বিরোধী দাবীগুলির সামঞ্জস্যসাধনের জন্য বোসাঙ্কেট যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা লট্‌জে যে নীতিদ্বারা আত্মা এবং জড় এই দুই বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মিলন ঘটাইতে

চাহিয়াছিলেন তাহারই প্রসারমাত্র। লট্‌জে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রকৃতি নিজেই সুর এবং র-এর সৌন্দর্য উৎপন্ন এবং ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজে নিজে ইহা করিতে পারে না, ইহার জন্য কেবলমাত্র যে অনুভূতি-বিশিষ্ট মন ইহার মূক চেষ্টাকে ভাষা দিতে পারে তাহাকেই ইহার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্ররূপে প্রয়োজন হয়। লট্‌জে যদিও গৌণগুণগুলি সম্বন্ধেই এই সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা হইলেও বোসাঙ্কেট ইহাদের মধ্যে স্বভাববাদ এবং অধ্যাত্মবাদের বিরোধ হ্রাস করিবার জন্য একটি সুবিধাজনক দার্শনিক পদ্ধতির সন্ধান পাইয়াছেন।

'সমগ্রতাই সত্য'—অধ্যাত্মবাদের এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করিতে এবং ইহা হইতে নিঃসৃত যৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছাইতে বোসাঙ্কেট যে মানসিক প্রযত্ন করিয়াছেন তাহাতেই অধ্যাত্মবাদের পূর্ব চিন্তাধারা হইতে তাঁহার পার্থক্যের চরম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ববর্তিগণের হস্তে এই সূত্রটি যে সুফল উৎপন্ন করিয়াছিল তাহাতে তিনি সন্তোষলাভ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়; কারণ, তাঁহাদের দার্শনিক বিশ্লেষণ জগতে একটি জৈব ঐক্য আছে এই বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও আমাদের জীবন এবং উপলব্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত পূর্ণ তাৎপর্য কি হইতে পারে তাহা তাঁহারা বিশদভাবে দেখান নাই। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাড্‌লের বিশ্লেষণ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বৌদ্ধিক ও অ-বৌদ্ধিক এই দুইটি দিকের মধ্যে যে দ্বৈতভাব আছে তাহাকেই আরও প্রখর করিয়া তুলিয়াছে এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছে যে যদিও দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে সব কিছুই স্বীকার করাইয়া লওয়া যায় না তাহা হইলেও ইহা অপূর্ণ অবভাস মাত্র। অপরপক্ষে, বোসাঙ্কেট এই বলিয়া এই দ্বৈতভাবের প্রখরতা হ্রাস করিয়াছেন যে সত্যতার মান সর্বত্রই এক, সুতরাং "কুরুচিই কু-যুক্তি এবং কু-যুক্তিই কুরুচি।" সেইজন্য তিনি দর্শনশাস্ত্রে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ যুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি অনুমোদন করেন না এবং তাহার পরিবর্তে আমাদের উপলব্ধি-গুলিকে যাহাকে তাহাদের কেন্দ্রীয়ভাব বলে তদনুযায়ী বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতির পক্ষপাতী। বর্তমান প্রসঙ্গে এই পদ্ধতি পরিবর্তনের মোট ফলের মূল্য নির্ণয় করা অসম্ভব, সুতরাং 'সমগ্রতাই সত্য' এই সূত্র হইতে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব।

এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি হইতেছে এই যে "কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর নিয়মগুলি" যে তথাকথিত অনিশ্চিত সত্যসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ এই দাবী

অস্বীকার করিতে হইবে। "বস্তুতঃ আমাদের উপলব্ধিগত সমগ্র জগৎকে অস্বীকার করা যায় বলিয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না বলিয়াই সর্বাপেক্ষা সরল প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ সত্যগুলিকে অস্বীকার করিবার সময়েই আমরা উহাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই।"[১৮] সত্যতার চরমমান সম্বন্ধে ব্রাড্‌লের যে মত, অর্থাৎ ইহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিলে অথবা এমনকি সন্দেহ করিবার চেষ্টা করিলেও উহাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করা হয়—এই মতের আংশিক সমালোচনা এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে। আবশ্যিক সত্যমাত্রই সর্তসাপেক্ষ ইহা ধরিয়া লইলে "বিরোধ-বাধক নিয়মসদৃশ সাধারণ নিয়মগুলি যে আকারগত সত্যতাবিশিষ্ট বচন এবং ইহাদের প্রত্যেকটি তাহাদের নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই সম্পূর্ণ এবং স্বতঃসিদ্ধ এবং সমগ্র জ্ঞান-সমষ্টিতে কোন পরিবর্তন হইলেও ইহাদের কোন পরিবর্তন হয় না" এরূপ মনে করা উচিত হইবে না।[১৯] অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, "প্রত্যেক অবধারণের সত্যতার প্রমাণ সমগ্র সংহতিবদ্ধ সমষ্টির মধ্যে পাওয়া যাইবে" এবং এই সংহতিবদ্ধ সমষ্টি হইতে "প্রত্যেক বচন এবং প্রত্যেক অবধারণ অর্থ এবং সত্যতা লাভ করিয়া থাকে।"[২০] বোসাঙ্কেটের মতে সদ্বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে "যে সকল অবধারণের আকারীয় সত্যতা অস্বীকার করা যায় না তাহাদের অপেক্ষা ধর্মীয় এবং নৈতিক উপলব্ধি অথবা সৌন্দর্য ও বিজ্ঞানের জগতের সাক্ষ্যই উচ্চস্তরের এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[২১] সমগ্রসত্তা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়াই তাঁহার এই মতের অর্থ বুঝিতে হইবে।

এই সকল উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া প্রথম যে বিষয়টির উপর আমরা গুরুত্ব দিতে চাই তাহা হইতেছে এই যে বোসাঙ্কেটের যুক্তিধারাগুলি সব সময়ে একই দিকে অগ্রসর হয় না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন যে "বিরোধ-বাধক নিয়ম বলে যে সদ্বস্তু সুসমঞ্জস ঐক্য—ইহা অবশ্য সদ্বস্তু যে ঐক্য এই কথারই পুনরুক্তি মাত্র"।[২২] কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই নিয়মটি সাক্ষাৎভাবে আবশ্যিক নহে এবং ইহার আবশ্যিকতা সমগ্র সুসমঞ্জস জগৎ হইতেই আসিয়াছে ইহা বলিতে বিরত হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি এই আপাতপ্রতীয়মান অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সেইজন্যই বলিয়াছেন যে আবশ্যিক সত্য এবং সম্ভাব্য সত্যের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করাই তাঁহার যুক্তিসমূহের উদ্দেশ্য।[২৩] এক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিবর্তন করিয়াছেন। আবশ্যিক সত্য এবং সম্ভাব্য সত্যের মধ্যে পার্থক্যের সমালোচনা করিতে গিয়া বোসাঙ্কেট লাইব্‌নিজের বিরুদ্ধে গ্রীণের যুক্তিগুলিকে অনুসরণ করিয়াছেন।[২৪] কিন্তু ইহাই মনে হয় যে অঙ্কশাস্ত্রীয়

সত্য এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যসমূহের মধ্যে পার্থক্য করার বিরুদ্ধে গ্রীণ যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা দ্বারা বিরোধ-বাধক নিয়মের আবশ্যিকতা যে অন্যান্য সত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা প্রমাণিত হয় না ইহা বোসাঙ্কেট বুঝিতে পারেন নাই। গ্রীণ যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই যে কোন বচন সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ সর্তনিরপেক্ষভাবে সত্য এইরূপ মনে করা হইলে জগতের ঐক্যের ধারণার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহার বিরুদ্ধবচনকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ জগতের ঐক্যকে স্বীকার না করিয়া কোন বচনকেই বস্তুতঃ সত্য কিংবা মিথ্যা বলিয়া মনে করা চলে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, গ্রীণের মতানুসারে জগতের ঐক্যের সহিত প্রত্যেক বচনের অবশ্যই সঙ্গতি থাকিবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কোন প্রদত্ত বচনের সর্তহীন সত্যতার মূলে জগতের ঐক্যই রহিয়াছে এইরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং বিরোধ-বাধক নিয়ম যে সিদ্ধ এবং ইহাকে প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই ইহা গ্রীণ ধরিয়াই লইয়াছেন। অপর পক্ষে, বোসাঙ্কেট কোন বচনকে প্রমাণ করিবার জন্য গ্রীণ যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেইগুলির সাহায্যেই এই অপেক্ষিত সত্যটিকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রায় গ্রীণের ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি বলিয়াছেন "প্রত্যেক সত্য বচন শেষ পর্যন্ত এই জন্যই সত্য যে আমাদের সমগ্র অনুভবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার বিরুদ্ধ বচনকে সত্য বলিয়া চিন্তা করা যায় না।" কিন্তু ইহা মনে হয় যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, সত্যতার এই মান বিরোধ-বাধক নিয়মের অপেক্ষা করে বলিয়া উহাকেই আবার প্রমাণ করিতে পারে না এবং এই নিয়মটি অন্যান্য বচনের ন্যায় অপর একটি বচন নয়।

প্রমাণ এবং অপেক্ষিত সত্য এই দুইয়ের পার্থক্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই বোসাঙ্কেট বিরোধ-বাধক নিয়ম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার জন্য কিছুটা স্থান দিয়াছি। আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা যদি এ পর্যন্ত ঠিক হয় তাহা হইলে দার্শনিকদের মধ্যে যাহারা যে সকল জ্ঞানসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রমাণ বা অ-প্রমাণের ভিত্তিস্থানীয় হওয়ায় নিজেরা প্রমাণিত বা অ-প্রমাণিত হইতে পারে না তাহাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে অক্ষম তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই যে সকল ভ্রম করা সম্ভবপর সেইগুলি নির্দেশ করা কঠিন হইবে না। তাহারা ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া তাহাদিগকে অস্বীকার করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সত্যতাকে পুনরায় স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এক্ষেত্রে ব্রাড্‌লে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক; এবং বোসাঙ্কেটের সমালোচনা যে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও বোসাঙ্কেট যাহা অপেক্ষিত সত্য এবং যাহাকে প্রমাণ অথবা খণ্ডন করিতে হইবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য না করিয়া একই প্রকার ভুল করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও ইংরাজ চিন্তাধারার প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতা অনুসরণ করিয়া তিনি আত্মাকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিচারের বিষয় করিয়াছেন এবং দেখিতে পাইয়াছেন যে আত্মা স্বয়ং "জড়-জগৎ হইতেই তাহার উপাদান সংগ্রহ করে এবং বহির্জগতের পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহের সম্মুখে অবস্থিত জ্ঞাতারূপে সেই উপাদান ব্যবহার করিয়া আত্মানুভব লাভ করিয়া থাকে।" যথার্থ আত্মা এমন একটি জিনিষ যাহাকে নির্মাণ করিতে এবং জয় করিতে হয় এবং যত্ন ও কষ্টের সহিত একত্র ধরিয়া রাখিতে হয়, উপভোগের বস্তু হিসাবে ইহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে না।" "ইহা সমগ্রকে প্রাপ্ত হইতে চায় এমন একটি খণ্ড বস্তুর মত।" ইহা অবশ্য নিঃসন্দেহ যে, এক অর্থে জড়জগতের অস্তিত্ব "কেবলমাত্র সসীম মনের মাধ্যমে কিন্তু সসীম মনসমূহও কেবলমাত্র জড়জগতের মাধ্যমে অস্তিত্ববান্।" এই ধরণের আরও বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে গ্রীণের মতবাদ হইতে বোসাঙ্কেটের মতবাদের কি গুরুতর পার্থক্য বর্তমান, কারণ গ্রীণের মতে বিষয়-সমূহের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ হইতে পারে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিষয়ী—বিষয় সম্বন্ধ তাহাদের অপেক্ষিত। এই ক্ষেত্রে বোসাঙ্কেটের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা তাঁহাকে লক্ এবং ভারতীয় দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের একটি প্রভাবশালী অংশের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। এই ঐতিহ্যানুসারে আত্মা অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি বিষয়মাত্র এবং সেই হিসাবে অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যে ভাবে প্রমাণ করিতে হয় ইহার অস্তিত্বও ঠিক সেই-ভাবেই প্রমাণ করিতে হয়। ইহা সমস্ত বিষয়ের অপেক্ষিত নয় এবং সেইজন্য সকল প্রমাণ এবং খণ্ডনের ভিত্তিও নয়। অদ্বৈত-দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে, যে আগন্তুক বিষয়ের প্রমাণ বা খণ্ডন সম্ভবপর তাহার সহিত স্বয়ং-সিদ্ধ তত্ত্বের অবিবেকের ফলেই এইরূপ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে।২৫

এই প্রকার বিভ্রমকারী অবিবেকের বিরুদ্ধেই কাণ্ট মনের দ্বিবিধ স্বভাবের উপর জোর দিয়াছেন। এই জন্যই গ্রীণ বিষয়ী-বিষয়ের সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। মনগুলিকে "দ্রব্য, দানাবাঁধা কণিকা, পতিত অথবা স্বর্গীয় দেবদূত" বলিয়া মনে করিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে "উত্থান পতনশীল জলপ্রবাহের" সহিত তুলনা করিতে হইবে, অথবা জড়বস্তু এবং প্রাণ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিয়া মনে করিতে হইবে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়

প্রশ্ন নয়; আত্মসচেতন চিন্তার সহিত সম্পর্কহীন বস্তুর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, এবং এই আত্ম-সচেতন চিন্তা যে সকল বস্তুর অপেক্ষিত তাহাদের অস্তিত্ব যে ভাবে প্রমাণ করা হয় ইহাকেও সেইভাবে প্রমাণ করা যায় কি না—আত্মা-সম্বন্ধীয় কোন যুক্তিযুক্ত দার্শনিক মতবাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন।

মনকে জগতের অঙ্গরূপে কল্পনা করিলেও যেমন, উহাকে দ্রব্যরূপে কল্পনা করিলেও তেমনই, জগৎ কি করিয়া জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। 'দ্রব্য' এবং 'কারণ'—এই দুইটি যান্ত্রিক ধারণা যেমন, জীববিদ্যায় ব্যবহৃত মূল ধারণাগুলিও তেমনই আত্ম-সচেতন চিন্তাকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ইহা সত্য যে মনকে জগতের অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিলে নিরবচ্ছিন্নতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে আত্মা এবং জড়জগৎ ইহাদিগকে দ্রব্য বলিয়া ধারণা করিলে যে আত্যন্তিক দ্বৈতের উদ্ভব হয় তাহার প্রখরতা কমিয়া যায়। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাতে অংশী ও অংশ এবং জীবদেহ ও তাহার পরিবেশ এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্মতর দ্বৈতভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে। অংশ ও অংশীর মধ্যে অবশ্য নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু অংশকে যদি অংশীর অধিকারভুক্ত অথবা অধীনস্থ বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, যে বিষয়ী সকল বিষয় এবং বিষয়সমূহের সম্বন্ধ কর্তৃক অপেক্ষিত তাহাকে অংশ বলা চলে না। আরও সুনির্দিষ্টভাবে ইহাই বলা যায় যে, ভেদসম্বন্ধ সমেত সকল প্রকার সম্বন্ধ বিষয়ীর উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য বিষয়ী অন্য একটি বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত অথবা উহা হইতে ভিন্ন একটি বস্তু হইতে পারে না। প্রায়ই যেমন বলা হইয়া থাকে, সকলপ্রকার ভেদ চৈতন্য অথবা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; ইহার অর্থ এই যে চৈতন্য অথবা জ্ঞানকে ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পৃথক করা অসম্ভব। তাহা হইলেও অপরপক্ষে অবস্থা এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান কেবলমাত্র শূন্য অথবা সকল প্রকার আধেয়বর্জিত নিকৃষ্ট পদার্থমাত্রে পর্যবসিত হইবে না; ইহার অর্থ কেবলমাত্র এই যে জ্ঞানকে অস্বীকার করা অসম্ভব হইলেও ইহা অনির্বচনীয়।

সুতরাং বিষয়ী এবং জ্ঞানের ধারণাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা এমন একটি তত্ত্বকে নির্দেশ করে যাহা সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত। এই তত্ত্বকে যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদীই হউন অথবা জ্ঞানবাদীই হউন তাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রচণ্ড উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। ভেদ-সম্বন্ধ সমেত সকল সম্বন্ধই যে বিষয় সমূহের মধ্যেই থাকে এই অনিবার্য সিদ্ধান্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের এই উদ্বেগ চরমে উঠে।

উদাহরণ-স্বরূপ, যখন Cook Wilson বুঝিতে পারেন যে বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে আমরা এমন কতকগুলি সাধারণ ধারণা ব্যবহার করি যাহারা কেবলমাত্র বিষয়গুলির সম্বন্ধ ব্যঞ্জক, ২৬, অথবা যখন ব্রাড্লে বলেন যে যথেচ্ছাচার না করিয়া কঠোর দৃষ্টিতে দেখিলে সাক্ষাৎ অনুভব এবং যাহা তাহার অতীত এই দুইয়ের মধ্যে আমরা কোন সম্বন্ধের অস্তিত্বের কথা বলিতে পারি না তখন নিঃসন্দেহে আমাদের বিচারমূলক বুদ্ধিতে সাংঘাতিক আঘাত লাগে, কিন্তু সেইজন্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত বিশ্লেষণ দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই এবং সেই বিশ্লেষণকে তাহার অস্বস্তিকর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার অনিচ্ছার ত কথাই নাই। ব্রাড্লের মতে সাক্ষাৎ অনুভবকে সম্বন্ধ-ব্যঞ্জক বুদ্ধি দ্বারা বর্ণনা করা যায়না কেবলমাত্র এই যুক্তির ভিত্তিতেই, এবং ব্রাড্লে যে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে এই অনুভবকে বর্ণনা করা যায়না তাহা সত্ত্বেও, সমালোচকেরা তাঁহার মতবাদের নিন্দা করিয়া প্রায় সর্বদাই ভুল করিয়াছেন। এই দিক দিয়া দেখিলে ব্রাড্লে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শঙ্করের মতই দুর্ভাগ্য ছিলেন।

এস্থলে এই সকল বিষয় লইয়া আরও অধিক আলোচনা করা সম্ভবপর নয়, সুতরাং আমরা কেবলমাত্র আমাদের এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াই অগ্রসর হইতে পারি যে গ্রীণ এবং ব্রাড্লে যে সম্বন্ধ-মূলক অনুভবের ভিত্তি-স্বরূপ এমন একটি সম্বন্ধ-রহিত তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছিলেন যাহাকে স্বীকার না করিলে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও ভ্রমে পতিত হন বহুলপরিমাণে ইহা দ্বারাই যুক্তিযুক্ত দার্শনিক মতবাদ গঠনে তাঁহাদের দানের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। অপরপক্ষে, বোসাঙ্কেট সমগ্র সত্তা (The Whole)-র ধারণা লইয়া এতই মুগ্ধ যে কেবল-মাত্র অসুবিধাজনক সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়রূপে না হইলে যে তত্ত্ব অনুভবের সম্বন্ধ রহিত ভিত্তি তাহার মূল্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। বোসাঙ্কেটের সমালোচকেরা যে তাঁহার দার্শনিক বিশ্লেষণের অসঙ্গতি-গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রায়ই বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অধ্যাপক W. Cunningham এই সকল অসঙ্গতির মধ্যে একটিকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছেন যে বোসাঙ্কেটকে হয় চরম সদ্বস্তু যে অনুভূতিস্বরূপ এই মত পরিত্যাগ করিতে হইবে নতুবা "স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুমাত্রেরই সত্তা উহা যাহা নয় তাহার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে (The Principle of Negativity) এই ধারণার কোনও তাত্ত্বিক

তাৎপর্য নাই।"[২৭] জগৎ যে সকল উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে জ্ঞানকে তাহাদের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া, এবং উহা যে জগতের ভিত্তি-স্থানীয় তাহা উপলব্ধি' করিতে না পারিয়া তিনি যে ভ্রম করিয়াছেন তাহাই গুরুতর এবং সম্ভবতঃ অধিক মৌলিক ভ্রম। আমরা যাহাকে 'অবিষয় ঘটিত স্থানচ্যুতি' রূপ ভ্রম বলিয়াছি ইহা তাহারই একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

৫। জে, এম, ঈ, ম্যাকটাগার্ট (খৃঃ ১৮৬৬-১৯২৫)

ম্যাকৃটাগার্টের দার্শনিক মতবাদে হেগেলীয় দর্শন এবং ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কেট যে দেশজ পরম্পরাগত ইংরাজ চিন্তার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এই দুইয়ের সমন্বয়-সাধনের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা দেখা যায়। গ্রীণ এবং কেয়ার্ড আত্ম-চেতনার ঐক্যের যথার্থতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া জ্ঞান-সম্বন্ধীয় এবং তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলিকে ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিবার পদ্ধতির নিন্দা করিয়াছিলেন, অপরপক্ষে, ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কেট মানব-স্বভাবের বুদ্ধি-বৃত্তির দিককে অন্যান্য দিক হইতে পৃথক করিবার প্রবণতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে সঙ্গতির জন্য বুদ্ধি যে দাবী করে চরম সদ্বস্তুকে তাহাও যেমন মিটাইতে হইবে আবার বুদ্ধি যে মনুষ্য যে মনুষ্য-স্বভাবের অংশমাত্র তাহার প্রধান প্রধান দাবগুলিও মিটাইতে হইবে। সেইজন্যই ব্রাড্‌লে মনে করিতেন যে চিন্তা একটি অপূর্ণাঙ্গ অবভাস এবং বেদনানুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ন্যায়ই ইহাকেও চিন্তা ও অন্যান্য মনোবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া যে একটি সমগ্রসত্তা আছে তাহাতে স্থানলাভ করিতে হইলে পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত হইতে হইবে। সুতরাং ব্রাড্‌লের মতে জগৎ যে কেবলমাত্র বুদ্ধির দিক হইতে সুসমঞ্জস হইতে হইবে এমন নয় "ইহাকে সর্বতোভাবেই সুসমঞ্জস হইতে হইবে।" ঠিক এইভাবেই ম্যাকৃটাগার্ট জ্ঞান বিশ্বকে যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ করিতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে জ্ঞানকে অনুপযুক্ত বলা কি একান্তই অযৌক্তিক নয়? তাঁহার উত্তর এই যে "কোন আদর্শ নির্দেশ করা এবং উহাকে বাস্তবরূপ দান করা এই দুইয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে।" জ্ঞান আমাদিগকে উহার নিজের আদর্শ দেখাইয়া দেয় কিন্তু উহাকে বাস্তবরূপ দান করিতে পারে না। জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তির দোষ এক বলিয়াই মনে হয়—তাহা হইতেছে এই

যে ইহাদের প্রত্যেকটিতেই একটি অনাত্মা বাহিরের অথবা ভিন্নজাতীয় বস্তু হিসাবে উপস্থিত থাকে। কেবলমাত্র প্রেমরূপ হৃদয়াবেগেই "আমাদের প্রেমাস্পদ নিজেকে যে ভাবে দেখে আমরা তাহাকেও সেইভাবেই দেখিতে পারি" এবং যাহা আমা হইতে ভিন্ন তাহাকে আর আকস্মিক বা ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে হয় না। দ্বন্দ্ব-মূলক বিচারের দৃষ্টিতে আত্মা এবং অনাত্মা উভয়েই সমভাবে সত্য; কিন্তু প্রত্যেকেই চরমসত্তার একটি উপাদানমাত্র এবং এই চরমসত্তা নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ স্বয়ংসৎ চৈতন্য-কেন্দ্রের সমষ্টি। গ্রীণের মতানুসারে বিরোধের একটি পক্ষকে অপরপক্ষে পরিণত করিতে হইবে। ম্যাকৃটাগার্ট এই মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং মনে করেন যে দ্বন্দ্বমূলক বিচারের দৃষ্টিতে ইহা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে সসীম আত্মা সমূহই চরম সদ্বস্তুর মৌলিক অংশ এবং ইহাদের প্রেমের মাধ্যমেই চরম সদ্বস্তুর পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে।[২৯]

ম্যাকটাগার্টের দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি দিযাছেন সেগুলি সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, অথবা হেগেলীয় দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতির তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যথার্থ কিনা তাহাও পরীক্ষা করার প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মনের যে ত্রিধা বিভাগ স্থায়ীভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তদনুসারে তিনি যে জ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তি এবং ভাবাবেগের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন। কাণ্টের জ্ঞান-বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত ইহাই ছিল যে মনোবিজ্ঞান জ্ঞানসম্বন্ধীয় কতকগুলি পূর্বস্বীকৃত সত্যের উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য এইগুলিকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যায় না। ইংলণ্ডে গ্রীণ এবং কেয়ার্ড যে অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার প্রতিনিধি তাহা এই বিশ্বাস হইতেই প্রেরণালাভ করিয়াছিল। পরে অবশ্য ব্রাড্‌লে পুনরায় মনোবিজ্ঞান এবং জ্ঞানতত্ত্বের অযথা সংমিশ্রণের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে যুক্তিবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাড্‌লে যুক্তিবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার যে অনতিক্রমনীয় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে H. Joachim যে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে ইংরাজ অধ্যাত্মবাদীরা সকলে এই দ্বৈত-বাদকে গ্রহণ করেন নাই।[৩০]

সমস্ত বিষয়টি হয়ত অন্যরূপে আরও পরিষ্কারভাবে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি এবং ভাবাবেগ এই তিনের পার্থক্যকে যথার্থ পার্থক্য বলিয়া

স্বীকার করিলে ইহার সহিত যে বিশ্লেষণের সঙ্গতি নাই তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। এই পার্থক্যের বৈধতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিলে ইহা যে সত্য বলিয়া দাবী করে এমন কতকগুলি যুক্তি হইতে নিঃসৃত সিদ্ধান্ত তাহা দেখাইতে হইবে। তাহাদের স্বীকৃত সত্যতার উপরেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নির্ভর করে। এই অর্থে যথার্থ-জ্ঞান এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু নিহিত আছে তাহাই এই পার্থক্যের একমাত্র ভিত্তি এবং আশ্রয়স্থল। অনুরূপভাবে, জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি এবং ভাবাবেগ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা স্থির করিতে হইলে ঐকান্তিকভাবে সত্য জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান শব্দটি দ্ব্যর্থক। মানসিক বৃত্তিগুলির মনোবিজ্ঞান সম্মত পার্থক্য করিতে হইলে যে মূল জ্ঞানকে স্বীকার করা প্রয়োজন ইহা তাহাকে নির্দেশ করিতে পারে অথবা মনোবিজ্ঞান মনের যে সকল উপাদানের প্রভেদ করে তাহাদের মধ্যে একটিকে নির্দেশ করিতে পারে। সমস্ত পদার্থেরই ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া যে সকল উপাদানকে পরস্পর হইতে পৃথক করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন একটির সহিত জ্ঞানকে এক বলিয়া মনে করা যায় না এবং তাহাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, যে বহুকাল প্রচলিত বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী দর্শনের মতে "জ্ঞানের বিষয় তাহার সত্তার জন্য চেতন বিষয়ীর উপর অথবা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে" ম্যাক্‌টাগার্ট কেন তাহা পরিহার করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্তে বার্কলে, লাইব্‌নিজ অথবা ওয়ার্ডের ন্যায় বহু-জীববাদ গ্রহণ করিয়াছেন। মন অথবা জ্ঞানের মনোবিজ্ঞানসম্মত যে ধারণা অর্থাৎ ইহা অন্যান্য বস্তুর সমপর্যায়ভুক্ত অপর একটি বস্তু, এই ধারণার সহিত অধ্যাত্মবাদ অনিবার্যভাবে সংশিষ্ট তাঁহার এই অযৌক্তিক বিশ্বাসই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ন্যায় তাঁহারও অসন্তোষের মূল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গ্রীণ এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাকে সকল অনুভবের ভিত্তিমূলে এমন এক অনন্যসিদ্ধ চেতন তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল যাহাকে কেবলমাত্র নঞর্থক ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর। ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কেট দর্শনে যে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করিয়া ম্যাক্‌টাগার্ট হেগেলীয় দর্শনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানবাদের প্রতি নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। জগৎকে শেষ পর্যন্ত আত্মার প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে এই বিশ্বাসই তাঁহার এবং ইংরাজ

জ্ঞানবাদের মধ্যে একমাত্র সংযোগসূত্র। কিন্তু এই সংযোগসূত্র এতই দুর্বল যে উহা স্পষ্টতঃ বহুবাদ অভিমুখী তাঁহার পারমার্থিক অধ্যাত্মবাদের (Ontological idealism) ভার বহন করিতে অক্ষম। ম্যাক্‌টাগার্ট 'আত্মা' (spirit) শব্দটি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার মূল অর্থ (জ্ঞানের) বিষয়ঘটিত ধারণা সমূহ দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত হইয়া আছে যে গ্রীণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত আত্মতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবগুলির সহিত উহার সামঞ্জস্য হয় না। ইহা যে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় তাহার কারণ হইতেছে এই যে কোন শব্দের আদিম অর্থ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গেলেও উহা আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ, এক ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এবং অপর এক ব্যক্তির শয়তান সম্বন্ধে ধারণা অভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহারা একই শব্দ ব্যবহার করে বলিয়া উভয়েই ঈশ্বরবাদীর প্রাপ্য সুনাম উপভোগ করিতে পারে। গ্রীণ এবং ম্যাক্‌টাগার্ট যে 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও ইহা সত্য। তাঁহাদের চিন্তাসমূহের গতিবিধি হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবের মধ্যে ঘটিলেও শঙ্কর এবং মাধব উভয়েই বাদরায়ণের দর্শনের অনুবর্তী বলিয়া দাবী করিলেও যেমন শঙ্করের ব্রহ্মবাদ মাধবের ব্রহ্মবাদের বিরোধী তেমনই ইহাদের একজনের সিদ্ধান্তগুলি অপরের সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধী।

যে দ্রব্য আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি হইতে মুক্ত তাহা যে অবশ্যই চৈতন্যময় দ্রব্য হইবে, সুতরাং কেবলমাত্র এইরূপ দ্রব্যেরই সত্তা আছে ইহা প্রমাণ করিতে ম্যাক্‌টাগার্ট যে প্রযত্ন করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও অসাধারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তিনি ইহা ধরিয়া লইযাছেন যে, যে সকল ধারণা সসীমদ্রব্য বিশিষ্ট জগতে প্রযোজ্য তাহা সমস্ত সসীম বস্তুর যাহা যৌক্তিক অপেক্ষিত তত্ত্ব তাহার সম্বন্ধেও অপ্রযোজ্য নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ বিশ্বাস থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া স্বপ্নমাত্র হইবে। ইহা বিশদভাবে দেখাইতে হইলে ম্যাক্‌টাগার্টের যুক্তিগুলির, বিশেষ করিয়া তাঁহার (Principle of Determining Correspondence)-এর বিস্তারিত বিচার করিতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজ অধ্যাত্মবাদের কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি, সুতরাং এইরূপ বিচার ইহার ক্ষেত্রের বহির্ভূত।

দ্রষ্টব্য

১। আত্মা, চিন্তা এবং চরমতত্ত্ব, পৃঃ ৫৫
২।' Rudolf Metz, *A Hundred Years of British Philosoply*, পৃঃ ২৬৮
৩। *Prolegomena*, Section 47
৪। গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬
৫। ঐ, পৃঃ ১০৯
৬। গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০
৭। *Prolegomena*, Section 52
৮। *Appearance and Reality*, 9th impression, পৃঃ ১৫৫
৯। Aliotta, *Idealistie Re-action against Science*, পৃঃ ১০৫
১০। *Appearance and Reality*, পৃঃ ৪৯২
১১। ঐ পৃঃ ১৫৫
১২। Green, *Prolegomena*, section 47
১৩। Ruggiero, *Modern Philosophy*, পৃঃ ২৭০
১৪। গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৭
১৫। *Essays on Truth and Reality*, পৃঃ ১৯৪
১৬। *Appearance and Reality*, পৃঃ ৪৯৭
১৭। *Logic*, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২২
১৮। *The Principle of Individuality and Value*, পৃঃ ২৬৭
১৯। *Logic*, Book II, পৃঃ ২৩৮
২০। ঐ পৃঃ ৪৬
২১। *The Principle*, পৃঃ ৪৮
২২। *Logic*, Book II, পৃঃ ২১৩
২৩। *The Principle*, পৃঃ ৪৮
২৪। গ্রীণের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪
২৫। ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য ২।৩।৭
২৬। *Statement and Inference*, পৃঃ ৮০৩
২৭। *The Idealistic Arguments*, পৃ. ৪২৭
২৮। *Hegelian Cosmology*, পৃঃ ২৭৪
২৯। *A Commentary on Hegel's Logic*, পৃঃ ১১০
৩০। *The Nature of Truth.*

গ্রন্থবিবরণী

Metz, Dr. Rudolph : *A Hundred years of British Philosophy.*

Haldar, Hiralal : *Neo-Hegelianism.*

Cunningham G. W. : *The Idealistic Argument in Recent British and American Philosophy.*

Hoernle, R. F. A. : *Idealism.*

Ewing, A. C. : *Idealism : A Critical survey.*

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইতালী ও আমেরিকার অধ্যাত্মবাদ

১। ভূমিকা

'অধ্যাত্মবাদ' শব্দটির নানা অর্থ আছে এবং প্রসঙ্গানুযায়ী ইহার অর্থের ব্যতিক্রম হয়। এই প্রবন্ধে দার্শনিক মতবাদরূপেই অধ্যাত্মবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এইরূপ মতবাদ হিসাবে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে ইহার দীর্ঘ এবং বিচিত্র ইতিহাস আছে এবং ইহা বহুসংখ্যক এবং পরস্পর হইতে বহুলপরিমাণে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এই মতবাদের বিভিন্ন আকার আলোচনা করা অথবা তাহাদের ইতিহাস বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, ইতালী ও আমেরিকায় এই মতবাদ যে সকল আকার ধারণ করিয়াছে তাহাদের প্রধান ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে প্রতিনিধি-স্থানীয় ক্রোচে এবং জেন্টিলে, রয়েস্ এবং হাউইসনের প্রতি যথাক্রমে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ যেরূপ করা হইয়া থাকে সেইভাবে একসত্তাবাদ (Absolutism) এবং বহু-আত্মাবাদ (Spiritual Pluralism) অধ্যাত্মবাদের এই দুইটি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে পার্থক্য করিলে ক্রোচে এবং জেন্টিলেকে প্রথমটির, হাউইসন্‌কে দ্বিতীয়টির সমর্থক বলিয়া এবং রয়েস্‌কে উহাদের সমন্বয়কারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্মানীর অধ্যাত্মবাদ প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলির উপর আধিপত্য করিয়াছিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ইংলণ্ডে একটি অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছিল এবং ব্রাড্‌লে, বোসাঙ্কেট প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যক্ষবাদের চর্চা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং সেখান কাণ্ট, ফিশ্‌টে এবং হেগেলের গ্রন্থসমূহ পুঙখানুপুঙখরূপে এবং যত্নের সহিত পঠিত হইত। রয়েস্ বিশেষ করিয়া ফিশ্‌টের গভীর প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই প্রভাব দ্বারা চালিত হইয়া তিনি তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যাত্মবাদী দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ইতালীতে কিন্তু "হেগেলকেই সাম্প্রতিক

নব অধ্যাত্মবাদী দর্শনের আধ্যাত্মিক জনক বলা যায়, এই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের দুইজন প্রধান ব্যাখ্যাতা হইতেছেন ক্রোচে এবং জেন্টিলে।"

ক্রোচে, জেন্টিলে, রয়েস্ এবং হাউইসনের অধ্যাত্মবাদ ব্রাড্‌লের অধ্যাত্মবাদ হইতে পৃথক। তাঁহারা সকলেই 'নিশ্চল জগতে'র বিরোধী, গতিই যে জগতের স্বরূপ এবং প্রযত্নই যে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই মতে বিশ্বাসী এবং ব্যবহারিক জগতের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া থাকেন। সেইজন্য ইঁহাদিগকে একত্র আলোচনা করা হইতেছে।

ক। ইতালীয় অধ্যাত্মবাদ

ক্রোচে এবং জেণ্টিলের নব অধ্যাত্মবাদী দর্শন স্বভাববাদ এবং নৈষ্ঠিক খৃষ্টধর্মের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নির্দেশ করে ইহা বলিলে এই দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইতে পারে। ইহা মুখ্যতঃ তত্ত্ববিদ্যাবিরোধী এবং মানবতাবাদী। তাঁহাদের দর্শনকে আরও বোধগম্য করিবার জন্য যে সকল দার্শনিক তাঁহাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিয়াছিলেন—যেমন ভিকো, স্পাভেণ্টা এবং ফ্রান্সেস্কো ডি সাংটিস—ইহাদের নাম করিতে পারি। হেগেল সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্রোচে এবং জেণ্টিলে তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার জন্য তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার দর্শনের সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজেদের চিন্তা এবং অনুভবকে অনুসরণ করিয়া নূতন ধারায় তাঁহাদের নিজেদের দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বন্দ্বমূলক বিচার-পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য আছে ইহা স্বীকার করিয়াও মূর্ত সামান্যের (Concrete Universal) ভিতর পৃথক পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধকে বিরোধী পদার্থের সম্বন্ধ বলিয়া ভ্রম করিবার জন্য তাঁহার দোষ দেখাইয়াছেন। ক্রোচে এবং জেণ্টিলের মতে এই বিভ্রমের ফলেই হেগেলের চিন্তা-সর্বস্ববাদের উদ্ভব হইয়াছিল। এককথায় তাঁহাদের দৃষ্টিতে হেগেল ছিলেন "দ্বন্দ্বাত্মক ত্রিতয়সমূহ বয়নকারী" এবং "যাহাতে কোন পরিবর্তন হইতে পারে না এমন মতবাদের প্রবর্তক।"

ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২ খৃঃ)

আত্মাবিষয়ক দর্শন—বেনিদেত্তো ক্রোচে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র রক্ষণশীল, বিত্তবান্ রাজভক্ত ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি

প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। রোমে তিনি নীতিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কতকগুলি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার আগ্রহ ছিল কিন্তু ইহাদের মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তিনি সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্র চর্চার দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। দার্শনিকদিগকে সাধারণতঃ দারিদ্র্য এবং অধ্যাপকতা রূপ যে দণ্ড দিতে হয় তাহা না দিয়াও তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। বহুলাংশে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে যোগদান করিতে হইয়াছিল এবং "সম্ভবতঃ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রী পরিষদকে দার্শনিক মর্যাদা দিবার জন্য" তাঁহাকে শিক্ষা-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আন্তরিকতার সহিত রাষ্ট্রীয় কার্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি জেণ্টিলের সহায়তায় তাঁহার বিখ্যাত পত্রিকা 'লা ক্রিতিকা' পরিচালনা করিতেই প্রধানতঃ তাঁহার সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধকে তিনি আত্মঘাতী মনোবিকার বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের সহিত কোন সংশ্রব রাখেন নাই এবং সেইজন্য ইংলণ্ডে বারট্রাণ্ড রাসেল এবং ফ্রান্সে রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় তিনিও ইতালীতে সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ-প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার "ঐতিহাসিক জড়বাদ এবং কার্লমার্ক্স" নামক গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং জড়বাদ যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দর্শন অথবা এমন কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইতে পারে তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। মন বা আত্মাকেই তিনি প্রাথমিক এবং চরম সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি "আত্মা-সম্বন্ধীয় দর্শন"[১] এই নামে চারখণ্ডে লিখিত গ্রন্থ এবং তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "হেগেলীয় দর্শনের কোন কোন অংশ জীবিত এবং কোন কোন অংশ মৃত" সংবলিত "দার্শনিক প্রবন্ধাবলী" নামক গ্রন্থে তাঁহার মতকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ক্রোচে তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে আত্মা-সম্বন্ধীয় দর্শন এই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে মন বা আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু। মন বা আত্মা নহে এমন কোন সদ্বস্তু নাই। অর্থাৎ, চরমসত্তা যে কোন রূপ ধরে অথবা ধরিতে পারে তাহা মনের উপর নির্ভরশীল। মন সৃজনধর্মী এবং চরমসত্তার ব্যাখ্যাই উহার সৃজনক্রিয়া। চরমসত্তা গতিশীল এবং বিশিষ্ট সত্তা (The concrete)ই একমাত্র সদ্বস্তু। চরমসত্তা মন কিংবা আত্মা ইহা বলার অর্থই হইতেছে এই যে চরমসত্তা অনুভব। ইহা এমন

একটি ক্রিয়া যাহার আকারগুলির ভেদ বুঝা গেলেও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইহা সর্বাংশেই মনোময় একটি সুসংহত সমষ্টি, একটি ঐক্য বিশিষ্ট সমগ্র সত্তা। তাহা হইলে বিষয়সমূহ দ্বারা গঠিত মূর্ত জগৎ, বিষয়ী এবং বিষয়ের পার্থক্য কি করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে? ক্রোচে বলেন যে "জ্ঞাত পদার্থ হিসাবে মূর্ত জগৎ সম্পূর্ণভাবেই সৌন্দর্য ও বুদ্ধির জগৎ।" বিষয়ী এবং বিষয়ের যে পার্থক্য উহাও মনেরই সৃষ্টি। মনই নিজের বিষয়সমূহ সৃষ্টি করে এবং তাহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে অনুভব এমন একটি ক্রিয়া যাহা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সৃষ্টি করে।

ক্রোচের মতে মনের দুইটি বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া আছে—যথা (১) জ্ঞানাত্মক এবং ব্যবহারাত্মক, জানা এবং করা, অথবা যথাঃক্রমে বুদ্ধির ক্রিয়া এবং সঙ্কল্প। এই দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। "সঙ্কল্প যে ভাবে বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বুদ্ধি সে ভাবে সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে না। প্রতি ক্ষেত্রেই জানার উদ্দেশ্য কিছু করা, কিন্তু জানিবার জন্য অবশ্যই কিছু করিতে হইবে এমন নয়।"[২]

জ্ঞান একটি সক্রিয় ব্যাপার, ইহার দুইটি আকার আছে—অনুভূতি এবং ধারণাত্মক চিন্তা, অথবা যথাক্রমে রসাত্মক এবং বিচারাত্মক ক্রিয়া। এই দুইটির পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেছে "প্রথম স্তরের সহিত দ্বিতীয় স্তরের সম্বন্ধ"; কারণ বিচারাত্মক প্রক্রিয়া রসাত্মক প্রক্রিয়া অথবা প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু রসাত্মক ক্রিয়া অন্য কোন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। ব্যবহারেরও সেইরূপ অর্থকরী ও নৈতিক অর্থাৎ উপকারী ও শ্রেয়স্কর এই দুইটি বিভাগ আছে। সুন্দর এবং সত্য, উপকারী এবং শুভ—এই চারিটি হইতেছে স্পষ্টতঃ বিভিন্ন, শুদ্ধ, সর্বগত ধারণা। ইহাদের প্রত্যেকেই সমগ্র জগতের যে বিভিন্নরূপ আছে তাহাদের মধ্যে একটিকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করে।

জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াঃ অনুভূতি এবং ধারণা ঃ—"জ্ঞানের দুইটি আকার আছে। ইহা হয় অনুভূতিমূলক জ্ঞান অথবা বিচারাত্মক জ্ঞান; কল্পনালব্ধ জ্ঞান অথবা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান, ব্যক্তির জ্ঞান অথবা সামান্যের জ্ঞান; সংক্ষেপে, জ্ঞান হয় কতকগুলি প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অথবা কতকগুলি সার্বিক ধারণার সৃষ্টি করে।"[৩]

ক্রোচে জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রথম উপ-বিভাগ অনুভূতি বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন? পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। কোন চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত চন্দ্রালোকের দৃশ্য, কোন সঙ্গীতের উপজীব্য বস্তু, কোন মানচিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপরেখা—এই সমস্তই অনুভূতি হইতে পারে এবং বুদ্ধি কর্তৃক